॥ প্রমাণ-পঞ্জী ॥

গ্রন্থে যেসব প্রামাণিক পুস্তক, সরকারী বিবরণ এবং বিভিন্ন পত্র-সাময়িকী দেখা হয়েছে, নীচে তাদের কতকগুলির নাম উল্লেখ করা হলো।

auses of the Indian Revolt—Sayyid Ahmad Khan.
History of the Sepoy War—Kaye.
istory of the Indian Mutiny—Malleson.
History of the Indian Mutiny—Holmes.
History of the Indian Mutiny—Forrest.
History of the Indian Mutiny—Charles Ball.
Cawnpore—Treveleyan.
My Diary in India—Russell.
History of the Siege of Delhi—
By One Who Served There.
Correspondence of Lord Canning.
The Sepoy Revolt—Henry Mead.
Reminiscences of the Indian Mutiny—Mit...
Sepoy Revolt—Innes
Muting Letters, Despatches and Military Retu...
Forres...
Punjab Government Records and Mutiny Correspondence and Reports.
Indian Empire—Martin.
Pursuit of Tantia Topee—Blackwood's Magazine, 1860.
Memoirs of Sir Henry Havelock—Marshman.
Forty-one years in India—Lord Roberts.
Mutinies in Oudh—Gubbins.
Siege of Lucknow—Rees.
Other Side of the Medal—Thompson.
irst War of Independence—Savarkar.
welve Years in India—Hodson.
ise and Fall of the East India Company—
Ramkrishna Mukherjee.
lhousie's Administration—Arnold.
lia under Dalhousie and Canning—Duke of Arg...
orty-three years in India—Sir G... ge Lawrence.
...els of a H...doo—Bholanath ...under.
Empire of ...

এই লেখকের ॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র	কা
ছোটদের ছত্রপতি	ছোটদের অরবিন্দ	ছে
ছোটদের বিবেকানন্দ	ছোটদের গৌতমবুদ্ধ	ক
লীলা-কথ	মহাচীনে শ্রীনেহরু	গে
নিবেদিতা	নিবেদিতা-নৈবেদ্য	না.
SISTER NIVEDITA		OUR BUI

॥ পরবর্তী বই ॥

বিদ্যাসাগর

মানুষের আত্মকথা

কেমন করে স্বাধীন হলাম?

জাতি বা one nation বলতে যা বোঝায়, সেদিন ভারতে তা
হই ছিল না। জাতীয়তাবোধ তখনো ইতিহাসের গর্ভে। তবে
করবার বিষয় এই যে, বিপ্লবে যোগদানকারীদের মানসিকত
প্রমের ভাবাবেগেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তা নইলে বিপ্লব এত
কাল স্থায়ী হতো না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে
এই বিদ্রোহের ফলেই পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে
সাধারণের মধ্যে দেখা দিল জাতীয়তাবোধ এবং এ
তীয়তাবোধের পথ দিয়েই আমরা ধীরে ধীরে সংগ্রাম করে
ধীনতা লাভ করেছি।

সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক মূল্য এইখানেই।

প্রকৃতপক্ষে সেদিন যা ঘটেছিল আজকের রাজনৈতিক পরিভাষায়
তার নাম 'মিলিটারি কুপ' (military coup) বা সামরিক
অভ্যুত্থান। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে অভ্যুত্থানের অর্থ ও তাৎপর্যের
সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন। তাই এর গুরুত্ব লাঘব করার
উদ্দেশ্যে সামরিক সেই অভ্যুত্থানকে তাঁরা অভিহিত করেছিলেন
সিপাহী বিদ্রোহ বা সিপাহী যুদ্ধ আখ্যায়। কিন্তু বিদেশী
ঐতিহাসিকের লেখনী আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করলেও
... অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর
সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করবার জন্যে বহু পরস্পর-বিরোধী স্বা
র্থের সেদিন সাময়িক সমন্বয় ঘটেছিল এবং সংগ্রামরত
সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনসাধারণের নৈতিক সম
র্থন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয় সহযোগিতা।

একটা মহৎ প্রেরণা ভিন্ন এত বড় একটা ঘটনা কিছুতেই ঘটতে পারত
না। এই বিদ্রোহ যদি কেবলমাত্র কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ও স্বার্থান্বেষীর
প্রচেষ্টামাত্র হতো, তাহলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর সিপাহী
বিপ্লবের আগুনে এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত না, কিংবা বাহাদুর

শাহ, নানাসাহেব, অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসির রাণা, কুঁর্ঘরা,
আহমদ উদ্দৌল্লা প্রভৃতিকে এই আবর্তের মধ্যে—এই সংঘর্ষের
কখনই টেনে আনত না। আজ শতবর্ষের ব্যবধানে, ১৮৫৭-র বি
সম্পর্কে, তার নেতৃত্বের স্বরূপ ও চরিত্র নিয়ে আমরা যদি নিরা
ভাবে বিচার করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে
যে, এই বিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্বের অংশ গ্রহণ করেছিলেন,
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন বা হৃত ক্ষমতা ফিরে পা
আশায় বিদ্রোহ করেন নি; অথবা কোম্পানীর সিপাহী
কেবলমাত্র জাতি ও ধর্ম নাশের ভয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র
করেনি—একটা বৃহত্তর, মহত্তর উদ্দেশ্য এঁদের সবাইকে প্রের
দিয়েছিল।

বিদ্রোহ যেমন অনিবার্য ছিল, এর ব্যর্থতাও ছিল তেমনি অবধারিত
অসন্তুষ্ট ও অত্যাচারিত জনগণ ছিল বিদ্রোহীদের পেছনে, কি
তিহাস তখন ইংরেজদের পেছনে। তাই শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রো
র্থক হতে পারেনি। একেবারে যে সার্থক হয়নি তা নয়। ভারতে
সনভার তখন ছিল একটা লিমিটেড কোম্পানীর হাতে। ইতিহাসে
গোঁজামিল (anomaly), এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান
দিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ। এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে
দ্রোহ সার্থক হয় নি—ইতিহাসের নেপথ্য বিধানেই হয়নি।
ই বিদ্রোহ, এই অভ্যুত্থান সম্পূর্ণভাবে সার্থক হতো, তা'হলে
রতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে আবার দেখা দিত অন্ধকারের যুগ
মন্ত রাজাদের আধিপত্য স্থাপিত হতো এবং তার ফলে ভারতব
দীর্ঘকালের জন্য মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে চলে যেত।
ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘুরত। এটাও বোধ করি ইতিহাসের
ভিপ্রেত ছিল না। তাই এই বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি।
বিদ্রোহের যেমন একাধিক কারণ ছিল, বিদ্রোহ ব্যর্থ হবারও তেমনি

...থিক কারণ ছিল। এই সম্পর্কে আমি যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

সুতরাং ইতিহাসের নিরপেক্ষ মানদণ্ডে ১৮৫৭-র এই অভ্যুত্থানকে জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম না বলতে পারলেও, দেশের ইতিহাসে এর গুরুত্বকে আমরা কিছুতেই লঘু করে দেখতে চলে না। সেদিনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অর্থ ও তাৎপর্য আজকের নৈতিক পটভূমিকায় বিচার্য নয়। আগেই বলেছি, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ সেদিন ছিল না, তথাপি সেদিনের সেই খণ্ড, ছিন্ন ও দুর্বল ভারতে এত বড়ো একটা সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা, বৃটিশ সিংহের মহাশক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এই সশস্ত্র অভিযান তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে না কেন? বৈদেশিক শাসনপাশ ছিন্ন করবার একটা দুরন্ত প্রচেষ্টা এই বিদ্রোহ—এতে কোনো ভুল নেই। এই স্মরণীয় বিদ্রোহ-ই সেদিন একটা উজ্জ্বল ও মহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ যুগান্তরের মুখে আমাদের এনে দিয়েছিল। কাজেই এ-বিদ্রোহ ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পরাজয়ের গ্লানি সত্ত্বেও, তাঁদের শৌর্য এবং আত্মোৎসর্গ ভারতের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য। শতাব্দীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে জাতি তার সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবে আর চিরদিন স্মরণ করবে শৃঙ্খল-মোচনের জন্য তাদের সেই সর্বস্বপণ আত্মদান।

কলিকাতা
১৯৫৭

মণি বাগচি

বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ

। এক

লাহোর-দরবার।

পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাহোর-দরবার।

সেই লাহোর-দরবারে আজ এসেছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। শিখ-বিজয়ী হার্ডিঞ্জ।

জম্মুর শাসনকর্তা, রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র, রাজা গুলাব সিংহ তখন লাহোর দরবারের প্রধান মন্ত্রী। কাশ্মীরের ওপর তাঁর অনেক দিনের লোভ। সেই লোভ মেটাবার সুযোগ এল এত দিনে। প্রথম শিখযুদ্ধে পাঞ্জাবের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেল। খালসা সেনাপতি সর্দার তেজ সিংহ ও রাজা লাল সিংহ গোপনে ইংরেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করলেন। কর্ণেল নিকল্‌সনের বীরত্ব নয়, শিখ সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতাই শিখদের পরাজয়ের কারণ। পলাশি-যুদ্ধের পুনরভিনয় হলো প্রথম শিখযুদ্ধে—বৃটিশ সেনানায়কদের সেই চাতুরী আর শিখ সেনাপতিদের সেই বিশ্বাসঘাতকতা। তারপর সন্ধি। মিয়াঁমীরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে নির্ধারিত হলো এই সন্ধি। এইভাবে শিখপ্রধানদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে লর্ড হাডিঞ্জ কৌশলে গ্রাস করলেন পাঞ্জাব। রণজিৎ সিংহের রাজ্য নামে মাত্র স্বাধীন রইল।

লাহোর-দরবারে লর্ড হার্ডিঞ্জ আজ শিখ-প্রধানদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন সন্ধিপত্র। রণজিৎ সিংহের নাবালক পুত্র কুমার দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে রণজিৎ-মহিষী রাণী ঝিন্দনের সম্মুখে হলো এই অনুষ্ঠান। কোম্পানীর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো—মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য আমরা স্বাধীনভাবেই রাখলাম, তবে সন্ধির সর্ত অনুসারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মাঝামাঝি জলন্ধর দোয়াব অঞ্চল গ্রহণ করলেন আর যেসব খালসা সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, তাদের নিরস্ত্রীকৃত করা হলো। রাখা হলো বিশ হাজার পদাতিক ও বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

দরবারের সকলেই বিনা প্রতিবাদে কোম্পানীর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল। তারপর লর্ড হার্ডিঞ্জ বললেন—মহারাজ রণজিৎ সিংহ কোষাগারে বারো কোটি টাকা রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোষাগার খুলে দেখা গেল আছে মাত্র ছ' কোটি। মনে হয় বাকী টাকা দরবারের অমাত্যদের বেহিসাবী খরচে নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এই টাকার জন্যে কোম্পানীর সরকার কাশ্মীর রাজ্যটা নেবেন ঠিক করেছেন। ঝিন্দনের বুক থেকে সকলের অলক্ষ্যে উঠল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। হার্ডিঞ্জের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা গুলাব সিংহ এগিয়ে এসে লর্ড হার্ডিঞ্জকে বললেন—আমি তিন কোটি টাকা দিচ্ছি, কাশ্মীর আমাকে দিন। তাই হলো। দরবারে কেউ এর প্রতিবাদ করল না। গুলাব সিংহ হার্ডিঞ্জের কাছ থেকে তিন কোটি টাকা মূল্য দিয়ে কাশ্মীর কিনে নিলেন। রণজিৎ সিংহের বিরাট রাজ্যের একটা বড় অংশ হাতছাড়া হলো, ভারতের মানচিত্রে শুরু হলো শিখরাজ্যের সঙ্কোচন।

দলীপ সিংহ নাবালক। ঝিন্দনের হাতে রাজ্যশাসনের ভার। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী হার্ডিঞ্জ বললেন, রাজা গুলাব সিংহের পর, রাজা লাল সিংহকে আমি লাহোর দরবারের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করলাম। লাল সিংহ বেশী দিন দরবারে থাকতে পারলেন না। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও অযোগ্যতার ফলে রণজিতের বিস্তৃত রাজ্য আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তাঁকে আগ্রায় নির্বাসিত করা হলো। রাণী ঝিন্দনের সঙ্গে কোম্পানীর আবার সন্ধি হলো—বাইরবলের সন্ধি। এই সন্ধির নিয়মানুসারে দলীপ সিংহ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত একটি প্রতিনিধি সভাদ্বারা রাজ্যশাসন করার ব্যবস্থা হলো। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দলীপ সিংহের অভিভাবক হয়ে পাঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করলেন আর প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তে হেনরী লরেন্সকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করলেন হার্ডিঞ্জ।

রাণী ঝিন্দন বুঝলেন, ইংরেজের অভিপ্রায় সাধু নয়, ইংরেজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে তাঁর স্বামীর সমগ্র রাজ্যের ওপর। বুঝলেন, শীঘ্রই পাঞ্জাব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুক্ষিগত হবার সম্ভাবনা। বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর হাতে আজ ভারতের শাসনদণ্ড। তবু তিনি এই স্পর্ধা নীরবে মেনে নিতে পারলেন না। রাণীর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো। রেসিডেণ্ট বিনা বিচারে রাণীকে নির্বাসিত করলেন। শেখপুরার নির্জন স্থানে ঝিন্দনকে কারারুদ্ধ করা হলো। ঝিন্দনের নির্বাসনের সঙ্গে, ইংরেজের মনে হলো, দুরন্ত পাঞ্জাব শান্ত হয়েছে

নিবে গেছে বিদ্রোহের আগুন। ঠিক এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের হাত থেকে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন লর্ড ডালহৌসি।

ডালহৌসী এসে দেখলেন পঞ্চনদের প্রসন্ন সলিলসিক্ত পাঞ্জাব অস্থির, পাঞ্জাব চঞ্চল। শেখপুরার নির্জন কারান্তরাল থেকে রাণী ঝিন্দন লাহোর দরবারে বিদ্রোহের চক্রান্ত পরিচালনা করছেন, বিক্ষুব্ধ শিখের অসন্তোষকে তিনি তাঁর স্বামীর নাম নিয়ে সযত্নে বর্ধিত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। মূলতানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং বিদ্রোহীদের আক্রমণে সেখানে দুজন ইংরেজ কর্মচারীর জীবনান্ত হয়েছে। এই সুযোগে লর্ড ডালহৌসি পাঞ্জাবে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হলেন। তাঁর প্রথম আঘাত গিয়ে পড়ল রাণী ঝিন্দনের উপর। মূলতানের বিদ্রোহ, লাহোর দরবারে ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত—এই সব অপরাধে রাণী ঝিন্দন, শিখ সেনাপতি খাঁ সিংহ ও মহারাণীর বিশ্বস্ত পাত্র গঙ্গারাম প্রভৃতিকে ডালহৌসি দোষী সাব্যস্ত করলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রকাশ্যে ফাঁসী হলো। আর রাণী ঝিন্দনকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হলো সুদূর কাশীতে। শুধু তাই নয়। মহারাণীর দেড় লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি কমিয়ে মাত্র বার হাজার টাকা করা হলো এবং রেসিডেন্ট তাঁর মূল্যবান হীরাজহরৎ সব বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তি ডালহৌসি এইভাবে দমন করলেন। বিধ্বস্ত মূলতান নরশোণিতে প্লাবিত হলো।

রাণী ঝিন্দনের নির্বাসনের ফলে শিখজাতির অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। খালসা সৈন্য যারা তাঁকে মায়ের মতন ভক্তি করত, তাঁর এই শোচনীয় নির্বাসনে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। এমন কি, পঞ্চনদের প্রত্যেকটি প্রাণী সেদিন এই ব্যাপারে চরম অপমান বোধ করল। রাজরাণী এবং রাজমাতার প্রতি ইংরেজের এই অসৌজন্য সকলের কাছেই জাতীয় অপমান বলে মনে হলো। তারা বুঝলো যে রণজিৎ সিংহ বেঁচে থাকতে ইংরেজ বন্ধুভাবে যে সরলতা দেখিয়ে এসেছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তারা এখন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছে। রণজিৎ সিংহের বিশাল রাজ্য ইংরেজ এখন গ্রাস করতে উদ্যত। নাবালক রাজকুমার দলীপ সিংহ এখন ইংরেজের হাতের পুতুল। লাহোর দরবারের শিখ-প্রধানরা রাজকুমারের বিয়ের প্রস্তাব করলেন রেসিডেন্টের কাছে। হাজরার শাসনকর্তা ছত্রসিংহের মেয়ের সঙ্গে তাঁরা দলীপ সিংহের বিয়ের

সম্বন্ধ ঠিক করলেন। রেসিডেণ্ট এই বিয়েতে অমত প্রকাশ করলেন। বৃদ্ধ ছত্র সিংহ বিদ্রোহী হলেন। তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পাঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

এল দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ। চিনিয়াবালার যুদ্ধে শিখদের তেজস্বিতা, সাহস ও বীরত্বের কাছে ওয়াটার্লু-বিজয়ী ইংরেজ মাথা অবনত করল। ছত্রসিংহের পুত্র শেরসিংহ এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। চিনিয়াবালা উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি সার ওয়াল্টার গিলবার্টই শেষ পর্যন্ত বিজয়শ্রী লাভ করলেন এবং পিতা-পুত্র উভয়েই বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করলেন। শিখ সর্দাররা একে একে তাঁদের অস্ত্র মাটিতে রাখলেন। যুদ্ধ শেষ হলো। এই অবসরে লর্ড ডালহৌসি তাঁর সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান করলেন। ইলিয়ট তখন লাহোর দরবারের রেসিডেণ্ট। তিনি মহারাজ দলীপ সিংহকে তাঁর রাজ্য কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে বললেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য। ডালহৌসির ঘোষণাপত্র পাঠ করা হলো দরবারে। দুর্গ থেকে তোপধ্বনি হলো। রণজিতের দুর্গশিরে উড়ল ইংরেজের পতাকা। সিংহাসন থেকে নেমে এলেন দলীপ সিংহ। পাঞ্জাব কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হলো। রণজিৎ সিংহের কোহিনুর ইংরেজের হস্তগত হলো।

পাঞ্জাব অধিকৃত হলো। দলীপ সিংহ শুধু রাজ্যচ্যুতই হলেন না, তাঁকে তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করল ইংরেজ। ফতেগড়ে তাঁর বাসস্থান ঠিক হলো। তাঁর সমস্ত খাসসম্পত্তি ডালহৌসি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং আগেকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাঁর বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হলো মাত্র এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। নিয়তিনেমির আবর্তনে পাঞ্জাব-কেশরীর পুত্র এখন হলেন ইংরেজের কৃপার পাত্র। দলীপ সিংহ যখন রাজ্যচ্যুত হলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার বছর। ইংরেজ এখানেই ক্ষান্ত হলো না। রাজ্যচ্যুতির পাঁচ বছর পরে ফতেগড়ের একজন খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক দলীপ সিংহকে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করলেন। এর এক বছর পরেই দলীপ সিংহকে ইংরেজ ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত করে। রণজিৎ সিংহের পাঞ্জাব ইংরেজের রাজ্যভুক্ত হলো। শিখদের জাতীয় প্রাধান্য খর্ব হলো। "সব্ লাল হো যায়েগা"—রণজিতের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো।

সিপাহী যুদ্ধের আট বছর আগের এই ঘটনা।
ডালহৌসির সর্বগ্রাসী নীতির যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি পাঞ্জাব

লর্ড ডালহৌসি ভারতবর্ষে এলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। আট বছর কাল তিনি ভারত সাম্রাজ্য শাসন করলেন দোর্দণ্ড প্রতাপে। একাধিক স্বাধীন রাজ্য কোম্পানীর রাজত্বভুক্ত করাই ইতিহাসে তাঁর কীর্তি। পাঞ্জাবের পর ডালহৌসি তাঁর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার জন্যে তৈরি করলেন এক বিচিত্র আইন—'ডকট্রিন অব্ ল্যাপ্স্'—পররাজ্য-গ্রাস নীতি। এই আইনে বলা হলো: "যে সমস্ত রাজ্য সার্বভৌম প্রভুশক্তির আশ্রিত, সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিগণ ঔরসজাত পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন, সেই রাজ্যগুলি কোম্পানীর সরকারের অনুমোদিত না হইলে তাঁহাদের রাজ্য উক্ত কোম্পানীর রাজ্যের অধীন হইবে।" বলা বাহুল্য, ভারতে তখন বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারের তৃতীয় পর্ব চলেছে। তখন আশ্রিত রাজ্য ছিল সেতারা, ঝাঁসি, অযোধ্যা ইত্যাদি। এই অপূর্ব আইনের বলে প্রথমেই সেতারা-রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হলো।

সেতারা।

ছত্রপতি শিবাজীর সেতারা।

এই সেতারার দুর্গ থেকেই শিবাজী একদিন তাঁর গুরু রামদাস স্বামীকে ভিক্ষা করতে দেখে, সমস্ত মহারাষ্ট্র রাজ্য তাঁর চরণে অর্পণ করেছিলেন, এবং গৈরিক পতাকা উড়িয়ে বৈরাগীর উত্তরীয় সযত্নে ধারণ করেছিলেন। শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহকে নৈশ অন্ধকারে বারাণসীতে নির্বাসিত করা হলো। তাঁর ভাই আপা সাহেব তখন সেতারার গদীতে। তিনি মারা গেলেন অপুত্রক অবস্থায় এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি যথারীতি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। লর্ড ডালহৌসি এই দত্তক অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন এবং সেই সঙ্গে আরো ঘোষণা করলেন: "সেতারা-রাজ কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করাতে উক্ত প্রদেশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।"

সেতারার পর ডালহৌসির দৃষ্টি পড়ল বুন্দেলখণ্ডের ঝাঁসির উপর।

ঝাঁসি একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। তরুণ গঙ্গাধর রাও তখন ঝাঁসির রাজা।

তাঁর সহধর্মিণী রাণী লক্ষ্মীবাঈ। রাজকুমারের বয়স তিন মাস পূর্ণ হতে না হতেই তার অকাল মৃত্যু হয়। পুত্রশোকে লক্ষ্মীবাঈ কাতর হলেন। গঙ্গাধর রাও এমন আঘাত পেলেন যে, তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেল। বহু চিকিৎসাতেও তিনি আর সুস্থ হতে পারলেন না। দুরন্ত রোগ অবশেষে তাঁর দুঃসহ শোকের শান্তি করল। সিপাহী যুদ্ধের চার বছর আগে তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত হন। রোগমুক্তির আশা না দেখে তিনি বৃটিশ রেসিডেণ্টের সামনে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করলেন। পূর্বতন সন্ধি অনুসারেই তিনি দত্তক গ্রহণ করলেন, কাজেই তাঁর আশা ছিল কোম্পানীর সরকার এই দত্তক স্বীকার করবেন। রেসিডেণ্টের কাছে গঙ্গাধর লিখলেন: "আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার গৃহীত দত্তকপুত্র দামোদর গঙ্গাধর রাও-এর প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নী রাণী লক্ষ্মীবাঈকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন, তাঁহার প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার প্রদর্শিত না হয়।"
মুমূর্ষু গঙ্গাধর রাওএর এই অন্তিম অনুরোধ রক্ষিত হলো না। তাঁর মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে ডালহৌসি ঝাঁসিকে কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করবার আদেশ প্রচার করলেন।

লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন পুরুষোচিত অটলতা ও তেজস্বিতার আধার।
তিনি ডালহৌসির এই আদেশের প্রতিবাদ করলেন, পূর্বতন সন্ধির দোহাই দিলেন, বহু যুক্তির অবতারণা করলেন, এমন কি, বীরাঙ্গনা শেষ পর্যন্ত কত বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা-পত্র পাঠালেন কোম্পানীর দরবারে। কিন্তু রাণীর সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হলো। প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের ভেতর দিয়ে যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, সেই ইংরেজ লক্ষ্মীবাঈ-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করল। ডালহৌসির বজ্রদণ্ড নিপতিত হলো ঝাঁসির মাথায়। এই অবিচার ও অবমাননা লক্ষ্মীবাঈকে ব্যথিত করল, কিন্তু কর্তব্যবিমুখ করতে পারল না। হৃদয়ের ব্যথা বীরজায়া চোখের জলে বিলীন হতে দিলেন না। ইংরেজের অবিচার, ইংরেজের অন্যায় আচরণ তাঁর বুকে জ্বালিয়ে তুললো দারুণ অগ্নিজ্বালা। পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মীবাঈ দেখা করলেন ইংরেজ প্রতিনিধি ম্যালকমের সঙ্গে। বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন—মেরি ঝাঁসি দিউঙ্গী নেহি। রাজপ্রতিনিধি স্তম্ভিত। কিন্তু শক্তিশালী কোম্পানী ঝাঁসি অধিকার করলেন। লক্ষ্মীবাঈ এ

অপমান ভুলতে পারলেন না—তুষানলের মতন এই অপমানের জ্বালা বীরাঙ্গনার হৃদয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি শুধু সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেতারা গেল, ঝাঁসি গেল, এবার ডালহৌসির শ্যেনদৃষ্টি পড়ল নাগপুর রাজ্যের উপর। সেতারা ও ঝাঁসির মতন নাগপুর রাজ্যও অমিত-পরাক্রম মহারাষ্ট্রের ভোঁসলা কুলের শাসনাধীনে ছিল এবং এখানকার অধিপতিও ঔরসপুত্রের অভাবে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। তখন এই রাজ্য ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভোঁসলাবংশীয় এক রাজার অধিকারে। তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন, তখন (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে, তাঁর রাজ্য পুরুষানুক্রমে ভোঁসলা-বংশের অধীনেই থাকবে। সিপাহী যুদ্ধের ঠিক চার বছর আগে সাতচল্লিশ বছর বয়সে রঘুজী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলেন। রঘুজীর জ্যেষ্ঠা মহিষী অন্নপূর্ণা বাঈ একটি দত্তক-পুত্র গ্রহণের প্রস্তাব করলেন এবং যথাসময়ে এই প্রস্তাব বৃটিশ রেসিডেণ্টের কাছে জানান হলো। মান্‌সেল সাহেব তখন নাগপুরের রেসিডেণ্ট তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করলেন না, অনুমোদনও করলেন না। শুধু বললেন, কোম্পানীর সরকারের সম্মতি ছাড়া তিনি কোন প্রকার দত্তক গ্রহণ আইনতঃ সিদ্ধ বলে স্বীকার করতে পারেন না। নাগপুর প্রাসাদে দত্তক-ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হলো।

ডালহৌসির কাছে রিপোর্ট গেল। তাঁর বুভুক্ষা তখন সর্বগ্রাসী। সেনাপতি লো-সাহেব নাগপুরের স্বাধীনতা রক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ডালহৌসি সর্বময় কর্তা। তিনি পরওয়ানা জারি করলেন—যেহেতু নাগপুর রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই, সেইজন্য নাগপুর-রাজ্য কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ডালহৌসি দত্তক-গ্রহণের বৈধতার প্রশ্ন তুললেন। বললেন, তৃতীয় রঘুজী স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করেন নি, তাঁর বিধবা পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী গ্রহণ করেন নি, অতএব পত্নীর গৃহীত দত্তক সিদ্ধ হতে পারে না। অন্নপূর্ণা বাঈ তাঁর অমাত্যদের মারফৎ ডালহৌসিকে জানালেন যে, আইনের চক্ষে ঠিক হতে না পারে, কিন্তু শাস্ত্রের চক্ষে ঠিক। হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথানুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী যথাবিধি দত্তক গ্রহণ করতে পারেন।

ডালহৌসি এ যুক্তি মানলেন না। ভারতের মানচিত্রে স্বাধীন নাগপুর বলে কিছু থাকল না। ডালহৌসির বিচিত্র বিধানে ভোঁসলা-শাসিত রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেল।

শুধু রাজ্য নিয়েই ডালহৌসি নিরস্ত হলেন না রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত ধন-সম্পদও গ্রহণ করলেন—হাতী-ঘোড়া পর্যন্ত বাদ গেল না। প্রাসাদে রাণীদের মহল থেকে কোম্পানীর কর্মচারিরা প্রায় সোনারূপায় চার লক্ষ টাকা হস্তগত করল। এক নাগপুর থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোষাগারে এল প্রায় এক কোটি টাকার মণিমুক্তা ও অন্যান্য সম্পত্তি। একাধিক ইংরেজ ঐতিহাসিক একবাক্যে ডালহৌসির গভর্ণমেণ্টের এই অন্যায় লুণ্ঠনের তীব্র নিন্দা করেছেন।

নাগপুর অধিকার করবার আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল। ডালহৌসির নিজের কথাতেই সেই কারণটা এখানে উল্লেখ করব: "নাগপুর রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত হইলে ইংলণ্ডের একটি অভাব পুরণ হয়। এই অভাব পুরণের উপরই ইংলণ্ডের বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই উন্নতি অনেক প্রকার বাণিজ্য-দ্রব্য দ্বারা হইতে পারে কিন্তু ইংলণ্ডে নিয়মিতরূপে তুলার আমদানী হইলে এই উন্নতি যেমন হয়, বোধ হয় অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা তেমন হইতে পারে না। ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পুর্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক সম্প্রদায় আমার নিকট এই বিষয়ে প্রস্তাব করেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীও অনেকবার আমাকে পত্র দ্বারা এই বিষয়ে সচেতন করিয়াছেন। যাহাতে ইংলণ্ডে নিয়মিতরূপে তুলা আমদানি হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমার সবিশেষ মনোযোগ আছে।"

তুলা চাই আর এই তুলার জন্যই নাগপুর চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু নাগপুর হাতে না পেলে তুলার একচেটিয়া অধিকার লাভ করা যায় না। অতএব নাগপুর গ্রাস করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদের স্বার্থবাহী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাই রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ন্যায়ের মর্যাদা উপেক্ষা করে নাগপুর রাজ্য গ্রাস করলেন। তুলার লোভে ইংরেজ সেদিন তার ন্যায় বিচার ত্যাগ করেছিল, তুলার লোভে ইংরেজ সেদিন সত্যই অন্ধ হয়েছিল—ইতিহাসের এ মর্মান্তিক সত্যকে একাধিক নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখকও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই একে একে সেতারা, ঝাঁসি ও নাগপুর কোম্পানীর কুক্ষিগত হলো। মানচিত্র থেকে মুছে গেল তিনটি প্রধান মহারাষ্ট্র-বংশের রাজসম্মান ও রাজচিহ্ন। কোম্পানীর ভারত সাম্রাজ্যের লোহিত-রেখায় পরিবেষ্টিত হলো সেতারা, ঝাঁসি ও নাগপুর। প্রসারিত হলো কোম্পানীর অধিকার আর বিচিত্র ঘটনার আবর্তে রূপান্তরিত হতে লাগল ভারতের ইতিহাস। সে-ইতিহাসের নায়ক লর্ড ডালহৌসি।

এরপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল দাক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদের নিজাম রাজ্যের ওপর। ডালহৌসি ভারতবর্ষে আসার প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে নিজামের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি ছিল বন্ধুত্বের সন্ধি আর এই সন্ধি অনুসারে নিজাম চল্লিশ বছর পর্যন্ত একদল ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন। চল্লিশ বছর ধরে এই সুবিপুল ব্যয়ভার বহন করার ফলে নিজাম ঋণগ্রস্ত হলেন। চল্লিশ বছর উত্তীর্ণ হলো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজামের সৈন্যদল থেকে তাদের নিজস্ব সৈন্যদল সরিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থাই করলেন না। কোম্পানীর দরবারে নিজাম জানালেন, সন্ধির সর্ত এমন ছিল না যে, নিজামকে চিরকাল এই সমস্ত সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে অথবা এই সব সৈন্য চিরকাল নিজামের রাজ্যে রাখতে হবে। আরো দশ বছর অতিক্রান্ত হলো। সৈন্য পরিপোষণ বাবদ নিজামের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় এক কোটি টাকা। তখন ডালহৌসির গভর্ণমেণ্ট আর বিলম্ব না করে নিজাম-সকাশে এই বার্তা প্রেরণ করলেন: "নিজামকে শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, নতুবা বার্ষিক কমপক্ষে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট তিন বৎসরের মধ্যে ঐ আয় হইতে আপনাদের আসল টাকা তুলিয়া লইবেন।"

বিপন্ন নিজাম ঋণ পরিশোধ করতে সচেষ্ট হলেন। অবিলম্বে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়ে বাকী টাকার পরিশোধ করার জন্য কিছু সময় চেয়ে নিলেন। আরো দু' বছর গেল। সিপাহী যুদ্ধের ঠিক চার বছর আগে নিজামের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকায়। তখন ডালহৌসি আর কোন কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের টাকা আদায়ের জন্য নিজামের অধিকৃত ভূ-সম্পত্তি গ্রহণে উদ্যত হলেন। অবিলম্বে সন্ধির ছলে সম্পত্তি গ্রহণের নিয়ম লিপিবদ্ধ হলো। নিজাম রেসিডেণ্টকে বললেন, "আমি একজন

স্বাধীন রাজ্যাধিপতি। সাতপুরুষ ধরিয়া এই রাজ্য নিজামশাহী বংশের অধীন। আমি প্রাণ থাকিতে আমার রাজ্যের কোন অংশ কোম্পানীকে দিতে পারিব না। রাজ্যের অংশ হস্তান্তরিত হইলে আমি আপনাকে যারপর নাই অপমানিত জ্ঞান করিব।"

এই বলে নিজাম নবাব নসিরউদ্দৌলা চুপ করলেন। কিন্তু তাঁর এ আবেদনও নিষ্ফল হলো। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণের দায়ে বেরার অঞ্চল নিজামের হাতছাড়া হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন: "ক্রূর প্রকৃতি উত্তমর্ণ যেমন অধমর্ণের সহিত ব্যবহার করে, ডালহৌসিও এস্থলে নিজামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা বিধৌত বেরার প্রদেশটি হস্তগত করার আরো একটি বিশেষ কারণ ছিল। বেরারের তুলা প্রসিদ্ধ। ম্যাঞ্চেষ্টারের তুলা দরকার। অতএব দক্ষিণ ভারতের এই রকম একটা শস্য-সম্পদপূর্ণ বিস্তৃত অঞ্চল একজন মিত্ররাজের হাত থেকে বেমালুম কেড়ে নিতে ডালহৌসি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করলেন না।

এবার তাঁর লোলুপ দৃষ্টি পড়ল তাঞ্জোর রাজ্যের ওপর।

তাঞ্জোরের রাজা ছিলেন তখন শিবজী। সিপাহী যুদ্ধের দু'বছর আগে দু'টি মেয়ে রেখে তিনি পরলোক গমন করলেন। বৃটিশ রেসিডেণ্ট শিবজীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তাঁর পিতার উত্তরাধিকারিণী বলে স্বীকার করলেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার এই দাবীও তিনি সমর্থন করলেন। শিবজীর মেয়ে যাতে তাঞ্জোরের সিংহাসন লাভ করেন, রেসিডেণ্ট সেই মর্মে লর্ড ডালহৌসিকে একখানি চিঠিও লিখলেন। তিনি রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতের ইতিহাসে সেতারা, নাগপুর ও পুণা-এই তিনটি স্থানে তিনটি প্রসিদ্ধ স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় বংশ ছিল। সেতারা ও নাগপুরের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী আগেই বলেছি। এইবার তৃতীয়টির কথা। ডালহৌসির পররাজ্য গ্রহণ নীতি, স্বাধীন ও মিত্র রাজাদের রাজ-সম্মান ও রাজ-পদ লোপ করেই ক্ষান্ত হতো না। এই নীতির উগ্রতা অন্যভাবেও প্রকাশ পেয়েছে। তারই দৃষ্টান্ত পুণা রাজ্য অধিকারের সময় প্রকাশ পেয়েছিল।

ডালহৌসির বহু পূর্বেই এই রাজ্যটি কোম্পানীর হস্তগত হয়। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের শেষে (১৮১৮) পুণার প্রসিদ্ধ পেশবা বাজীরাও আত্মসমর্পণ করলেন। কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সন্ধি হলো এবং তিনি আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পেয়ে রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করে নির্জনবাসের অনুমতি পেলেন। কানপুরের প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত বিঠুর নামক স্থানে বাজীরাও-এর আবাস-স্থল নির্দিষ্ট হলো। বাজীরাও আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিঠুরে গিয়ে গঙ্গার পবিত্র তটে জীবনের শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় তাঁর অনুবর্তী হলো, সঙ্গে এলো বহু দাসদাসী। রাজ্যচ্যুত বাজীরাও রাজার গৌরব নিয়েই বিঠুরে এলেন। সদাশয় কোম্পানী তাঁকে বিঠুরে একটি জায়গীর দিলেন। বিঠুরে বাজীরাও এই ভাবে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে লাগলেন। কোম্পানীর মনে এর জন্যে স্বতঃই আশঙ্কার উদ্রেক হলো, তাঁরা সতর্ক হলেন। কিন্তু বাজীরাও সৌজন্য ও বন্ধুত্ব দেখিয়ে গভর্ণমেণ্টের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

কালক্রমে বাজীরাও অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি যথারীতি একটি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করলেন এবং তাকে পেশবা উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করলেন। অনুরোধ অগ্রাহ্য হলো। শুধু বলা হলো, পেশবার মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা বিবেচনা করবেন। ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করেই সাতাত্তর বছর বয়সে বাজীরাও অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। উইলে তিনি তাঁর দত্তকপুত্র ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবকে পেশবার গদী এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার দিয়ে যান।

নানাসাহেবের বয়স তখন সাতাশ বছর। পিতার মৃত্যুর পর নানাসাহেব ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিকারী হলেন। তিনি দাবী করলেন বাজীরাওর বৃত্তি। বিঠুরের বৃটিশ কমিশনার তাঁর দাবী অনুমোদন করলেন। ডালহৌসি তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। তিনি নানাসাহেবের পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ করে দিলেন। যথাসময়ে ডালহৌসির আদেশ-লিপি বিঠুরে নানাসাহেবের হাতে এসে পৌছল। সেই আদেশ-লিপিতে লেখা ছিল : "পেশবা তেত্রিশ বৎসরকাল বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এ ছাড়া জায়গীরের উপস্বত্ব

ছিল। তিনি সেই সময়ে আড়াই কোটি টাকারও বেশী লাভ করিয়াছেন। তাঁকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। তাঁহার কোন ঔরস পুত্রও বর্তমান নাই। তিনি মৃত্যুকালে আপনার পরিবারদিগের জন্য আটাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পেশবার যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন বর্তমান আছেন, গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে তাঁহাদের কোনরূপ দাবী নাই। পেশবা যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট।"

এইভাবে ডালহৌসির কলমের আঘাতে নানাসাহেব আজীবন পৈতৃক বৃত্তি হতে বঞ্চিত হলেন। ভূতপুর্ব পেশবা কাবুল ও পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ কোম্পানীকে অর্থ দিয়ে, সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতার পুরস্কার নানাসাহেব আজ পেলেন এইভাবে। নানাসাহেব তখন বহু যুক্তিতর্ক, শাস্ত্র ও নীতির দোহাই দিয়ে কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টর সভায় আবেদন করলেন। আবেদন পত্রে নানা বিষয়ের উল্লেখ করে পরিশেষে তিনি লিখলেন: "আবেদনকারী সুবিচারপ্রার্থী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভূতপুর্ব পেশবার নিকট হইতে যে কিছু উপকার পাইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই আমি সুবিচার চাহিতেছি। আমি তাঁহার যথাবিধি-গৃহীত দত্তকপুত্র; অতএব আমি ঔরসপুত্রের ন্যায় পিতার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী।"

কিন্তু ইংলণ্ডের ডিরেক্টরগণও নানার আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। ইংলণ্ড থেকে ডালহৌসির নিষ্পত্তির অনুমোদন করে নানার কাছে উত্তর এল এই মর্মে: আবেদনকারীকে জানান হইতেছে যে, তাঁহার পিতার বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক নয়, সুতরাং উহাতে তাঁহার কোনরূপ দাবী নাই। তাঁহার আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল।"

নানাসাহেব সুবিচার পেলেন না। বঞ্চিত মহারাষ্ট্র-বীর এই অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনতে লাগলেন বিঠুর-প্রাসাদে বসে।

এইবার ডালহৌসি অগ্রসর হলেন অযোধ্যা গ্রাস করতে।

পাঞ্জাবের মতন বিদ্রোহের কারণ দেখিয়ে সহজে অযোধ্যা নেওয়া চলে না। অযোধ্যার অধিপতি চিরকাল ইংরেজের পরম বন্ধু। আবার নাগপুর, ঝাঁসির মতন উত্তরাধিকারীর অভাব দেখিয়েও অযোধ্যা নেওয়া চলে না, কারণ এর

অধিপতির দায়াদগণ বর্তমান। কুশাসনের ওজুহাতে তিনি অযোধ্যা গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন। ধনে জনে বিশাল এবং বহু দুর্গ ও সৈন্যসমন্বিত উত্তরপ্রদেশের এই ভূ-খণ্ডটি কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে ডালহৌসিকে বিলেতের বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু ডালহৌসির সংকল্প ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মতই অটল। তাই অযোধ্যা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি একাই অগ্রসর হয়েছিলেন বলা চলে।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা কোম্পানীর মিত্র ছিলেন। বক্সার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুজাউদ্দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির সর্ত হলো যে, শত্রুর আক্রমণ থেকে মিত্ররাজ্য রক্ষা করতে বৃটিশ কোম্পানীর যেসব সৈন্য অযোধ্যায় থাকবে, নবাবকে সেই সব সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। এ ছাড়া, যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। সন্ধির তিন বছর পরে জনরব উঠল, সুজাউদ্দৌল্লা কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করছেন। গভর্ণমেণ্ট এই জনরবের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। কৈফিয়ৎ তলব করা হলো নবাবের কাছে। উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে নবাব কৈফিয়ৎ দিলেন। তবুও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রসন্ন হলেন না। সন্ধিপত্রে কোম্পানী আর একটি নূতন সর্ত সংযোজন করলেন—অযোধ্যার নবাব পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য রাখতে পারবেন না।

এইভাবে ইংরেজের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ নবাবের অদৃষ্টচক্র পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করল। কোম্পানীর সরকার দেখলেন, অযোধ্যা একটি বহু সমৃদ্ধিশালী ও জনাকীর্ণ রাজ্য। অতএব অযোধ্যা দরকার। তখন ভারতে চলছে বর্গীর হাঙ্গামা। সেই হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে কৌশলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চুনার দুর্গ গ্রহণ করলেন এবং এলাহাবাদ আপাততঃ নিজের অধিকারে রাখলেন। তখন হেষ্টিংসের গভর্ণমেণ্ট টাকার অভাবে বিব্রত। কোম্পানীর রাজকোষ একরকম শূন্য বললেই হয়। সৈন্যদের বেতন বাকী পড়েছে। অথচ ইংলণ্ডে দশ লক্ষ টাকা পাঠাতে হবে। কোথায় টাকা পাওয়া যায়?—হেস্টিংস ভাবলেন। দৃষ্টি পড়ল অযোধ্যার ওপর। নবাবের অপরিমিত অর্থ। হেষ্টিংসের হস্ত প্রসারিত হলো অযোধ্যার দিকে। ইতিপূর্বে কোম্পানী যে কোরা ও এলাহাবাদ গ্রাস করেছিলেন, এখন আর একটা নতুন সন্ধি করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাবকে সেই কোরা আর এলাহাবাদ ফিরিয়ে

দেওয়া হলো। এ ছাড়া, যে সব ইংরেজ সৈন্য নবাবের সাহায্যের জন্য অযোধ্যায় রাখা হলো, নবাব তাদের ব্যয়ভার বহন করতে প্রতিশ্রুত হলেন। এই ব্যয়ের পরিমাণও কম নয়।

নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রের সময়ে কোম্পানী একটির পর একটি সন্ধি করে বারাণসী, জৌনপুর, গাজীপুর প্রভৃতি এক একটি প্রদেশ গ্রাস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কোম্পানীর ফৌজের ব্যয়ভারও বার্ষিক ছিয়াত্তর লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়াল। এতেও কোম্পানীর সাধ মিটল না। তারপর এলেন লর্ড ওয়েলেসলি। ওয়েলেসলি কলকাতায় পদার্পণ করেই নবাব সাদাৎ আলিকে লিখে পাঠালেন: "হয় আপনি বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করুন, নতুবা কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অর্ধেক রাজত্ব ছাড়িয়া দিন।" সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে একটি সন্ধিপত্র নিয়ে ওয়েলেসলির প্রতিনিধি এলেন অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে। নবাব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়েই তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করলেন। ইংরেজ সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে এই ভাবে অযোধ্যার নবাবের বার্ষিক দু'কোটি টাকা আয়ের রোহিলখণ্ড ও দোয়াব অঞ্চল হস্তচ্যুত হয়। তারপর এল নেপাল যুদ্ধ। কোম্পানীর টাকার দরকার। অযোধ্যার নবাবকে দিতে হলো এক কোটি টাকা। কোম্পানী আরো এক কোটি নবাবের কাছ থেকে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করলেন। তারপর অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সর্বশেষ সন্ধি হলো এই মর্মে: "নবাবের রাজ্যে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর্মচারী দ্বারা অযোধ্যা সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া, পরে উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন।"

এই প্রসঙ্গে একটু পুর্ব-ইতিহাসের কথা বলা দরকার।

ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত অযোধ্যার ধনসম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বহুদিন ধরেই প্রলুব্ধ করেছিল। অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এবং তখন থেকেই অযোধ্যার উর্বর ও সম্পদশালী ভূখণ্ডের ওপর কোম্পানীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। সেইজন্য গোড়া থেকেই এখানে নবাবের ব্যয়ে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন রাখা হয় রাজ্যরক্ষার কারণ দেখিয়ে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর প্রথম সন্ধি হয় এবং দ্বিতীয় সন্ধি হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। দিল্লীর মোগল-মহিমা

বিলীন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার নবাব, পরিপূর্ণভাবে নবাবী স্বাধীনতা ও বিলাসভোগ্য উপভোগ করতে চাইলেন। প্রতিষ্ঠা করেলেন এক বিশাল ভূখণ্ডের ওপর তাঁর সার্বভৌম আধিপত্য। অযোধ্যায় শুরু হয় দ্বৈত শাসন। রাজনৈতিক ও সামরিক শাসনের দায়িত্ব রইল কোম্পানীর হাতে আর নবাবের হাতে রইল রাজ্যশাসনের ও রাজস্ব আদায়ের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে, এরই ফলে সমস্ত রকম বিশৃঙ্খলা একে একে দেখা দিতে লাগল সমগ্র অযোধ্যা রাজ্যে।

নবাবের জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হতো তালুকদারদের। এইসব তালুকদার বেশীর ভাগই হিন্দু। পুরুষানুক্রমে এঁরা নবাবের দেওয়া জায়গীর ও তালুকদারী নিশ্চিন্তে ভোগ করতেন। এই রকম এক-একজন তালুকদারের অধীনে শত শত গ্রাম থাকত; এমন কি, তাদের নিজস্ব দুর্গ ও সৈন্যও ছিল। অযোধ্যায় প্রকৃত শাসক এঁরাই ছিলেন। প্রজাদের কাছ থেকে তালুকদারেরা যেভাবে খাজনা আদায় করতেন, তা লুণ্ঠন ও অত্যাচারের সামিল ছিল। উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী নবাব দরবারের বিলাসভোগে মত্ত থাকতেন, নর্তকীর নূপুর-শিঞ্জন ও চাটুকারদের মূঢ় স্তাবকতায় চাপা পড়ে যেত অসহায় ও অত্যাচারিত প্রজাদের আর্তনাদ। তালুকদারদের অত্যাচারে প্রজাদের প্রাণ অতিষ্ঠ ছিল। তাঁরা যেন মূর্তিমান বিভীষিকা। অথচ তাঁরাই নবাব-দরবারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। তাই নবাব ছিলেন তালুকদারদের হাতের মুঠোর মধ্যে। রাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, আর অসন্তোষ। সুবিচার বলে কিছুই ছিল না, সুশাসন বলে কিছু ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিস থেকে আরম্ভ করে একাধিক গভর্ণর-জেনারেল অযোধ্যার নবাবকে এ-বিষয়ে সচেতন করে তুলবার প্রয়াস পান, কিন্তু কোন ফলই হয় না। তালুকদারদের পীড়ন আর অসহায় প্রজাদের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে চলে। এমন কি, শেষবার লর্ড হার্ডিঞ্জ নবাবকে দু'বছর সময় দিলেন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সুগঠিত করবার জন্য। কিন্তু বিলাসে উন্মত্ত নবাব গ্রাহ্যই করলেন না হার্ডিঞ্জের উপদেশ।

এই পটভূমিকায় এলেন ক্ষিপ্রকর্মা, কার্যকুশল লর্ড ডালহৌসি। ১৮৩৭-এর সন্ধির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি এসেই এই সন্ধিকে কার্যকরী করে তুলবার প্রয়াস পেলেন। ওয়াজেদ আলি শাহ তখন অযোধ্যার নবাব।

অব্যবস্থা, অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলতার কারণ দেখিয়ে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাবের রাজত্বের শেষ চিহ্ন ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে দিলেন। কর্ণেল স্লিমান তখন নবাবের দরবারে রেসিডেন্ট। তিনি ডালহৌসির স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করে লিখলেন: "রাজ্যশাসনে অব্যবস্থার অভিযোগ সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই যদি আমরা অযোধ্যা অথবা উহার কোন অংশ আত্মসাৎ করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদের সুনাম নষ্ট হইবে। এই সুনাম এক ডজন অযোধ্যা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান।" কিন্তু ডালহৌসি এ যুক্তি মানলেন না। এমন কি, রেসিডেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী অযোধ্যা সুব্যবস্থিত করতেও মনোযোগী হলেন না।

১৮৫৫, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। স্থান—অযোধ্যার দরবার, লক্ষ্ণৌ।

নতুন রেসিডেন্ট কর্ণেল আউট্রাম এসেছেন নবাব ওয়াজেদ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। প্রাসাদ-দ্বার কামান-শূন্য, রক্ষীরা নিরস্ত্র। কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্যের সঙ্গে নবাব রেসিডেন্টকে দরবারে গ্রহণ করলেন। রেসিডেন্ট গভর্ণর-জেনারেলের পত্র ও গুরুতর দণ্ড-বিধায়ক সন্ধির একখানি পাণ্ডুলিপি নবাবের হাতে দিয়ে বললেন, নবাব যেন এই সন্ধি অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন। নবাব সন্ধিপত্রে কম্পিত হস্তে স্বাক্ষর দিলেন। মাথার উষ্ণীষ খুলে দিলেন আউট্রামের হাতে। ষাট বছরের নবাবীর অবসান ঘটে গেল এক কথায়। আউট্রাম তখন সেই দরবারে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন: "অযোধ্যারাজ্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল।" তারপর? "শেষ নবাবের অগণিত ধন-সম্পত্তি, গৃহসজ্জা, মূল্যবান বস্ত্র, শকট, গ্রন্থাগারের দুই লক্ষ টাকা মূল্যের হস্তলিখিত পুস্তক; হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইল এবং সেই অর্থ মাননীয় কোম্পানীর ধনাগার পরিপূর্ণ করিল···কর্মচারিগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলপূর্বক বেগমদের বাহিরে আনিল, বলপূর্বক তাঁহাদের দ্রব্যাদি প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করিল।"

অসন্তোষ ও বিদ্বেষের আগুন বুকে নিয়ে অযোধ্যার জনসাধারণ ইংরেজের সঙ্গে নবাবের বন্ধুত্বের শোচনীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ করল। নবাবের জন্য বার্ষিক বারো লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্ধারিত হলো। অযোধ্যার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল তালুকদারই বিক্ষুব্ধ হলো। তাদের বিক্ষোভের কারণ অবশ্য

স্বতন্ত্র। অযোধ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ডালহৌসির পররাজ্য-গ্রহণ নীতির পরিসমাপ্তি ঘটল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই হলো ডালহৌসির শেষ ও সর্বপ্রধান কীর্তি। কীর্তি নয়, কুকীর্তি।

অযোধ্যায় সুশাসন ছিল না অথবা এই রাজ্যটি অত্যাচার-পীড়িত ছিল, এ বিষয়ে বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়। নবাবের রাজত্বকালে অযোধ্যার প্রজারা সুখী ছিল এবং শস্য-সম্পদ ছিল প্রচুর। সুশাসন না থাকলে অথবা কেবলমাত্র অত্যাচার থাকলে—এই জিনিস সম্ভব হতে পারে না, এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। অযোধ্যা গ্রহণের বিশ বছর আগে বিচারপতি ফ্রেডরিক শোর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করেছিলেন। স্যর হেনরী লরেন্সের জীবন-চরিতকার হারমান মারিবেল লিখেছেন: "ন্যায়তঃ বলিতে হইলে, আমাদিগকে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যখন অযোধ্যা অধিকার করি, তখন উহা অধিবাসিপূর্ণ ও সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। সত্য, অযোধ্যারাজ্য উত্তমরূপে শাসিত ছিল না; কিন্তু উহাতে কখন এতদূর অত্যাচার হয় নাই যাহার জন্য উহা কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইতে পারে।" ঐতিহাসিক মসীউদ্দীন তাই লিখেছেন: "অযোধ্যা ঘোরতর দৌরাত্ম্যপূর্ণ ছিল না। নবাব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সর্বাংশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পরামর্শগ্রাহী ছিলেন।" এমন কি, জেনারেল লো পর্যন্ত লিখেছেন: "অযোধ্যার পূর্বতন পাঁচজন নবাবের মধ্যে সকলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পরম মিত্র ছিলেন; সকলেই রেসিডেণ্টগণের পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন। ইহাদের কার্য-পদ্ধতি সাতিশয় প্রশংসনীয় ছিল। অযোধ্যার নবাবগণ কেবল আমাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না, কোম্পানীর বিপদে-আপদে ইহারা সবাই সাহায্য করিতেন। নেপাল ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময় অযোধ্যার নবাব আমাদিগকে তিন কোটি টাকা ঋণ দেন। লর্ড এলেনবরার গভর্ণমেণ্ট যখন আফগানিস্তানের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন অযোধ্যার নবাবের কোষাগার হইতে আমরা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইয়াছি। নেপাল যুদ্ধের সময়ে নবাব আমাদিগকে তিন শত হাতী দিয়াছিলেন।" সুতরাং এই সব বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব বিস্তার ও ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেই লর্ড ডালহৌসি অযোধ্যা অধিকার

করেন। পাঞ্জাব ও অযোধ্যা—এই দুটি বিরাট রাজ্য অধিকার করার মধ্যেই ডালহৌসির শাসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছিল।

এইভাবে আট বছর কাল গভর্ণর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে, কোম্পানীর রাজ্যবৃদ্ধি করে দিয়ে লর্ড ডালহৌসি বিদায় গ্রহণ করলেন। রাজ্যবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে রাজ্যনাশের বীজও বপন করে গেলেন, তাঁর বিদায়ের এক বছর পরেই কোম্পানীর সরকার সে-কথা মর্মান্তিকভাবেই উপলব্ধি করলেন। যে-বিপ্লব সমগ্র ভারত বিপ্লাবিত করে এক দারুণ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই সাতান্নর বিপ্লবের প্রকৃত জন্মদাতা এই লর্ড ডালহৌসি।

স্বাধীন রাজ্যগুলোই শুধু একে একে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুক্ষিগত হলো না, সেইসঙ্গে সর্বনাশের খড়্গ নেমে এল ভূস্বামীদের ওপর। স্বাধীন রাজত্বগুলির বিলুপ্তি সাধন ছিল ডালহৌসির কীর্তি আর অভিজাতদলের উন্মূলন সাধন ছিল জেমস্ টমসনের কীর্তি। টমসন ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সচিব। এই ব্যাপার একদিনে হয়নি। ধীরে ধীরে এর সূত্রপাত হয়, নীরবে এর গতি প্রসারিত হয় এবং কালক্রমে এর সর্বতোমুখী প্রভুত্ব সকলকে সচকিত করে তুললো। ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন দু'ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এক, ভূমির বন্দোবস্ত ; অপর, ভূমির ক্রোক। এই সম্পর্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঘোষণা ছিল এই রকম: "দরিদ্র ও নিঃসহায় কৃষকদিগের এবং ধনী ও সম্পত্তিসম্পন্ন তালুকদারগণের বর্তমান স্বত্বের নির্ধারণ এবং সেই স্বত্বের রক্ষণ, গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য।" কিন্তু অনিষ্টের সূত্রপাত করলেন বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্মচারিরা। তাঁরা ন্যায়ের অনুসরণ করতে গিয়ে প্রশ্রয় দিলেন অন্যায়কে, সুবিচার করতে গিয়ে অবিচারের পরিচয় দিলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মচারিরা সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে বিরত থাকতেন এবং প্রত্যেক ভূস্বামীকে তাঁর চিরন্তন সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করতেন। এইভাবে ভূস্বামী হলেন কৃষক, 'মালিক' হলেন 'মুস্তাজীর'। ভারতের পল্লীসমাজে, এই ব্যবস্থার ফলে দেখা দিল এক বিপুল পরিবর্তন। কোম্পানীর কর্মচারিরা তাদের ইচ্ছামত ভূমির বন্দোবস্ত করতেন। যে তালুকদারের দুশো বিঘা জমি

আছে, তাঁর অধিকাংশ জমি কেড়ে নিয়ে অন্য জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অর্থ গ্রহণ করতেন। এমনি করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বেশীর ভাগ তালুকদার নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। অনেকেরই সম্পত্তি নিলামে বিক্রী হলো। পুরুষানুক্রমে ভোগ-করা সম্পত্তি হলো হস্তচ্যুত। জমিজমা এঁদের কাছে সব চেয়ে প্রিয়। সেই সম্পত্তির অধিকার-চ্যুতি ও স্বত্ব-বিলোপ, এই সম্প্রদায়কে স্বভাবতই উত্তেজিত করে তুললো। এরই ফলে ভূস্বামিদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সিপাহী যুদ্ধের বহু কারণের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর এই অসন্তোষও ছিল একটি কারণ।

একাধিক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতিই ভবিষ্য বিপ্লবের বীজ রোপণ করেছে। মার্টিন গাবিন্স লিখেছেন: "ভারতের জনসাধারণের জন্য আমরা রাজস্ব সংক্রান্ত যে নীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অনেক দোষ বর্তমান রহিয়াছে। রাজস্ব প্রদানে অক্ষম লোকদিগের প্রতি আমরা যে কঠোরতা দেখাই, তাহা রাজস্ব প্রণালীর একটি প্রধান দোষ। এই নিয়মানুসারে অক্ষম লোকের ভূসম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হয়, এবং সে পুরুষানুক্রমে যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।" বলা বাহুল্য, এই নীতিই পরবর্তিকালে ভারতবাসীর মন বিস্ময়, ভয় ও আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়। যাঁরা ইংরেজের পক্ষপাতী ও হিতৈষী বন্ধু হতে পারতেন, তাঁরা পর্যন্ত এই নীতির জন্য ইংরেজের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই বিষয়ে ডিরেক্টর সভার অন্যতম সদস্য টাকারের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: "আমরা এক শ্রেণীকে তাহাদের পূর্বতন অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্বস্মৃতির অনুভূতি নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহারা এক্ষণে নীরব আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোনো বিপ্লব ঘটে তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, হৃতগৌরব তালুকদারগণ বিপক্ষ দলের পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়াছেন।" উইলিয়ম এডওয়ার্ডস্ লিখেছেন: "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোম্পানী যদি প্রাচীন ভূস্বামিগণের পুরুষানুক্রমিক স্বত্ববিলোপ না ঘটাইতেন, তাহা হইলে পল্লীবাসীগণ সিপাহীদিগের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত না কিম্বা ভূস্বামিগণও ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

হইতেন না। অসন্তোষের বীজ কোম্পানীর নীতিগত অদূরদর্শিতার মধ্যেই নিহিত ছিল।”

তারপর লাখেরাজদের কথা। এঁরা মোগল আমল থেকে পুরুষানুক্রমে নিষ্কর ভূমির স্বত্ব ভোগ করে আসছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণ লাখেরাজদের স্বত্ব প্রমাণের দলিল দেখাতে আদেশ দিলেন। বহু পুরুষ ধরে তাঁরা এই জমি ভোগ করে আসছিলেন, সুতরাং প্রায় কারো কাছেই দলিল ছিল না; আর যাঁদের ছিল, তাঁদেরও তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাঁদের এই নিষ্কর জমি ভোগ করা ঘুচে গেল। কারো সম্পত্তিই রক্ষা পেল না। এর ফলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লাখেরাজদের মনে অসন্তোষ ও উত্তেজনা পুঞ্জীভূত হয়ে রইল। বন্দোবস্ত বিভাগের কর্মচারিদের অদূরদর্শী কাজের ফলে নিষ্কর ভূমির বিলোপ সাধন থেকেই পরবর্তীকালে জনসাধারণের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিরাগ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। দেওয়ানী বিভাগের বিচারপতিগণ রাজস্ববিভাগের এই ভূমি-গ্রাস নীতি সমর্থন করার ফলে ভূস্বামিদের হৃদয়ে নিদারুণ তুষানল সঞ্চারিত হয়। সকলেই কোম্পানীর নীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে থাকেন, সকলেই কোম্পানীর শাসনে নিজেদের নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও হৃত-সর্বস্ব মনে করতে থাকেন। ডালহৌসি এই প্রণালীর অনুমোদন ও সম্প্রাসরণ করলেন চূড়ান্তভাবে এবং তিনি নিজে যেসব প্রদেশ অধিকার করেছিলেন, সেসব স্থানে ঐ সর্বনাশা নীতি সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু এ কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্যর হেনরী লরেন্স প্রমুখ একাধিক প্রশস্তমনা ইংরেজ-রাজপুরুষ এই নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হৃতসর্বস্ব ভূস্বামিদের এই বিরাগ ও অসন্তোষই একদিন আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। সার হার্বার্ট এডওয়ার্ডিস তাই স্পষ্টই ডালহৌসিকে জানিয়েছিলেন: “বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যাহাদের ভূসম্পত্তি এইভাবে অধিকার করিয়াছেন সেই অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত ও সমবেদনাশূন্য হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত ধূমায়মান বহ্নি একদিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভারতে কোম্পানী-রাজত্বের অবসান ঘটাইতেও পারে।”

রাজস্ব-সংক্রান্ত বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অনেকাংশে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। সে-পরিবর্তনে অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণ

ছিল না। কিন্তু সামাজিক রীতির পরিবর্তন ছাড়া আর একটি বিষয়ের পরিবর্তনে সাধারণের হৃদয় সহজেই সংক্ষুব্ধ হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে আরম্ভ করে। নবীন যুগ পুরাতন যুগকে আঘাত করল। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি অভ্যাস ও ইংরেজি রীতিতে সংস্কৃত এক অভিনব সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম-শাসিত পুরাতন সমাজকে সচকিত করে তুললো। হিন্দুসমাজের বনিয়াদ ছিল জাতি-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জাতি-বিচারের প্রতি কোম্পানীর সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই চিরন্তন প্রথার ওপর কোম্পানী প্রথম আঘাত হানলেন কারাগৃহের নতুন প্রণালী প্রবর্তন করে। কারাগারে কয়েদিগণের জন্ম পাচক নিযুক্ত করার প্রথা যখন প্রবর্তিত হলো, তখন সকলেই মনে করতে লাগল যে, গভর্ণমেণ্ট এইবার ভারতবাসীর জাতি নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন। শীঘ্রই ভারতের জনসাধারণ ফিরিঙ্গী গভর্ণমেণ্টের শাসনে জাতি নষ্ট হবে ভেবে কর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কা তাদের উন্মত্ত করে তুলেছিল এবং গভীর আতঙ্ক তীব্র তুষানলের মতন অলক্ষ্যভাবে তার গতি প্রসারিত করে তাদের নিরন্তর দগ্ধ করতে থাকে।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য-সংখ্যা তিন লক্ষের বেশী ছিল না এবং এই তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে শতকরা সত্তর জন ছিল ভারতবাসী। ভারতে যে অল্প সংখ্যক দেশীয় সৈন্য একদা রবার্ট ক্লাইভকে পলাশির আমবাগানে জয়লাভে সহায়তা করেছিল, তারাই ক্রমে একটি বিরাট সুশিক্ষিত বাহিনীতে পরিণত হয়। তারা সাহসে অনমনীয়, তেজস্বিতায় অপ্রতিহত ও রণপাণ্ডিত্যে ইংরেজ সেনার সমকক্ষ ছিল। কোম্পানীর এই দেশীয় সৈন্যদের বলা হতো সিপাহী। সিপাহীদের শুধু বীরত্ব আর রণকুশলতাই ছিল না, তাদের বিশ্বাস ও প্রভুভক্তিও ছিল অসামান্য। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের আদি পর্বে এই সিপাহীরাই ছিল বণিক কোম্পানীর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। একাধিক ইংরেজ সেনানায়ক, যাঁরা কোম্পানীর সামরিক কার্যে এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সিপাহীরা কখনো কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ ছিল না এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তারা সকল রকম কষ্ট স্বীকারে

প্রবৃত্ত হতো। হ্যাভলকের মতন প্রবীন সেনাপতি লিখেছেন: "ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহী সর্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহ সহকারে কর্তব্য-পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধভাবে ভিন্ন দেশীয় অধিনায়কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অম্লানভাবে তাঁহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে।...এবং সে যুদ্ধের সময়ে আপনার বহু পরিশ্রমলভ্য যৎকিঞ্চিৎ বেতনের অংশ দিয়া, বৃটিশ রাজ্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি জাজ্বল্যমান। তাহার মহত্ত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্তব্যবুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ তাহাকে ইতিহাসে বরণীয় করিয়া রাখিবে।"

সিপাহীযুদ্ধের প্রাক্কালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গঠন ছিল এইরকম। মূল রেজিমেণ্টের সংখ্যা চারটি: (১) কুইনস্ রেজিমেণ্ট (ইহা কেবলমাত্র য়ুরোপীয় সৈন্যদ্বারা গঠিত); (২) বেঙ্গল রেজিমেণ্ট; (৩) মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট এবং (৪) বোম্বাই রেজিমেণ্ট। প্রত্যেকটি রেজিমেণ্ট তিনভাগে বিভক্ত ছিল: (১) পদাতিক সৈন্য; (২) অশ্বারোহী সৈন্য এবং (৩) গোলন্দাজ সৈন্য। বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ৩৪ নম্বর পল্টনের যে সাতটি দলকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকটির সৈন্যের শ্রেণী-বিভাগ ছিল এই রকম: ব্রাহ্মণ—৩৩৫; ছত্রী—২৩৭; নিম্নবর্ণের হিন্দু—২৩১; দেশীয় খৃস্টান—১২; মুসলমান—২০০ এবং শিখ—৩৪।

সিপাহীদের মধ্যে রাজপুত ছিল, মুসলমান ছিল, উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিল এবং শিখ ও গুর্খা ছিল, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোকই ছিল। এই সিপাহী একান্ত ভাবেই কোম্পানীর তৈরি হলেও, ভারতের সামরিক ঐতিহ্যের ধারা যে কিছুটা এদের মধ্যে ছিল না, তা বলা যায় না। সমরকুশল একটা সম্প্রদায়কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য়ুরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। মাদুরা, আর্কট ও কডালুরের রণাঙ্গনে ভারতীয় সিপাহীদের রণনৈপুণ্য, ফরাসী ও ইংরেজের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। কিন্তু এর বিনিময়ে সিপাহীরা কিছুই পায়নি। সবরকম ক্ষমতা, সবরকম দায়িত্ব, সবরকম পুরস্কার কেবলমাত্র ইংরেজ সৈন্যদের প্রাপ্য ছিল। কলকাতা অধিকারের পর ক্লাইভ বাংলায় একদল সৈন্য সংগঠন করেছিলেন। এই বাঙালি পল্টনের রণনৈপুণ্যও সেদিন ইংরেজের প্রশংসা

অর্জন করেছিল। ভারতে কোম্পানীর দেশী ফৌজদের মধ্যে রণ-কুশল, ক্ষিপ্র ও কর্মঠ বাঙালী সৈন্যদের একটা বিশেষ স্থান ছিল। বাঙালি পল্টনের সিপাহীরা কেবল মাত্র যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিল না। তারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলেও সমাজে সম্মানিত ছিল। সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করলেও, তারা পুরুষানুক্রমিক ধর্মানুশাসন রক্ষায় যত্নবান ছিল। দক্ষিণাপথের সৈন্যদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। এরাও বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত থেকে নিজের নিজের ধর্মপদ্ধতির অনুরূপ কার্যানুষ্ঠান করত। এ পর্যন্ত এই ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু শেষে কোম্পানীর সৈন্য-বিভাগ থেকে একটার পর একটা নতুন আদেশ প্রবর্তিত হতে থাকে। প্রতি আদেশেই নতুন ধারণা, নতুন প্রস্তাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাক্ষিণাত্যের সিপাহীরা বরাবর কর্ণভূষণ ও তিলক ব্যবহার করে আসছিল। নতুন রেগুলেশনে বলা হলো তারা কর্ণভূষণ ও তিলক ব্যবহার করতে পারবে না। এতকাল তাদের মাথায় ছিল পাগড়ি, নতুন আইনে পাগড়ি অপসারিত হলো এবং তার জায়গায় এলো ইংরেজি ধরণের গোল টুপি। নতুন নিয়মে সিপাহীদের ইংরেজি কায়দায় শিক্ষা দেওয়া হলো। তারা ইংরেজি রীতিতে সজ্জিত হলো এবং ইংরেজি রীতিতে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করতে বাধ্য হলো। কৌতূহলী সিপাহীরা ধর্মনাশ ও জাতি-নাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। গোল টুপি দেখে তারা মনে করল, কোম্পানীর সরকার এবার তাদের সকলকে খৃষ্টান করবার মতলব করেছে। তাদের ধারণা হলো, এই টুপি গরু ও শূয়োরের চর্বিতে তৈরি, অতএব হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অস্পৃশ্য। তারপর হিন্দু সিপাহীরা যেমন তিলক ব্যবহারের নিষেধে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলো, মুসলমান সিপাহীগণও সেই রকম শ্মশ্রুচ্ছেদন ও কর্ণভূষণের অপসারণে বিরক্ত হয়ে উঠল।

প্রকৃত পক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের চৌদ্দ বছর আগে থেকেই সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানীর সুবিচার সম্পর্কে অসন্তোষ দেখা দেয়। তখন লর্ড এলেনবরা ভারতের গভর্নর-জেনারেল আর স্তর চার্লস নেপিয়ার প্রধান সেনাপতি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে কিছুদিনের জন্ত বাস করছিলেন। সেই সময়ে তিনি ৩৪ নম্বর পল্টনের অসন্তোষের সংবাদ জানতে পারেন। এই পল্টনকে বাংলা থেকে সিন্ধুদেশে কাজ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ফিরোজপুর পর্যন্ত এসে তারা আর

অগ্রসর হতে অসম্মত হয়। তাদের দাবী ছিল যুদ্ধের সময় যে অতিরিক্ত বেতন পাবার কথা, তা না পেলে তারা সিন্ধু-যুদ্ধে যাবে না। বাংলার সাত নম্বর অশ্বারোহী সৈন্যরাও সীমান্ত প্রদেশে যাবার সময়ে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহাচরণ করেছিল। ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে সিপাহীদের মধ্যে বিরাগ অসন্তোষ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল। তাদের অন্তরের ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠার জন্যে খালি সময়ের অপেক্ষা করছিল।

এ ছাড়া, কোম্পানীর সুবিচার সম্বন্ধেও সিপাহীদের অনেক অভিযোগ ছিল। বিশ্বস্তভাবে আজীবন কাজ করার পুরস্কার ছিল মাত্র সুবেদারী। এর চেয়ে উচ্চতর পদ তাদের অদৃষ্টে ঘটে উঠত না। এমন কি, সুবেদারদেরও বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হতো না। তারপর অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা। সিপাহীদের বেতন ছিল খুবই কম। সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্যন্ত দেখা যায় যে সিপাহীদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র সাত টাকা। কোম্পানীর জন্য প্রাণ দিয়ে, কোম্পনীর রাজ্য প্রসারে সহায়তা করে, তারা যা আশা করেছিল তা পেল না। একবার রাওলপিণ্ডির দুই দল সৈন্য মাইনে নিতে অসম্মত হলো। তাদের মধ্যে চারজন সৈন্য কিছুতেই মাইনে নিল না বলে তাদের প্রতি অবাধ্যতার অভিযোগে অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হলো। তাদের দ্বীপান্তরে কারাবাস করতে হলো। নিতান্ত অল্প বেতনের প্রতিবাদ করায় এমন কঠোর দণ্ড হলো দেখে, সমস্ত সিপাহীদের মনেই বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিল। কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের বিদ্বেষবুদ্ধি ও বিরুদ্ধভাব একদিনের ব্যাপার নয়। সিপাহীযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই তাদের মধ্যে নানা কারণে বিদ্বেষ ও অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। সাতান্নর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর আগে ভেলোরের সিপাহীদের বিদ্রোহ এই বিদ্বেষ ও অসন্তোষের প্রথম নিদর্শন।

সিপাহীদের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষের পটভূমিকায় ডালহৌসি ও নেপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সার চার্লস নেপিয়ার তখন ভারতের প্রধান সেনাপতি। তিনি ভারতবর্ষে এসে কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী, আগ্রা, রাওলপিণ্ডি, মিরাট, কানপুর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সেনা-নিবাসগুলি পরিদর্শন করে, দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখতে পেলেন। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন যে, বেতনের স্বল্পতা ও চাকুরীতে ভবিষ্যৎ

নিরাপত্তা বা উন্নতির অভাবের দরুণই সিপাহীদের মধ্যে বিরাগ ও অসন্তোষ সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। "সিপাহীরা বর্ধিত বেতনের প্রত্যাশা করে"—এই কথা তিনি ডালহৌসিকে জানালেন। "বর্ধিত বেতন ভিন্ন তাহাদের বিরাগ ও অসন্তোষ নিরাকৃত হইবে না। বহু ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন বেতন বাকী পড়িয়াছে—সিপাহীদের মনঃক্ষোভের ইহাও একটি কারণ। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ আমি সিপাহীদিগকে নিয়মানুসারে বেতন দিতে আদেশ প্রচার করিলাম।"

লর্ড ডালহৌসি নেপিয়ারের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন। নেপিয়ার উত্তরে জানালেন, "এ বিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। সিপাহীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই আমি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম।" ডালহৌসি প্রধান সেনাপতির যুক্তি মানতে পারলেন না। গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে মত-বৈষম্য হওয়াতে সার চার্লস নেপিয়ার পদত্যাগ করলেন। ডালহৌসি ও নেপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সিপাহীদের মনেও দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল—তারা ভাবলে ভারতে ইংরেজশাসনের মূল ভিত্তি শিথিল হয়ে এসেছে। ভারতের প্রায় সকল সেনানিবাসে এই বিষয়টা সেদিন আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। কোম্পানীর ওপর সিপাহীরা আস্থাশূন্য হতে আরম্ভ করল। ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন পর্যন্ত বলেছেন: "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ছিল। যে কোন নিরপেক্ষ দর্শক সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, সিপাহীদের মধ্যে এমন সব লক্ষণ পরিস্ফুট যাহা নিঃসন্দেহে তাহাদের মনের অসন্তোষের পরিচায়ক। তাহাদের বেতনের স্বল্পতা এবং উন্নতির অনিশ্চয়তাই ছিল এই অসন্তোষের মূল কারণ। সেনানিবাসে সিপাহীদের বাসস্থান, ইংরেজ সৈন্যদের বাসস্থানের তুলনায় অত্যন্ত অসন্তোষজনক ছিল এবং এই বিষয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না। তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কোম্পানীর সরকারের অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা সমালোচনার অতীত ছিল না।"

এরপরেই ব্রহ্মযুদ্ধের ঘটনায় সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। গোরাসৈন্যদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের ভারতীয় সিপাহী পাঠাবার দরকার হয়। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, চিরদিনের আচার-অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে সিপাহীদের কখনো সমুদ্রপারে যেতে হবে না;

অথচ ব্রহ্মদেশে যাবার জন্তে তাদের ওপর কোম্পানীর হুকুম এলো। ইংরেজের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সিপাহীদের মনে সন্দেহ জাগল। তাদের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সংবাদ ভারতে এসে পৌছল। ক্রিমিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার নিকট ইংরেজের পরাজয় সিপাহীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল—ইংলণ্ডের পরাক্রম সম্বন্ধে তাদের মনে জাগল বিষম সন্দেহ। বৃটিশরাজের অবনতি সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণের মনে পর্যন্ত ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। এরপর ইংলণ্ড যখন ক্রিমিয়া যুদ্ধের জন্ত ভারতবর্ষে অর্থ ও সৈন্ত সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকে, তখন ভারতের জনসাধারণ ভাবতে লাগল, ইংলণ্ডের সৈন্তসংখ্যাই কেবল কমে যায়নি, তার টাকার জোরও কমে গেছে।

এ ছাড়া, খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমির উচ্ছেদ হওয়াতেও দেশের সকলেই অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই ভাবে আট বছর কাল ভারতবর্ষ শাসন করে, দেশে আসন্ন বিপ্লবের বীজ বপন করে ডালহৌসি ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড ত্যাগ করলেন। তাঁর কাছ থেকে দুর্বল হস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন লর্ড ক্যানিং। ভারতে আসবার প্রাক্কালে লণ্ডনের এক ভোজসভায় লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন: "ভারতবর্ষের আকাশ এক্ষণে নির্মল দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে এক হস্ত পরিমিত একখণ্ড মেঘের উদয় হইতে পারে। ঐ মেঘ ক্রমে বর্ধিত হইয়া অবশেষে আমাদের সর্বনাশ সাধন করিতে পারে।"

ক্যানিং শঙ্কিত হৃদয়ে এক হস্ত পরিমিত যে মেঘের উল্লেখ করেছিলেন, সেই মেঘই দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হয়ে দেখা দিল ভারতের আকাশে এক বছরের মধ্যে এবং সেই মেঘ বর্ধিত হয়ে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টকে বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। ক্যানিং-এর ভবিষ্যৎবাণী অতি মারাত্মক ভাবেই সফল হয়েছিল।

॥ দুই ॥

স্থান—দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট। সময়—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের একদিন। সকালবেলা।

বারুদখানার সামনের উঠানে এক ব্রাহ্মণ সিপাহী বসে একমনে তুলসীরামায়ণ পাঠ করছিল। এমন সময়ে ব্যারাকের একজন লস্কর এসে সেই সিপাহীর কাছে একটু জল চাইল। কপালে ফোঁটা-তিলক, গলায় শুভ্র উপবীত, সেই সিপাহী মুখ তুলে লস্করের দিকে চাইল একবার। তারপর আবার একমনে পড়তে লাগল রামায়ণ।

—কেঁও জী, পানি নেহি মিলেগা? জিজ্ঞাসা করল লস্কর।

—মিলেগা। লেকিন তেরা লোটা কাঁহা? মুখ তুলে বললে সিপাহী।

—আপকা লোটামে—লস্করের কথা শেষ হবার আগেই সিপাহী কঠিন ভাবে তাকাল তার দিকে। অস্পৃশ্য নীচজাতীয় লস্করের স্পর্ধা দেখে তার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। আজ এত বছর ধরে সে কোম্পানীর ফৌজে কাজ করছে জাতি ও ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, আর আজ কিনা সামান্য একটা লস্কর তারই লোটায় জল খেতে চায়। ভ্রুকুটি-কুটিল চক্ষে সিপাহী লস্করকে বললে—আমি উঁচু জাতের বামুন, তুমি নীচ জাতের লোক, আমার লোটায় তুমি জল খাবে, তোমার আস্পর্ধা ত কম নয়!

লস্কর তবু বলে— এতে আর দোষ কী, সিপাহীজী?

— দোষ! এ আমাদের ধর্ম ও জাতি-ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

— ধর্ম! জাতি! কোম্পানীর সিপাহীদের ধর্ম ও জাতি বলে কিছু আছে নাকি? লস্করের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। লস্করের মুখে এই কথা শুনে শুদ্ধাচার-সম্পন্ন সিপাহী স্তম্ভিত হয়। এতকাল চাকরী করছে, এমন কথা তো

লস্করের মুখে সে এর আগে আর কোন দিন শোনে নি। লোকটা কি উপহাস করছে তাকে?

— কেন, আমাদের জাত মারে কে? জিজ্ঞাসা করল সিপাহী একটু উত্তেজিত ভাবেই।

— কোম্পানীর রাজ্যে এখন আর জাতধর্মের ভেদাভেদ থাকবে না। বললে লস্কর একটু গম্ভীরভাবেই।

— কে বললে থাকবে না? রামায়ণ বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে সিপাহী।

— কেন, নতুন টোটা।

— টোটা! টোটাতে জাত-ধর্ম যাবে কেন?

— এই টোটা যে গরু আর শূয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি।

— তাতে কি হয়েছে?

— ঐ টোটা দাঁত দিয়ে কাটতে হবে। কোম্পানীর হুকুম।

নিমেষ মধ্যে সিপাহীর মুখের ভাব বদলে গেল। সে আর কোন কথা না বলে রামায়ণ বন্ধ করে ব্যারাকে ফিরে গেল।

ডালহৌসি যখন শাসনভার ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন ভারতের বৃহত্তর অংশ যেন ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি। তাঁর পররাজ্য-গ্রাস নীতি, পাঞ্জাব অধিকার, অযোধ্যা অধিকার এবং নাগপুর, সেতারা, ঝাঁসি, বেরার প্রভৃতি রাজ্যের প্রতি ব্যবহার, ভারতবাসীর হৃদয়ে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর অযোধ্যার নবাবকে যখন বন্দী করে কলকাতায় আনা হলো, তখন সেই রাজ্যের সমস্ত মুসলমান জনসাধারণের চিত্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হয়ে উঠল। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অসন্তোষ। অসন্তোষের সেই বারুদস্তূপে চর্বিযুক্ত নতুন টোটার সংবাদ আচম্বিতে অগ্নিসংযোগ করল। জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ-বহ্নি সহসা এক প্রবল অগ্ন্যুদ্গারে আত্মপ্রকাশ করল—চর্বি-মাখানো টোটার জনরবে ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। টোটায় গরু আর শূয়োরের চর্বি আছে—এই কথা শুনে কোম্পানীর সকল সিপাহী-ই জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। কোম্পানী তাদের কাছে শত্রু হয়ে উঠল। কোম্পানীর ফৌজের মধ্যে এতকাল 'ব্রাউনবেস' বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এ বন্দুকের নিশানা খুব দূর পাল্লার ছিল না। কোম্পানী আমদানী করলেন এক নতুন ধরণের

বন্দুক—'এন্‌ফিল্ড্‌ রাইফেল'। খুব দূর-পাল্লার বন্দুক। আর এর নিশানাও অব্যর্থ। এই বন্দুকের জন্যই তৈরি হয়েছে এই টোটা। গরু হিন্দুর কাছে পবিত্র, শূয়োর মুসলমানের কাছে হারাম—অতএব গরু ও শূয়োরের চর্বি মেশানো এই টোটা ব্যবহারে কি হিন্দু, কি মুসলমান, সব সিপাহীরই আপত্তি হবার কথা। প্রকৃত কথা, টোটার জনরব জনরব মাত্র ছিল না। ইংলণ্ডের উলউইচের কারখানা থেকে সত্যিই এই চর্বি-টোটার আমদানী হয়েছিল। ভারতবর্ষে মিরাট ও দমদমেও তখন চর্বি-টোটা তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে। ব্যবহার করা হয় নি। ধূমায়িত অসন্তোষের আগুনে ইন্ধন জোগাবার পক্ষে সেদিন এই জনরবই ছিল যথেষ্ট।

সেই জনরবের সঙ্গে এসে মিশল আজগুবি এক ভবিষ্যদ্বাণী। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল একটি কথা—১৮৫৬-র শেষে ভারতের মাটিতে কোম্পানীর রাজত্ব আর থাকবে না। এ ভবিষ্যদ্বাণী নাকি অব্যর্থ, এমন কথাও লোকেরা বলাবলি করতে লাগল। এক শ বছর আগে কোন্ এক সাধু পুরুষ এই ভবিষ্যদ্বাণীই করে গেছেন। আসল কথা, জনসাধারণের মনে যখন কোন বিষয়ে উত্তেজনা জাগে, তখন বাতাসে ভবিষ্যদ্বাণী ভেসে বেড়ায় এবং তাই লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে সমাজের পরিবেশকে আরো উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। নতুন বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের ইউনিফর্মেরও বদল হলো। নীল কোর্তার স্থানে তাদের দেওয়া হলো লাল রং-এর কোর্তা। এই ইউনিফর্ম বদলের ব্যাপারটাও সিপাহীদের কিছুটা যে সন্দিগ্ধ করে না তুলেছিল, এমন নয়। ভয়ার্ত সেই সিপাহী সেই লস্করের মুখে ঐ ভয়ঙ্কর কথা শুনে সেনাদলের সকলের কাছে বিষয়টা ব্যক্ত করল। তারাও ভয় পেল, চমকে উঠল। যে 'এন্‌ফিল্ড রাইফেল' পেয়ে তারা আনন্দিত হয়েছিল, এখন চর্বি-টোটার কথা শুনে তাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো। ক্রমে সেই বিষাদ পরিণত হলো ঘৃণা এবং আতঙ্কে। জনরব এক স্থানে আবদ্ধ থাকে না, মুখে মুখে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দাঁত দিয়ে নতুন টোটা কাটতে হবে—এই জনশ্রুতি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল নানা জায়গায়, এক ছাউনি থেকে আরেক ছাউনিতে। যারা শুনল তারাই জাত-ধর্ম যাবার ভয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। সিপাহী ও সেনাপতিদের মধ্যে তখন আগের মতন সদ্ভাবের সম্বন্ধ ছিল না, আগে সেনাপতিদের উপর তাদের যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস আজ তিরোহিত। তাই

টোটাসংবাদে বিচলিত সিপাহীদের কেউই বিষয়টির সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্ত আগের মতন সেনাপতির কাছে গেল না। জনরবকে তারা সত্য বলে মেনে নিল। এই জনরবের ভেতর দিয়েই এল নতুন বছর—ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় আঠার শো সাতান্ন।

ক্রমে দমদমের বাতাস বারাকপুরে পৌঁছিল। সেখানেও সিপাহীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ। বাংলার সবচেয়ে প্রধান সেনানিবাস বারাকপুর। আবার এই বারাকপুর প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরও। সারা ভারতবর্ষে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের নাম। কলকাতা থেকে ষোল মাইল দূরে গঙ্গার তীরে এই ক্যান্টনমেন্টটি দেখতে ভারি সুন্দর। বড় বড় গাছ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুধারে ছায়া ফেলে, সুন্দর সুন্দর চওড়া রাস্তা, সুন্দর সৌধাবলী—সমস্ত মিলিয়ে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট অতি চমৎকার। এখানে তখন ছিল ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের প্রাদেশিক বিরাম-প্রাসাদ। বারাকপুরের জলবায়ু উপকারী। কাছেই টিটাগর—সেখান থেকে বহু ইংরেজ নর-নারী বারাকপুরে বেড়াতে আসতেন। জব চার্ণকের নাম অনুসারে বারাকপুরের তখন দ্বিতীয় নাম ছিল—চানক।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বারাকপুরের সেনানিবাসে ছিল চারদল পদাতিক সিপাহী। এদের মধ্যে সবচেয়ে রণনিপুণ রেজিমেণ্ট দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার আর তেতাল্লিশ নম্বরের রেজিমেণ্ট। এই দুই বাহিনী কান্দাহারের যুদ্ধে এবং মহারাষ্ট্র ও শিখযুদ্ধে বিজয়লাভ করে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া, আরো কয়েকটি পলটন এখানে সেই সময়ে ছিল। বারাকপুর সেনানিবাসের সেনাপতি তখন বিগ্রেডিয়ার চার্লস গ্রাণ্ট আর বিভাগীয় সেনাপতি জেনারেল জন হিয়ার্সে।

দমদমের জনরব এল বারাকপুরে এবং বারাকপুর থেকে কলকাতায়। সেখানে রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রমুখ সনাতনী হিন্দু নেতারা এই সংবাদে একটু বিচলিত হলেন। ধর্মসভা বলে তখন তাঁদের একটা সমিতি ছিল। সেই সমিতিতে টোটার কথা আলোচিত হলো। কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখন এমনিতেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন উপলক্ষে অত্যন্ত বিচলিত ছিল। বিধবা বিবাহের আইন পাশ হয়ে গিয়েছে এবং এই বিধানকে তাঁরা হিন্দু-ধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত বলে

ঘোষণা করলেন। কাজেই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার পাঁচ মাস পরেই যখন টোটার জনরব উঠল, তখন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা এই জনরবের সত্যাসত্য বিচার করে দেখলেন না।

অবিলম্বে কলকাতার ধর্মসভার এক অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, সনাতন হিন্দুধর্মে এইভাবে হস্তক্ষেপ করা ইংরেজ-শাসকদের পক্ষে বিশেষ অন্যায়। গভর্ণর-জেনারেলের কাছে এ-বিষয়ে একটি আবেদন পাঠাবার কথাও তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন। টোটার জনশ্রুতি চারদিকের পরিবেশকে এমনই আতঙ্কিত করে তুললো যে, জেনারেল হিয়ার্সে ২৮শে জানুয়ারী এ্যাডজুটান্ট জেনারেলের কাছে এই মর্মে এক ডেসপ্যাচ পাঠালেন: "বারাকপুরে সিপাহী পল্টনে বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কতিপয় কুচক্রী ব্রাহ্মণশ্রেণীর লোক এবং কলিকাতার হিন্দুপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ (আমার বিশ্বাস ধর্মসভা) এইরূপ এক জনরব তুলিয়া দিয়াছেন যে, সেনাদলের সিপাহীদের বলপূর্বক খৃস্টান করা হইবে। যে সকল হিন্দু কলিকাতায় বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে, বোধ হয়, তাহারাই অন্যবিধ উপায়ে বিধবাবিবাহ প্রতিষেধের ব্যবহার বজায় রাখিবার জন্য, বিধবাবিবাহের অনুকূল আইন রদ করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কল্পনা করিয়াছে যে, মূর্খ সিপাহীদিগকে বিপরীত পথে লওয়াইলে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে; সেই কল্পনাপ্রভাবেই এই বলিয়া তাহারা সিপাহীদিগকে ক্ষেপাইয়া দিতেছে; 'ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে বলপূর্বক খৃস্টান করিবেন, বলপূর্বক তোমাদের জাতিধর্ম বিনাশ করিবেন, অতএব তোমরা পূর্ব হইতেই উপদ্রব করিতে আরম্ভ কর'। এক্ষণে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিলে (নিরস্ত করা কঠিন বোধ হইতেছে) সম্ভবত তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

জেনারেল হিয়ার্সের এই ডেসপ্যাচ থেকে জানা যায় যে, জনরব কি রকম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলের মুখেই চর্বি-টোটার কথা। বারাকপুরের সকল সিপাহীর মুখে ঐ কথার আলোচনা। আলোচনা ক্রমে আন্দোলনে পরিণত হয়। গোখাদক ও শূকরখাদক ফিরিঙ্গীরা আমাদের জাত-ধর্ম নষ্ট করতে সংকল্প করেছে—সিপাহীদের এই মনোভাব সেনানিবাসের কর্তৃপক্ষদের স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন করে তুলল। সেনাদলে গভীর অসন্তোষ—সেই

অসন্তোষ প্রকাশ পেল তাদের ছোটখাট উপদ্রবের ভেতর দিয়ে। রাত্রির অন্ধকারে সেনানিবাসের খড়ের ছাউনি আচম্বিতে জ্বলে ওঠে। বারাকপুরের টেলিগ্রাফ অফিসটি আগুন দিয়ে ভস্মসাৎ করা হলো। প্রতি রাত্রেই অগ্নিকাণ্ড। উড়ন্ত তীরের ডগায় জ্বলন্ত আগুন এসে পড়ে অফিসারদের বাংলোর খড়ের চালে, সরকারী বাড়িতে হয় অগ্নিকাণ্ড। সংবাদ এল, অনুরূপ অগ্নিকাণ্ড রাণীগঞ্জের ছাউনিতেও শুরু হয়েছে। কারা আগুন লাগায়, জানা যায় না।

বহরমপুর সেনানিবাস।

বারাকপুর থেকে এক শ মাইল দূরে ভাগীরথী তীরে এই সেনানিবাস। বিদ্রোহের ডঙ্কা এখানেই প্রথম বেজে উঠেছিল। অদূরে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের বাসস্থান। ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটলেও নবাব এখনো বহু ধনের মালিক, এবং বহু অমাত্য-পরিবেষ্টিত। তিনি জানেন, কোম্পানীর সরকার তাঁকে অপদস্থ করেছেন। দুর্বল, কিন্তু বংশ-মর্যাদার নাম আছে এবং এখনো তাঁর ইঙ্গিতে হাজার হাজার লোক নবাবের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে—এই তাঁর অনুমান।

বহরমপুর সেনানিবাসে একটিও ইংরেজ সৈন্য ছিল না। এমন কি, কাছাকাছি ইংরেজ-সৈন্যের কোন শিবির পর্যন্ত ছিল না। উনিশ নম্বর পল্টনের একদল পদাতিক সিপাহী আর একদল অচিহ্নিত অশ্বারোহী মাত্র সেখানে ছিল। আর ছিল কয়েকটা কামান যা দেশীয় গোলন্দাজেরাই দাগত। বারাকপুর থেকে একদল সৈন্য এল বহরমপুরে। তারা এসেই সেখানকার সিপাহীদের উপস্থিত ঘটনা ও তাদের সংকল্প সম্বন্ধে অবহিত করল। বলল, ইংরেজেরা আমাদের চর্বি দেওয়া টোটা দাঁত দিয়ে কাটাবে, কেমন করে এর প্রতিবিধান করা যায়, তোমরা বিবেচনা কর। এই কথা শুনে বহরমপুরের সিপাহীরা বারাকপুর থেকে সমাগত চৌত্রিশ নম্বর পল্টনের সৈন্যদের বাহু প্রসারণ করে মধুর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করল। এই দুই পল্টনের মধ্যে বন্ধুত্ব অনেক দিনের—একদা এই দুই পল্টন এক সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে ছিল।

বহরমপুরের পল্টনের এক সিপাহী জিজ্ঞাসা করল, বারাকপুর থেকে টোটাকাটার যে গুজবটা রটেছে, সেটা সত্যি কি না?

বারাকপুরের সিপাহী উত্তরে বলে, গুজব হবে কেন? ব্যাপারটা সত্যি। কোম্পানীর সরকার দাঁত দিয়ে চর্বি-টোটা কাটিয়ে আমাদের জাত-ধর্ম নষ্ট করতে চায়।

—প্রেসিডেন্সী বিভাগের সৈন্যরা কি বলে? জিজ্ঞাসা করে বহরমপুর পল্টনের আরেকজন সিপাহী।

—তারা এই টোটা ব্যবহার করতে নারাজ।

এই কথা শুনে বহরমপুরের উনিশ নম্বর রেজিমেণ্টের সিপাহীদের আতঙ্ক ও বিরাগ বেড়ে উঠল। বুঝল এই বিষয়ে তারা তাদের অফিসারদের কাছে যা শুনেছিল, সে সবই মিথ্যা। বহরমপুরের সিপাহীরা বারাকপুরের সিপাহীদের কথা ষোল আনা বিশ্বাস করল—আসন্ন বিদ্রোহের উত্তেজনার সূচনা এইখানে এইভাবেই।

পরের দিন। বহরমপুরের সেনানিবাসের কর্তারা হুকুম দিলেন, আগামী কাল প্যারেড হবে। সিপাহীরা এ হুকুমের তাৎপর্য কিছুই বুঝতে পারল না, শুধু ভাবল সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, এ প্যারেডও বুঝি সেইরকম। কিন্তু টোটা-বিহীন বন্দুক নিয়ে প্যারেড—সে আবার কি? প্রশ্ন জাগল অনেকের মনে। সকালবেলায় প্যারেড আরম্ভ হলো। তখনো পর্যন্ত কোনরকম অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায় নি। কিন্তু যেই সিপাহীদের নতুন টোটা দেওয়া হলো, অমনি তারা বেঁকে দাঁড়াল। কেউ সে-টোটা স্পর্শ করল না। বলল, এ টোটা আমরা নেব না, এর মধ্যে এমন দূষিত জিনিস আছে যা ছুঁতে আমাদের ধর্মে বাধে। হিন্দু ও মুসলমান সকল সিপাহীদের মুখে ঐ এক কথা। বারাকপুরের সিপাহীদের উস্কানির সদ্য ফল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগেই এ্যাডজুট্যাণ্ট এই খবর দিলেন কর্ণেল মিচেলকে। কর্ণেল বুঝলেন ছাউনির মধ্যে মহা গোলযোগ। কলকাতা থেকে যে নতুন টোটা এসেছে, তা দেখে অবধি সিপাহীরা বেঁকে দাঁড়িয়েছে। এ্যাডজুটাণ্টের মুখে এই খবর শুনে কর্ণেল মিচেল তখুনি ঢুকলেন ছাউনিতে এবং জমাদার, হাবিলদার ও সুবেদারদের আদেশ পাঠালেন কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখে হাজির হবার জন্যে। দেশীয় অফিসাররা এলেন। কর্ণেল মিচেল্ তাঁদের সঙ্গে মিষ্ট কথা বলা দূরে থাক, অত্যন্ত মেজাজ দেখিয়েই বজ্রনিনাদে বললেন, সিপাহীরা টোটা নিতে অস্বীকার করেছে, তাদের বলো যদি তারা টোটা নিতে

অস্বীকার করে তা'হলে তাদের অত্যন্ত কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হবে। হয়ত তাদের চীন কি ব্রহ্মদেশে চালান করে দেওয়া হবে—যেখানে গেলেই মানুষ মরে।

—কিন্তু এই টোটা যে তারা ছুঁতেই চায় না। বললেন সুবেদার মোহন সিং। কর্ণেল মিচেল তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিতে বললেন, এক বছর আগে ঐ টোটা তৈরি হয়েছে, সব ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীরা তা আগে ব্যবহার করেছে। এখন যারা জিদ করে সরকারের আদেশ অমান্য করবে, তাদের ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে।

অফিসাররা বিদায় নিলেন। কর্ণেলের কথায় বিশেষ কোন ফল হলো না। সিপাহীদের ধারণা বদ্‌লাল না, বরং তাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে তাদের জাতি ও ধর্ম বিপদাপন্ন। কর্ণেলের ক্রুদ্ধ বাক্য বিপরীত ফলই প্রসব করল। অন্ধকার রাত। কর্ণেল মিচেল গাড়ি চড়ে চলেছেন তাঁর বাংলোয়। সঙ্গে এ্যাডজুটাণ্ট। মনে মনে আতঙ্ক, কি জানি কি বিপদ ঘটে। এখানকার সেনানিবাসে একটাও ইংরেজ সৈন্য নেই। পদাতিক দেশী সিপাহীরা দলে ভারি, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজের 'সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া, তাদের ওপরই বা ভরসা কোথায়—তারাও তো ভারতীয়। তারাও যদি সিপাহীদের মতন বেঁকে দাঁড়ায়, যদি তাদের সঙ্গে হাত মেলায়, তা হলে তো আরো বিপদ। এখন কি করা কর্তব্য? কর্ণেল কিছুই স্থির করতে না পেরে সেই রাত্রেই আদেশ জারী করলেন, কাল সকালে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ দলের প্যারেড হবে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী। রাত দশটা।

বিদ্রোহের প্রথম সংকেত দেখা দিল বহরমপুরের উনিশ নম্বর রেজিমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে। ধর্মনাশ ও জাতি নাশের আশঙ্কায় তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রবল উত্তেজনা। রাত্রির অন্ধকারেও তারা বেরিয়ে পড়ল ব্যারাক থেকে। বাঘ যেমন বেরোয় গুহা থেকে, ঠিক সেই ভাবে।

রাত দশটা। কর্ণেল তখনও ঘুমোন নি। শুয়ে শুয়ে আগামী সকালে কি করা হবে, সেই কথা ভাবছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা ভীষণ কলরবে তিনি চমকে উঠলেন। ডঙ্কাধ্বনি, বহুকণ্ঠের সমবেত উচ্চরব আর সেই সঙ্গে

বহুলোকের গর্জন। কিছুই বোঝা গেল না। তবে কি পল্টনের সিপাহীরা ক্ষেপে উঠল? চারদিকে শোনা যাচ্ছে ছুটোছুটি, দাপাদাপি আর উত্তেজনাপূর্ণ তুমুল চীৎকার—আগ্ লাগাও। পদাতিক সৈন্তরা সকালবেলায় প্যারেড করবার জন্তে যে সব বন্দুক সাজিয়ে রেখেছিল, সেগুলোতে তারা গুলী-বারুদ ভর্তি করতে লাগল। কর্ণেলের আর ঘুম হলো না। তিনি তখনি ইউনিফর্ম পরে সিপাহীদের ছাউনিতে উপস্থিত হলেন।

অশ্বারোহীদলের সেনাপতির কাছে গিয়ে মিচেল্ হুকুম দিলেন—ফল্ ইন্। গোলন্দাজদেরও তিনি অনুরূপ হুকুম দিয়ে বললেন, এখনি যেন তারা যুদ্ধের কামান নিয়ে পদাতিক-দলের ছাউনির সম্মুখে হাজির হয়। এই খবর গিয়ে পৌঁছল সিপাহীদের ব্যারাকে। তারা প্রমাদ গণল। ভাবল, বোধ হয় তাদের ধ্বংস করবার জন্তে এই আয়োজন হচ্ছে। তবু তারা স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তাদের হাতে ছিল গুলি-ভরা বন্দুক, তবু তারা একটা আওয়াজও করল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্যারেডের মাঠে এসে সমবেত হয়েছে সবাই—অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্ত। পদাতিক সৈন্তরাও বিনা ইউনিফর্মেই এসেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের অন্ধকার রাত। মশালের আলোয় সে অন্ধকার আরো জমাট হয়ে উঠেছে। হুকুম হলো—কাল সকালে সবাই যেন প্যারেডে উপস্থিত থাকে। সিপাহীরা শান্তভাব ধারণ করল।

বহরমপুরের বিদ্রোহ-ঘটনার এক সপ্তাহ পরে। কলকাতা থেকে কর্ণেল মিচেলের কাছে নির্দেশ গেল তিনি যেন অবিলম্বে সেখানকার উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহীদের নিরস্ত্র করে বারাকপুরে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে বারাকপুর শান্তভাব ধারণ করেছিল। বাইরে শান্ত, কিন্তু সিপাহীদের মনের ভেতর সন্দেহের ছায়া। মনে মনে তাদের বিশ্বাস, নতুন রাইফেল বন্দুকে গরু-শুয়োরের চর্বি মেশানো টোটা ব্যবহারের ব্যবস্থা, টোটার কাগজেও সেই দূষিত চর্বি মেশান হয়েছে। তারা ভাবল, তাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন, জীবনের চেয়ে যা প্রিয়তর, তাও সঙ্কটাপন্ন। আশঙ্কায় তাদের মন চঞ্চল, তবু তারা বাইরে শান্তভাব দেখিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। বহরমপুর ও বারাকপুরের সংবাদে গভর্ণর-জেনারেল একটু নিরুদ্বিগ্ন হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন থেকে ভয় একেবারে দূর হলো না। এক ছাউনি থেকে অন্ত ছাউনিতে বিদ্যুৎবেগে

বিরুদ্ধ জনরব ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনা আর আশঙ্কায় চারদিকের পরিবেশ যেন থম্ থম্ করছে। এক হাত পরিমাণ মেঘখানা ক্রমশঃ যেন বিস্তার লাভ করছে। ক্রমশই অন্ধকার বাড়ছে। দিগন্ত এখন কালোয় কালো হয়ে উঠছে। এই-ই তাঁর মনে হলো। এমন জনরবও উঠল যে, আগামী মার্চ মাসের এক রাত্রিতে সিপাহীরা রাজধানী আক্রমণ করবে, এই রকম তারা স্থির করেছে। চারদিকের অবস্থা বিবেচনা করে, গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং একদিন জেনারেল হিয়ার্সে'কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে বারাকপুরে পাঠালেন।

১৭ই মার্চ। বারাকপুরের ছাউনিতে আজ প্যারেড হবে। প্যারেডে বক্তৃতা দেবেন জেনারেল হিয়ার্সে। কলকাতা থেকে ঘোড়ায় চড়ে এলেন হিয়ার্সে। ব্রিগেড সেনাদল তাঁর সম্মুখে সমবেত। শিষ্টাচারে মিষ্টবাক্যে তিনি আরম্ভ করলেন: "টোটার কাগজের প্রতি তোমাদের সন্দেহ। কাগজের চাক্‌চিক্য দেখিয়া তোমরা মনে করিতেছ, ইহাতে চর্বি মিশ্রিত আছে। বাস্তবিক কোন প্রকার চর্বি ইহাতে নাই। কাগজগুলি মসৃণ ও সুদৃশ্য করিবার জন্য এক রকম মণ্ড মাখাইয়া চারু-চিক্কণশালী করা হইয়া থাকে।" এই বলে তিনি পকেট থেকে একখানা সুদৃশ্য চিঠি বের করে সিপাহীদের সামনে ধরলেন এবং তারপর বললেন: "এই দেখ, তোমাদের টোটার কাগজ অপেক্ষা এই কাগজ আরো অধিক চাক্‌চিক্যশালী—এই চিঠি কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিংহ ব্যবহার করেন। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে তোমরা শ্রীরামপুরে গিয়া দেখিয়া আসিতে পার, সেখানে তোমাদের ব্যবহারের জন্য যেসব কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহাতে চর্বির লেশমাত্র নাই।"

বক্তৃতা শেষ করে জেনারেল হিয়ার্সে সমবেত সৈন্যশ্রেণীর ভেতর দিয়ে কদমে কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর বামে ও দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সিপাহীরা—কারো কারো বুকে রূপোর মেডেল, সোনার মেডেল প্রভাত-সূর্যের আলোয় ঝক ঝক করছে। জেনারেল সহাস্য বদনে মেডেলধারী সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করেন—স্মরণ কর দেখি, কোন্ কোন্ বিশেষ যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখিয়ে তোমরা এইসব পদক পুরস্কার পেয়েছ? এই কথা শুনে সিপাহীদের উত্তেজনা হ্রাস পায়, আতঙ্কের পরিবর্তে হয় আনন্দ।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে তখন বেশী ইংরেজ সৈন্য ছিল না। রেঙ্গুন থেকে ইতিমধ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য কলকাতায় আনা হলো। গোরা সৈন্য-বোঝাই জাহাজ কলকাতার বন্দরে আসতেই অন্যান্য সিপাহীদের মধ্যে আবার ভয়ের লক্ষণ দেখা দিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল— গোরা লোগ্ আ গিয়া। জেনারেলের বক্তৃতার ফলে বারাকপুরের ব্রিগেড তখন শান্ত। কিন্তু বহরমপুরের বিদ্রোহীদের শাস্তি হবে—এই খবরে বারাকপুরের সিপাহীরা আবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠে। দেশীয় সংবাদপত্রে এ-নিয়ে তখন তুমুল আলোচনা। তার ঢেউ এসে লাগল বারাকপুর ব্রিগেডে। বারাকপুরে নিয়ে এসে তোপের মুখে বহরমপুরের বিদ্রোহীদের উড়িয়ে দেওয়া হবে—এইরকম একটা সংবাদ পেল বারাকপুরের সিপাহীরা এবং সেই জন্যে নাকি তাদের এখানে নিরস্ত্র করে আনা হচ্ছে।

২৯শে মার্চ, রবিবার।

আর দু'দিন বাদেই বহরমপুরের অপরাধী সৈন্যদের বারাকপুরে পৌছবার কথা। ৩০শে মার্চ কর্ণেল মিচেলের রক্ষণাধীনে তারা বারাসতে এসে পৌছল এবং তাদের কলকাতায় কি দমদমে অথবা বারাকপুরে নিয়ে আসা হবে এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত আদেশের অপেক্ষায় ৩০শে মার্চ তাদের বারাসতেই কাটাতে হলো। বারাসতে পৌছেই কর্ণেল মিচেল সংবাদ পেলেন বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে ভীষণ গোলযোগ। আগের দিন অর্থাৎ ২৯শে মার্চ তারিখে সেখানে একজন অফিসার আহত হয়েছে।

বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে ছিল মঙ্গল পাঁড়ে নামে একজন সচ্চরিত্র ও দেশপ্রেমিক তরুণ। সে যখন শুনল যে কলকাতায় অনেক গোরা-সৈন্য আমদানী করা হয়েছে, তখন সে ভাবল, ঐসব গোরা-সৈন্য নিশ্চয়ই বারাকপুর ছেয়ে ফেলবে। এমনিতেই চর্বি-টোটার নামে তার মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রগাঢ় বিদ্বেষ জন্মেছিল। মঙ্গল পাঁড়ে ভাবল, জাতি-ধর্ম জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে একটা কিছু করা ভাল। বিকেল বেলায় সে পোষাক পরে, বন্দুক নিয়ে নিজের ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গীদের আহ্বান করে মঙ্গল পাঁড়ে বলল, দাঁতে চর্বি কেটে জাত হারিয়ে কাফের হতে যদি তোমাদের ইচ্ছা না থাকে, তবে এখনি আমার সঙ্গে এস, এখনি তূর্যধ্বনি কর।

সেদিন রবিবার। সকলের বিশ্রামের দিন। কোনো সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ের কথা শুনে এগিয়ে এল না। সে তখন মরিয়া হয়ে একাই ছাউনির সম্মুখে উন্মুক্ত তরোয়াল হাতে নিয়ে ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগল। খবর পেয়ে একজন সার্জেন্ট-মেজর সেখানে উপস্থিত হলো। মঙ্গল পাঁড়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। লক্ষ্য ব্যর্থ হলো। যেসব সিপাহী ঐ কাণ্ড দেখছিল, তারা ভয় পেল বটে, কিন্তু উন্মত্তপ্রায় মঙ্গল পাঁড়েকে ধরতে তাদের কেউ-ই অগ্রসর হলো না। একজন অশ্বারোহী সিপাহী তখনি গিয়ে এ্যাডজুটাণ্টকে এই সংবাদ দিল। লেফ্টেনাণ্ট বগ মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তলোয়ার ও গুলিভরা পিস্তল নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। মঙ্গল পাঁড়ে তখন একটা কামানের পেছনে লুকিয়ে ছিল। লেফ্টেনাণ্ট বগ্ কাছাকাছি আসা মাত্র, সে তাঁকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ল। কিন্তু গুলি বগের গায়ে না লেগে, তাঁর ঘোড়ার গায়ে লাগল। আহত অশ্ব সওয়ার নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাটি থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, লেফ্টেনাণ্ট বগ্ মঙ্গল পাঁড়েকে মারবার জন্যে পিস্তল ছুঁড়লেন। লক্ষ্য ব্যর্থ হলো। বগ্ তখন তলোয়ার ধরলেন। নির্ভীক মঙ্গল পাঁড়েও তার অসি কোষমুক্ত করল। দুজনে বাধল যুদ্ধ। এমন সময়ে সেই সার্জেন্ট-মেজর এগিয়ে এলো। একদিকে মঙ্গল পাঁড়ে, অন্যদিকে দুজন ইংরেজ সৈন্য। কিন্তু তারা মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ রোধ করতে পারল না। তার ক্ষিপ্র অসির আঘাতে তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। সাহেবের মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল, কিন্তু এমন সময়ে অতর্কিতে সেখ পল্টু নামে একজন মুসলমান সৈনিক পেছন দিক থেকে এসে মঙ্গল পাঁড়েকে জড়িয়ে ধরল। ইংরেজ সৈন্য দুজন প্রাণে বেঁচে গেল।

বিশ্বাসঘাতক মুসলমান সৈনিকটির এই আচরণ দেখে কয়েকজন সিপাহী সেখ পল্টুকে ধিক্কার দিল। অদূরে সিপাহীরা নীরবে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছিল। তাদের কেউই এগিয়ে এসে মঙ্গল পাঁড়ের সঙ্গে যোগ দিল না, কিম্বা তাদের বাধা দেবারও চেষ্টা করল না। মঙ্গল পাঁড়ে তাদের ভীরু, কাপুরুষ ও দেশদ্রোহী বলে তিরস্কার করতে লাগল।

ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে জেনারেল হিয়ার্সে এসে হাজির হলেন। তিনি এসে স্বচক্ষে দেখলেন— চারদিকে বহু সিপাহীর জনতা, কারো পোষাক-পরা, হাতে অস্ত্র, কেউ বা ইউনিফর্ম-বিহীন, নিরস্ত্র। কয়েকজন অফিসারও

আছেন, কেউ ঘোড়ার ওপর, কেউবা মাটিতে। সবাই কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শক। মঙ্গল পাঁড়ে ততক্ষণ পল্টুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে ছাউনির সম্মুখে তেমনি নির্ভীকভাবে পায়চারী করছে আর উচ্চ কণ্ঠে সঙ্গীদের আহ্বান করে বলছে, এস, আমার অনুসরণ কর। ধর্মরক্ষার জন্য যদি মরতে হয়, মরব; এস একসঙ্গে মরব। কিন্তু কেউই প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হতে সাহস পেল না। জেনারেল হিয়ার্সে এগিয়ে চললেন। একজন অফিসার তাঁকে সাবধান করে বললেন, বিদ্রোহীর বন্দুক গুলীভরা।

—আমি বিদ্রোহীর বন্দুক গ্রাহ্য করি না।

এই উত্তর দিয়ে জেনারেল অগ্রসর হলেন। মঙ্গল পাঁড়ে তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করতে করতে গুলি করবার জন্য বন্দুক ঘোরাচ্ছিল। হিয়ার্সে একাই তার সম্মুখীন হলেন। মঙ্গল পাঁড়ে তখন জেনারেল হিয়ার্সেকে লক্ষ্য করল না। নির্ভীক সৈনিক নিজের বুকের দিকেই বন্দুকের মুখ ফেরাল। বন্দুকের গোড়াটা মাটিতে রেখে, নলটা নিজের বুকের ওপর রাখল। পা দিয়ে ট্রিগার চালাল। নিমেষ মধ্যে তার অচৈতন্য দেহ মাটিতে পড়ে গেল। ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা বইতে লাগল। গুলিটা বুকে লাগেনি। ডাক্তারের পরামর্শমত মঙ্গল পাঁড়েকে তখনি হাসপাতালে পাঠান হলো। হাসপাতালে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করলে পরে তাকে সামরিক বিচারালয়ে পাঠান হলো। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হলো।

৮ই এপ্রিল কলকাতার সর্বজন সমক্ষে তার ফাঁসি হলো।

মঙ্গল পাঁড়ে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ। তারই রক্তে বাংলার মাটি প্রথম লাল হলো।

॥ তিন ॥
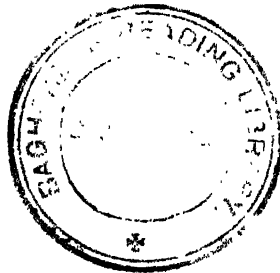
বিদ্রোহের আগুন বারাকপুর থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে।

লর্ড ক্যানিং আদেশ দিয়েছেন বহরমপুরের উনিশ নম্বর পলটনকে ডিস্‌মিস্‌ করা হবে।

মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার চেয়ে এ বড়ো কঠোর শাস্তি। সকলের সম্মুখে অস্ত্র ও সামরিক চিহ্নাদি বর্জন করে অবনত মস্তকে চলে যাওয়া—সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। জেনারেল হিয়ার্সে'র ওপর ভার দেওয়া হয়েছে এই অপ্রীতিকর কাজটি সুসম্পন্ন করবার জন্যে।

৩০শে মার্চ। সকাল বেলা। শেষবারের মত কুচ-কাওয়াজ করে উনিশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা দণ্ড গ্রহণের জন্য প্যারেড-ক্ষেত্রের চিহ্নিত স্থানে এসে সমবেত হলো। বন্দুকধারী সৈন্যরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে, পেছনে কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে গোলন্দাজ বাহিনী। তারা একে একে বন্দুক পরিত্যাগ করল। কটিবন্ধ থেকে সঙ্গীন খুলে নিয়ে বন্দুকের ডগায় নিবদ্ধ করে রাখলো। ইংরেজের সৈন্যদলে তাদের সামরিক-জীবনের এই শেষ অভিনয়। তারপর রণপতাকাসমূহ আনা হলো এবং রাশিকৃত বন্দুকের ওপর সেগুলো মোতায়েন রাখা হলো। এখন আর তারা বৃটিশ সেনাদলের সিপাহী বলে গণ্য হবে না।

ডিস্‌মিস্‌ করবার আগে জেনারেল হিয়ার্সে একটি ছোট বক্তৃতা করলেন: "গভর্ণমেণ্ট যদিও তোমাদিগকে সরাসরি ডিস্‌মিস্‌ করিলেন, কিন্তু বহরমপুর হইতে তোমরা যে প্রকার শান্তভাব ধারণ করিয়া বারাকপুরে আসিয়াছ, তাহাতে তোমাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। গভর্ণর-জেনারেলের আদেশে তোমাদের ব্যবহৃত ইউনিফর্ম তোমাদের অঙ্গেই থাকিবে, তাহা খুলিয়া লওয়া হইবে না, এবং তোমাদের দেশে পৌঁছিবার গাড়ি ভাড়া ও রাহাখরচ সরকারী তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে। এই পলটনের মধ্যে চারিশত ব্রাহ্মণ এবং

একশত পঞ্চাশ জন রাজপুত আছ। তোমরা এখন স্বদেশে চলিলে। তোমরা এখন স্বাধীন। যে যে পুণ্যতীর্থে তোমরা এখন যাইতে ইচ্ছা কর, স্বচ্ছন্দে যাইতে পার। তোমাদের সকলেরই ধারণা হওয়া উচিত যে, গভর্ণমেণ্ট সিপাহিগণের ধর্ম নষ্ট করিবেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহা দুষ্টবুদ্ধি লোকের কল্পিত—সম্পূর্ণ অমূলক এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

জেনারেল হিয়ার্সে শেষের কথাটির উপর বিশেষ জোর দিলেন। মনোযোগ-সহকারে সিপাহিরা ঐ বক্তৃতা শুনল এবং তারপর তারা স্থিরভাবে নিঃশব্দে নিজেদের ছাউনিতে ফিরে গেল। বেলা ন'টার সময়ে তাদের প্রাপ্য বেতন শোধ করে দেওয়া হলো। তারপর কয়েকজন য়ুরোপীয় সৈন্য দিয়ে তাদের বারাকপুরের সীমা পার করে দেওয়া হলো। ক্যানিং-এর এডিকং কলকাতায় ফিরে গভর্ণর-জেনারেলকে এই সমাচার দিলেন। তিনি সন্তুষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন হলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতা লুঠ করবে, কেল্লা আক্রমণ করবে, ইংরেজ জাতিকে সমূলে বিনাশ করবে—এই ভীষণ জনরবে যারা ভয় পেয়েছিল, লর্ড ক্যানিং তাদেরকে জানিয়ে দিলেন—বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

উনিশ নম্বর পল্টনের দণ্ড হয়ে গেল। চৌত্রিশ নম্বর পল্টনের মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হলো এবং ঐ পল্টনের একজন জমাদারেরও সর্বজনসমক্ষে ফাঁসি হলো। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, সে মঙ্গল পাঁড়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও তাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করেনি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চেষ্ট ছিল। তবু ইংরেজের চিত্তচাঞ্চল্য ঘুচল না। লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত চারদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝলেন, আকাশের এক প্রান্তে যে ক্ষুদ্র মেঘখানি সঞ্চিত হয়েছিল, ক্রমশঃ তা সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। দূরবর্তী ষ্টেশন থেকে বজ্রধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, হিমালয়ের নীচে থেকে বহুদূর পর্যন্ত জনপদ যেন চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, কেবল একটি মাত্র ক্যাণ্টনমেণ্টে একটি মাত্র সিপাহী পলটনে নতুন রাইফেলে চর্বি-টোটার আতঙ্ক প্রবেশ করেনি।

সমস্ত বারাকপুর যেন থম্‌থম্ করছে। একদল সিপাহীকে প্রকাশ্যে নিরস্ত্র করে সামরিক বিভাগ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। চৌত্রিশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা বাইরে এ নিয়ে কোন বিক্ষোভ দেখাল না;

কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের বিদ্বেষের আগুন বেড়েই চলল। টোটা সম্বন্ধে সমস্ত পদাতিক সিপাহীদলেই অসন্তোষ প্রবল। পদাতিকদলে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। অশ্বারোহীদলে মুসলমান প্রধান। চর্বি-টোটার জনরবে সকলের মনেই দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, সকলের মুখেই এক কথা—এবার জাতধর্ম থাকবে না।

বারাকপুরের সেনানিবাস তাই আশঙ্কায় আর অসন্তোষে থম্‌থম্ করছে। চৌত্রিশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা স্বচ্ছন্দে বন্দুক হাতে নিয়ে প্যারেডের মাঠে পরিভ্রমণ করছে, তাই দেখে বারাকপুরের ইংরেজরা ভয়ে আকুল। রাত্রিবেলায় ছাউনির ইংরেজ অফিসাররা যখন ভোজনাগার থেকে ফেরেন, তখন তাঁদের মনে ভয় হয়, এই বুঝি সিপাহীরা অন্ধকারে তাঁদের আক্রমণ করল। বিবিদের অবস্থা আরো শোচনীয়। সন্ধ্যার পর তাঁরা প্রতিবেশিনীদের আবাসে বেড়াতে যেতেন; সিপাহীদের ভয়ে এখন আর তাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে বের হন না। আতঙ্ক এইভাবে নিঃশব্দে তার বিভীষিকা বিস্তার করে চলল। মঙ্গল পাঁড়ের ব্যাপারটি এখানকার সেনানিবাসের ওপর যেন বিষাদের একটা গভীর ছায়াপাত করেছে।

আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট। ভারতের সামরিক বিভাগের প্রধান দফ্‌তর এবং ভারতের অন্যতম রাইফেল-ডিপো।

জেনারেল আনসন্ তখন ভারতের প্রধান সেনাপতি।

ছাউনিতে ছাউনিতে অসন্তোষ আর অশান্তির লক্ষণ জানতে পেরে সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। আম্বালার গুরুত্ব আরো বেশী। নতুন রাইফেল বন্দুক ব্যবহারের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয় এইখানে। দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে সিপাহীদের আম্বালায় নিয়ে আসা হয় ঐ প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্তে। মিরাট থেকে তখনো পর্যন্ত নতুন এনফিলড্ রাইফেল ও টোটা সেখানে পৌঁছায়নি, তবু প্রধান সেনাপতি আশঙ্কা করলেন যে আম্বালার সিপাহীদের মনে অসন্তোষ জেগেছে জনরবের সূত্রে। একটা ঘটনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, সিপাহীদের মধ্যে অনেকের মনেই দৃঢ় কুসংস্কার জন্মেছে যে, চর্বি-টোটা ব্যবহার করলে তারা জাতিচ্যুত হবে। অবিলম্বে তাদের মনের এই ধারণা দূর করা দরকার। জেনারেল আন্‌সন্ একদিন সকালে প্যারেডের

মাঠে সিপাহীদের ডেকে বললেন, "তোমরা অনেক দিন কোম্পানীর সরকারের অধীনে কর্ম করিতেছ। টোটা সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ ও আশঙ্কা অমূলক। কার্যের সুবিধার নিমিত্ত নূতন রাইফেল বন্দুক আমদানি করা হইয়াছে, সেই বন্দুকের জন্য পূর্বাপেক্ষা সুসংস্কৃত টোটা আবশ্যক হইয়াছে। এই টোটায় অপবিত্র বস্তু কিছু নাই। কাহারও জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধ। তোমরা ধর্মতঃ শপথ গ্রহণ করিয়া কোম্পানির সেনাদলে ভর্তি হইয়াছ, অকারণে সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া যদি তোমরা অবাধ্যতা প্রকাশ কর, তবে তোমাদিগকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। দুষ্টলোকে মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়া তোমাদের বিভ্রান্ত করিতেছে। সে জনরব সম্পূর্ণ অমূলক। তোমরা মিথ্যা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কর্তব্যপালন কর।"

প্রধান সেনাপতির বক্তৃতা আম্বালা সেনানিবাসের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি লেফটেনাণ্ট মার্টিনিউ হিন্দী করে সিপাহীদের বুঝিয়ে দিলেন। দেশীয় অফিসাররাও এই বক্তৃতা শুনলেন। একজন সুবেদার বললেন, কিন্তু জনরবে বিশ্বাস করে হাজার হাজার সিপাহী অন্যরকম বুঝেছে। তাদের দৃঢ় ধারণা, চর্বি-টোটা ব্যবহার করলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, সমাজচ্যুত হতে হবে, সেই আশঙ্কাতেই তারা এমন উদ্বিগ্ন হয়েছে।

জেনারেল আন্সন বুঝলেন চর্বি-টোটার জনরব প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে গভর্ণর-জেনারেলকে সব কথা লিখে পাঠালেন। তাঁর পত্রের একাংশে লেখা ছিল: "গোলযোগ দেখিয়া মনে হয়, আম্বালার রাইফেল-ডিপো তুলিয়া দেওয়া ভালো। কেননা, টোটা অপেক্ষা টোটার কাগজেই সিপাহীদের বেশী আপত্তি। সে আপত্তি কেমন করিয়া খণ্ডন করা যাইবে?" শেষে তিনি লিখলেন: "যে কাগজের সম্বন্ধে আপত্তি, মিরাট হইতে সেই কাগজের বিষয়ে পরিষ্কার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আম্বালার প্যারেডে নূতন রাইফেল বন্দুকের আওয়াজ করা বন্ধ রাখা কর্তব্য।"

গভর্ণর-জেনারেল উত্তরে লিখলেন: "রাইফেল-চালনা স্থগিত রাখার আমি বিরোধী। নূতন টোটা যদি চর্বি-পরিবর্জিত হয়, কাগজে যদি সেরকম চর্বি না থাকে, সিপাহীরা তাহা ব্যবহার করিতে কোন আপত্তি করিবে না। তবে প্রকৃত কথা টোটা নহে, জনরব। ইহাতেই তাহারা অধিক ভয় পাইতেছে।

লোকে বলিতেছে, জাতি গিয়াছে, ইহা শুনিয়াই তাঁহারা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেনাদলের মধ্যে কেহ যেন সেইভাবে সিপাহীদের মনে ব্যথা না দেয়, এইরূপ বিধান করা কর্তব্য। আম্বালার রাইফেল বন্দুকের শিক্ষা যেমন চলিতেছে সেইরকম চলুক, উদ্বিগ্ন হইয়া তাহা বন্ধ রাখিবার দরকার নাই।"

লর্ড-ক্যানিং-এর এই চিঠিতে বিচক্ষণতার পরিচয় আছে। গভর্ণর-জেনারেলের চিঠি যখন আম্বালায় পৌঁছল প্রধান সেনাপতি তখন সিমলার শৈলশিখরে। সেখান থেকেই তিনি লর্ড ক্যানিংকে লিখে পাঠালেন, "সিমলাশৈল এ-সময় অতি রমণীয় স্থান। বায়ু যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ, প্রাকৃতিক শোভাও সেইরকম সুন্দর। আপনি যদি এই সময়ে শৈলবিহারে এখানে আসেন, তাহা হইলে আপনার শরীরের ও মনের সবিশেষ স্ফূর্তি হয়।"

লর্ড ক্যানিং এর উত্তরে লিখলেন: "রাজ্যের চারিদিকেই বিস্ফোরকের অবস্থা। এই সময়ে শৈলবিহারে আমোদ-প্রমোদ করিবার সময় নয়।"

গভর্ণর-জেনারেল যথার্থই অনুমান করেছিলেন। চারিদিকেই বিস্ফোরকের অবস্থা। তখনো পর্যন্ত বারাকপুর শান্ত হয়নি। আম্বালায় প্রকাশ্যে কোন বিক্ষোভ না থাকলেও, সেখানেও অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত। সেনাবারিক, কমিসেরিয়েট রসদভাণ্ডার, হাসপাতাল এবং ছাউনিগুলির চালাঘরে রাতে আগুন জ্বলত। হঠাৎ আগুন লেগেছে, এমন কথা বলা যায়না, কেননা প্রায় রাত্রেই ঐরকম ভয়াবহ কাণ্ড। কারা আগুন দিচ্ছে কিছুই জানা যায় না। আবার কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেলের কাছে রিপোর্ট গেল। লর্ড ক্যানিং বুঝলেন—এসবই আসন্ন বিদ্রোহের পূর্বাভাষ।

মিরাট।

ভারতের সবচেয়ে বড়ো সেনানিবাস।

ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্য এখানে প্রচুর। ভারতীয় সৈন্য তিন হাজার আর ইংরেজ সৈন্য প্রায় দু'হাজার। বিরাট কমিসেরিয়েট। অজস্র কামান-বন্দুক। মিরাট ছাউনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হৃৎপিণ্ড। সেনানিবাসের মধ্যেই কারখানা। এই কারখানাতেই তৈরি হয় চর্বি-টোটা। বিদ্রোহের আগুন প্রকৃতপক্ষে এখানেই প্রথম জ্বলে উঠেছিল। মিরাটে এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটে। একদিন সকালে দেখা গেল কোথা থেকে এক মুসলমান ফকির এসে হাজির

হয়েছে মিরাটে। তার সঙ্গে অনেক চেলা। একটা হাতীর ওপর চড়ে সেই ফকিরকে পরপর ক'দিনই ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। ফকির সেখানে কি করতে গিয়েছিল, কেউ-ই তা জানে না। পুলিশের হুকুম এল তার ওপর দলবল নিয়ে মিরাট থেকে এখনি চলে যাবার জন্যে। ফকির হুকুম পালন করল বটে, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, ফকির মিরাট ছেড়ে যায়নি, সে কুড়ি নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহীদলের ছাউনির মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

মিরাটে শুধু টোটার জনরবই ছিল না। হাড়ের গুঁড়ো মেশানো ময়দার জনরবও প্রবল। সিপাহীদের ধারণা ইংরেজ নানাভাবে তাদের জাত মারবার চেষ্টা করছে। ময়দাতে হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আছে—এই জনরব কেবলমাত্র মিরাটেই নয়, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনরব উঠল মিরাটের খালধারের কলগুলোতে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে ময়দা তৈরি হচ্ছে এবং সেইসব ময়দার সঙ্গে গরুর হাড়ের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে। মিরাটের ময়দা নৌকায় করে কানপুরে এল। কানপুরের বাজারে হঠাৎ ময়দার দাম কমে গেল। লোকের মনে ধারণা দৃঢ় হলো, হাড়ের গুঁড়ো মেশানো ময়দা, তাই এত সস্তা। কানপুরের বাজারে কেউই আর সে-ময়দা কিনল না। সেখানকার সিপাহীরা পর্যন্ত ঐ ময়দা স্পর্শ করল না। মাদ্রাজে ভেলোর বিদ্রোহের সময়েও (১৮০৬) এই হাড়ের গুঁড়ো-মেশানো ময়দার কথা উঠেছিল। শুধু ময়দা নয়, তখন এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে, ইংলণ্ডের রাণী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতিক্রমে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কর্মচারীরা ময়দাতে, চিনিতে ও নুনে হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছেন, ঘিয়ের সঙ্গে মেশান হচ্ছে জন্তুর চর্বি। কুয়োর জলে গরুর মাংস ও শুয়োরের মাংস ফেলে দিয়ে ঐসব অপবিত্র করা হয়েছে। তখন গুজব আরো রটেছিল যে, কোম্পানীর হুকুমে সকল ভারতবাসীকে বিলিতি রুটি খেতে হবে। পাউরুটিকে তখন লোকে বলত বিলিতি রুটি আর তাদের ধারণা ছিল এই বিলিতি রুটি খেলে জাত যাবে।

কিন্তু টোটা সম্পর্কে মিরাটের সিপাহীদের মনে যেরকম প্রবল বিরুদ্ধভাব জেগেছিল, এমন আর কোথাও হয়নি। মিরাটের সিপাহীদের নতুন রাইফেল বা নতুন টোটা কিছুই দেওয়া হয়নি, কেবল পুরোনো টোটা দাঁত দিয়ে কাটবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। এতেই তারা ক্ষেপে গিয়ে টোটা ছুঁতে অসম্মত হয়।

নব্বুই জনের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচজন অফিসারের হুকুম পালন করেছিল, বাকী পঁচাশীজনকে অবাধ্যতার অপরাধে অপরাধী করে কোর্টমার্শাল করা হয়।

২৪শে এপ্রিল। স্থান—মিরাট ক্যান্টনমেন্ট।

সাতান্নর বিপ্লবের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ চব্বিশে এপ্রিল।

তাই চব্বিশে এপ্রিলের ঘটনা একটু সবিস্তারে বলা দরকার। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পদাতিকদের মধ্যে হিন্দুই ছিল সংখ্যায় বেশী আর মুসলমান বেশী ছিল অশ্বারোহী দলে। অসন্তোষের প্রথম আভাস দেখা দিয়েছিল হিন্দু পদাতিকদের মধ্যে। তাই সামরিক বিভাগের কর্তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান অশ্বারোহীদের পক্ষ থেকে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। তাঁদের সেই ভুল ভেঙে দিল মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী পলটন। গভর্ণমেন্টের আশঙ্কা সীমাবদ্ধ ছিল ভারতীয় পদাতিকদের মধ্যে—কারণ চর্বি-টোটার হাঙ্গামা এদের মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ যখন কলকাতায় এসে পৌছল, তখন লর্ড ক্যানিং স্বভাবতই বিচলিত না হয়ে পারেন নি, কেননা অশ্বারোহীদলের সৈন্যদের বিদ্রোহ ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।

মিরাট শুধু ভারতের বৃহত্তম সেনানিবাসই ছিল না, সম্ভব-অসম্ভব যতরকম জল্পনা-কল্পনা ও জনরবের কেন্দ্রস্থলও ছিল। চর্বি-টোটার এত বেশী উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা সেদিন আর কোথাও ছিল না যেমন ছিল মিরাটে। ভারতের অন্যান্য সেনানিবাসের সিপাহীরা তাই তাকিয়ে ছিল মিরাটের দিকে। সেখানকার সিপাহীরা কি করে?—এই প্রতীক্ষাই তারা করছিল। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর জাতধর্ম নষ্ট করতে চায় এবং চর্বি-টোটা হলো তারই পূর্বাভাস—এই ধারণা মিরাট ছাউনিতে যত বেশী বদ্ধমূল ছিল, এমন আর কোথাও নয়। শুধু ছাউনি নয়, মিরাটের বাজারে পর্যন্ত এই নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। নানারকমের জনরব। সকলেরই জাত মারতে চায় ইংরেজ—মিরাটের বাজারে এই উত্তপ্ত জনরবগুলির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল হাড়ের গুঁড়ো মেশানো ময়দা।

কর্ণেল স্মিথ ছিলেন মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী দলের কমাণ্ডিং অফিসার। আসন্ন বিদ্রোহের আভাস তিনিই সকলের আগে বুঝতে পেরেছিলেন। ২৩শে এপ্রিল রাত্রে তিনি হুকুম দিলেন ২৪শে-র সকালে প্যারেড হবে।

এই প্যারেডের উদ্দেশ্য ছিল সিপাহীদের মনের উত্তেজনা প্রশমন করা আর নতুন সরকারী আদেশ জানিয়ে দেওয়া—যে-আদেশে বলা হয়েছিল যে, অতঃপর সিপাহীদের আর দাঁত দিয়ে টোটা কাটতে হবে না। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের কথা তাদের আগে থেকে জানান হয়নি। ২৩শে এপ্রিলের রাত্রেও যথারীতি ছাউনিতে অগ্নিকাণ্ড দেখা দিয়েছিল এবং তার থেকেই ইংরেজ অফিসাররা সিপাহীদের উত্তেজনার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন। পাঁচ মাইল জুড়ে এই বিরাট সেনানিবাসের এক অংশে ইংরেজ সৈন্য ও অফিসারদের ব্যারাক, অপর অংশে দেশীয় সৈন্য ও দেশীয় অফিসারদের ব্যারাক। মিরাট সেনানিবাসের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন জেনারেল হিউয়েট। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মেদবহুল বিপুল কলেবর, কিন্তু খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ।

চব্বিশে এপ্রিলের প্যারেডে তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সৈন্যরা এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল, কিন্তু কেউই টোটা স্পর্শ করল না। কমাণ্ডিং অফিসারের আদেশ তারা অমান্য করল। অমান্য করল বটে কিন্তু তখনই বিদ্রোহ করতে সাহস পেল না। কেননা, তাদের সামনে ও পিছনে কামান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোলন্দাজবাহিনী। তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অবাধ্যতার সংবাদ পেয়ে জেনারেল হিউয়েট কারণ অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, টোটায় অপবিত্র বস্তু আছে এই অনুমান করেই ১০০ জন অশ্বারোহীর মধ্যে ৮৫ জন তা স্পর্শ করেনি। প্রধান সেনাপতির আদেশ না আসা পর্যন্ত সেই ৮৫ জনকে একটা হাসপাতালে তাদেরই পলটনের সিপাহীদের প্রহরাধীনে আটক রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে সিমলা থেকে জেনারেল আনসনের নির্দেশ এল—কোর্ট মার্শাল, সামরিক বিচার। পনর জন দেশীয় অফিসার নিয়ে গঠিত হল এই সামরিক আদালত—ছ'জন মুসলমান ও ন'জন হিন্দু। এই পনরজন অফিসারদের মধ্যে দশজন নির্বাচিত হয়েছিলেন গোলন্দাজ, পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী থেকে আর বাকী পাঁচজনকে আনা হয়েছিল দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী থেকে।

৬ই, ৭ই ও ৮ই মে—তিন দিন ধরে চললো এই বিচার। চৌদ্দ জন বিচারকের মতে সিপাহীরা দোষী সাব্যস্ত হলো এবং তাদের প্রত্যেকের দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো। জেনারেল হিউয়েট সামরিক আদালতের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। ৯ই মে দণ্ডিত সিপাহীদের হাতে পায়ে

লোহার বেড়ি দিয়ে ক্যান্টনমেণ্ট থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত একটি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। প্রকাশ্য স্থানেই বিদ্রোহী সিপাহীদের এই লাঞ্ছনা অন্যান্য সিপাহীদের মনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, সে বিষয়ে না হিউয়েট, না স্মিথ—কেউই কিছু অনুমান করতে পারলেন না। জেলে দেশীয় সিপাহীদের প্রহরাধীনেই তাদের রাখা হলো।

কলকাতায় বসে লর্ড ক্যানিং এই খবর পেলেন।

তাঁর মন চঞ্চল হলো। ভাবলেন, সাধারণের এই বিশ্বাসের পরিণতি ভয়াবহ। সিপাহীদের বিদ্বেষের চেয়ে এই সম্ভাবিত বিপদের ভয় আরো বেশী। তাঁর মনে পড়ল চাপাটির গল্প। কাউন্সিলের সভ্যদের কাছে ক্যানিং সেই গল্পটি বললেন। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ক্রমাগত লোকের পর লোক উপস্থিত হয়ে এক রকমের চাপাটি বিলি করত। ময়দাতে জল মিশিয়ে সেই চাপাটি তৈরী। যারা বিলি করতে যেত, তারা এক এক গ্রামের প্রধানের হাতে তা দিয়ে আসত। প্রধান আবার সেটা অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিত। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে পিষ্টক-বিলির কাজ চলত। কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত, কি জিনিস কেউই জিজ্ঞাসা করত না, সকলেই কিন্তু গ্রহণ করত। সেই সব চাপাটির মধ্যে থাকত গুপ্ত চিঠি। যারা খেত, তারা সেই সব চিঠি পড়ত। চিঠিতে রাজদ্রোহিতার কথা লেখা। যারা বিলি করত, তারা বলত, এই চাপাটি খেলে রোগ আরাম হয়, সংক্রামক ওলাওঠার সময় বহু উপকার হয়, অন্যান্য রোগেও উপকারী। প্রথম প্রথম গোপনে গোপনে এই চাপাটি বিলি হতো। তারপর সরকারী কর্মচারীরা জানতে পারলেন। তারপর ব্যাপারটা যখন লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণরের গোচরে, এল, তিনি জেলায় জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের নামে ঘোষণা জারি করে তদন্তের আদেশ দিলেন। চাপাটি কারা বিলি করে তা জানা যায়নি। এমন কি, সরকারী জেলখানাতে পাচকদের ঘুশ দিয়ে এই চাপাটি চালান করা হতো। রুটির মধ্যে যে চিঠি থাকত, রুটি ভাঙলেই কয়েদীরা তা দেখে পাঠ করত। কি লেখা থাকত, সকলে তা জানত না। কোথা থেকে চাপাটি আসে, কারা তৈরি করে, কারা বিলি করে, নিঃসন্দেহে তা জানা গেল না। শুধু অনুমান করা হলো যে, ঐ চাপাটি রাজবিদ্রোহ-উত্তেজক! প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, হয়ত

অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব-পক্ষের লোকেরা ঐ রকম করছে, পরে ধারণা হলো যে গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষ লোকেরা কোম্পানীর আধিপত্য লোপ করবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে এই অদ্ভুত কৌশল বিস্তার করেছে। কিন্তু এ সবই অনুমান।

স্থান—লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী। সময়—১৮ই এপ্রিল, সকালবেলা।

হেনরী লরেন্স গভর্ণর-জেনারেলকে চিঠি লিখছেন: "কিছুদিন আগে বিঠুরের নানাসাহেব এখানে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছি। শুনিলাম তিনি কাল্পী, দিল্লী ও কানপুরও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বিঠুরের কমিশনার মরল্যাণ্ড আমাকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে নানাসাহেবের প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে অবিচার করিয়াছেন, তিনি নাকি তাহা এখনো পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির লোক হঠাৎ এই সময়ে দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ পরিভ্রমণ করিলেন, ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিতেছি না। অবশ্য নানাসাহেব ইংরেজ কর্মচারিগণের বন্ধু, তথাপি চারিদিকের অসন্তোষের বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমি তাঁহার গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিবার পরামর্শ দিতেছি। নয়ত শান্ত প্রকৃতির এই মানুষটিই ভবিষ্যতে রাজবিদ্রোহী-পক্ষের উত্তরসাধক হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। তাহার পর লক্ষ্ণৌর কথা। এই নগরে প্রায় ছয়-সাত লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে অযোধ্যায় ভূতপূর্ব নবাবের আমলে সেনাদলের বহু সহস্র (গতকল্য আমি শুনিয়াছি বিশ হাজার) পদচ্যুত সেনা আহারাভাবে উপবাস-কষ্ট ভোগ করিতেছে। নগরের প্রধান প্রধান অধিবাসিগণের মধ্যে কুমন্ত্রণামূলক বিরুদ্ধ লক্ষণের আভাস পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ জনগণের মনেও অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সংস্কারের উদ্দেশ্যে পুরাতন গৃহাদি ভাঙিয়া ফেলাতে জনসাধারণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে এবং খণ্ডখণ্ড খালি জমি সরকারে খাস করিয়া লইবার উদ্যোগে স্থানীয় লোকের অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা উপদ্রব করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। আমি সাধ্যমত অসন্তুষ্ট লোকদিগকে শান্ত করিয়াছি। ভূমি দখল করা আপাতত স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছি। তারপর রাজস্ব নিরূপণ-প্রণালীতে প্রজারা আদৌ সন্তুষ্ট নহে। জমির বন্দোবস্তেও তাহারা সন্তুষ্ট নহে। বঞ্চিত ও

সম্পত্তিশূন্য তালুকদারদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ। সমগ্র অযোধ্যার সংবাদ আরো উদ্বেগজনক। সর্বত্র জনসাধারণ বলিতেছে, ইংরাজেরা যখন অযোধ্যার নবাবের তুল্য উপকারী বন্ধুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, তখন আর তাহাদের উপর বিশ্বাস কি? ইংরাজের বিপদের সময়ে আমাদের নবাব সাহেব প্রচুর সাহায্য দান করিলেন, ইংরাজ তাহা ভুলিয়া গেল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল, বন্দী করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। ইংরাজের উপর আমাদের আর কিছুমাত্র বিশ্বাস রাখা উচিত নয়। অযোধ্যার ক্ষুব্ধ জনসাধারণের এই মনোভাব এই প্রদেশে সর্বত্রই ধীরে ধীরে সংক্রামিত হইতেছে। এই বিস্ফোরক অবস্থায় সিপাহীগণের সহিত আমাদের আচরণ সৌহার্দ্যমূলক হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আপনার মতামতের অপেক্ষায় রহিলাম।"

কলকাতার লাট-প্রাসাদে বসে লর্ড ক্যানিং এই চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। ভারতের আকাশে তা হলে কি আসন্ন বিদ্রোহের মেঘ-বিস্তার শুরু হয়েছে? দুশ্চিন্তার কুটিল রেখা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। তাঁর পূর্ববর্তী গভর্ণর-জেনারেল একটির পর একটি স্বাধীন রাজ্য গ্রাস করে যে অসন্তোষের বীজ ভারতের মাটিতে বপণ করে গেছেন, সত্যই কি আজ তার থেকে অঙ্কুরোদ্গম হলো? তিনটি মহারাষ্ট্র বংশকে সাংঘাতিক আঘাত করে গিয়েছেন ডালহৌসি। সেতারার রাজবংশ, পেশবা বংশ আর ভোঁস্‌লা বংশ। পুনা ও সেতারা রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সুবিচারের আশায় ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। দাক্ষিণাত্যে একটা বিরাট অংশে ধূমায়িত বিদ্বেষ। ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের ষড়যন্ত্র। অযোধ্যা অধিকৃত হবার পর নানাসাহেব কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন রাজা ও নবাবদের দরবারে সাহায্যের জন্য পত্র প্রেরণের কথাও লর্ড ক্যানিং-এর মনে হলো। মনে পড়ল এই প্রসঙ্গে নানাসাহেবকে লেখা কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিংহের উত্তর: "আমি আপনার পরামর্শে সহায়তা করিতে প্রস্তুত, টাকা দিয়া ও সৈন্য দিয়া সহায়তা করিব।" এমন খবরও পাওয়া গেছে যে, নানাসাহেবের সাহায্যের জন্য গুলাব সিংহ অযোধ্যার একজন তালুকদারের কাছে কিছু অগ্রিম টাকাও পাঠিয়েছেন। তার ওপর ভারতের সমস্ত সেনানিবাসে চর্বি-টোটা আর হাড়ের গুঁড়ো-মেশানো ময়দার

অনরব। লাট-প্রাসাদের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে লর্ড ক্যানিং ভাবলেন—ভারতের আকাশে সত্যিই রক্তের মেঘ। ডালহৌসি যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন, অসন্তোষ, বিদ্বেষ, চক্রান্ত, আর জনশ্রুতির সলিল সিঞ্চনে সেই বৃক্ষে এতদিন ফল ধরতে আরম্ভ করেছে। জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি একবার তাকালেন দেওয়ালে বিলম্বিত লর্ড ক্লাইভের ছবিখানার দিকে। ছবির তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা: "১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশি যুদ্ধ-বিজেতা লর্ড ক্লাইভ"।

সতর শ সাতান্ন, আর আজ আঠার শ সাতান্ন। কোম্পানির রাজত্বের এক শ বছর হলো—আর এই এক শ বছর পরে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে? ঘটনাস্রোত যেভাবে দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলেছে, তাতে লর্ড ক্যানিং ভাবলেন, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই অগ্রসর হওয়া দরকার। মুহূর্তের অসতর্কতায় হয়ত কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের রাজদণ্ড খসে যেতে পারে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও মহারাষ্ট্র—সকল রকমের ভারতীয়ই তো কোম্পানীর সৈন্যদলে আছে। যদি এরা সবাই বিদ্রোহী হয়, তা'হলে সে-বিদ্রোহ প্রতিরোধ করা কি সম্ভব হবে?

সে-রাত্রে লর্ড ক্যানিং আর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলেন না।

। চার ।

এপ্রিল মাস শেষ হয় হয়।

দেশব্যাপী আতঙ্ক ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। গুপ্তচরদের মুখে আসন্ন বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ নগরে ও গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। পদচ্যুত উনিশ নম্বর পলটনের অনেক সিপাহী অযোধ্যায় এসে সেখানকার ধূমায়িত অসন্তোষের মূলে ইন্ধন জোগাল। কলকাতায় লর্ড ক্যানিং-এর কাছে দমদম, শিয়ালকোট, আম্বালা প্রভৃতি চারদিক থেকে ভাল-মন্দ নানা রকমের খবর প্রতিদিন আসছে। সে সব সংবাদ এমন জটিল এবং সামঞ্জস্যবিহীন যে, তার ভেতর থেকে প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উদ্বিগ্নচিত্তে আসন্ন বিপ্লব প্রতিরোধ করবার উপায় চিন্তা করেন তিনি। যতই চিন্তা করেন ততই বিচক্ষণ ক্যানিং-এর মনে হতে লাগল যে, বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে হিমালয়ের পায়ের তলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আকাশ যেন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ছেয়ে গেছে। একদিকে একটু আলো, অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকার। বারাকপুরের সিপাহীরা আপাতত শান্ত। দমদমার রাইফেল ডিপোর সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তারা নতুন প্রণালীতে চর্বিশূন্য টোটা ব্যবহার করছে। এই গেল কলকাতার কাছাকাছি ক্যান্টনমেন্ট দুটির কথা। পাঞ্জাব থেকেও সংবাদ এসেছে যে, সেখানকার প্রত্যেক সেনানিবাসে যথারীতি প্যারেড চলছে। শিয়ালকোটের সেনানিবাসে সিপাহীরা বিনা আপত্তিতে নতুন বন্দুক ব্যবহার করছে। স্যর জন লরেন্স নিজে পরিদর্শন করে এই সংবাদ জানিয়েছেন গভর্নর-জেনারেলকে। তিনি আরো লিখেছেন, এখানকার সিপাহীদের মনে বিন্দুমাত্র কুভাব নেই। জেনারেল বার্নার্ড লিখেছেন আম্বালা থেকে, এখানকার সিপাহীদের মনের মধ্যে অসন্তোষের ভাব থাকলেও তারা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই সৈনিক-বৃত্তি পালন করছে

এবং নতুন বন্দুক ব্যবহারে তাদের কারো মধ্যে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। একমাত্র মিরাট ক্যান্টনমেন্টের সংবাদ উদ্বেগজনক। সেখানে ২৩শে এপ্রিল তিন নম্বর অশ্বারোহীদলের পঁচাশী জন সিপাহী কর্ণেলের আদেশ অমান্য করেছে, দাঁত দিয়ে টোটা কাটতে সম্মত হয়নি। মিরাট সেনানিবাসে প্রধান সেনাপতি জেনারেল হিউয়েট এই অবাধ্যতার তদন্ত করছেন। এ ছাড়া আর কোনো সেনানিবাস থেকে নতুন কোনো উপদ্রবের খবর আসেনি। বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে এই সব খবর পেয়ে লর্ড ক্যানিং আপাততঃ কিছুটা নিশ্চিন্ত এবং সুস্থ হলেন। পাঞ্জাব ও অযোধ্যা—এই দুটোই ছিল ক্যানিং-এর চিন্তার গুরুতর বিষয়। কিন্তু উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল না। কারণ দুই লরেন্সের হাতে দুটি রাজ্যের ভার—পাঞ্জাবে স্যার জন লরেন্স আর অযোধ্যায় স্যর হেনরী লরেন্স। এঁদের ওপর ক্যানিং-এর অটল বিশ্বাস। এঁদের সাহস, যোগ্যতা ও কর্তব্যপালনে তৎপরতা তাঁর বিলক্ষণ জানা ছিল। তার ওপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনান্ট-গভর্ণর কলভিনও কম বিচক্ষণ নন। কাজেই সিপাহীদের মনে অসন্তোষের হেতু বিদ্যমান থাকলেও—এই সব অভিজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীদের ওপর লর্ড ক্যানিং-এর ভরসা ছিল অনেক।

২২শে এপ্রিল। বারাকপুর।

চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের বিদ্রোহী জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ের ফাঁসী হয়ে গেল। অন্যান্য সিপাহীরা দণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করছে। লর্ড ক্যানিং চেয়েছিলেন সিপাহীদের প্রাণদণ্ড না দিতে, জেনারেল হিয়ার্সেরও সেই রকম অভিমত ছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তা প্রধান সেনাপতি জেনারেল আনসন সিমলার শৈল-শিখর থেকে লিখে পাঠালেন: বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ডই যুক্তিসঙ্গত। লর্ড ক্যানিং এ-যুক্তি মানলেন না। তিনি চৌত্রিশ নম্বর পলটনের পদচ্যুতিই সাব্যস্ত করলেন।

৬ই মে। সকালবেলা। বারাকপুরের প্রশস্ত প্যারেড গ্রাউণ্ডে চৌত্রিশ নম্বর পল্টনের সিপাহীরা সমবেত হলো দণ্ড নেবার জন্যে। তাদের সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে রইল সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য আর দু'টি কামান। লেঃ পামার দণ্ডাদেশ পাঠ করে শোনালেন। তারপর জেনারেল হিয়ার্সের আদেশে

সিপাহীরা একে একে অস্ত্র পরিত্যাগ করল এবং তাদের সামরিক পরিচ্ছদও খুলে নেওয়া হলো। তারপর য়ুরোপীয় সৈন্যের প্রহরায় তাদের ক্যান্টনমেন্টের সীমা থেকে বের করে দেওয়া হলো। এই ভাবে চারশো সিপাহীকে নিরস্ত্র করে সেনাদলের তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হলো।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। বহরমপুরের যে উনিশ নম্বর আর ব্যারাকপুরের যে চৌত্রিশ নম্বর পল্টন দুটিকে পদচ্যুত করা হয়, এই দুটি পল্টনই, লর্ড ডালহৌসি যখন অযোধ্যা অধিকার করেন, তখন লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিল এবং সেই সময় থেকেই তাদের মনে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই প্রসঙ্গে লর্ড ক্যানিংকে লেখা হেনরী লরেন্সের একটি ডেসপ্যাচ এখানে আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা হলো: "উনিশ নম্বর পল্টনের প্রায় সাত শত লোক অযোধ্যাবাসী। পদচ্যুত হইবার পর তাহাদের বেশীর ভাগই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা এখানকার সিপাহীদের চিঠি লিখিয়া এই মর্মে উত্তেজিত করিয়াছে যে, ধর্মরক্ষার জন্ত তাহারা যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। সেই চিঠি পাইয়া স্থানীয় পল্টনের সিপাহীদের মনে ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, অফিসারগণের বহুবিধ প্রবোধবাক্যেও তাহাদের অবিশ্বাস দূর হইতেছে না। সাত নম্বর পল্টনের সিপাহীরা তো টোটা ব্যবহার সম্পর্কে যারপর নাই অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে।"

অযোধ্যার অবস্থা ক্রমেই সঙীন হয়ে উঠল। সিপাহীরা কিছুতেই দাঁত দিয়ে চর্বি-টোটা কাটতে চায় না। তারা রীতিমত ক্ষেপে ওঠে। অফিসারদের খুন করবার ভয় দেখায়। সংবাদ শুনে হেনরী লরেন্স বুঝলেন বিপদ আসন্ন। তাদের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে তিনি ৮ই মে সন্ধ্যাবেলায় বহু সৈন্য ও কামান নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে বের হলেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে সাত মাইল দূরে ছিল অযোধ্যার সেনানিবাস। সেদিন ছিল রবিবার। বিশ্রামের দিন। তিন ঘণ্টায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের ছাউনির সম্মুখে উপস্থিত হলেন। চাঁদের উজ্জল আলোয় ছাউনি আলোকিত। সিপাহীরা প্যারেড শুরু করল। হঠাৎ রাত্রিকালে এত সৈন্য, কামান এবং তাদের পুরোভাগে স্বয়ং হেনরী লরেন্স— বিদ্রোহী সিপাহীরা বিস্মিত এবং চমকিত হলো। গোলন্দাজদলে মশাল

জলে ওঠে। কামানের মুখ বিদ্রোহী সেনাদলের দিকে। সপ্তম পল্টনের সিপাহীরা আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হলো। অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে তারা ইতস্ততঃ ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। কেবল অল্পসংখ্যক সিপাহী দাঁড়িয়ে রইল। হেনরী লরেন্স ঘোড়ায় চড়ে তাদের সামনে এসে আদেশ দিলেন—তোমরা ইউনিফর্ম খুলে ফেল, বন্দুক ফিরিয়ে দাও।

তারপর পঞ্চাশ জন বিদ্রোহী দলপতিকে গ্রেপ্তার করে কয়েদ করা হলো। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। বিচারে প্রত্যেককে কঠোর দণ্ড দেওয়া হলো। এইভাবে নৈশ অভিযানে বিদ্রোহ দমন করে হেনরী লরেন্স কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। অযোধ্যার সিপাহীদলের মনোভাব যে কি রকম, তা সে-সময় বিশেষ ভাবে বুঝেছিলেন একজন। তিনি দূরদর্শী হেনরী লরেন্স। সিপাহীরা বেঁকে দাঁড়াবে, এ তিনি অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং যাদের মনে যে ধর্মভাবের সংস্কার বদ্ধমূল, তাদের মনে ধর্মনাশের আশঙ্কা কি ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, এ তিনি বিলক্ষণ অনুমান করেছিলেন। একদিন তিনি অযোধ্যার গোলন্দাজ দলের একজন জমাদারের সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশী আলাপ করলেন। জমাদারটি ব্রাহ্মণ। বয়স চল্লিশের ওপর। ভারতের বহু সেনানিবাস ঘুরে সে এখন অযোধ্যায় এসেছে। বহু অভিজ্ঞ এই জমাদারটির সঙ্গে আলাপ করে হেনরী লরেন্স বুঝলেন যে, নানা কারণে দেশীয় সৈন্যদের মনে অসন্তোষ এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বর্তমানে একমাত্র তাদের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে রাজ্যশাসন আর সম্ভব নয়।

দিন যায়।

ক্রমে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানী-বিদ্বেষ ভৈরব-মূর্তিতে দেখা দিল। হাড়ের গুঁড়ো-মেশানো ময়দা, নুন, চিনি, চর্বি-টোটা, শতবর্ষ পরে কোম্পানী রাজত্বের অবসানের ভবিষ্যবাণী এবং বিদ্রোহী সিপাহীদের দণ্ড—এই সব জনরব ও ঘটনা মিলে সে-বিদ্বেষকে আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুললো। লর্ড ক্যানিং বুঝলেন, একমাত্র দেশীয় সৈন্যের ওপর নির্ভর করা আর যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেসব সৈন্য চীনে যাচ্ছিল, তখনি তাদের ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন। আর বোম্বাই থেকে যেসব সৈন্য পারস্যে গিয়েছিল তারাও যাতে

অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে পারে, সেজন্ত লর্ড ক্যানিং লর্ড এলিনবরাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে চিঠি দিলেন।

ভারতের কয়েকটি শহরের অবস্থা, লর্ড ক্যানিং-এর মনে হলো—বারুদের বাক্সের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষা শুধু একটি দেশলাই-এর কাঠির। মে মাসের আরম্ভেই লর্ড ক্যানিং ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভায় ভারতের বিস্ফোরক অবস্থা জানিয়ে এক চিঠিতে লিখলেন: "ভারতে বিদ্রোহের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। সিপাহীদের মনে শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রধানতঃ চর্বি-টোটার দরুণ ধর্ম ও জাতি নাশের ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মণশ্রেণীর লোকেরা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। আবার রাজ্যচ্যুত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন বিঠুরের নানা ধুন্দুপন্থ), রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে আমাদের ভারতীয় সৈন্যদের মনে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এক বৎসর দুই মাস পূর্বে আমি যাঁহার হস্ত হইতে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছি, সেই লর্ড ডালহৌসি ভারতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, স্পষ্টই দেখিতেছি, এতদিনে সেই বৃক্ষে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত-শাসন ব্যাপারে তাঁহার ভ্রান্ত-নীতি এখন কুফল উৎপন্ন করিতেছে। কিছুদিন পূর্বেও আপনাকে আমি জানাইয়াছি যে, ভারতের অবস্থা এখন একটি বারুদের বাক্সের মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সে অবস্থাও অতিক্রান্ত হইয়াছে। সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য এখন প্রজ্জলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমি দেখিতে পাইতেছি, সেই অগ্নিশিখা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। দেখিতে পাইতেছি, যে সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী আমরা শতবর্ষের চেষ্টায় গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহারা এখন আমাদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতেছে।"

লক্ষ্ণৌ থেকে হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে টেলিগ্রাম করলেন: "অযোধ্যার গুরুতর পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, কিছুদিনের জন্ত আমাকে অযোধ্যার সামরিক ক্ষমতা প্রদান করুন। আমি সে-ক্ষমতার অপব্যবহার করিব না।"

লর্ড ক্যানিং হেনরী লরেন্সের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কারণ তাঁর ধারণা হলো যে, ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহ সামরিক বিদ্রোহ, কিন্তু অযোধ্যার

বিদ্রোহ রাজবিদ্রোহ—সুতরাং ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর। তাই তিনি হেনরী লরেন্সকে কিছু দিনের জন্ত পূর্ণ সামরিক ক্ষমতা দিতে ইতস্ততঃ করলেন না। তাঁর যোগ্যতা ও বিচক্ষণতায় গভর্ণর-জেনারেলের অগাধ বিশ্বাস। ক্যানিং-এর মিলিটারী-সেক্রেটারি তখন গভর্ণর-জেনারেলের মঞ্জুরী পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন: "আবশ্যকমতে আপনি যে সব স্তায়সঙ্গত ক্ষমতা চাহিবেন, গভর্নর-জেনারেল তাহাই আপনাকে প্রদান করিবেন।"

পাঞ্জাব থেকে জন লরেন্স ঠিক সেই একই সময়ে লর্ড ক্যানিংকে চিঠি লিখলেন: "অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। অতএব এই গ্রীষ্মকালের কিছুদিন কাশ্মীরে অবস্থান করা আমার অভিলাষ।" গভর্ণর-জেনারেল অনুমতি দিতে চাইলেন না। রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ করে তিনি জন লরেন্সকে উত্তর লিখলেন: "মহারাজ গুলাবসিংহ এখন মৃত্যু শয্যায়। এ-সময়ে আপনি তাঁহার রাজ্যে গমন করিলে লোকে মনে করিবে, ইংরেজ গভর্ণমেন্ট বুঝি কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিতে চাহেন।"

মিরাটের বিদ্রোহের খবর যখন পাঞ্জাবে পৌঁছল, তখন জন লরেন্সও গভর্ণর-জেনারেলকে জরুরী চিঠি লিখে অতিরিক্ত ক্ষমতা চেয়ে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে লিখলেন: "ভারতবর্ষে বৃটিশ সৈন্তের সংখ্যা এত কম যে, তাহা দ্বারা আসন্ন বিদ্রোহ প্রতিরোধ করা অসম্ভব। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি অবিলম্বে শিখ সৈন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ-বিষয়ে আমি প্রধান সেনাপতি, জেনারেল আনসানকেও লিখিয়াছি। অতএব আমি এক হাজার শিখ অশ্বারোহী সৈন্ত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা চাহি। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আমি এই ক্ষমতা পরিচালনা করিব না।"

লর্ড ক্যানিং জন লরেন্সকেও এ-ক্ষমতা প্রদান করলেন।

এই দুটি বিষয়ই লর্ড ক্যানিং-এর বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

স্তর জন লরেন্স, স্তর হেনরী লরেন্স এবং জেনারেল হিয়ার্সে প্রভৃতি বিচক্ষণ সেনানায়ক-বৃন্দের বিভিন্ন ডেসপ্যাচ থেকে লর্ড ক্যানিং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যেমন করেই হোক ভারতে এখন সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীও এই পন্থা অনুমোদন করলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে সৈন্ত নিয়ে আসা, পারস্ত উপসাগর থেকে প্রত্যাগত সৈন্তদের ভারতে ফিরিয়ে আনা এবং চীনের অভিযান আপাততঃ বন্ধ রাখবার জন্ত

তিনি লর্ড ক্যানিংকে পরামর্শ দিলেন। এমন কি, চীন, সিংহল অথবা যেখান থেকে হোক ইংরেজ সৈন্য সংগ্রহ করা ও পাহাড়ী গুর্খা সৈন্য আমদানী করার কথাও তিনি বললেন।

লর্ড ক্যানিং এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করতে ইতস্ততঃ করলেন না। তিনি বুঝেছিলেন ডালহৌসির কৃতকর্মের জন্য ভারতের প্রজাসাধারণ অসন্তুষ্ট। অযোধ্যা অধিকার সেই অসন্তোষকে আরো তীব্র করে তুলেছে। এই বিদ্রোহের মূল তাই গভীরে। চর্বি-টোটা গৌণ, রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারই মুখ্য। ভারতের এই প্রধূমিত অন্তরাগ্নির অনিবার্যতা উপলব্ধি করেই লর্ড ক্যানিং তাই বিলাতের মন্ত্রীসভায় লিখলেন: "ডালহৌসি-রোপিত বিষবৃক্ষে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

দিন যায়।

দিল্লী ও মিরাটের অভ্যুত্থানের সংবাদে বিচলিত হন লর্ড ক্যানিং। আগ্রা থেকে লেঃ গভর্ণর কলভিন মিরাট সম্পর্কে যা লিখেছেন তা রীতিমত উদ্বেগজনক। বন্যাপ্রবাহের মতো বিদ্রোহ-প্রবাহ হিন্দুস্থানে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার অবিবেচনার ফল হাতে হাতে ফলল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ইংরেজ সৈন্য কমানো কতদূর অবিবেচনার কাজ হয়েছে, সে কথা তিনি আরেক বার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। এখন ভারতে ইংরেজ সৈন্য সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু অতীতের জন্য অনুশোচনা বা প্রতিবাদ এখন নিষ্ফল। লর্ড ক্যানিং তাই বর্তমানের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। পারস্য ও চীনের অভিযান থেকে প্রত্যাগত ইংরেজ সেনাদের কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। রেঙ্গুন ও মৌলমিন থেকেও আরো একদল ইংরেজ সৈন্যকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হলো। মাদ্রাজ থেকে এল তেতাল্লিশ নম্বরের রেজিমেণ্ট, সিংহল থেকেও আনা হলো প্রচুর সৈন্য। লর্ড ক্যানিং আরো সৈন্য সংগ্রহের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। মিরাটের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী-কর্তৃক দিল্লী অবরোধের দুঃসংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ক্যানিং ভারতের নানাস্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে তৎপর হলেন। পাঞ্জাব থেকে উদ্বৃত্ত শিখ ও ইংরেজ সৈন্য অবিলম্বে দিল্লীতে পাঠাবার জন্যে তিনি জন লরেন্সকে জরুরী নির্দেশ দিলেন। এমন কি, তিনি যেন গভর্ণর-জেনারেলের নামে

পাতিয়ালা ও ঝিন্দের মহারাজার কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠাতে ইতস্ততঃ না করেন।

এইসব ব্যবস্থা ত্বরিৎ গতিতে সম্পন্ন করে লর্ড ক্যানিং মিলিটারী সেক্রেটারি কর্ণেল বার্চের পরামর্শ অনুসারে, দু'খানা নতুন ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। একখানা ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, অপরখানা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে। প্রথমখানিতে বলা হলো : "ভারতে কাহারো জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, কাহারো ধর্মসংস্কারে আঘাত করা হইবে না।" এই ঘোষণাপত্র, প্রত্যেক নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বাজারে বাজারে এবং প্রত্যেক প্রকাশ্যস্থলে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রখানি খুব সংক্ষিপ্ত : "কোম্পানীর অধীনস্থ সৈন্যগণ তাহাদের শপথের অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিশ্বাসে কার্য করিলে, কোম্পানী হইতে যথারীতি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া, বিশ্বাস ভুলিয়া যাহারা বিপথে বিচরণ করিবে, অবাধ্য হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা দেখাইবে, তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করা হইবে।"

দণ্ডদানের জন্য একটা নতুন আইন বিধিবদ্ধ করা হলো।

বিদ্রোহ-শান্তির জন্যে এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করে লর্ড ক্যানিং দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভায় লিখলেন : "এখন হইতে ইংলণ্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান পুরুষেরা যেন ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে যত্নবান হন। একের অবিবেচনার মূল্য আমরা দিতে চলিয়াছি। জানি না, এই বিদ্রোহের পরিণতি কি হইবে। আমি যথাসাধ্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইতেছি।"

॥ পাঁচ ॥

নানাসাহেব।

সাতান্নর বিপ্লবের প্রধান নায়ক ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি নাম। সেদিন এই নাম আতঙ্কের শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বুকে। ইংরেজদের কাছে নানাসাহেব ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর প্রতিভা ও পৌরুষ নিয়ে। মারাঠার অজেয় শৌর্যের শেষ প্রতীক এই নানাসাহেব। সাতান্নর বিপ্লবে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেই বিপ্লবের ইতিহাস বর্ণনা করবার আগে নানাসাহেবের জীবনেতিহাসের সঙ্গে পাঠকদের একটু পরিচিত হওয়া দরকার।

সেতারা, নাগপুর ও পুনা, ভারতের ইতিহাসে এই তিনটি মহারাষ্ট্রীয় বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গোড়াতেই আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, লর্ড ডালহৌসি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করবার বহু পূর্বেই বৃটিশ কোম্পানী পুনা অধিকার করে এবং পুনার প্রসিদ্ধ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওকে রাজ্যচ্যুত করে কানপুর থেকে বার মাইল দূরে বিঠুরে একটা জায়গীর দিয়ে নির্বাসিত করে। কোম্পানার অ[illegible] বার্ষিক আট লক্ষ টাকার বৃত্তি নিয়ে বাজীরাও বিঠুরে গঙ্গাতীরে জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করেন। বহু আত্মীয়স্বজন অনুচরবৃন্দ ও সৈন্য পরিবৃত হয়ে সামান্য একজন জায়গীর-দারের মতন বাস করতেন ভূতপূর্ব পেশবা। একদা যাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে পশ্চিমভারত কাঁপত, তা তিনি ভুলে গেলেন। যে বৃটিশ কোম্পানী এক সময়ে যাঁর ভয়ে সশঙ্ক থাকত, সেই তিনিই এখন নিরীহ ও সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করতে লাগলেন এবং ইংরেজের সুসময়ে দুঃসময়ে তাদের সৈন্য ও অর্থসাহায্য

করে স্থহৃৎ-সৌজন্যের পরিচয় দিতে লাগলেন। সে সাহস, সে বীর্যবত্তা, সে রণোন্মাদ বিগত সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আফগানিস্তানের যুদ্ধে পাঁচলক্ষ টাকা ধার এবং খালসা যুদ্ধে এক হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়ে, বাজীরাও তাঁর বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। তবুও ভূতপূর্ব পেশাবাকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সন্দেহের চক্ষেই দেখতেন।

বাজীরাওর বিপুল ঐশ্বর্যের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

কোথায় পাওয়া যায় ভূতপূর্ব পেশাবার উপযুক্ত দত্তকপুত্র? মহারাষ্ট্রের মাথেরন পর্বতের সানুদেশে চিরশ্যাম উপত্যকার কোলে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটির নাম বেণু। এই বেণুগ্রামের সবচেয়ে পুরাতন ও সম্মানিত বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার। নাম মাধবরাও নারায়ণ ভট্ট। মাধবরাওর স্ত্রীর নাম গঙ্গাবাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও এই দম্পতীর জীবন সুখে অতিবাহিত হতো। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভ দিনে গঙ্গাবাঈ একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন। এই পুত্রই পরবর্তী কালের ইতিহাস-বিখ্যাত নানাসাহেব।

বাজীরাওয়ের পদচ্যুত হবার দু'বছর পরে তাঁর ভবিষ্য দত্তকপুত্র নানাসাহেব জন্মগ্রহণ করেন। বাজীরাও বিঠুরের জায়গীর পাবার পর, মহারাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট পরিবার তাঁর অনুগমন করে বিঠুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে মাধবরাও ছিলেন একজন। পুত্রের জন্মের তিন বছর পরে মাধবরাও এলেন বেণুগ্রাম থেকে বিঠুরে বাজীরাওয়ের বদান্যতার প্রার্থী হয়ে। মাধবরাওর শিশুপুত্রটিকে দেখে অবধি বাজীরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিঠুর দরবারে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল এই বালক। শৈশবেই নানার ধীর গম্ভীর স্বভাব, বুদ্ধির দীপ্তি বৃদ্ধ পেশবার মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি বালককে দত্তক নিতে মনস্থ করলেন। ১৮২৭ এর ৭ই জুন তারিখে তিন বছরের নানা-কে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে তাকে সাধারণ ভাবে দত্তক গ্রহণ করেন। এই ভাবেই বেণুগ্রামের দরিদ্র পরিবারের এক বালক, অদৃষ্টের দাক্ষিণ্যে পেশবার গদীতে আরোহণ করেছিলেন।

সত্যই মারাঠার পেশবাদের উত্তরাধিকারী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সঙ্গে বালকের ওপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল,

তা কি সে তখন বুঝতে পেরেছিল? পেশবাদের সিংহাসন তো সামান্ত জিনিস নয়। এই সিংহাসনের ওপরে বসেই পরাক্রান্ত বাজীরাও একদা শাসনদণ্ড ধারণ করে একটি সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এই সিংহাসনের জন্তেই পানিপথের যুদ্ধ। সিন্ধুনদের পবিত্র সলিল-স্পর্শে পূত এই সিংহাসন। এই সিংহাসনে বসেই তিনি ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন এবং ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে এই সিংহাসনই দাসত্বের স্বার্থে গ্লানিযুক্ত হয়। বাজীরাওয়ের দত্তক-পুত্র হিসাবে বালক নানা এসব কথা সেদিন কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, তা বলা শক্ত। এই সিংহাসনে প্রথমে বসেছিলেন বালাজী বিশ্বনাথ আর সর্বশেষে বসলেন নানাসাহেব।

ঠিক এই সময়েই হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে বাস করছিলেন মোরোপন্ত তাম্বে ও তাঁর স্ত্রী ভাগীরথী বাঈ। এঁরা ছিলেন চিমণাজী আপ্পা পেশবার অনুচরদের অন্যতম। সেদিন এই অখ্যাত দম্পতি উপলব্ধিই করতে পারেন নি যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁদের নাম অমর হয়ে থাকবে। এই ভাগীরথী বাঈ-এর গর্ভেই জন্মেছিল একটি মেয়ে। এই মেয়েই ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরবর্তী কালে ঝাঁসির রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শিখাময়ী এই লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন সাতান্নর বিপ্লবের অন্যতম নায়িকা। শৈশবে তার নাম ছিল মনু বাঈ। মনু যখন তিন-চার বছরের মেয়ে, মেরোপন্ত তাম্বে সপরিবারে বারাণসী ত্যাগ করে বিঠুরে এলেন বাজীরাওর কাছে। বিঠুরের সকল লোকের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন লক্ষ্মীবাঈ। তাঁকে সবাই আদর করে 'ছবেলী' (ময়না) বলে ডাকে। রাজকুমার নানা আর ছবেলী যেন সকলের নয়ন-মণি। যখন এঁরা দুটিতে মিলে পেশবার অস্ত্রাগারে অসি-চালনা শিক্ষা করতেন—তখন কে ধারণা করতে পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে এঁরাই একদিন সবল হস্তে তরবারী ধারণ করে তাঁদের প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন? বিঠুরের প্রাসাদে নানা, তাঁর খুড়তুতো ভাই রাও সাহেব যখন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতেন, তখন ছবেলী দূর থেকে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করতেন, আর যতটা পারতেন নিজে নিজে শিখতেন। নানাসাহেব যখন হাতীর ওপর হাওদায় চড়ে বসতেন, তখন ছবেলী তাঁর কাছে এসে স্নেহভরে বলতেন,

আমাকে সঙ্গে নেবে না? কখনো নানা তাঁকে হাওদায় তুলে নিতেন এবং কেমন করে এই অতিকায় জন্তুটিকে চালনা করতে হয়, তা যত্নের সঙ্গে শেখাতেন। কখনো নানাসাহেব ঘোড়ায় পিঠে চড়ে ছবেলীর জন্তে অপেক্ষা করতেন এবং তারপর আর একটি ঘোড়ায় চড়ে ছবেলী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন। বালিকার কোমরে দুলতো অসি আর হাওয়ায় উড়তো তাঁর অলকদাম। দুরন্ত ঘোড়াকে নিজের বশে আনবার চেষ্টায় তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল হয়ে উঠতো আরক্তিম। তারপরেই দুজনে সবল হাতে ঘোড়ার লাগাম টেনে ছুটিয়ে দিতেন ঘোড়া। বিঠুরের সবাই পুলকিত নয়নে তাই দেখতো। তখন নানার বয়স আঠার আর ছবেলীর সাত। এই সাত বছর বয়সেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন যুদ্ধের শিক্ষাদীক্ষা। আশৈশব তাঁদের মধ্যে গভীর ভালবাসা। কথিত আছে, প্রতি যমদ্বিতীয়া উৎসবে ইতিহাসের এই দুটি ভ্রাতা ও ভগ্নী—মিলিত হতেন। সোনার থালায় ঘৃতপ্রদীপ আর রক্তচন্দনের পাত্র নিয়ে ছবেলী তাঁর ভাইয়ের কপালে দিতেন ফোঁটা। আর প্রদীপ নিয়ে আরতি করতেন নানার মুখের চারদিকে। বিঠুর প্রাসাদে সকলেই উপভোগ করতেন সেই দৃশ্য। ইতিহাস ত এইভাবেই রমণীয় হয়ে ওঠে।

এই দুটি বীর ও বীরাঙ্গনা ভিন্ন, ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের আর একটি নায়কও এই সময়ে বিঠুরে লালিত পালিত হচ্ছিলেন। তিনি তাঁতিয়া তোপি। এই তাঁতিয়া তোপির নামও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ১৮১৪ সালে এঁর জন্ম। প্রকৃত নাম রঘুনাথ। পিতার নাম পাণ্ডুরাং ভাট। ইনিও বিঠুরের অধিবাসী। তাঁতিয়ার সামরিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নানাসাহেব তাঁকে বিঠুর প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং প্রথমে শরীর-রক্ষক এবং পরে সৈন্যবিভাগে উচ্চতর কাজে নিযুক্ত করেন। এইভাবেই সেদিন বিঠুর প্রাসাদে ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, আজিমুল্লা, আর বীর তাঁতিয়া তোপি—সাতান্নর বিপ্লবে যাঁরা প্রত্যেকেই গৌরবময় স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

নানাসাহেব আর লক্ষ্মীবাঈ যে ভবিষ্যতে বড় হবেন, শৈশবেই তার অনেক লক্ষণ তাঁদের দুজনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের স্বভাবে প্রখর হয়ে ফুটে উঠেছিল আত্মমর্যাদা, বংশমর্যাদা আর স্বাধীনতার জন্তে

অপরিসীম আগ্রহ। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাওর সঙ্গে অষ্টম বর্ষীয়া লক্ষ্মীবাঈ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। লক্ষ্মীবাঈয়ের মহারাষ্ট্রীয় জীবনীলেখক লিখেছেন :

"পুরোহিত যখন গঙ্গাধর রাওর বস্ত্রাঞ্চলের সহিত মনুর বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন করেন, তখন বালিকা পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন, 'ভাল করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবদ্ধ করুন।' নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে শ্বশুর-গৃহে বধূর নূতন নামকরণ হয়। মনুর দেহে রমণীয় কান্তি ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখিয়া পুরবাসীদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা বধূকে মূর্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এজন্য লক্ষ্মীস্বরূপিনী বধূর নাম রাখা হইল 'লক্ষ্মীবাঈ'। মোরোপন্তের মনুবাঈ, বিঠুরের ছবেলী এইভাবে লক্ষ্মীবাঈ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর লক্ষ্মীবাঈয়ের পিতা ঝাঁসীর দরবারের অন্যতম সর্দার হইয়াছিলেন।"

১৮৫১-তে পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুকে শোকাশ্রু ফেলবার কোন কারণ ছিল না। কেননা গদীচ্যুত হবার পর যে তেত্রিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, সেই তেত্রিশ বছরের ইতিহাস শুধু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্যের ইতিহাস, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সবিনয় বন্ধুত্বের ইতিহাস, অন্যান্য স্বাধীন রাজাদের রাজ্যচ্যুতিতে কোম্পানীকে নির্লজ্জভাবে সহায়তা করার ইতিহাস। কোম্পানীর দেওয়া আট লক্ষ টাকার বৃত্তি থেকে তিনি যে অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা তিনি কোম্পানীর কাগজে নিয়োগ করেছিলেন। শুধু তাই নয় আফগান যুদ্ধের সময় কোম্পানীকে তিনি ধার দিলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর শিখযুদ্ধের সময় কোম্পানীকে তিনি সাহায্য করলেন এক হাজার পদাতিক আর এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে। এ হেন মহারাষ্ট্রকুল-কলঙ্কের মৃত্যুতে বিঠুরের কেউই যে এক ফোঁটা শোকাশ্রু ফেলব না—এই তো স্বাভাবিক।

মৃত্যুর পূর্বে বাজীরাও নানা সাহেবকে পেশবা উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেন এবং তার ফল কি হয়েছিল সে-কথা ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। রামচন্দ্র পন্থ ছিলেন বাজীরাওর বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। ইংলণ্ডের

দরবারে নানার আবেদন যখন অগ্রাহ্য হলো, তখন রামচন্দ্র পন্থ বন্ধুপুত্রের স্বত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করলেন। লর্ড ডালহৌসির কাছে তিনি এই বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য বিঠুরের কমিশনার মারল্যাণ্ডের সুপারিশসহ আর একবার আবেদন করলেন। সে-আবেদনও নিষ্ফল হলো। ডালহৌসি আর একবার স্পষ্টাক্ষরে রামচন্দ্র পন্থকে জানিয়ে দিলেন: "গভর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে ভূতপূর্ব পেশবার বর্তমান আত্মীয়স্বজনের কোনো দাবী নাই। গভর্ণমেণ্টের দয়ার উপরেও এ-সময়ে তাঁহারা কোন রকম দাবী উপস্থিত করিতে পারেন না। তথাকথিত দত্তকপুত্র নানাসাহেবও পারেন না। পেশবার পরিত্যক্ত সম্পত্তিই তাঁহাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট।" ডালহৌসি এইখানেই ক্ষান্ত হলেন না। পেশবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে বিঠুরের অধিবাসীদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের অধীনে নিয়ে এলেন।

নানাসাহেব বিলাতে আপিল করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। এই আবেদনপত্রে তিনি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ আবেদনপত্রের একাংশে নানাসাহেব লিখলেন: "স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কেবল সমবেদনার হানিকর হয় নাই, একটি প্রাচীন রাজবংশের প্রতিনিধির প্রাপ্য স্বত্বেরও বিরোধী হইয়াছে। আমি কেবল সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া সুবিচারপ্রার্থী হই নাই। বৃটিশ কোম্পানী মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শেষ অধিপতির নিকট হইতে যে কিছু উপকার পাইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই আপিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পেশবা যখন আপনার উত্তরাধিকারিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহার রাজ্য বৃটিশ কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন কোম্পানী ন্যায়তঃ, পেশবা ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে তাহার মূল্য দিতে বাধ্য।" নানাসাহেব তাঁর আবেদনপত্রে দিল্লী ও মহীশূরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, কোম্পানী এই দুটি রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণের সঙ্গে যে রকম সদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেই বা এমন বৈষম্য প্রদর্শিত হবে কেন? কেন তাঁর বংশধরদিগকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হবে? কোন্ কারণে কোম্পানীর বিবেচনায় পেশবার বংশধরগণের স্বত্ব বিজিত মহীশূর ও কারারুদ্ধ মোগলের বংশধরগণের স্বত্বের চেয়ে কম? তারপর নানাসাহেব

নিজেকে পেশবার যথাবিধি গৃহীত দত্তক বলে প্রতিপন্ন করেন ; এইরকম দত্তক পুত্র যে, ঔরস পুত্রের ন্যায় পিতার সমস্ত রাজচিহ্ন ও বিষয়ের অধিকারী এবং বৃটিশ কোম্পানীও যে এর বৈধতা স্বীকারে বাধ্য, সে-কথাও তাঁর আবেদনপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

আবেদনের উপসংহারে নানাসাহেব আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন। যুক্তিপূর্ণ এবং অত্যন্ত তেজগর্ভ সেই সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি লিখলেন : "বাজীরাও তাঁহার পেন্সন বাঁচাইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কোনরূপ পেন্সন দেওয়া নিরর্থক, কোম্পানীর এই আপত্তির মধ্যে কোন যুক্তি নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সন্ধি অনুসারে পেশবা ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ বার্ষিক আটলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত। সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করা কি যুক্তিসঙ্গত ? ইহা কি ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত ?" যাই হোক, নানার এই যুক্তিপূর্ণ আবেদন ইংলণ্ডে কোন সুফল উৎপাদনে সমর্থ হয় নি। ডিরেক্টরদের সেই এক কথা (এবং ইহা ডালহৌসির কথারই প্রতিধ্বনি)—ভূতপূর্ব পেশবা তেত্রিশ বছর ধরে পেন্সন পেয়ে যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, তাই তাঁর পরিবার ও পোষ্যবর্গের জীবিকাসংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট। পিতার বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক নয়।

ইংলণ্ড থেকে এই উত্তর আসবার আগেই নানাসাহেব নিজের স্বত্ব সমর্থনের জন্যে সেখানে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। ইনি আজিমুল্লা খাঁ। দীর্ঘকায়, সুশ্রী ও সুগঠিত দেহ, এই মুসলমান যুবক ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সাতান্নর বিপ্লবে ইনিও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন আজিমুল্লা ছিলেন নানাসাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সকল বিষয়েই নানা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাই এই গুরুতর দৌত্যকার্যের দায়িত্ব তিনি আজিমুল্লার ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আজিমুল্লা ইংলণ্ডে পৌছে বিডন সাহেবের সহায়তায় নানার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন না।

আজিমউল্লার জন্ম খুব দরিদ্রের ঘরে। তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার বলে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠার শিখরে আরোহণ করেন এবং কালক্রমে তিনি সিপাহী যুদ্ধের প্রধান নায়কের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হন। এই স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান শৈশবে এমনই দারিদ্র্যের কোলে লালিত-পালিত

হয়েছিলেন যে, তাঁকে এক ইংরেজের গৃহে সামান্ত বাবুর্চির কাজ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। তখনো কিন্তু যুবক আজিমুল্লার অন্তরে আকাংখার আগুন অনির্বাণভাবেই জ্বলত। বাবুর্চির বৃত্তি অবলম্বন করার সময়েই তিনি তাঁর ইংরেজ মনিবের সাহায্যে ইংরেজী ও ফরাসী এই দুটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এই দুটি ভাষায় যখন আজিমুল্লার বেশ ভালো রকমের দখল জন্মালো, তখন তিনি বাবুর্চির চাকরী ছেড়ে দিলেন এবং কানপুরের এক সরকারী স্কুলে পড়তে লাগলেন। স্বীয় দক্ষতার বলে আজিমুল্লা সেই স্কুলেই শিক্ষক নিযুক্ত হন। কানপুর স্কুলের এই সুদক্ষ শিক্ষকটির নাম ও খ্যাতি যথাসময়ে নানাসাহেবের কাছে পৌছল। বিঠুর দরবারে একবার আসবার জন্তে নানাসাহেব আজিমুল্লাকে আমন্ত্রণ জানালেন। তরুণ আজিমুল্লার সঙ্গে আলাপ করেই নানা বুঝলেন, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি যেমন গভীর তেমনি অকৃত্রিম তাঁর স্বদেশপ্রেম। সেই দিন থেকে আজিমুল্লা হলেন নানার বিশ্বাসী সহচর ও প্রধান পরামর্শদাতা। যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই তিনি আজিমুল্লাকে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্ত ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন।

লণ্ডনে তাঁর দৌত্য নিষ্ফল হলেও প্রিয়দর্শন আজিমুল্লা তাঁর মার্জিত আদবকায়দা, শিষ্টাচার ও সুকণ্ঠের জন্ত সেখানকার অভিজাতমহলে অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে, য়ুরোপের উচ্চ সমাজের মহিলাদের কাছে তিনি হয়ে উঠ্‌লেন 'ডার্লিং আজিমুল্লা'। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরেও তাঁদের অনেকের কাছ থেকেই আজিমুল্লা স্নেহসম্ভাষণ পূর্ণ চিঠি পেয়েছিলেন। লণ্ডনের ব্যয়বহুল এই দৌত্য নিষ্ফল হলো বটে, কিন্তু আজিমুল্লা সেইখানেই থামলেন না বা দমলেন না। এই সময়ে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল এক নতুন আশা, এক নতুন প্রেরণা। সে আশা, সে প্রেরণা সফল করার জন্তে বৈদেশিকের সম্মতির প্রয়োজন ছিল না, তার সফলতা একান্তভাবেই নির্ভর করত তাঁর স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর ওপর। সাম, দান ও ভেদের পথে যখন স্বাধীনতা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন বলপূর্বক কোন্ উপায়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে,—এই চিন্তাই সেদিন আজিমুল্লার অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছিল।

ঠিক এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন আর একজন মারাঠি ব্রাহ্মণ। তিনিও এসেছেন ইংলণ্ডের দরবারে আবেদন জানাতে। আবেদন-নিবেদন করে যখন কোন

ফল হলো না, তখন তাঁরও অন্তঃকরণ নৈরাশ্যজনিত প্রতিহিংসায় পূর্ণ হয়ে উঠল এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তিনিও নানারকম উপায়ের কথা চিন্তা করছিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাম রঙ্গ বাপুজী। তিনি এসেছেন সেতারা রাজ্যের দূত হয়ে। ডালহৌসির পররাজ্য গ্রাস-নীতির প্রথম বলি ছিল সেতারা, সে কথা আগেই বলেছি। আপাসাহেব সেতারার গদির অধিকারী থাকতেই যথানিয়মে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন, তবু ডালহৌসি এই দত্তক অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টর সভা ডালহৌসির পক্ষই সমর্থন করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রের নীতি নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করেই ডালহৌসি নীরা ও ভীমার রমণীয় তট ও ফল-সম্পত্তি শোভিত মহাবলেশ্বর পর্বতের সঙ্গে বহুমূল্য সেতারা রাজ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুক্ষিগত করে নিয়েছিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠ ও স্থিরবুদ্ধি রঙ্গ বাপুজী ইংলণ্ডের দরবারে এসে যখন বললেন—"১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রে স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছিল যে, সেতারার রাজা আপাসাহেব স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিবেন—এই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার স্বরূপ ও অর্থ কি?"—তখন বোর্ড অব ডিরেক্টররা ডালহৌসির নীতির আশ্রয়ে মুখ লুকোতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিয়তির নেপথ্যবিধান রঙ্গ বাপুজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আজিমুল্লার। একজন পেশবার প্রতিনিধি অর্থাৎ ছত্রপতি শিবাজীর প্রধানমন্ত্রীর বংশের প্রতিনিধি, অপরজন ছত্রপতি শিবাজীর বংশধরের প্রতিনিধি এবং দুজনেই কার্যসিদ্ধিতে অকৃতার্থ। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই তাই ধর্ম, জাতি ও আচার তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন অন্তরায়ই সৃষ্টি করতে পারেনি। দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। একই সংকল্প ও একই অকৃতকার্যতা দুজনকেই এই দূরত্ব দেশে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আকৃষ্ট করল।

বিঠুরের প্রাসাদে নানাসাহেব আলস্য-বিলাসে দিনাতিপাত করেন নি। তিনি ইংরেজের অনুগ্রহের দান নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করেন নি। ইংরেজ দরবারের নিমন্ত্রণ তিনি আদৌ গ্রহণ করতেন না। কেননা, পেশবা হিসেবে তাঁহার যে সম্মান প্রাপ্য, সে সম্মান প্রদর্শন করতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যখন কুণ্ঠিত, তখন তিনিই বা কেন তাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করবেন? প্রখর ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা জ্ঞান। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ

বা বৈরিতা পোষণ করতেন না, নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই লিখেছেন যে, কানপুর থেকে বহু সময়ে বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী সস্ত্রীক বিঠুর দরবারে আসতেন এবং নানাসাহেবের আতিথ্য ও সৌজন্যে তাঁরা প্রীত ও মুগ্ধ হতেন। শিক্ষিত ও শিষ্টাচার-সম্পন্ন নানাসাহেবকে তাঁদের অনেকেই বন্ধু বলে জ্ঞান করতেন। নানার বিঠুর দরবারের জাঁকজমকের খ্যাতি ছিল যেমন, তেমন ছিল তার ব্যক্তিগত চরিত্রের খ্যাতি। গৃহ শিক্ষক টড্ সাহেবের কাছে বহু যত্নে নানা ইংরেজী শিখেছিলেন। তৎকালীন সমস্ত ইংরেজি পত্র-পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন এবং প্রতিদিন দরবারে টড্ সাহেব তাঁকে সেইসব ইংরেজী সংবাদ-পত্র পাঠ করে শোনাতেন। সংবাদ পত্রের সংবাদ অনুসরণ করেই নানাসাহেব ইংলণ্ড ও ভারতের সকলরকম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও ছিল অসাধারণ। ডালহৌসি যখন অযোধ্যা দখল করেন, তখন ঐতিহাসিক চার্লস বল্-এর মতে, নানাসাহেব এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, এর ফলে দেশে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ড থেকে যখন সংবাদ এল, নানাসাহেবের দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতে এই-ই সুবিচার, তখন নানাসাহেবের অন্তর মথিত করে শুধু জাগল একটি কথা—সুবিচার! সুবিচার কি অবিচার তা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সাতারার ব্রাহ্মণ রঙ্গবাপুজীর সঙ্গে বিঠুরের খানসাহেব আজিমুল্লার লণ্ডনের নিভৃত ঘরে বসে কি গোপন পরামর্শ হতো, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয় নি। তবে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আসন্ন বিপ্লবের মানচিত্র এই লণ্ডনে বসেই এঁরা দুজনে নিপুণভাবে এঁকেছিলেন। ব্যর্থকাম রঙ্গবাপুজী ইংলণ্ড থেকে সাতারায় ফিরলেন, কিন্তু আজিমুল্লা তখনই ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন না। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, সেই ইংরেজের সাম্রাজ্যের সীমানা ও কূটনীতির পরিধি তো কেবলমাত্র হিন্দুস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এ-কথা বিশেষভাবেই জানতেন আজিমুল্লা। সেইজন্যই যতদিক থেকে পারা যায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আঘাত দেবার প্রয়োজন ছিল। তাই সকলের অলক্ষ্যে চললো আজিমুল্লার প্রস্তুতি। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দৌত্য নিষ্ফল হলো। কিন্তু আজিমুল্লা নিরুৎসাহ হলেন না। রঙ্গবাপুজীর

মারফৎ তিনি বিঠুরে এই বার্তা প্রেরণ করলেন যে, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁকে এখনো কিছুদিন—হয়ত দু'তিন বছর, ভারতের বাইরেই থাকতে হবে এবং নানাসাহেব যেন তাঁর জন্যে উদ্বিগ্ন না হন। কি সেই অভীষ্ট-তা রঙ্গবাপুজী নিজে তাঁকে জানাবেন। যথাসময়ে বিঠুরে এলেন রঙ্গবাপুজী। নানাসাহেবকে সব কথা খুলে বললেন। এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনার শেষে নানাসাহেব শুধু বললেন—বিপ্লব তা হলে আসন্ন?
—আসন্ন কিন্তু আমাদের পদক্ষেপ হওয়া চাই নির্ভুল ও সতর্ক, বললেন রঙ্গবাপুজী। আগামী দুবছর আমাদের চলবে শুধু সতর্ক প্রস্তুতি। কণ্টকে নৈব কণ্টকম্—ইংরেজের সিপাহী দিয়েই ইংরেজকে আঘাত করতে হবে—এই হোলো আজিমুল্লার অভিমত।
তারপর দুজনে নানার কক্ষের দেওয়ালে বিলম্বিত ছত্রপতি শিবাজীর ছবিখানির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিস্তব্ধ অন্তরেই তাঁরা বিপ্লবের প্রস্তুতি পরিচালনার শপথ গ্রহণ করলেন।

ভারতের আসন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধে য়ুরোপের কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের সহায়তা লাভ সম্ভব তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করবার জন্য আজিমুল্লা য়ুরোপ ভ্রমণে বেরুলেন। প্রথমে তিনি গেলেন তুরস্কের সুলতানের রাজধানীতে। তুরস্কের সুলতান তখন সমগ্র মুসলমান সমাজের খলিফা। তখন রুশ-তুরস্ক সংগ্রাম শেষ হয়নি এবং সিবাস্তপোলের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে, এ-খবর পেলেন আজিমুল্লা। এলেন তিনি রাশিয়াতে। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মিঃ রাসেল তখন রাশিয়াতে। তাঁরই তাঁবুতে আজিমুল্লা রাত্রিবাস করেন এবং পরবর্তীকালে সাত্তান্নর বিপ্লবের সময়ে এই রাসেলই ছিলেন ভারতবর্ষে 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা এবং সেই সময়ে বিপ্লবে আজিমুল্লার সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কিত বহু সংবাদ তিনি তাঁর পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। আজিমুল্লা যখনই খবর পেলেন যে রুশ-সৈন্য ইংরেজ ও ফরাসীর সম্মিলিত আক্রমণ ব্যাহত করে দিয়েছে এবং তাদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছে, তখনই তিনি এই সাংবাদিকের শিবিরে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। তাঁর রাজোচিত বেশভূষা ও অতি মার্জিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে, মিঃ রাসেল তাঁকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দান করতে কুণ্ঠিত

হন নি। তারপর রাশিয়া থেকে মিশর হয়ে আজিমুল্লা যখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বিপ্লবের ধূমায়িত অবস্থা। যথাসময়ে আজিমুল্লা বিঠুরে এসে নানাসাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

দীর্ঘকাল পরে দুইজনে মিলিত হয়ে কুশল প্রশ্নাদির বিনিময় হলো এবং ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, সে-বিষয়ে নানাসাহেব আজিমুল্লাকে ওয়াকিবহাল করলেন। লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবার কিছু আগে থেকেই নানাসাহেব ভারতের সর্বত্র তাঁর গুপ্তচর প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন জনসাধারণকে রাজনীতি-সচেতন করে তুলবার জন্ত। তিনি শুধু গুপ্তচর পাঠিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। দিল্লী থেকে মহীশূর পর্যন্ত সমস্ত দেশীয় রাজদরবারে তাঁর সুদক্ষ ও বিশ্বাসী দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁদের সকলকে একতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আসন্ন বিপ্লবে যোগদান করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক দরবারেই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এইসব চিঠিপত্র পাঠাতেন এবং 'উত্তরাধিকারী নেই—এই ওজুহাতে রাজ্যগ্রাস'—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই নীতির প্রতি তিনি প্রত্যেকের মন আকৃষ্ট করেন। অযোধ্যা, কোল্‌হাপুর, বুন্দেলখণ্ড—সর্বত্রই নানার দূত বিচরণ করত। মহীশূর দরবারে এইরকম একজন নানার দূতকে ইংরেজ একবার গ্রেপ্তার করেছিল। এই ভাবে ভারতের একাধিক রাজ্যের রাজ্যচ্যুত নৃপতিদের ও ভারতের জনসাধারণকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করার যে প্রয়াস তা নানাসাহেবের রাজনৈতিক প্রতিভারই পরিচায়ক। তিনি নিজেও আজিমুল্লার সঙ্গে একাধিক স্থানে গিয়েছিলেন। ডালহৌসির অযোধ্যা-গ্রাস সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নানার গুপ্তচক্র সকলের অলক্ষ্যেই ঘূর্ণিত হয়েছিল। অযোধ্যা অধিকারের পর নানাসাহেব প্রকাশ্যেই তাঁর অভীষ্টসিদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। তারপর চর্বি-টোটার অধ্যায়ে বিপ্লব যখন ধূমায়িতস্তর অতিক্রম করে প্রজ্বলিত অবস্থায় উপনীত হলো, তখনই নানাসাহেব ইংরেজের মহাত্রাস হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। ক্ষিপ্র ও কর্মকুশল নানাসাহেবের রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং সৈন্য-সংগঠন ও পরিচালনার দক্ষতা দেখে ইংরেজকে বিস্মিত, সন্ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হতে হয়েছিল সেদিন।

প্রসঙ্গত সিপাহীযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা দরকার। যে অভ্যুত্থানের ফলে ভারতে বণিক কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটেছিল, সেই

অভ্যুত্থান যে আকস্মিক ছিল না, তা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের পর যে বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল সেই কমিশনের রিপোর্টেও ব্যক্ত হয়েছে যে, সমগ্র সিপাহী যুদ্ধের পেছনে ছিল একটা সুসবদ্ধ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। সিপাহীযুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ম্যালসিন বলেছেন: "১৮৫৭-র অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ইহা চর্বি-টোটার জন্য সংঘটিত হয় নাই এবং ইহা সিপাহীদিগের দ্বারাও পরিকল্পিত হয় নাই। লর্ড ডালহৌসির জবরদস্ত নীতি ভারতব্যাপী যে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল, এই বিদ্রোহের জন্ম সেই অসন্তোষের মধ্যেই এবং অযোধ্যা অধিকারের পর ইহাই চরমে উঠিয়াছিল। বিক্ষুব্ধ ষড়যন্ত্রকারীরা অতি নিপুণভাবে চর্বি-টোটার সুযোগ গ্রহণপূর্বক সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশই ছিল অযোধ্যার লোক। এ ছাড়া, সিপাহীদিগের বেতন, পুরস্কার ও ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট বারবার যে ভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং চুক্তির অমর্যাদা করেন, তাহাও তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

সিপাহী কমিশনের চেয়ারম্যান স্যর ক্রাকফোর্ড উইলসন তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, "সিপাহীযুদ্ধের ঘটনা সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করিলে পরে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে, ইহার পিছনে সিপাহীদের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বিশেষ তারিখে এই বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইবে বলিয়া ঠিক ছিল। এই সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বহুযত্নে সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ঐ নির্ধারিত তারিখটি ছিল ৩১ শে মে, রবিবার, ১৮৫৭। প্রত্যেক দেশীয় পলটনে গোপনে গোপনে এই আসন্ন বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলিয়াছিল।"

বলা বাহুল্য, এই গোপন চক্রান্তের কেন্দ্র ছিল বিঠুর, দিল্লী, লক্ষ্মৌ আর বিহারের জগদীশপুর। অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের প্রধান মন্ত্রী আলি নক্কী খানও বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের সমস্ত দেশীয় পলটনের মধ্যে নানাসাহেব তাঁর চর পাঠিয়ে আসন্ন বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। প্রত্যেক পলটনে তিনজন সিপাহী দ্বারা গঠিত একটি করে কমিটি ছিল এবং সেই কমিটি নানাসাহেবের নির্দেশে কাজ করত।

৩১শে মে, রবিবারের দিনটিকে অভ্যুত্থানের জন্ত ধার্য করা হয়েছিল এই কারণে যে, ঐদিন সমস্ত ইংরেজরা গির্জায় সমবেত হবে এবং তাদের নিধন করা সহজ হবে। প্রত্যেক সেনানিবাসের ধনাগার লুণ্ঠন করা, অস্ত্রাগার হস্তগত করা, জেলখানার কয়েদীদের মুক্ত করে দেওয়া—এইভাবে বিদ্রোহের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এমন কি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা পরিকল্পনাকারীগণ চিন্তা করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশেই এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আবেদন জানান হয়েছিল। পুলিশ-বাহিনীকেও এই বিষয়ে প্রভাবান্বিত করা হয়েছিল। এই প্রস্তুতির প্রথম পর্বে নানাসাহেব দিল্লী, আম্বালা, লক্ষ্নৌ, ঝাঁসি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত কার্যসূচী প্রস্তুত করে এপ্রিল মাসের শেষে বিঠুরে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্রোহের বাণী সেদিন সারা ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এক আশ্চর্য উপায়ে—চাপাটির মারফৎ। কি ভাবে এই চাপাটি বিলি করা হতো তা আগেই বলেছি। এ ছাড়া, মুসলমান সিপাহীদের প্ররোচিত করবার জন্ত বহু মুসলমান ফকিরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এরা ছাউনিতে ছাউনিতে গিয়ে আসন্ন বিপ্লবের কথা, কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হবার কথা কৌশলে প্রচার করে আসত। এত বড় একটা বিদ্রোহের প্রস্তুতির কাজ নানাসাহেব সেদিন এমন নিঃশব্দে ও কৌশলে সম্পন্ন করেছিলেন যে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেন নি। তখনো তিনি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে, শিষ্টাচার প্রদর্শন করে চলেছেন। ইংরেজ তাই কোন দিন বুঝতে পারেনি যে ভারতব্যাপী এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন নানাসাহেব। কানপুরের ঘটনার পর তাঁদের এই ভুল ভেঙেছিল—কিন্তু তখন বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

।ছয়

দিল্লী।

কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী এই দিল্লী।

কোথা থেকে কারা এলো, কাটাকাটি মারামারি পড়ে গেল, পিতাপুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি চলতে লাগলো—একদল চলে যাবার পর আর একদল কোথা থেকে এসে পড়ে, পাঠান মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী ইংরেজ সকলের লোলুপ দৃষ্টি দিল্লীর ওপর। সেই দিল্লী—যেখানে নবাবের বিলাসশালায় দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলে উঠ্‌তো, বাদশাহের সুরাপানের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ চোখের মত দেখা দিত। তারপর নিয়তি-নেমির আবর্তনে দীপালোক নিভে গেল, মোগল-মহিমা দিল্লীর ধূলিতলে মিশে গেল; সুলতান প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মর রচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করলো। ইতিহাসের ঘন অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গায়িত পাণ্ডুরতা, কিংখাব আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা সব কিছু স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। অবশেষে মোগলের সেই চিতাভস্মের ওপর শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে স্থাপিত হলো ইংরেজের সিংহাসন।

বহু সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি সেই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ। নামেই সম্রাট। তাঁর না আছে বাদশাহী মর্যাদা, না আছে সম্রাটের সেইএকচ্ছত্র ক্ষমতা। তখন তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী নামমাত্র বাদশাহ। সাতান্নর বিপ্লবে তাঁর কি ভূমিকা ছিল, তা নির্ধারণ করার আগে, আগের ইতিহাস কিছু জানা দরকার।

সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে শাহ-আলমের মৃত্যু হলো। তাঁর পুত্র আকবর শাহ বসলেন দিল্লীর মসনদে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে। ইতিহাসে ইনিই

দ্বিতীয় আকবর নামে পরিচিত। তখন পলাশি-যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দী মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে। লর্ড ওয়েলেসলি তার এক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখনো পর্যন্ত দৃঢ় হয়ে ওঠেনি—সাম্রাজ্যের সৌধ নির্মাণের কাজ চলছে পূর্ণ উদ্যমে। ফরাসীরা তখনো ভারতবর্ষে প্রবল, হায়দরাবাদে নিজামের দরবারে ফরাসী সৈন্যের আধিপত্য; একাধিক দেশীয় রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে তাদের বিশেষ প্রাধান্য। ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই ফরাসীরা। ওয়েলেসলির শাসনকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখন ভারতে দুইজন ওয়েলেসলি—গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি আর তাঁর ভাই, ওয়াটার্লু-বিজয়ী, জেনারেল ওয়েলেসলি (ইতিহাসে ইনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত)। এই দুজনের যুগ্ম প্রচেষ্টাতেই ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় হয়। মারাঠাশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে ও ভারতে ফরাসীদের রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন উন্মুলিত করে দিয়ে, ওয়েলেসলি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন প্রায় সমগ্র ভারতে ইংরেজের একচ্ছত্র ক্ষমতা স্থাপিত হয়েছে এবং বশ্যতা স্বীকার করেছে অনেকেই। সাম্রাজ্যেরও বিস্তৃতি হয়েছে প্রায় সকল অঞ্চলে। বাকী ছিল শুধু মারাঠা এবং শিখ। তাদেরও পরমায়ু তখন আর বেশী দিন ছিল না। তারপর এলেন লর্ড মিণ্টো এবং তিনিও একাগ্রমনে ওয়েলেসলির রাজ্যবিস্তার নীতিকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হলেন। মিণ্টোর আমলেই অল্পদিনের জন্য আবার এসেছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। প্রকৃতপক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের ভূমিকা এই সময়েই রচিত হয়। কোম্পানীর অপরিসীম লালসা, ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে দুর্নীতিই সিপাহীদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। মাদ্রাজে ভেলোর বিদ্রোহে এই অসন্তোষ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং বিদ্রোহীরা দুইটি ইংরেজ পলটন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতি নির্মমভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহ একেবারে প্রশমিত হয় না। ১৮০৯-এর মসৌলিপত্তনের বিদ্রোহ তার প্রমাণ। এ বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যের সম্মিলিত অভ্যুত্থান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-বিদ্রোহও সার্থক হয় নি। সার্থক না হলেও আগামী বিপ্লবের সূচনা করে যায় নির্ভুল ভাবেই।

শাহ্‌আলম দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন ১৮০৪-এ। তৈমুর বংশের দশম বংশধর তিনি। ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসে তখন ওয়েলেসলির যুগ। ইংরেজরাজত্বের প্রকৃত আদিপর্বের আরম্ভ এইখান থেকেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু পরাক্রান্ত মারাঠার শ্যেন দৃষ্টি তখন দিল্লীর সিংহাসনের ওপর। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় দিলেন শাহ-আলমকে। মোগল-মহিমা তখন অস্তগামী—তারই সুযোগ নিলেন ওয়েলেসলি। রক্ষা করলেন শাহ আলমকে মারাঠাদের উৎপীড়ন থেকে। একদিনের একটি ঘটনা। হতভাগ্য শাহ-আলম তাঁর মনোরম প্রাসাদে একটি জীর্ণ চাঁদোয়ার নীচে বসে আছেন। ম্লান মুখ। দুটি চোখ অন্ধ। নিঃস্বম্বল। কষ্টের অবধি ছিল না। এমন সময় এলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল লেক সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের প্রপৌত্র, মোগল সাম্রাজ্যের আদিপুরুষ তৈমুরের দশম বংশধর শাহআলম তাঁর দরবারে অভ্যর্থনা করলেন ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান সেনাপতিকে। মোগল দরবারের সে জৌলুষ আজ নেই—নেই সেই উজ্জ্বল আলোকিত বাদশাহী জাঁকজমক যা দেখে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন স্যর টমাস রো, বার্নিয়ে ও ট্যাভার্নিয়ে। না থাক—তবু ইংরেজ সেনাপতি শাহআলমকে সম্বোধন করলেন 'ইওর ম্যাজেষ্টি' বলেই। সে সম্ভাষণ আন্তরিক না প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, তা বৃদ্ধ শাহআলমের বুঝবার মত বুদ্ধি ছিল না। ইংরেজ তাঁকে সম্রাটের গৌরবে সম্মানিত করছে এই-ই যথেষ্ট।

১৮০৪-এর ১৩ই জুলাই, লণ্ডনে প্রেরিত ওয়েলেসলির একটি ডেসপ্যাচ এখানে উল্লেখযোগ্য। সেই ডেসপ্যাচে তিনি লিখেছিলেন: "ফরাসী নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্রাট শাহ আলমকে উদ্ধার করার ফলে ভারতে ফরাসীর আধিপত্যের মূলে আঘাত করা হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই তাহাদের বেশী প্রাধান্য ছিল। এখন সেই প্রাধান্য নিঃসন্দেহে বিলুপ্ত হইল এবং ফরাসীরাও আর ভারতবর্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ বাদশাহকে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে আনিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার ফলে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের বিশ্বাস ও প্রশংসা আমরা সহজেই লাভ করিতে পারিয়াছি। ভারতে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারের পথ এখন হইতে সুগম হইবে বলিয়া আমার ধারণা।

এইবার আমরা ধীরে ধীরে দিল্লীতে আমাদের আধিপত্য বিস্তারের কথা বিবেচনা করিব।"

যথাসময়ে ওয়েলেসলি দিল্লী অধিকার করলেন। বৃদ্ধ বাদশাহকে কিন্তু রাজ-সম্ভ্রম থেকে বঞ্চিত করা হলো না। ফরাসী অথবা মারাঠাদের হাতে বন্দী হলে তাঁর কী দুর্দশা হতো, ওয়েলেসলি অতি নিপুণভাবে সেই চিত্র এঁকে দিলেন সম্রাটের চোখের সামনে। সেই দুর্দশা থেকে, সেই সুনিশ্চিত লাঞ্ছনা থেকে ইংরেজ তাঁকে রক্ষা করেছে। শুধু কি তাই? এই দৈন্য দশায় বিশাল বাদশাহী পরিবারের খরচ জোগাবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বছরে সাড়ে তের লক্ষ টাকা করে বৃত্তি পর্যন্ত দিতে স্বীকৃত ও সম্মত হয়েছেন। শুধু কি মাসহারা? লর্ড ওয়েলেসলি কূটনৈতিক ভাষায় অশেষ সৌজন্য প্রকাশ করে এক পত্রে শাহআলমকে লিখে জানালেন: "আপনি পরাক্রান্ত মোগল বংশের বংশধর, ইহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সর্বতোভাবেই স্বীকার করেন। আপনাকে যদিও কোম্পানীর বৃত্তিভোগী করা হইল, তথাপি দিল্লীর যাবতীয় মুসলমান ও হিন্দু প্রজা আপনাকে পূর্বের ন্যায় বাদশাহ বলিয়াই জ্ঞান করিবে এবং আপনার প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাবতীয় বিষয়ে বাদশাহী রীতি-নীতি ও আইন-কানুনই বলবৎ থাকিবে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাতে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না।"

ওয়েলেসলির এই পত্রে বাদশাহ নিশ্চিন্ত হলেন। ফরাসী অথবা মারাঠা নিশ্চয়ই এতখানি উদারতা প্রদর্শন করত না। কিছুদিন পরেই ওয়েলেসলির কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত নতুন প্রস্তাব এলো। দিল্লী ভারতের হৃৎপিণ্ড, এর সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং তা অবহেলা করা চলে না। অতএব তিনি প্রস্তাব করলেন, বাদশাহের পরিবারবর্গকে দিল্লী থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করবার জন্যে কোম্পানীর খরচে দিল্লী-প্রাসাদের অনুরূপ একখানি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। রাজধানী স্থানান্তরিত হবার আশঙ্কায় বৃদ্ধ বাদশাহ কেঁপে উঠলেন। পূর্বপুরুষদের স্মৃতিমণ্ডিত এই দিল্লী ছেড়ে যেতে হবে—এই আশঙ্কায় শাহ আলম ভেঙে পড়লেন, ম্রিয়মাণ হলো প্রাসাদের সকলেই। তিনি ওয়েলেসলির কাছে আবেদন জানালেন। ওয়েলেসলির দয়া হলো। দরিদ্র বাদশাহ সপরিবারে দিল্লীর প্রাসাদে বাস করবার অনুমতি পেলেন।

এই শাহআলমের কাছ থেকেই কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেছিলেন। ত্রিবছর সিংহাসন ভোগ করবার পর শাহ আলমের মৃত্যু হলো।

মোগল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ছেলে আকবর শাহ। আকবর শাহের রাজত্বকালেই হেষ্টিংস এলেন গভর্ণর-জেনারেল হয়ে। তিনি এসে নতুন করে আঘাত হানলেন দিল্লীর অস্তমিত বাদশাহী গৌরবকে। লণ্ডনে ডেসপ্যাচ পাঠালেন এই মর্মে যে, দিল্লীর বাদশাহীর অস্তিত্ব এখন অর্থহীন। সুতরাং ইহার অবলুপ্তিই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বোর্ড অব ডিরেক্টরস লিখে পাঠালেন যে, সহসা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা সমীচীন। অর্থহীন, ক্ষমতাহীন বাদশাহীর প্রতি প্রজাদের এখনো কিছুটা আনুগত্য রয়েছে। অসন্তোষের সৃষ্টি না করে ইতিহাসের হাতেই অবলুপ্তির বাকী কাজটুকু ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সুদীর্ঘ একত্রিশ বছরকাল আকবর শাহ রাজত্ব করলেন। নামে মাত্র বাদশাহী। বণিকের বৃত্তিভোগী বাদশাহীর মূল্যই বা কি? পৈত্রিক নামের দোহাই দিয়ে তিনি লোকের অনুরাগভাজন ও অনুগ্রহের পাত্র হয়ে রইলেন। তিনি আর ভারত সম্রাট বলে স্বীকৃত হলেন না। কেননা, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংকল্প ইংরেজের অধিকৃত রাজ্যাংশ ভিন্ন ভারতের অপর কোন স্থানকেই 'সাম্রাজ্য' নামে অভিহিত করা হবে না। তৈমুরবংশের অধস্তন কোন বংশধরকেই রাজক্ষমতা দেওয়া হবে না। তখনো প্রচলিত ছিল বাদশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা। ১৮৩৫-এ প্রচলিত হলো কোম্পানীর মুদ্রা। প্রাধান্য বিস্তারের প্রতীক হলো মুদ্রা, কাজেই কোম্পানী তাঁদের নিজস্ব মুদ্রা প্রচলিত করে ভারতে তাঁদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করলেন। বাদশাহী মুদ্রা লোপ পাওয়াতে মোগল-প্রাসাদে সকলেই ব্যথিত ও বিচলিত হলেন। কিন্তু কালের পাশায় তখন উল্টো দান পড়তে শুরু হয়েছে। ইতিহাসের গতিপথে তখন মোগলের মহিমা মিলিয়ে যেতে বসেছে। সে-পরিবর্তনের গতি-রোধ করে সাধ্য কার? দিল্লীর প্রাসাদ তখন পাপের বিলাসভূমি হয়ে উঠেছে। মোগল রাজধানী তখন চরিত্রহীনতার পাপকুণ্ডে নিমজ্জিত। প্রাসাদের বিলাসভবনে যারা সর্বদা পাপকার্যের অনুষ্ঠান করত, তারা কেউই আইন মানত না, গ্রাহ্য করত না সাধারণের মতামত। আলস্য ও ব্যভিচারে আকণ্ঠ

নিমজ্জিত মোগল-প্রাসাদ। কাজেই ইতিহাসের দুর্নিবার গতিপথে তার অস্তিত্ব আর ক'দিন?

১৮৩৭-এ বিরাশী বছর বয়সে আকবর শাহের মৃত্যু হলো।

আকবর শাহের ইচ্ছা ছিল তাঁর এক প্রিয়পুত্রকে উত্তরাধিকারী করে যাবেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপে তাঁর সে-কল্পনা সিদ্ধ হয় নি। শাহজাদা আবু জুফর, "আবুল মুজাফার সুরাজউদ্দীন মহম্মদ বাহাদুর শাহ পাৎশাহী গাজী", এই উপাধি নিয়ে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। দীর্ঘ উপাধি কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে তখন নিতান্ত মূল্যহীন। তাই তিনি কেবল বাহাদুর শাহ নামেই পরিচিত। ইতিহাসে ইনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। শান্ত প্রকৃতি, কাব্যপ্রিয় বাহাদুর শাহ রাজ্যসংক্রান্ত চিন্তা থেকে বিরত ছিলেন। কেবল একটি বিষয়ে তাঁর আকাংখা ছিল। বৃত্তি। কোম্পানী থেকে বাদশাহের জন্য যে বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছে তা যথেষ্ট নয়—এই প্রশ্ন প্রথম তুলেছিলেন আকবর শাহ। এবং ইংলণ্ডে কোম্পানীর দরবারে তিনি এই সম্পর্কে সরাসরিভাবে একটি আবেদনও করেছিলেন। বাদশাহের পক্ষ থেকে বিলাতের পার্লামেণ্টে তাঁর দাবী উত্থাপন করতে পারেন এমন যোগ্য লোক হিন্দুস্থানে কোথায়? আকবর শাহের দৃষ্টি পড়ল এক বাঙালি ব্রাহ্মণের ওপর। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, সেই সর্বজনবরেণ্য বাঙালি হলেন রামমোহন রায়। বাদশাহ তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রামমোহনকে নিজের প্রতিনিধি করলেন এবং মহাসম্মানে মহাসমারোহে 'রাজা' উপাধি দান করলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল বাদশাহের সেই উপাধিদান নামে মাত্র অনুমোদন করলেন। কেননা, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কোনদিনই রামমোহন রায়কে 'রাজা' বলে স্বীকার করেনি; কিন্তু সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম-সংস্কারক উদারচেতা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহনকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগ্য সম্মান প্রদানে কুণ্ঠিত ছিলেন না। মোগলের দূত হয়ে রামমোহন রায় গেলেন ইংলণ্ডে। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর দৌত্য নিষ্ফল হয়। বাহাদুর শাহ এসব কথা জানতেন এবং তাঁর পিতার আমলে যে-বৃত্তি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নির্ধারিত করেছিলেন, তাঁর আমলেও বাদশাহী বৃত্তির পরিমাণ ঠিক তাই আছে। তিনি আর একবার ইংলণ্ডের দরবারে এ বিষয়ে চেষ্টা করলেন এবং এবার

[illegible] দরবার থেকে [illegible] নিয়োগ করলেন। [illegible] [illegible] লর্ড টমসনকে। বলা বাহুল্য, এ দৌত্যও নিষ্ফল হলো। বৃটিশ গভর্নমেন্ট দিল্লীর নামে-মাত্র বাদশাহকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, তাঁকে মাসে মাসে লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া, ভূমির রাজস্ব ও বাড়িভাড়া বাবদ তিনি হাজার হাজার টাকা উপায় করে থাকেন, সুতরাং তিনি যেন আর অতিরিক্ত দাবী না করেন। ইতিপূর্বে দিল্লীর বাদশাহের আরো একটি আয় ছিল। যে সব ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দিল্লীতে আসতেন তাঁরা বাদশাহদের নজর সেলামী প্রদান করতেন এবং গভর্ণর-জেনারেল ও প্রধান সেনাপতিরাও নজর দিয়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এ প্রথা অনেক দিনের। লর্ড এলেনবরার আমলে এই প্রথার অবসান হলো। এর ফলে বাদশাহী মর্যাদার অনেকখানি লাঘব হয়।

বাহাদুর শাহ বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর সেই তরুণী বেগমের নাম জিন্নৎমহল। জিন্নতের গর্ভে একটি পুত্র জন্মায়। নাম—জোয়ান বখত্। ছেলেটি রাজার বড় প্রিয়পাত্র। বাদশাহের উপর অসীম প্রভাব জিন্নতের। তাই বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চিত করে নিজের গর্ভজাত পুত্রকে বাদশাহী দেবার জন্যে তিনি স্বামীকে পরামর্শ দেন। প্রিয়তমা বেগমের বাসনা চরিতার্থ করতে সম্রাট সম্মত হলেন। সকলেই জানল যে জোয়ান বখতই মসনদে বসবেন। ১৮৪৯-এ সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র, শাহাজাদা দারা বখত্ মারা গেলেন। প্রাসাদে তখন চলেছে জটিল চক্রান্ত—সেই চক্রান্তের কেন্দ্রে জিন্নৎ আর সেই চক্রান্তের লক্ষ্য মোগল সিংহাসন। যুবরাজ দারা বখতের মৃত্যুতে বাদশাহকে মৌখিক সান্ত্বনা দিলেন বেগম। দারা বখতের মৃত্যু হলো, জিন্নৎ মনে করলেন পথের কণ্টক দূর হলো। বাদশাহের বয়স তখন সত্তর বছর হয়েছে, তিনি আর ক'দিন? কাজেই উত্তরাধিকারী প্রশ্নটির মীমাংসা তাঁর জীবিতকালেই হয়ে থাকা দরকার, ভাবলেন জিন্নৎ। তা নইলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে গোলযোগ ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। লর্ড ডালহৌসি তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। ভারতের মাটিতে ইংরেজের সাম্রাজ্য-সৌধ গড়ে তোলার সাধনায় তিনি ব্রতী। মোগলবংশের শূন্যগর্ভ রাজক্ষমতার পোষকতার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করবেন, ডালহৌসি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কোম্পানীর দরবারে দিল্লীর
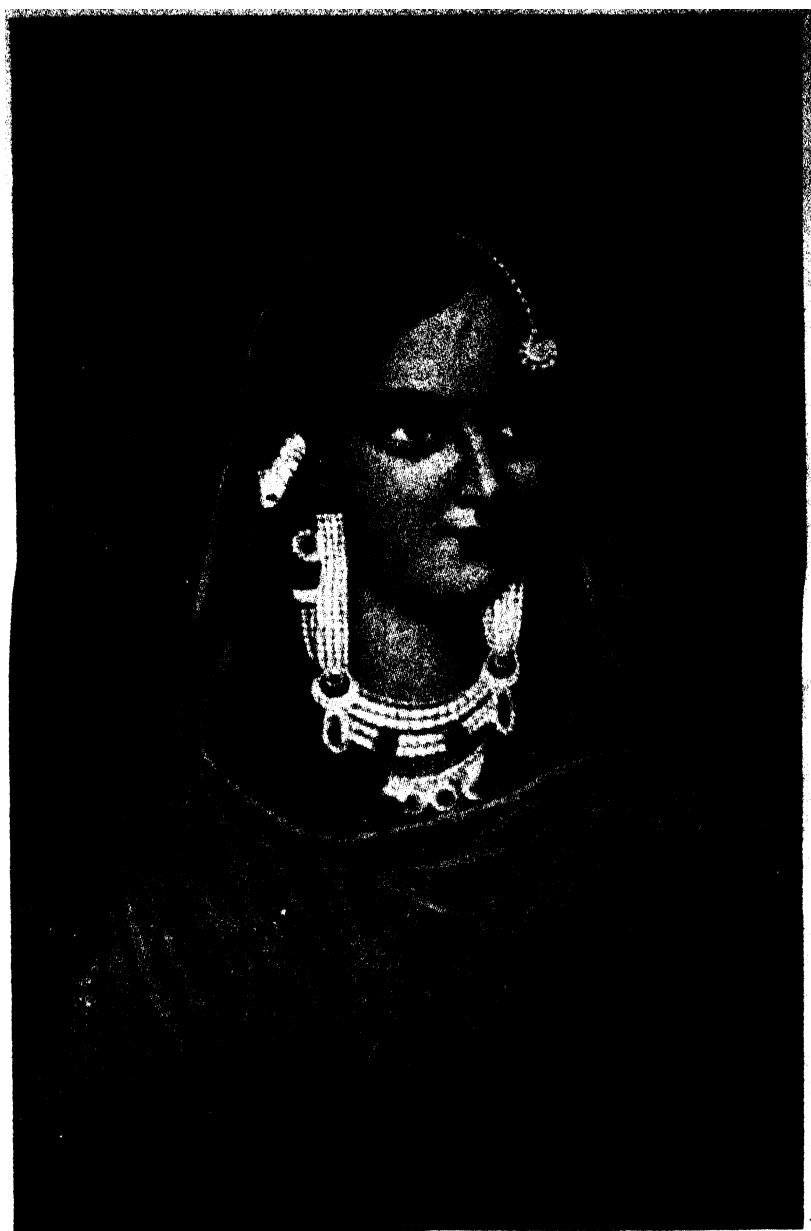
বেগম জিন্নৎ মহল

সম্রাটের উত্তরাধিকারীর প্রশ্নটা যখন নতুন করে উঠল, তখন ডালহৌসি সে-সুযোগ অবহেলা করলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পর মুসলমান আইন অনুসারে দ্বিতীয় পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হয়। শাহজাদা ফকিরুদ্দীন বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। বয়স ত্রিশ বছর। ইংরেজের খুবই অনুগত। উত্তরাধিকারত্ব এখন তারই প্রাপ্য। ফকিরুদ্দীনের চরিত্র ও ব্যবহারে প্রীত ডালহৌসি ভাবলেন, এইরকম একটি হাতের পুতুলকে দিল্লীর সিংহাসনে বসালে তাঁর অভিপ্রেত পরিবর্তন সহজেই সুসিদ্ধ হতে পারবে। অভিপ্রেত পরিবর্তন সম্পর্কে ডালহৌসি তাঁর ডেসপ্যাচে লিখলেন, "বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে দিল্লীর বাদশাহীর উপাধি মর্যাদা একেবারে বিলোপ করার জন্য আমি কোম্পানীর নিকটে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি। আমার পূর্ববর্তী গভর্ণর-জেনারেলেরা যে কেন এবং কিজন্য দিল্লীর প্রাচীন রাজবংশের প্রচলিত প্রথা বজায় রাখিতে যত্নবান ছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় কোম্পানীর বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচারের জন্য দুটি সভা ছিল; কোর্ট অব ডিরেক্টর এবং বোর্ড অব কণ্ট্রোল। ডালহৌসির প্রস্তাবে ডিরেক্টর সভা যে মত প্রকাশ করলেন, বোর্ড তার প্রতিবাদী হলেন। কাজেই উত্তরাধিকারীর প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল। তারপর দিল্লীর নিরাপত্তার প্রশ্নটির প্রতি প্রধান সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার যখন গভর্ণর-জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন লর্ড ডালহৌসি মোগল-মর্যাদাকে আরো একটু নীচে নামিয়ে দিতে অগ্রসর হলেন। দিল্লীতে তখন ইউরোপীয় সৈন্য বেশী ছিল না। বারুদখানাও নিরাপদ স্থানে অবস্থিত নয়। নগরের প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হওয়ায় এর বিপদাশঙ্কা বেশী। যদি দৈবাৎ আগুন লাগে, দিল্লীর রমণীয় রাজপ্রাসাদ পুড়ে যাবে, অপরিমিত সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হবে। নগরীর ফটকগুলি অরক্ষিত। পুরাতন দুর্গে বারুদখানা স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়। নগরের কাছেই একটা আলাদা বারুদখানা তৈরি করা প্রয়োজন। দিল্লী সহর নিরাপদ নয়—ডালহৌসিও একথা জানতেন। প্রধান সেনাপতির প্রস্তাবকে ভিত্তি করে, তিনি রাজা ও রাজ-পরিবারদের দিল্লীর প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করতে চাইলেন এবং প্রাসাদের মধ্যেই অস্ত্রভাণ্ডার ও বারুদখানা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিলাতের

ডিরেক্টর সভায় ডালহৌসি তাঁর অভিলাষ জানিয়ে লিখলেন : "খেতাবী রাজার মরা-বাঁচা সমান কথা। নগরের বার মাইল দূরে কুতুবমিনার। পূর্ব-পূর্ব সম্রাটেরা প্রায়ই সেখানে যাওয়া-আসা করিতেন, বংশের কয়েকটি সমাধিও সেখানে আছে। সপরিবার সানুচর বাহাদুর শাহকে সেইখানে যাইতে বলা হউক। আপত্তি করিলে মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে।" ইংলণ্ডের দরবারে ডালহৌসির এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হলো না। বোর্ড এই যুক্তি দেখালেন যে, গভর্ণর-জেনারেলের প্রস্তাবমতে কাজ করলে, দিল্লীর মুসলমান প্রজারা নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, ভবিষ্যতে দারুণ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

দারা বখ্‌তের মৃত্যুর সাত বছর পরে একদিন রাত্রে শাহজাদা ফকিরুদ্দীন হঠাৎ মারা গেলেন। কেউ তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে, প্রাসাদের লোকের এই বিশ্বাস হলো। সে-রাত্রে মোগল-অন্তঃপুরে বিলাপধ্বনি উঠল। বাহাদুর শাহ সংবাদ পেলেন, শাহজাদা মারা গেছেন। বেগম জিন্নতমহল পূর্বের মতই মৌখিক সান্ত্বনা দেখাতে ক্রটী করলেন না। সেই রাত্রে প্রাসাদে জিন্নতের মহলে আবার চললো চক্রান্ত। উত্তরাধিকারীর বিষয়টি আর উপেক্ষা করা চলে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে দিল্লীর প্রতিনিধি তখন স্যার টমাস মেটকাফ। পরের দিনই বাহাদুর শাহ মেটকাফকে একাকী দরবারে আহ্বান করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বেগম জিন্নৎমহলের পুত্র মীর্জা জোয়ান-বখত্‌কে যাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে কোম্পানী স্বীকার করে নেন, সেই মর্মে লিখিত একটি অনুরোধ-পত্র তিনি ইংরেজ প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করলেন। সেই সঙ্গে বাহাদুর শাহ আরো একখানা দলিল মেটকাফের হাতে তুলে দিলেন। সেই দলিলে তাঁর অন্যান্য পুত্রেরা দস্তখত মোহর করেছেন, জিন্নৎমহলের পুত্রকেই উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করা হোক। রাজকুমারদের মধ্যে আটজন এতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর দেননি শুধু মহম্মদ মীর্জা কোরেশ—বাদশাহের জীবিত পুত্রদের মধ্যে তিনিই তখন জ্যেষ্ঠ। তিনি স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উত্তরাধিকারত্বের দাবী জানিয়ে কোম্পানীর দরবারে আবেদন করেন। সেই আবেদনে মহম্মদ মীর্জা কোরেশ লিখলেন, "আমার পিতা তাঁহার প্রিয়তমা বেগম জিন্নৎমহলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া আমাকে

সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন। প্রাসাদে বেগম সাহেবা দিবারাত্র এই বিষয়েই চক্রান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার উদ্ধত ও দুর্বিনীত পুত্র মীর্জা জোয়ান বখত্ শুধু বিলাসী নহে, শিষ্টাচার-বর্জিত। এই প্রকারে আমার ন্যায্য প্রাপ্য বঞ্চিত হইয়া আমার পক্ষে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। জন্মের সঙ্গেই আমি যে অধিকার লাভ করিয়াছি, সেই অধিকার হইতে আমি অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি। বাদশাহের জীবিত পুত্রদের মধ্যে আমিই এখন জ্যেষ্ঠ। সুতরাং আমার বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠাইবেন। আমি একবার মক্কাতীর্থ করিয়াছি, এবং সমগ্র কোরান আমার কণ্ঠস্থ।"

অতঃপর ডালহৌসি এ-বিষয়ে আর অগ্রসর হলেন না। পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলের বিবেচনার জন্য বিষয়টি অমীমাংসিত রেখেই তিনি অবসর গ্রহণ করলেন।

এই পটভূমিকায় এলেন লর্ড ক্যানিং।

নতুন গভর্ণর-জেনারেলের নতুন কাউন্সিলে দিল্লীর উত্তরাধিকার প্রশ্নটি সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনা হলো।

ডালহৌসির ছিন্নসূত্র অবলম্বন করেই ক্যানিং এ-বিষয়ে অগ্রসর হলেন। সমুদয় বিষয়টি তিনি আনুপূর্বিক আলাপ-আলোচনা করলেন এবং বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর রাজপরিবারকে স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সতীর্থের সিদ্ধান্তই অনুমোদন করলেন। অধিকন্তু দিল্লী শহর সাক্ষাৎভাবে গভর্ণমেণ্টের অধীনে আনা এবং শাসনকার্যের সুব্যবস্থা করা, তিনি জরুরী বিবেচনা করলেন। বিলাতে ডিরেক্টর সভায় ক্যানিং দিল্লী সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপি প্রেরণ করেন তাতে তিনি লিখলেন: "যদিও আমি অল্পদিন মাত্র ভারতের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমার বিশ্বাস তৈমুর-বংশের ঐতিহ্য ভারতের জনসাধারণের মন হইতে একেবারে মুছিয়া না গেলেও, ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং সম্রাটের প্রতি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। দিল্লীর বিশেষ রাজক্ষমতা এখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত। এখন বাহাদুর শাহকে উপাধিচ্যুত করিতে পারিলেই অভীষ্ট কার্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। নজরানা প্রথা রহিত করা হইয়াছে। বাদশাহী মুদ্রার পরিবর্তে কোম্পানীর মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। একণে দিল্লীর নিরাপত্তাই আমাদের

প্রধান বিবেচনার বিষয়। মোগল-প্রাসাদ অস্ত্রাগারে পরিণত হইলে এই নিরাপত্তা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। কুতব মিনার বা অন্য কোথাও বাদশাহ *থাকিতে পারেন।"*

আর দিল্লীর বাদশাহের পত্রের উত্তরে লর্ড ক্যানিং দিল্লীর এজেন্টকে লিখলেন :

"জোয়ান বখ্‌তের উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে গভর্ণর-জেনারেল সম্মতি দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ফকিরউদ্দীনকে যে যে সর্তে উত্তরাধিকার প্রদানের কথা হইয়াছিল, মির্জা মহম্মদ কোরেশ সেরূপ ক্ষমতা পাইবার আশা যেন না করেন। দিল্লীর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বাহাদুর শাহের জীবনকালের মধ্যে তাঁহাকে অথবা রাজবংশের কাহাকেও সরকারী ভাবে আর কোন পত্রাদি লেখা হইবে না। তৃতীয়তঃ, মির্জা মহম্মদ কোরেশকে জানাইবেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে রাজপরিবারের কর্তা বলিয়া স্বীকার করা হইবে, কিন্তু 'রাজা' উপাধি তিনি পাইবেন না। তাঁহার উপাধি হইবে শাহজাদা। চতুর্থতঃ, অতঃপর যিনি রাজার উত্তরাধিকারী হইবেন, রাজপরিবারের নির্দিষ্ট বৃত্তি হইতে তাঁহাকে মাসিক দেড় হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হইবে এবং ভবিষ্য রাজার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের ব্যয়ভার সরকার আর বহন করিবেন না।"

মোগল বাদশাহের এই শেষ পরিণতিতে দিল্লীর জনসাধারণ সেদিন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৭ যতই আসন্ন হতে লাগল, দিল্লীর প্রাসাদে চক্রান্ত ও চাঞ্চল্য ততই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন এখন নয়। বাতাসে এখন একটি নতুন কথা—এবার একটা কিছু ঘটবে। প্রাসাদের প্রত্যেকের মুখে মুখে একই কথা—শীঘ্রই একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবে। ইংরেজের পরাক্রম খর্ব হয়ে আসবে। এই চিন্তাভাবনার মূলে ছিল পারস্যের যুদ্ধ। ঐতিহাসিক স্যর জন উইলিয়ম কেয়ি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "নববর্ষের (১৮৫৭) আরম্ভ হইতেই দিল্লীর মুসলমানদিগের নির্ভীকতা ও উন্মত্ততা বাড়িতে থাকে। দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল, শীঘ্রই এমন একটা কিছু ঘটনা ঘটিবে, যাহা বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা করিবে। সেইসঙ্গে পারস্য-যুদ্ধের অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ হইতে লাগিল। একবার প্রকাশ হইল পারস্য সৈন্যবাহিনী আটক সহর পর্যন্ত আসিয়াছে; আবার

একদিন প্রকাশ পাইল, সেইসব সৈন্য রুশপতি বোলান পাস অতিক্রম করিয়াছে। আর একদিন বলা হইল, পারস্যের শাহ পাঁচ পুরুষ ধরিয়া ভারত-বিজয়ের সংকল্প করিয়া আসিতেছেন, এতদিন পরে সেই সংকল্প সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রুশ গভর্ণমেণ্ট পারস্যের শাহের সামরিক সাহায্যের জন্য পাঁচ লক্ষ সৈন্য ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়াছেন। ফরাসী এবং তুরস্ক গভর্ণমেণ্টও অনুরূপভাবে সাহায্য করিলেন। এ সব সংবাদই বিশেষ প্রামাণিক সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া দেশীয় সংবাদপত্রগুলির দাবী। ফ্রান্সের সম্রাট, তুরস্কের সুলতান, যুদ্ধে পারস্যের সহায়তা করিবেন। অন্যান্য খবরের কাগজে আবার এমন সংবাদও বাহির হইল যে, কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ যদিও কপট মৈত্রীর ছলনায় ইংরেজের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্র লইতেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইংরেজের উপর তাঁহার রাগ; সেই রাগ মিটাইবার জন্য তিনিও পারস্যের সহিত যোগদান করিবেন। দিল্লীর বাজারে, দোকানে, সৈনিক শিবিরে এবং প্রাসাদের দরবারে ও বাহির মহলে—সর্বত্র এই ধরণের গল্প প্রচারিত হওয়ার ফলে সকলের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছে, শতবর্ষের অধিককাল ভারতে ইংরাজের প্রভুত্ব থাকিবে না, এইরূপ যে ভবিষ্যবাণী আছে, তাহা এইবার সিদ্ধ হইবে।"

এই প্রসঙ্গে জেমস আউট্রাম লিখেছেন—"ভারতে ও ইংলণ্ডে এই গল্পের আন্দোলন সমভাবে চলিয়াছিল।" উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরকে এই সময়ে লিখিত একজন দেশীয় সংবাদদাতার পত্র হইতে জানা যায় যে, "বাহাদুর শাহ এখন পারস্যের শাহের সহিত পত্রদ্বারা কুমন্ত্রণায় নিযুক্ত। রাজপ্রাসাদে, বিশেষত বাদশাহের খাস কামরায় দিবারাত্রি এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। মোগল-বংশের পুরুষানুক্রমে কুল-পুরোহিত, হোসেন আস্‌কারী ঐ কুমন্ত্রণার প্রধান উত্তরসাধক। রাজাকে তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছিলেন, পারস্যের শাহ দিল্লীশ্বর হইবেন, সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিবেন এবং তিনি সদয় হইয়া বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে রাজমুকুট পরাইয়া রাজ্যাভিষেক করিবেন, আর পূর্বের ন্যায় সমস্ত রাজক্ষমতা তাঁহার হস্তে দিবেন। প্রাসাদে এই উপলক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা ও মঙ্গলাচরণের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল।"

দিল্লীর প্রাসাদে ও বিপণিতে, সৈনিকশিবিরে ও আমীর-ওমরাহদের ঘরে, এই সব উন্মাদ জল্পনা-কল্পনা যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তখন এলো মিরাট বিদ্রোহের খবর। প্রাসাদের প্রহরীদের সঙ্গে চললো কোম্পানীর সিপাহীদের গুপ্ত পরামর্শ। দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল প্রবল উত্তেজনা। উত্তেজনার সেই বারুদস্তূপের ওপর বসে থেকেও প্রাসাদে বাহাদুর শাহ নীরব ছিলেন। লোকেরা তাঁর নাম নিয়ে কি করছে আর কি না করছে, সে-বিষয়ে তাঁর ভ্রুক্ষেপই ছিল না। কবিতা, সুরা আর তরুণী স্ত্রী—বৃদ্ধ বয়সে কোম্পানীর বৃত্তিভোগী সম্রাটের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। চারদিকের উত্তেজক এই জনশ্রুতি বাদশাহ কতদূর বিশ্বাস করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না, তবে সেই সময়ে প্রতিদিন অস্তগামী সূর্যের আরক্তিম আভায় উদ্ভাসিত যমুনার নিস্তরঙ্গ জলে আসন্ন বিপ্লবের যে ছায়াপাত হতো দিল্লীর জনরবে তারই পূর্বাভাষ ছিল না কি? ইতিহাসের গতিপথেও সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে এবার একটা কিছু ঘটবে।

॥ সাত ॥

অবশেষে একদিন তাই ঘটল

মিরাটের আকাশে উঠল বিপ্লবের রক্তসূর্য।

সেদিন ছিল ১০ই মে, রবিবার।

পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে যে-অভ্যুত্থান সংঘটিত হবার কথা ৩১শে মে, সেই অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে দিল মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহীদলের পঁচাশীজন সিপাহীর কঠোর কারাদণ্ড। ক্যান্টনমেণ্টের কর্তৃপক্ষের এই নির্মম বিচার অলক্ষ্যে অন্যান্য সিপাহীদের প্রতিহিংসায় উন্মত্ত করে তুললো।

সকালবেলায় অফিসারদের বাংলোয় কোনো দেশীয় ভৃত্যের টিকি দেখা গেল না। কেউই কাজে আসেনি। ব্যাপার কি? এমন তো কখনো হয় না—মেমসাহেবরা বলাবলি করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। শনিবারের ব্যাপারটি কি তবে সেখানেই শেষ হয় নি? জেনারেল হিউয়েট বিদ্রোহী সিপাহীদের এত কঠিন দণ্ডদানের পক্ষে ছিলেন না। সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যেই তিনি কোর্ট-মার্শালের বিচার সমর্থন করেন। কোম্পানীর তিনি একজন পুরানো ও অভিজ্ঞ কর্মচারী। অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং আলস্যপ্রিয় লোক। সত্তর বৎসরের ভোগে স্থূলাঙ্গ। কার্যকালে কোনরকম দক্ষতাই তিনি দেখাতে পারতেন না। তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সেনাপতি কারমাইকেল স্মিথ ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। বিদ্বান, বুদ্ধিমান কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতির। সেনাদলে আদৌ জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তবে অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। চারদিকের ঘটনা থেকে বহুপূর্বেই তিনি আসন্ন বিপ্লবের আভাস সঠিক বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি প্রধান সেনাপতিকে এ-বিষয়ে পূর্বাহ্নেই সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সিপাহীদের উগ্রভাবের প্রশমন করাই ছিল

তাঁর চব্বিশে এপ্রিলের প্যারেডের উদ্দেশ্য। হিতে বিপরীত হবে, এটা স্মিথ অনুমান করতে পারেন নি। এমন কি, ৯ই মে-র ব্যাপারের পরও তিনি ক্যান্টনমেন্টে কোনো রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

পরের দিন রবিবার সকালে ভৃত্যদের অনুপস্থিতি ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। উদ্বিগ্নচিত্তে জেনারেল হিউয়েট কর্নেল স্মিথকে বললেন, প্যারেড করান অত্যন্ত ভুল হয়েছে। এখানে তো কোনো গোলমাল ছিল না। তুমি যদি আর এক মাস চুপ করে থাকতে, তাহলে সমস্ত গোল চুকে যেত।

কর্নেল স্মিথ। আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। সরকারী আদেশপত্রে নতুন করে বলা হয়েছে দাঁত দিয়ে টোটা কাটতে হবে না। ভাবলাম এই সংবাদে সিপাহীদের অসন্তোষ দূর হবে। আম্বালা, মুসৌরী, হরিদ্বার সর্বত্র ঘুরে আমি দেখেছি সিপাহীদের মধ্যে কী দারুণ অসন্তোষ।

জেনারেল হিউয়েট। কিন্তু আমার এখানে কি কোনো অসন্তোষ ছিল?

কর্নেল স্মিথ। ছিল না বলা যায় না। কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

শনিবার। ৯ই মে।

কোর্ট-মার্শালের বিচারে বিদ্রোহী সিপাহীদের যখন দণ্ড দেওয়া হয়, ক্যাণ্টনমেণ্টের অন্যান্য সিপাহীরা তার নীরব দর্শক ছিল। তারপর সেই দণ্ডিত পঁচাশীজন সিপাহীকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা হলো। তাদের ইউনিফর্ম ও শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়ে এবং সামান্য চোর-ডাকাতের মতো তাদের হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী পড়িয়ে দেওয়া হলো। তখনও তারা নীরব দর্শক ছিল। দণ্ডিত সিপাহীরা যখন তাদের সহকর্মিদের ধিক্কার দিয়ে বলল—"তোমরা আমাদের এই অপমান স্বচক্ষে দেখছ," তখনও তারা নিরব দর্শক ছিল। কিন্তু তাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যেত, তাদের ভেতরে কী নিদারুণ ক্রোধাগ্নিই না তখন জ্বলে উঠেছে। এমন কি, প্রতিবাদের কঠিন ভাষা অনেকের জিহ্বাগ্রে এসেছিল। কিন্তু উপায় নেই। সামনেই গোলাভরা কামান, গুলিভরা বন্দুক, শাণিত বেয়নেট নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সৈন্য।

দণ্ডিত বিদ্রোহীরা কারাগারে গেল।

পেছনে রেখে গেল ধিক্কার-বাণী আর বিদ্রোহের উত্তেজনা।

সিপাহীরা ফিরে গেল ব্যারাকে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে। সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে কি আলোচনা হলো, কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল স্মিথ বা মিরাট বিভাগের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হিউয়েট কেউই তা অনুমান করতে পারলেন না। বাকী দিনটা নিরুপদ্রবে গেল।

মিরাটের ওপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল।

শনিবারের সন্ধ্যা—য়ুরোপীয় নর-নারীর আনন্দ-উজ্জ্বল ও কলরব-মুখরিত সন্ধ্যা। ক্যাণ্টনমেণ্টে শনিবারের সন্ধ্যার জৌলুষ বেশী।

কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় আলোচনার বিষয় ছিল একটি—কি হবে?

মিরাটের কমিশনারের বাড়িতে সেদিন ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন কর্ণেল স্মিথ। সস্ত্রীক কমিশনার ও কর্ণেল বসে আছেন ডিনার টেবিলে। ভোজনপর্বের পর শুরু হয়েছে পান-পর্ব। গেলাসে হুইস্কি ঢালা হয়েছে। এমন সময়ে জনরব এলো, শহরের প্রাচীরে প্রাচীরে মুসলমানদের ঘোষণাপত্র দেখা দিয়েছে। সেই ঘোষণাপত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে। মিরাটের বাজারে এই নিয়ে চলেছে তুমুল আলোচনা। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না।

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হলো। নিস্তব্ধ হয়ে আসে সারা ক্যাণ্টনমেণ্ট।

নিশ্চিন্তমনে সবাই বাড়ি ফিরে গিয়ে সুখশয্যায় শয়ন করল।

জেলের মধ্যে জেগে রইল শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ হতভাগ্য এবং দণ্ডিত সেই পঁচাশীজন বিদ্রোহী। তাদের শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে ভেঙে যায় রাত্রির নিস্তব্ধতা আর বেজে ওঠে বিদ্রোহের বন্দনা-গান।

দু'মাইল দূর থেকে নৈশ বায়ুতরঙ্গে ভেসে আসে তারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ব্যারাকের সিপাহীদের কানে। সেই প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তোলে তাদের মনের মধ্যে আগ্নেয় উত্তেজনা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট ছিল ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো সেনানিবাস এবং গোলন্দাজ-বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার। তার আগে দমদম ছিল গোলন্দাজ-বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র। সেনানিবাসের পরিধি পাঁচ মাইল। মাঝখানে প্রশস্ত ময়দান। ময়দানের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে একটা নালা। নালার একদিকে য়ুরোপীয় সেনানিবাস, অন্যদিকে দেশীয়

সেনানিবাস। উত্তর দিকে ইংরেজ-সৈন্যের ব্যারাক, দক্ষিণে গোলন্দাজ সৈন্যের ব্যারাক, বাঁদিকে ড্রাগন ব্যারাক এবং মাঝখানে রাইফেল ব্যারাক। ড্রাগন ও রাইফেল ব্যারাকের মাঝখানে ক্যাণ্টনমেণ্টের গির্জা। আরো উত্তর দিকে প্যারেড গ্রাউণ্ড। ইংরেজ সৈন্য ও দেশীয় সৈন্যদের মাঝখানে সারিসারি দোকান ঘর ও বাসগৃহ। চারদিকে সুন্দর একটি বাগান। বাগানে অজস্র গাছপালা। সেনানিবাসের দক্ষিণ দিকে মিরাট শহর। উত্তর দিকে য়ুরোপীয় পল্টনের ও গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসারদের সুন্দর সুন্দর বাংলো। সিপাহী পল্টনের অফিসারদের বাংলো তাদের ব্যারাকের কাছেই। সেনানিবাসের সর্বশেষ প্রান্তে থাকেন জেনারেল হিউয়েট।

শনিবার রাত্রেও এই মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে আসন্ন বিপদের কোনো লক্ষণ দেখা দেয় নি।

রবিবারের সকালেও বিপদের কোনো সঙ্কেত দেখা গেল না।

মে মাসের প্রখর সূর্য মিরাটের আকাশে। গির্জায় উপাসনা করতে যাবার জন্যে ইংরেজ নর-নারী সব প্রস্তুত। নির্বিঘ্নে উপাসনা শেষ হলো। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো—কোনো দিকে কোনো বিপদের লক্ষণ নেই। সৈনিকের বৃত্তি ছাড়াও কর্নেল স্মিথের আরো একটি পেশা ছিল। তিনি নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে লিখতেন। সেদিন রবিবার দ্বিপ্রহরে তাঁর বাংলোয় বসে তিনি 'দিল্লী গেজেট'-এর জন্য লিখছিলেন: "মিরাট শান্ত। বিদ্রোহীদের শাস্তি দিবার পর মনে হইতেছে এখানে আর কোনো উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু মিরাট সেদিন—সেই ১০ই মে রবিবার—শান্ত ছিল না।

ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে শহর—সমগ্র মিরাট সেদিন যেন সকলের অলক্ষ্যে একটা আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছিল। মিরাটের মাটির তলায় তখন যে ফাটল ধরেছে এবং সেই ফাটলের পথ দিয়ে দুর্বার বেগে বিপ্লবের অগ্নিস্রোত যে ওপরের দিকে উৎসারিত হতে চলেছে, তা কর্নেল স্মিথ বা জেনারেল হিউয়েট কিম্বা অন্য কোনো ইংরেজ অফিসার বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি যে, এই মিরাট থেকেই সাতান্নর বিপ্লবের তূর্যধ্বনি বেজে উঠবার উপক্রম হয়েছে। অগ্ন্যুৎগার হলো বলে। বেলা যতই শেষ হয়ে আসে, ততই নতুন করে আশঙ্কার কারণ দেখা দিতে থাকে। সিপাহীদের ব্যারাকে, মিরাটের জনাকীর্ণ বাজারে এবং চারদিকের গ্রামগুলিতে মহাগণ্ডগোল।

রবিবারের সারাদিন ব্যারাকের সিপাহীদের মধ্যে আসন্ন বিদ্রোহ সম্পর্কে সকলের অলক্ষ্যে যে কর্মতৎপরতা দেখা গেল, তার কোন আভাসই ক্যান্টনমেণ্টের কর্তৃপক্ষেরা বুঝতে পারলেন না—বুঝতে পারলেন না তাদের মধ্যে গোপনে গোপনে উত্তেজনাপূর্ণ কী আলোচনা চলেছে। কিন্তু মিরাটের আকাশে বাতাসে তখন ঝড়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ছেলেমেয়েরাও বুঝতে পেরেছে, কী একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে। মিরাট শহর তখন উদ্বেলিত—দূরের গ্রাম থেকেও বহু লোক এসে জমা হয়েছে বাজারে। সিপাহীদের মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছিল যে, হয়ত ইংরেজ-সৈন্যরা তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেবে কিম্বা তাদেরও অবিলম্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে। ইংরেজ সেনাদের মনে ঠিক সেই একই দুশ্চিন্তা—সিপাহীরা এবার প্রতিশোধ নেবে, ইংরেজদের প্রতি তাদের আক্রোশ অস্ত্রের মুখে দেখা দেবে। দুই পক্ষের এইরকম আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে এলো রবিবারের সন্ধ্যা। ভয়াবহ সেই সন্ধ্যা।

সূর্য ডুবে গেল। সান্ধ্য-উপাসনার সময় সমাগত। গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হলো। পাদ্রীরা প্রস্তুত হলেন। পাদ্রী নর্টন সস্ত্রীক গির্জায় যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময়ে তাঁদের হিন্দুস্থানী পরিচারিকা বাধা দিয়ে বলল, আজ আর গির্জায় যাবেন না। ভয়ানক বিপদ।

—কী বিপদ? জিজ্ঞাসা করলেন উদ্বিগ্ন পাদ্রী-গৃহিণী।

—সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। ঘরেই থাকুন।

—তুমি বুঝি বাজারের গুজব শুনেছ? বললেন পাদ্রী নর্টন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি গাড়িতে উঠলেন। পথে যেতে যেতে পরিচারিকার কথাগুলো তিনি আর একবার চিন্তা করলেন। কি মনে হলো, স্ত্রী-পুত্রদের একটা নিরাপদ স্থানে রেখে তিনি একাই গির্জায় চললেন। গির্জার প্রাঙ্গণে এসে দেখেন সকলেরই মুখ বিবর্ণ, সবাই উদ্বিগ্ন আর ব্যগ্র। পথিমধ্যে অনেক ইংরেজের সঙ্গে অনেক দেশী সিপাহীর দেখা হলো। তাদের উদ্ধত ভঙ্গী আর চোখের দৃপ্ত চাহনি দেখে আতঙ্কে তাঁদের বুক কেঁপে উঠল। বিপদের মুখে ইংরেজের নির্ভীকতা প্রসিদ্ধ, তবুও আজ রবিবারের সন্ধ্যায় চারদিকের থমথমে ভাব আর উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া দেখে তাঁদেরও মনে বিপদের ছায়াপাত হলো। তবু তাঁরা গির্জায় চললেন।

সন্ধ্যাবেলা।

অকস্মাৎ চারদিক কাঁপিয়ে কামানের চাকার ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তূরীর আওয়াজ। রাস্তায় সশস্ত্র সিপাহীদের উত্তেজিত পদক্ষেপ। চারদিকের আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। গুজবের সত্যতা প্রমাণ করে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। বন্দুকের শব্দ আর বিদ্রোহী জনতার ভৈরব কোলাহল সহসা মিরাটের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। ডঙ্কা বাজিয়ে এল সাতান্নর বিপ্লব। বিপ্লবের সেই ভয়ঙ্কর গর্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল গির্জার সান্ধ্য-ঘণ্টাধ্বনি।

আগেই বলেছি, ভারতের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র তখন মিরাট। ইংরেজ সৈন্য আর তাদের হেফাজতে অজস্র গোলাবারুদ কামান, স্বভাবতই সিপাহীদের মনে জাগিয়েছিল আতঙ্কজনিত একটা নৈরাশ্যের ভাব। তার থেকেই তাদের মধ্যে দেখা দিল উন্মত্ততা। সেই উন্মত্ততাই অবশেষে আত্মপ্রকাশ করলো বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। তৃতীয় অশ্বারোহী-দলের সৈন্যরাই ছিল বেশী উত্তেজিত। কারণ, তাদের পলটনেরই সহকর্মিরা হয়েছিল প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত; তাই তারা যেন লজ্জা, দুঃখ আর ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। মিরাটের বাজারের নর্তকীরা পর্যন্ত তাদের কাপুরুষ বলে উপহাস করেছে। সন্ধ্যার পর ষাট নম্বর রাইফেল রেজিমেণ্টের ইংরেজ সৈন্যরা যখন সান্ধ্য প্যারেডের জন্য উদ্যোগ করছিল, তখন তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে মিরাট জেলের দিকে তাদের সতীর্থদের মুক্ত করতে। সেখানে কোন ইংরেজ সৈন্য প্রহরী ছিল না, ছিল কেবল কুড়ি নম্বর পলটনের কয়েকজন সিপাহী। তারাও উত্তেজিত। বন্দুক ও তরবারী হাতে বিদ্রোহীরা এসে হানা দিল জেলে। ফটকে কেউ তাদের বাধা দিল না। ক্ষণকালের মধ্যেই তারা প্রবেশ করল জেলের মধ্যে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ভেঙে ফেললো জেলের দরজা। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের হাতে-পায়ের বেড়ী ভেঙে ফেলা হলো। বের করে নিয়ে এলো তাদের। মুক্ত বিদ্রোহীরা ঘোড়ায় চড়ে অন্যান্য সিপাহীদের সঙ্গে ফিরে এল ছাউনিতে। সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলো আরো তিন-চারশো সাধারণ কয়েদী।

ইতিমধ্যে ব্যারাকে পদাতিক দলে দেখা দিয়েছে প্রকাণ্ড বিদ্রোহ। য়ুরোপীয় সেনানিবাস থেকে দেশীয় সিপাহীদের ব্যারাক দূরে ছিল বলে, তাদের এই উত্তেজনা ও উন্মাদনার বিন্দুবিসর্গ ইংরেজ সৈন্য বা সেনাপতি কেউ জানতে পারেনি। এগার ও বিশ নম্বর পলটনের সিপাহীদের মধ্যেই দেখা দিল প্রবল উত্তেজনা। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের ভয় হচ্ছিল, ইংরেজ সৈন্যরা বুঝি তাদের আক্রমণ করে সমূলে উৎখাত করে ফেলবে, নয়ত কালাপানি পার করে চিরদিনের জন্যে আন্দামানে পাঠাবে। এই আশঙ্কাই তাদের যেন পাগল করে দিলো। উত্তেজনার এই সঙীন মুহূর্তে তারা স্থির করল, স্বাধীনতা রক্ষা, জীবনরক্ষা, আর ধর্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণ করবার এই সুবর্ণ সুযোগ। এ-সুযোগ তারা হেলায় নষ্ট হতে দেবে না কিছুতেই।

সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছল ক্যাণ্টনমেণ্টের অপর দিকে—ইংরেজ সেনানিবাসে। মুহূর্তমধ্যে একজন অফিসার কর্তব্য স্থির করে, জনকতক ইংরেজ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন এগার নম্বর পলটনের সিপাহীদের ব্যারাকে। তিনিই সেই পলটনের কম্যাণ্ডিং অফিসার। নাম কর্ণেল ফিনিস। মিরাট ছাউনির অন্যতম দক্ষ ও জনপ্রিয় অফিসার। সকলেই তাঁর গুণে বশীভূত। সিপাহীদের তিনি চিরদিন রাজভক্ত বলেই বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু আজ শান্তশিষ্ট ও চিরকালের অনুগত সেই সিপাহীদের ভিন্ন মূর্তি দেখে কর্ণেল দুঃখিত ও স্তম্ভিত হলেন। তখন প্যারেডের মাঠে জটলা করে দাঁড়িয়েছে এগার ও কুড়ি নম্বর পলটনের সিপাহীরা। কর্ণেল সাহেবকে কেউই আগের মত অভিবাদন করল না। কর্ণেলের ঘোড়া এসে থামলো একেবারে তাদের মধ্যে। ঘোড়ার ওপর থেকেই তিনি সিপাহীদের ভৎর্সনা করলেন ও সৎ পরামর্শ দিলেন। নিজের পলটনের সিপাহীদের সঙ্গে যখন তিনি আলাপ করছিলেন, সেই অবসরে কুড়ি নম্বর পলটনের একজন সিপাহী বন্দুকের আওয়াজ করল। কর্ণেলের গায়ে লাগল না, কিন্তু তাঁর ঘোড়াটি আহত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আওয়াজ। এবার বন্দুকের গুলী কর্ণেল ফিনিসের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করল। তিনি আহত হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আহত কর্ণেলের ওপর গুলী বর্ষিত হতে লাগল। সর্বাঙ্গে গুলীবিদ্ধ কর্ণেল অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর দুই পলটনে ক্ষণকাল মুখ চাওয়া-

চারি করে এক সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে হুঙ্কার করে উঠল—ফিরিঙ্গি লোক্‌কো মারো।

বহরমপুরের স্ফুলিঙ্গ সেদিন এই ভাবে মিরাটের ছাউনিতে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল।

ঐতিহাসিক ম্যালিসন্ লিখেছেন: "কর্ণেল ফিনিস নিহত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিরাটের সমস্ত সিপাহীদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পদাতিকদলের সিপাহীরা অশ্বারোহী দলের সওয়ারের সঙ্গে যোগ দিয়া ইংরেজের বিপক্ষতা-চরণ করিতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমানেও একযোগ—একযোগে ইংরেজ নরনারী ও বালকবালিকাগণকে নিধন করিতে তাহারা কৃতসংকল্প। সূর্যাস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিরাটে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড শুরু হইয়া গিয়াছিল।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সঙ্গে সঙ্গে মিরাট সেনানিবাসে দাবানল জ্বলে উঠল। বিপ্লবের মশালে আগুন জ্বেলে বন্য পশুর মত বিদ্রোহীরা যেন গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো। চোখে তাদের তেমনি হিংস্রতা; কণ্ঠে সেই একই আওয়াজ—ফিরিঙ্গি লোক্‌কো মারো। বিস্মিত বিমূঢ় ইংরেজ সৈন্য ও সেনাপতিদের দৃষ্টিপথে চললো উন্মত্ত সিপাহীদের অবাধ হত্যা আর লুণ্ঠন। আত্মরক্ষার কিম্বা আক্রমণের কোন সুযোগই তাঁরা পাননি। চিরদিনের বাধ্য ও শান্ত সিপাহীদের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান যেন তাঁদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁদের কর্তৃত্বে এত বড় একটা অস্ত্রাগার, এত কামান বন্দুক, তবু তাঁরা অসহায়। রবিবারের সন্ধ্যার সেই ভয়াবহ হত্যা আর লুণ্ঠনের বর্ণনা ঐতিহাসিক কেয়ি এইভাবে দিয়েছেন: "নৈশ-ভজনার পর ইংরেজ নর-নারী গির্জা হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন নিশ্চিন্তমনে। সিপাহীরা যে ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়াছে সে সংবাদ তাঁহারা কিছুই জানিতেন না। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া সুখস্বপ্নে বিভোর, কেহ কেহ গাড়ির গদীতে হেলান দিয়া আরাম উপভোগে মগ্ন, কেহ শীতলবায়ু সেবন করিতে করিতে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে ছিলেন। উন্মত্ত সিপাহীরা হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। কাহাকে গুলি মারিল, কাহাকেও বা তলোয়ার দিয়া কাটিল। আহত ও নিহতের সঠিক সংখ্যা

অনুমান করা তখন সম্ভব ছিল না। পথচারী ইংরেজ সৈন্যকে যেখানে তাহারা দেখিতে পাইল, নির্দয়ভাবে সেইখানে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ও বাজারে বাজারে বিদ্রোহীরা দলে দলে প্রবেশ করিল এবং অবাধে চলিল লুণ্ঠন আর গৃহদাহ। শিকারের গন্ধ পাইয়া হিংস্র ব্যাঘ্রেরা যেমন গুহা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, প্রত্যেক প্রকাশ্য রাস্তা গলি পথ ও আবর্জনাপূর্ণ শহরতলী হইতে সেইরূপে তাহারা বাহির হইতে আরম্ভ করিল।"

মিরাটের কমিশনার মিঃ হার্ভি গ্রেটহেড এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই: "নগরের লোক, গ্রামের লোক ও মিরাটের বাজারের দোকানদারেরা তলোয়ার, বন্দুক, বর্শা, লাঠি—যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া সিপাহীদের সহিত যোগ দিয়াছিল। মিরাটের জেলে তখন যে সাতশত কয়েদী ছিল, জেল ভাঙিয়া সিপাহীরা তাহাদের মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এমন কি জেলের পুলিশ-প্রহরীরাও মুক্ত কয়েদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া একত্রে ইংরেজদের আক্রমণ করিয়াছিল।'

কর্ণেল আর্চডিল উইলসন ছিলেন গোলন্দাজ-বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার এবং মিরাট সেনানিবাসের কমাণ্ডিং অফিসার। সচ্চরিত্র ও কার্যতৎপর লোক বিদ্রোহী সিপাহীদের তাণ্ডবের তিনিও ছিলেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর বর্ণনা থেকেও একটু উদ্ধৃতি দিই: "ক্যাণ্টনমেণ্টে ইংরেজদের ব্যারাকে পাহারা দিবার জন্য যাহারা নিযুক্ত ছিল, তাহারা বিদ্রোহী হয় নাই; কেবল তাহারা ভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের সমস্ত সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ক্যাণ্টনমেণ্টের একধারে সিপাহীরা তাহাদের অফিসারগণকে জবাই করিতেছে, অপর ধার দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহারা আবার সম্মুখবর্তী অফিসারগণকে সেলাম ঠুকিয়া যাইতেছে; কিছুই যেন ঘটে নাই এই রকমের ভাবভঙ্গী। ছাউনির ধনাগারের প্রতি বিদ্রোহী সিপাহীদের ঘনঘন লোলুপ দৃষ্টি। কিন্তু রাইফেল-পলটনের পাহাড়ায় ধনাগারটি সুরক্ষিত ছিল। বিদ্রোহীরা উহার ভিতরের একটি টাকাও স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিকাল সাড়ে ছয়টার সময় ব্রিগেড মেজর হুইল আমাকে প্রথম সংবাদ দিলেন যে, দেশীয় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ধনাগার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আমি

গোলন্দাজদলকে সঙ্গে লইয়া সিপাই ছাউনি অভিমুখে ধাবিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম বিদ্রোহীদলের প্রধান প্রধান সিপাহীকে সেখানে একত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু আমি যখন সেখানে গিয়া পৌছিলাম, তখন দেখি ছাউনিতে বা প্যারেডের মাঠে একজনও সিপাহী নাই। রাত হইয়া আসিল, চারিদিক অন্ধকার। সেই সময়ে এত ইংরেজ সৈন্য একত্রে জমা হইয়াছিল যে তাহারা মিরাটের সমস্ত বিদ্রোহী সিপাহীকে ধ্বংস করিতে পারিত। কিন্তু কোথায় বিদ্রোহীরা? অশ্বারোহী ছাউনির কাছে কয়েকজন সিপাহী দৃষ্টিগোচর হইল, রাইফেলধারীরা তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীরা নিকটবর্তী জঙ্গলে পলায়ন করিল। রাত্রির অন্ধকারে নিষ্ফল আওয়াজ করিয়া বন্দুকধারীরা ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়াছে এবং হয়ত তাহারা ইংরেজদের ব্যারাকের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রিগেড সৈন্যদের ব্যারাকে পাঠাইবার জন্য জেনারেল হিউয়েটকে অনুরোধ করিলাম। সৈন্যরা ব্যারাকের দিকে চলিয়া গেল। আকাশে চাঁদ উঠিল। তখন যে-দৃশ্য আমার চক্ষে পড়িল তাহা ভয়াবহ। অফিসারদের বাংলোগুলি জ্বলিতেছে—চাঁদের আলোয় প্রজ্বলিত আগুনের আভা ম্লান। ইংরেজ সেনারা সেই চাঁদের আলোয় কেবল জনকতক নিরস্ত্র লুণ্ঠনকারীকে দেখিতে পাইলেন মাত্র।"

সন্ধ্যার অন্ধকারের পর চাঁদ উঠেছিল।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল ছাউনিতে অফিসারদের বাংলোগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। শুধু তাই নয়। বেসরকারী ইংরেজদের বাসভবন থেকেও অগ্নি-শিখা দেখা গেল। রাশি রাশি ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের নানা রঙ রাত্রির আকাশকে যেন ভয়াবহ করে তুলেছে। স্তূপীকৃত ধোঁয়া থামের মত আকাশে উঠে উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আগুন যতই ছড়িয়ে পড়ে, ততই তার সংহার-মূর্তি ভীষণ হয়ে ওঠে। জলন্ত আগুনে ঘর পোড়ার প্রচণ্ড শব্দ, বাংলোর বাহাদুরি কাঠের পটাপট্ চটাপট দমাদম্ শব্দ, আগুনের গর্জন, আস্তাবলে দগ্ধশরীর ঘোড়ার মৃত্যু-যন্ত্রণার মর্মান্তিক শব্দ তার সঙ্গে বিদ্রোহীদের বিজয়-উল্লাস আর কামানের চাকার ঘরঘর শব্দ—এইসব শব্দ একত্রে ১০ই মে-র সেই ভয়াবহ রাত্রিতে ঘোষণা করল সিপাহীদের

সদর অভ্যুত্থান এবং খ্রীষ্টানকুলের সংহার। যে-সব ঘরে জ্বলছিল সেইসব জ্বলন্ত গৃহের নিরীহ অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে বাগানে বাগানে আস্তাবলে আস্তাবলে আশ্রয়ের সন্ধান করছিল। বিদ্রোহীরা খবর পেয়ে সেইসব জায়গায় গিয়ে হতভাগ্যদের গুলি করে করে মারতে লাগল। তলোয়ার দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করতে লাগল। কেউ অন্ধকারে পালিয়ে দূর পল্লীতে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বাঁচল। সেনানিবাসের ইংরেজ অফিসাররা যখন সৈনিকের কার্যে ব্যস্ত, সেই অবসরে বিদ্রোহীরা তাঁদের জ্বলন্ত বাংলোয় প্রবেশ করে, মায়েদের চো[illegible] ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আ[illegible] কেটে ফেলে, তারপর শোকাতুরা নারীদের [illegible]ম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে। অগ্নিব্যূহের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ [illegible] ও নারীর সেই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব

[illegible] কেরি মিরাটের এই হত্যাকাণ্ডকে এক কথায় খ্রীষ্টান নিধন-যজ্ঞ বা 'দি গ্রেট ক্রিশ্চিয়ান কার্নেজ' বলে অভিহিত করেছেন। যে-সব বিপন্ন ইংরেজ মহিলা প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরা কালো পোষাকে আত্মগোপন করে বাংলো থেকে বেরিয়ে অদূরস্থ বৃক্ষান্তরালে ভাঙা মন্দিরে লুকিয়ে ছিলেন। সেখানেও তাঁদের আতঙ্কের শেষ ছিলনা—দূর থেকে ভেসে আসছিল বিদ্রোহী আর লুণ্ঠনকারীদের হুঙ্কার গর্জন—মারো ফিরিঙ্গি লোককো।

প্রায় সারা রাত ধরে চললো হত্যা, গৃহদাহ আর লুণ্ঠন।

রাতও শেষ হয়ে এলো, উন্মত্ত সিপাহীরা আর লুণ্ঠনকারী জনসাধারণও আত্মগোপন করতে লাগল। দিবালোকে পলায়িত ইংরেজরা আস্তে আস্তে মাথা তুলে বাইরে এসে দেখেন, ছাউনির মাঠে বাংলোয় ইংরেজ নরনারী ও শিশুর অগণিত মৃতদেহ আর তাঁদের আবাসভূমি ভস্মস্তূপ। বাংলোর মূল্যবান জিনিসপত্র সব লুণ্ঠিত হয়েছে, যা সঙ্গে নিতে পারা যায়নি সেসব জিনিস লুণ্ঠনকারীরা ভেঙেচুরে বাইরে নিক্ষেপ করে গেছে। দগ্ধ ও ভস্মপুঞ্জ সেই বাংলোগুলি এক করুণ দৃশ্য সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। ছাউনির পথে পথে প্রাণহীন দেহ। ১১ই মে-র সকালবেলার আলো এসে পড়েছে বিগতপ্রাণ ও বিকৃত সেই সব দেহের ওপর।

কিন্তু কোথায় বিদ্রোহীরা ?

বিদ্রোহীরা ততক্ষণ ছুটে চলেছে দিল্লীর পথে।

শেষ রাত্রে চাঁদের আলোয় পথ করে নিয়ে মিরাটের তিন নম্বর অশ্বারোহী পলটন দ্রুতগতিতে যাত্রা করল দিল্লীর পথে। তাদের পেছনে পেছনে চললো পদাতিক দল। বাকী রাতটুকু তারা বৃথা যেতে দেবে না—প্রভাতেই পৌঁছতে হবে দিল্লীতে—এই তাদের সংকল্প। বিদ্রোহীদের অশ্ব-খুরধ্বনি আর পদাতিকদের দ্রুত পদক্ষেপে সহসা সচকিত হয়ে উঠল দিল্লী-মিরাটের নিস্তব্ধ পথ।

মোট দু'হাজার সিপাহী সে-রাত্রে দিল্লীর পথে রওনা হয়েছিল।

ইংরেজদের দিল্লী আক্রমণের সর্বশেষ পরিকল্পনা
১৮৫৭

দিল্লী—১৮৫৭
ইদগা
তেলিয়ানগঞ্জ
ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার
মেটকাফ হাউস
হাসপাতাল
জেল
দরিয়াগঞ্জ
বাদশাহের প্রাসাদ
ম্যাগাজিন
রাজঘাট
খয়রাতি গেট
য মু না
ন দী

।আট।
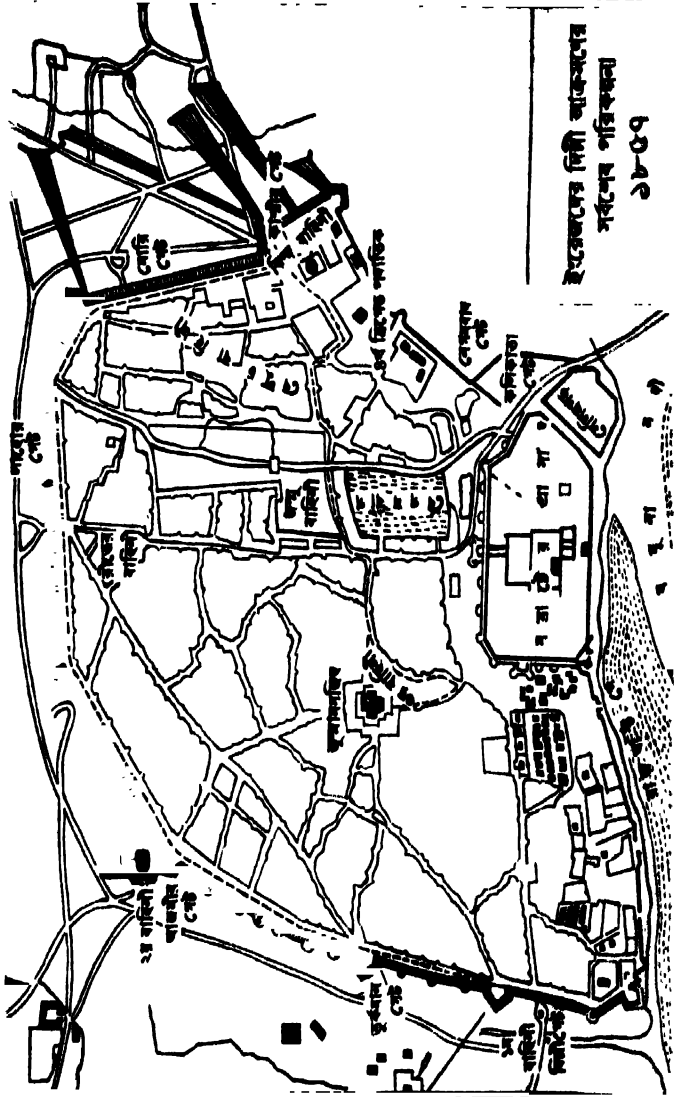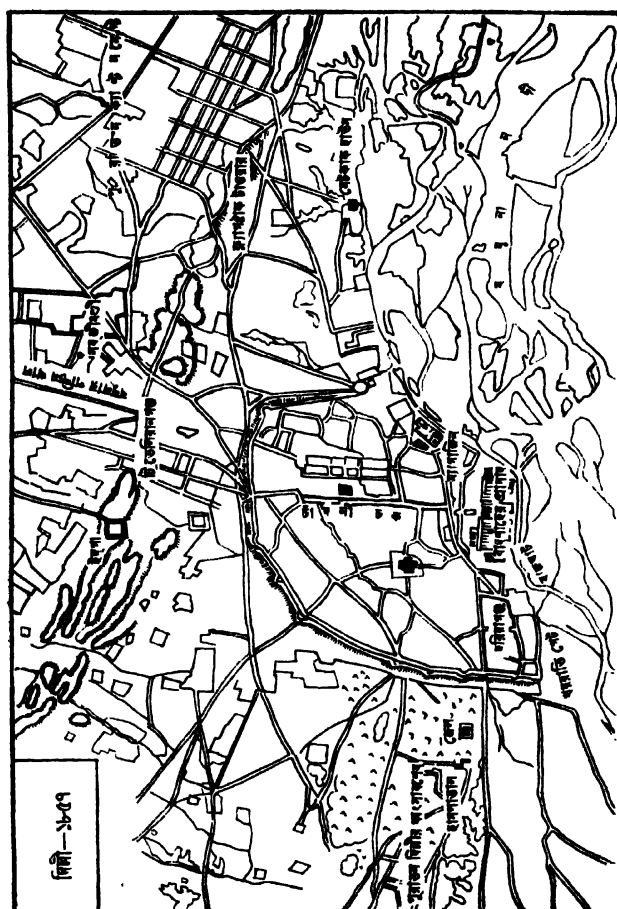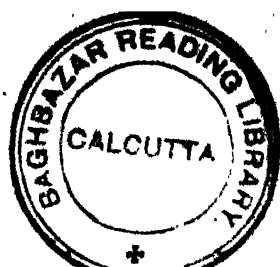
মিরাটের পর দিল্লীতে বিদ্রোহের ভেরী বেজে উঠল।

১১ই মে। সোমবার। সকালবেলা। প্রভাত-সূর্যের আলো এসে পড়ছে যমুনার জলে। যেন গলিত স্বর্ণস্রোত বয়ে চলেছে যমুনার বুকে। সম্মুখে শোভাময়ী দিল্লী নগরী। নগরীর উচ্চ সৌধশিখরের ছায়া প্রতিবিম্বিত যমুনার জলে। বিদ্রোহীরা এসে পৌছল যমুনার তীরে। রাত্রির মধ্যেই তারা অতিক্রম করে এসেছে বত্রিশ মাইল পথ। অশ্বারোহী দলের সৈন্যরাই আগে এসেছে, পদাতিকেরা তখনো পেছনে, একটু দূরে। উৎসাহে বিদ্রোহীদের হৃদয় ভরপুর। আতঙ্ক যে একটু না ছিল, এমন নয়। তাদের আশঙ্কা, হয়ত মিরাট ব্রিগেডের বিপুল বাহিনী নিয়ে ইংরেজ সেনাপতিরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবেন। মুহূর্তের বিলম্ব তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। রাত্রিজাগরণ ও অশ্বচালনার ক্লান্তি তারা ভুলে গেল। ক্ষিপ্র গতিতে তারা নৌ-সেতুর সাহায্যে যমুনার পরপারে এসে উপনীত হলো। সেই নির্জন নৌ-সেতু পার হয়ে সেই সময়ে আসছিল একজন ইংরেজ। অমনি এক সিপাহীর তরবারীর আঘাতে তার মাথাটা গিয়ে পড়ল যমুনার জলে। পরপারে এসে তাদের প্রথম কাজ হলো মাশুল-আদায়কারীকে হত্যা করা এবং মাশুল ঘরে আগুন লাগান। তারপর দিল্লীর রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল বিদ্রোহীদের অশ্বখুরের শব্দে। প্রভাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে "দীন্ দীন্" রবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বিদ্রোহীর একদল এসে দাঁড়াল লাল কেল্লায় বাদশাহী প্রাসাদের বাতায়ন-তলে। অন্যদল ছুটল ক্যান্টনমেন্টের পথে। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছিল বলে দিল্লী সেনানিবাসের ইংরেজরা মিরাটের খবর কিছুই জানতে পারেনি। দিল্লী শহর তাই সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। দিল্লীর চারদিকেই উচ্চ প্রাচীর এবং প্রশস্ত ও গভীর পরিখা-বেষ্টিত। নগরে প্রবেশ করবার আটটি তোরণ। নৌসেতুর

কাছেই প্রাসাদে ঢুকবার কলিকাতা গেট। নগর থেকে দু'মাইল দূরে পাহাড়ের উচ্চ ভূমির উপর দিল্লী ক্যান্টনমেন্ট। দিল্লীর সেনানিবাসে তখন ছিল সাড়ে তিন হাজার সিপাহী আর মাত্র ৫২ জন ইংরেজ সৈন্য। যেদিন সকালে মিরাটের বিদ্রোহীরা যমুনার পরপারে এসে উপনীত হলো, ঠিক সেই সময়ে দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড গ্রাউণ্ডে ৩৮, ৫৪, ও ৭৪ নম্বর পলটন আর দেশীয় গোলন্দাজদল একত্র সমবেত হয়। বারাকপুরের জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ের কোর্ট-মার্শালের সংবাদ তারা শুনল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। "এ অন্যায় বিচার"—নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল। অসন্তোষের একটা চাপা গুঞ্জন তাদের মধ্যে বয়ে গেল, অফিসাররা এটা লক্ষ্য করলেন। লক্ষণ দেখে তাঁরা বুঝলেন বিপদ নিকটবর্তী। সেদিন—১১ই মে—সোমবার যে তাঁদের পক্ষে ঘোরতর দুর্দিন হয়ে দেখা দেবে, এ তাঁরা কিছুতেই ধারণা করতে পারলেন না। আমোদ-প্রমোদ আর পান-ভোজনের মধ্যে সহসা তাঁরা খবর পেলেন—দিল্লী শহরে মিরাটের দু'হাজার বিদ্রোহী সৈন্য হানা দিয়াছে। চমকিত হয়ে ওঠেন সেনানিবাসের সেনাপতিরা। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাঁদের ধারণা, সিপাহী নয়, মিরাটের কয়েদীরা জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে। মিরাটের সিপাহীরা যদি বিদ্রোহী হয়ে সত্যি দিল্লীতে এসে থাকে, তাহলে মিরাটের রাইফেলধারী ইংরেজ সৈন্যরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করত। ৫৪ নম্বর পলটনের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন কর্ণেল রিপ্লে। শহরের গোলমাল শুনে তিনি তাঁর পলটনকে তখনি তৈরী হতে হুকুম দিলেন—মার্চ টু টাউন, শহরের দিকে যাত্রা কর।

তাদের সঙ্গে দুটো কামান দেবার কথা হলো। কিন্তু যুদ্ধের কামান তৈরি করে নিতে সময় লাগে। কর্ণেল রিপ্লে তখন দু'দল সৈন্যকে গোলন্দাজ দলের সঙ্গে যেতে হুকুম দিলেন এবং নিজে নিকটবর্তী তোরণের দিকে যাত্রা করলেন। সেটা ছিল কাশ্মীর গেট। শহরের মেন গার্ড ছিল উত্তরের দিকে—৩৮ নম্বর পলটনের সিপাহীরাই প্রধান প্রহরীদল। তারা আগে থেকেই ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহীদলের সঙ্গে যোগ দেবার মতলব এঁটে রেখেছিল। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এই পলটন ১৮৫২-এর আফগান যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং সেই সময় এদের ওপর আদেশ হয় ব্রহ্মদেশে যাবার জন্য। স্থলপথে তারা সর্বত্র যেতে

প্রস্তুত। কিন্তু জলপথে কোথাও যাওয়া তাদের সংস্কারের বিরুদ্ধে। তাই তারা সে আদেশ অমান্য করেছিল। সুতরাং আগে থেকেই এদের মধ্যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক। তারপর যে মুহূর্তে তারা দেখতে পেল যে ৫৪ নম্বর পলটনের পুরোভাগে কর্ণেল রিপ্লে কাশ্মীর গেটের কাছে পৌঁছেছেন, সেই মুহূর্তে তারা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করল।

মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী দলের বিদ্রোহী সওয়ারেরা তখন দিল্লীর অপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাশ্মীর গেটের দিকে ছুটে চলেছিল। তাদের পেছনে লাল কোর্তা-পরা অগণিত পদাতিক সৈন্য। পথিমধ্যে দুই রেজিমেণ্টে সাক্ষাৎ ও যথারীতি অভিবাদন বিনিময় হলো। দিল্লীর সৈন্য মিরাটের বিদ্রোহীদের জানাল স্বাগত। "ইংরেজ শাসন ধ্বংস হোক—বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন।" বিদ্রোহীদের কণ্ঠের এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলে দিল্লীর সৈন্যরা সমস্বরে গর্জন করে উঠল—ফিরিঙ্গী লোককো মারো। হতচকিত কর্ণেল রিপ্লে সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করেন—এসব কি হচ্ছে? বন্দুকে গুলি ভর। ওদিকে মেন গার্ডের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন ওয়ালেস বিদ্রোহীদের ওপর গুলি বর্ষণের জন্যে ৩৮ নম্বর পলটনের সিপাহীদের হুকুম দিলেন।

দুই দলের সিপাহীরা মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল।

কেউ বন্দুক তুললো না।

পলটনের দুই-একজন প্রভুভক্ত সিপাহী বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করল, ৫৪ নম্বর বাতাসে গোটা কতক গুলি ছুঁড়ল। কর্ণেল রিপ্লের বিস্ময় এখন সন্দেহে পরিণত হলো। দু'জন বিদ্রোহীকে গুলি করতে উদ্যত হলেন তিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো চারজন অফিসার প্রাণ হারালেন। দেশপ্রেমের চেতনাকে এইভাবে ইংরেজের রক্তে রঞ্জিত করে নিয়ে মিরাটের বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামল এবং দিল্লীর সিপাহীদের প্রাণভরে আলিঙ্গন করল। ঠিক সেই সময়ে কাশ্মীর গেট উন্মুক্ত হয়েছে। উন্মুক্ত সেই তোরণপথে প্রবেশ করল বিদ্রোহী সৈন্যরা "দীন্ দীন্" রবে।

"বাদশাহ খোদাবন্দ!"

"সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন

"আমরা স্বধর্ম রক্ষা করবার জন্ত এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি।"
উত্তেজিত বিদ্রোহীদের সমস্বরে উচ্চারিত এই আবেদন এসে পৌছল প্রাসাদে বাহাদুর শাহের কাণে। এ তিনি কী শুনছেন আজ? বাদশাহ খোদাবন্দ! এমন আনুগত্যের আওয়াজ তো অনেকদিন তাঁর কাণে যায় নি? কারা এরা? এত সৈন্য হঠাৎ জমা হলো কোথা থেকে তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন-তলে? বাতাসে কি আজ তিনি বিদ্রোহের জয়গান শুনছেন! তৈমুর বংশের রক্ত বিদ্যুৎগতিতে বয়ে যায় বৃদ্ধের লোল চর্মের নীচের শিরা উপশিরা দিয়ে।
চারদিকের চীৎকার শুনে দেওয়ান-ই-খাসে বাহাদুর শাহ তখনি তলব করলেন প্রাসাদ-রক্ষীদলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ডাগলাসকে। কম্পিত হাতে লাঠি ধরে, বৃদ্ধ সম্রাট এলেন দেওয়ান-ই-খাস গৃহে। এইখানেই তিনি দর্শনার্থীদের দর্শন দিতেন। ক্যাপ্টেন এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ক্যাপ্টেন বললেন—সিপাহীরা প্রাসাদের বাইরে সমবেত হয়েছে। আমি নীচে নেমে যাই, জিজ্ঞাসা করি ওদের কী মৎলব।
বাহাদুর শাহ তাঁকে যেতে দিলেন না, হাত ধরে নিষেধ করলেন। বললেন—ওরা হয়ত তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।
—কিন্তু ইওর ম্যাজেষ্টি, আপনার প্রাসাদ রক্ষার ভার যে আমার ওপর।
হাকিম আসানউল্লা তখন সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও ক্যাপ্টেন ডাগলাসের হাত ধরে নিষেধ করে বললেন—খবরদার, ফটকের বাইরে যেওনা সাহেব।
ডাগলাস তখন নীচে না গিয়ে গাড়ি-বারান্দার ওপর থেকে সিপাহীদের ডেকে বললেন—তোমরা চলে যাও, তোমরা এখানে আসাতে বাদশাহ বিরক্ত হচ্ছেন।
কিন্তু কে কার কথা শোনে। ক্যাপ্টেন যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বললেন। প্রথম ফটকে নিরাশ হয়ে বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় ফটকে গেল। প্রাসাদের প্রাচীরের কোল ঘেঁষে যে রাস্তা যমুনাতীরে রাজঘাট ফটক পর্যন্ত গিয়েছে, সিপাহীরা সেই রাস্তা ধরে রাজঘাট ফটকে এলো। সেখানে প্রহরীর সংখ্যা অল্প। দবা বাজারের মুসলমানেরা সেই ফটক খুলে দিল। বিদ্রোহীরা দলে দলে ভেতরে প্রবেশ করল। এর পরের বর্ণনা ভয়াবহ। ঐতিহাসিক কেরি লিখেছেন:
"বিদ্রোহীরা যেসব ইংরেজকে সম্মুখে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিল, তাহাদের গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিল। আবার তাহারা কলিকাতা

ফটকের দিকে ধাবিত হইল। তাহারা শুনিয়াছিল, কমিশনার ফ্রেজার সাহেব প্রাসাদ-রক্ষীদলের ক্যাপ্টেন ডাগলাস এবং আরো বড় বড় ইংরেজকে সেখানে দেখিতে পাইবে। উৎসাহে "দীন্ দীন্" ধ্বনি করিতে করিতে তাহারা সেই ফটকের দিকে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইল। তাহাদের পিছনে ক্ষিপ্তপ্রায় আরো অনেক নগরবাসী মুসলমান চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। দোকানীরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দোকান বন্ধ করিয়া দিল। পথচারী পথিকেরা ভয়ে ভয়ে বলাবলি করিতে লাগিল, কী ভয়ানক কাণ্ডই না ঘটিবে!...উন্মত্ত সিপাহীরা ইংরেজের গন্ধ পাইয়া উল্লাসে ফটকের দিকে ছুটিল। ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল—জয় পাৎশাহ বাহাদুরের জয়। ফিরিঙ্গী লোক্‌কো মারো। বিদ্রোহীরা যখন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিলেন, ফ্রেজার ও ডাগলাস দুজনে তখন বগী হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে উন্মত্ত জনতা দেখিয়া বিমূঢ় ফ্রেজার ও ডাগলাস বগী হইতে নামিয়া কাছাকাছি একটি পুলিশ থানার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। একজন পুলিশ প্রহরীর হাত হইতে একটা বন্দুক লইয়া তিনি সওয়ারদলের অগ্রবর্তী সিপাহীকে গুলি করিয়া মারিলেন। বিদ্রোহীরা ভীষণমূর্তি ধারণ করিল। বিপন্ন ফ্রেজার ও ডাগলাস ভাবিলেন পলায়ন ভিন্ন বাঁচিবার উপায় নাই। ফ্রেজার সাহেব্ আবার বগীতে চড়িয়া প্রাসাদের লাহোর তোরণের দিকে চলিলেন। ডাগলাস বাহির হইবার সময় একটা নালার মধ্যে পড়িয়া গিয়া আহত হইলেন। অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া তিনি প্রাসাদ-ফটকের কাছে পৌঁছিলেন। একজন প্রহরী তাঁহাকে কাঁধে করিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ফ্রেজার ও কলেক্টর হাচিনসনও প্রাসাদের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। ডাগলাসের ঘরের মধ্যে পাদ্রী জেনিং, তাহার কন্যা মিস জেনিং এবং তাহার এক তরুণী বান্ধবী —এই তিনজন অতিথিস্বরূপে বাস করিতেছিলেন। সেই ঘরের জানালা হইতে দূরবীণ দিয়া মিঃ জেনিং বিদ্রোহীদের গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ফ্রেজার সাহেব ছিলেন সিঁড়ির নীচের সোপানে দাঁড়িয়ে। এমন সময় আর্দালী মজলবেগ ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। সাইমন ফ্রেজারের মৃতদেহ সেই সোপানতলে পড়িয়া গেল। উপরে যে বাকী পাঁচজন ইংরেজ নরনারী ছিলেন, বিদ্রোহীরা উপরে উঠিয়া একে একে তাঁহাদের প্রত্যেককে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে মারিয়া ফেলিল। এইভাবে ফ্রেজার, হাচিনসন, ডাগলাস,

জেনিং, মিস জেনিং ও মিস ক্লিফোর্ড—এই ছয় জন অসহায় ইংরেজ নর-নারীর রক্তে দিল্লীর প্রাসাদ সর্বপ্রথম রঞ্জিত হইয়াছিল। ইহাদের মৃত্যু মর্মান্তিক ও শোচনীয়।”

প্রাসাদে আরো অনেক ইংরেজ মহিলা ছিল। মারা যাবার আগে ক্যাপ্টেন ডাগলাস বাদশাহকে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, বিবিদের যেন বেগমদের মহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে অবসর আর মেলেনি। তার আগেই উন্মত্ত হত্যাকারীরা তাদের এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করবার কেউ ছিল না।

সকাল দশটার মধ্যেই দিল্লীর প্রাসাদ ছাউনিতে পরিণত হলো।

বিদ্রোহী সৈন্যের গর্জন, বন্দুকের আওয়াজ, অস্ত্রের ঝনৎকার—এর মধ্যে ডুবে গেল প্রাসাদের চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রা। প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ও অলিন্দগুলি তখনি বিদ্রোহীদলে ছেয়ে গেল। আটত্রিশ নম্বর পলটন ও প্রাসাদের প্রহরীদল মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিল। ইতিমধ্যে মিরাটের পদাতিকদল এসে উপস্থিত হয়েছে। নগরের মুসলমান জনসাধারণ তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বিদ্রোহীদের পদভরে মোগলের রাজধানী বহুদিন পরে টলমল করে উঠল। সওয়ার সিপাহীরা প্রাসাদ প্রাঙ্গণের পরবর্তী ঘরগুলিকে আস্তাবল করল। বহুদূর পথ ভ্রমণে ক্লান্ত পদাতিকেরা ঘরের মেঝের ওপর তাঁবু ফেললো। নতুন পাহারা বসল প্রাসাদের চারদিকে। এইভাবে বাদশাহের সুরম্য বাসভবন পরিণত হলো একটা বিরাট সেনানিবাসে। তারপর বাহাদুর শাহ, জিন্নৎ বেগম আর বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে চললো গোপন পরামর্শ। ৩১শে মে পর্যন্ত অপেক্ষা করা এখন নির্বুদ্ধিতা—সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। বৃদ্ধ সম্রাট আর সংকোচ করলেন না—বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। দেখতে দেখতে মিরাট থেকে বিদ্রোহী গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ দিল্লীতে পৌঁছে গেল। তারা সোজা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল। একুশবার তোপধ্বনি করে তারা দিল্লীশ্বরকে জানাল সম্মান। সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত তরবারী হাতে বিদ্রোহীরা জানাল তাঁকে তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য। তৈমুর বংশের স্তিমিত রক্তধারা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাহাদুর শাহের শরীরে। দিল্লীর বুকে জাগে শিহরণ।

শেষ মুঘল-সম্রাট বাহাদুর শাহ

—"খোদাবন্দ! মিরাটের ইংরেজদের আমরা পরাজিত করেছি। পেশোয়ার থেকে কলকাতা—সর্বত্র সিপাহীরা আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছে। ইংরেজের অধীনতা শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সারা হিন্দুস্থান আজ জেগে উঠেছে। আপনি নিজের হাতে স্বাধীনতার পতাকা তুলে নিন, যাতে করে ভারতের সমস্ত যোদ্ধারা সেই পতাকার তলে এসে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধ করে। আপনি এই শুভ মুহূর্তে তাদের পরিচালনা করুন।"

উদ্বেলিত অন্তরে বৃদ্ধ সম্রাট শুনলেন বিদ্রোহী হিন্দু-মুসলমানের এই আবেদন। এই আবেদনের ভেতর দিয়ে তাঁর কানে ভেসে এল কালের প্রান্তর অতিক্রম করে তাঁর পূর্বপুরুষদের কণ্ঠস্বর। শাহজাহান ও আকবরের স্মৃতি ভেসে ওঠে তাঁর মানস চক্ষে। তাঁর সমস্ত অন্তর সারা দিয়ে উঠল বিদ্রোহীদের সেই আহ্বানে। তৈমুর বংশের বংশধর দাঁড়ালেন ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে। বহুদিন পরে হাতে তুলে নিলেন তাঁর বাদশাহী পাঞ্জা। তারপর বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে বললেন—আমি তো কপর্দকহীন সম্রাট। তোমাদের বেতন দেব কোথা থেকে?

—খোদাবন্দ, ভারতের যেখানে যেখানে ইংরেজের ধনাগার আছে, আমরা সেসব লুঠ করে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

—বেশ, আমি আমার পাঞ্জা গ্রহণ করলাম—আজ থেকে এই বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব নিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের তুমুল গর্জনে লাল কেল্লার প্রতিটি কোণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

রাজপ্রাসাদে যখন এই ঘটনা, তখন নগরের যে-অঞ্চলে প্রধান প্রধান ইংরেজদের বাস—সেইখানে শুরু হয়েছিল বিদ্রোহীদের সংহারকার্য। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে জনসাধারণ এবং হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটে চলেছে দলে দলে। দিল্লী আজ যেন সহসা একটা বিরাট রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে উঠেছে। পথচারী কোন ইংরেজই রেহাই পেলনা। অবাধ হত্যাকাণ্ড আর লুণ্ঠন। সূর্য তখন মধ্য আকাশে, যখন বিদ্রোহীরা এসে দিল্লীর ব্যাঙ্কে হানা দিল। ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারী নিহত এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। ম্যানেজার ব্রেসফোর্ড সাহেব স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একটা বাড়ির ছাদের ওপর

আত্মগোপন করেছিলেন। বিদ্রোহীদের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হলেন। বিদ্রোহীরা ব্যাঙ্কের বাড়ি তচ্‌নচ্‌ করে ভেঙে ফেলল। তারপর বিদ্রোহীরা ছুটল 'দিল্লী গেজেট'-এর ছাপাখানার দিকে। প্রেসের কম্পোজিটাররা তখন সবে মাত্র সীসার অক্ষর সাজিয়ে মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ রচনা করছিল। বিদ্রোহীদের ভীম আক্রমণের বেগে 'দিল্লী গেজেটের' ছাপাখানার এবং সেখানকার ইংরেজ কর্মচারিগণের পরিণতি দিল্লী ব্যাঙ্কের পরিণতির মতই হলো। বিদ্রোহের প্রবল স্রোত ঝড়ের গতিতে বয়ে চলেছে দিল্লীর রাজপথের ওপর দিয়ে। কার সাধ্য তাকে বাধা দেয়। একটা প্রচণ্ড উদ্দামতা প্রকাশ পেয়েছিল হত্যা, লুণ্ঠন আর গৃহদাহের ভেতর দিয়ে। ওই ত সামনে ফিরিঙ্গীদের গির্জা! এই বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ গির্জা? এই গির্জার বেদী থেকেই না প্রার্থনা উঠেছে ভারতবর্ষকে চিরদিন ইংরেজের অধীনে রাখার জন্যে? এই চিন্তা মনের মধ্যে জাগতেই বিদ্রোহীরা ছুটল সেই দিকে। তাদের ভীম আঘাতে ভেঙে পড়ে গির্জার চূড়া, ধ্বংস হয় প্রার্থনার বেদী, খান খান করে মাটিতে ভেঙে পড়ে গির্জার ঘণ্টা আর ক্রশ।

ইতিমধ্যে মেজর প্যাটার্সন ক্যাপ্টেন ওয়ালেসকে অনুরোধ করলেন, চুয়াত্তর নম্বর পলটনের সিপাহীদের নিয়ে কাশ্মীর তোরণের দিকে যেতে। সঙ্গে আরো দুটো কামান নিতেও বললেন। আটত্রিশ আর চুয়ান্ন নম্বর পল্টন বিদ্রোহী হয়েছে, এই খবর পাবা মাত্র মেজর এ্যাবট চুয়াত্তর নম্বর পলটনের সঙ্গে কাশ্মীর গেটে উপস্থিত হলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। ইংরেজ সেনাপতিরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন মিরাটের পথে। তাদের আশা মিরাট থেকে সাহায্যকারী সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিল্লীতে এসে পৌছল বলে। ততক্ষণ বিদ্রোহীদের যদি কোনোমতে প্রতিরোধ করে রাখা যায়, তাহলে হয়ত জয়লাভ করা যেতে পারে। ইংরেজ সৈন্যদের উৎসাহ দেন মেজর এ্যাবট। ভলন্টিয়ার দলও এসে হাজির হয়েছে এবং আদেশ পেয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা বন্দুকে গুলি ভরতে আরম্ভ করেছে। আরো দুটা কামান নিয়ে এলো সৈন্যরা। সময় এগিয়ে যায়। সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়ে। শহরের মধ্যে কী ঘটছে তার কোনো সংবাদই ক্যান্টনমেন্টের

অফিসারেরা তখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে পান নি। শহরের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে কয়েকজন ইংরেজ প্রাণভয়ে সেনানিবাসের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মুখে যতটুকু খবর পাওয়া গেল, তার বেশী কোনো সংবাদই সেখানে পৌঁছায়নি। তাঁরা সবাই ভয়ে অভিভূত। বললেন, পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা বেঁচে গেছি বটে, কিন্তু আমাদের কোন ভরসা নেই। অফিসাররা বুঝলেন অবস্থা সঙ্কটজনক। দিল্লী শহরের মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন জলছে, সে-বিষয়ে আর লেশমাত্র সংশয় রইল না। রণক্ষেত্রের কোলাহলে দিল্লী নগর মুখরিত আর সমগ্র ইংরেজটোলার জলন্ত আগুনের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে দিল্লীর আকাশ। দূর থেকে দেখা যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই ধোঁয়া। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কামানের গর্জন, বন্দুকের অবিশ্রান্ত শব্দ। সেই ভীষণ শব্দে ক্যান্টনমেন্টের দুর্গের মূল পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। এত আওয়াজ! এত ধোঁয়া! সকলেরই বিস্ফারিত দৃষ্টি দিল্লীর দিকে। তবে কী বারুদখানায় আগুন লাগল? বলাবলি করেন অফিসাররা। এমন সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন গোলন্দাজদলের সুবাদার। ধোঁয়ায় বিবর্ণ তাঁর সর্বাঙ্গ। মুখ দেখে চিনতেই পারা যায় না। তাঁর কাছেই অফিসাররা জানতে পারলেন দিল্লীর অস্ত্রাগারে আগুন লেগেছে। সেই অগ্নিকাণ্ড থেকে অতিকষ্টে জীবন নিয়ে তিনি পালিয়ে এসেছেন। সুবাদারের বর্ণনা অতি ভয়াবহ।

প্রাসাদের কাছেই দিল্লীর বিরাট অস্ত্রাগার।

অস্ত্রাগার ত নয়, যেন একটা বারুদের স্তূপ। অজস্র যুদ্ধাস্ত্র সেখানে। কার্টিজ আছে ন লক্ষ, রাইফেল বন্দুক দশ হাজার এবং অনেক কামান।

বিদ্রোহীরা ঠিক করল অস্ত্রাগার দখল করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাহসিক এই কাজ। ইংরেজদের অধিকারে সেই অস্ত্রাগার অধিকার করতে গেলে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। অথচ অস্ত্রাগার অধিকার করতে না পারলে বিদ্রোহের গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। হাজার হাজার সিপাহী সেটি আক্রমণ করবে ঠিক করল এবং তারা সম্রাটের নামে সংবাদ পাঠাল অস্ত্রাগারের অফিসারদের কাছে আত্মসমর্পণের দাবী জানিয়ে। লেফটেনান্ট জর্জ উইলোবি সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। আরো কুড়ি জন ইংরেজসৈন্য ছিল তাঁর

সহকারী। দেশীয় সিপাহীও কিছু ছিল। সকালবেলায় বিদ্রোহী সওয়ারেরা যখন নদী পার হয়ে প্রাসাদের ফটকের দিকে যায়, শহরের ম্যাজিস্ট্রেট মেটকাফ সাহেব সেই সংবাদ উইলোবিকে দেন। উইলোবি তখনি ম্যাগাজিন রক্ষার ব্যবস্থায় তৎপর হন। তাঁরও মনে আশা হলো মিরাটের ইংরাজ সেনাদল হয়ত এসে পৌছবে কিম্বা ক্যাণ্টনমেণ্টের রাইফেল পলটন ও গোলন্দাজ পলটন কামান বন্দুক নিয়ে ম্যাগাজিন রক্ষা করতে ছুটে আসবে। কিন্তু সে অনিশ্চিত ভরসায় থাকা চলে না। দেশীয় সিপাহীদের বিশ্বাস নেই। তখন ন'জন ইংরেজ সৈন্য অস্ত্রাগার রক্ষায় দৃঢ় সংকল্প হলো। বাইরে ফটক বন্ধ করে ভেতরে পাহারা রাখা হলো। ফটকে ফটকে কামান সাজান হলো। এক এক কামান দু'বার দাগা যায় এমনভাবে তার মধ্যে গোলাবারুদ ভরা হলো। সেই নয়জনের একজন একটা মশাল হাতে নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। দরকার হলেই কামান দাগবে। বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করলেই তোপে উড়িয়ে দেবে। এ যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে উইলোবির ইঙ্গিত মাত্রে তারা নিজেরাই আগুন লাগিয়ে ম্যাগাজিন উড়িয়ে দেবে ঠিক করল।

আত্মসমর্পণ-লিপির কোনো উত্তর এলো না।

আবার চিঠি এলো—বাদশাহের হুকুম, অস্ত্রাগারের ফটক খুলে দাও, আমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান কর।

উইলোবি এ-চিঠিরও কোনো উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল বিদ্রোহীরা সিঁড়ি বেয়ে অস্ত্রাগারের প্রাচীরে উঠতে আরম্ভ করেছে।

দ্রুম্‌ দ্রুম্‌।

ঘন ঘন বন্দুক ও কামানের ধ্বনি করতে থাকে ইংরেজ সৈন্যরা। বিদ্রোহীরাও প্রাচীর থেকে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্ত্রাগারের গুলি বারুদ ফুরিয়ে গেল। মিরাটের ইংরেজ সৈন্য এসে সাহায্য করবে, তখনো পর্যন্ত উইলোবির মনে সেই ভরসা। সে-ভরসা বিফল হলো। কেউই এলো না সাহায্য করতে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে শুধু বিদ্রোহীরা। আর বাধা দেওয়া যায় না। ম্যাগাজিনের যে অংশ অরক্ষিত, বিদ্রোহীরা ছুটল সেইদিকে। ন'জন রক্ষীর মধ্যে দু'জন আহত হলো। স্পষ্টই বোঝা গেল অস্ত্রাগার রক্ষা

করা তাদের অসাধ্য। তখন বেলা চারটা। সময় বুঝে উইলোবি সঙ্কেত করলেন। ইংরেজ সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে বারুদে আগুন লাগাল। নিমেষ মধ্যে ভীষণ গর্জনে দিল্লীর বারুদখানা জ্বলে উঠল। দেখতে দেখতে উড়ে গেল অস্ত্রাগার। অস্ত্রাগারের মাত্র চার পাঁচজন ইংরেজ সৈন্য মারা গেল। কিন্তু এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নগরের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় নিমেষমধ্যে প্রায় পাঁচশ' লোকের প্রাণ গেল। সমস্ত নগর কাঁপিয়ে এক ভীষণ শব্দ হলো। আগুনের লাল শিখা স্পর্শ করল আকাশ। কিছুক্ষণ বাদেই দিল্লীর আকাশ ছেয়ে গেল রাশীকৃত শাদা ধোঁয়ায়। ক্যাণ্টনমেণ্টের উঁচু জায়গা থেকে অফিসাররা সভয়ে লক্ষ্য করলেন রাশি রাশি সেই ধোঁয়া। তখনো তাঁদের আশা, মিরাট থেকে ইংরেজ সৈন্য এসে বিদ্রোহীদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করবে।

বেলা শেষ হয়ে এলো।

মিরাট থেকে কোনো সাহায্য এলো না।

এলো না কোনো সংবাদ।

কী করা যায়? কাউকে সেখানে পাঠান হবে? চুয়াত্তর নম্বর পলটনের সার্জন ব্যাটসন এগিয়ে এলেন। তাঁকেই পাঠান হলো। স্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়ে ডাক্তার ব্যাটসন ফকিরের বেশে যাত্রা করলেন মিরাটের উদ্দেশে। অতি বিপজ্জনক সেই মিশন। কিছুদূর যাবার পর বিদ্রোহীদের সতর্ক দৃষ্টি তাঁর ছদ্মবেশ ধরে ফেলে। ব্যাটসনের মিশন সার্থক হয় না।

দিল্লীর পথে সারা দিন উন্মত্তভাবে ঘুরে বেড়াল সিপাহীরা।

তাদের মুখে খালি মার্ মার্ শব্দ—মারো ফিরিঙ্গীকো।

দিন শেষ হয়ে এলো। অস্তগামী সূর্যের আভায় দিল্লীর আকাশ লাল।

তখনো পর্যন্ত মিরাটের ইংরেজ-সৈন্য আসবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

বিদ্রোহীদের মনের আতঙ্ক দূর হলো এতক্ষণে। তারা নতুন করে মাতল হত্যা, লুণ্ঠন আর গৃহদাহের কাজে। বিদ্রোহীদের পদভরে মোগল রাজধানী টলমল। ঝড়ের মত বেগে তারা যেন ছুটে চলেছে কাশ্মীর গেট থেকে কলকাতা গেট, সেখান থেকে লাহোর গেট। সর্বত্র তাদের সঙ্গে যোগ দিলো

দিল্লীর জনসাধারণ। শহর ও সেনানিবাসের মাঝখানে একটা পাহাড়। তার উপরে একটা গোলঘর—দিল্লীর 'ফ্ল্যাগষ্টাফ টাওয়ার'। অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা বালক-বালিকা নিয়ে পালিয়ে এই গোলঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আঠার ফুট ব্যাসের এই গোলঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে আশ্রয় নিলো তারা। মে মাসের দারুণ গরম আর মানসিক আতঙ্ক তাদের মনে জাগিয়ে তুললো অন্ধকূপের বিভীষিকা। এই সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হয়ে অল্প বাতাস আর উত্তপ্ত রৌদ্রে অবসন্ন হয়ে পড়ল অনেকেই। এখানে ইংরেজদের চরম দুর্গতি হয়।

মেন্ গার্ডের অবস্থা তখন আরো শোচনীয়।

একের পর এক ইংরেজ অফিসার নিহত হয়েছে, পালানো ছাড়া আর উপায় নেই। কাপড় ও কোমরবন্ধের সাহায্যে অবশিষ্ট ইংরেজ নেমে গেল ত্রিশ ফুট গভীর পরিখার মধ্যে। মহিলাদেরও নামিয়ে দেওয়া হলো। সন্ধ্যার অন্ধকারে পরিখা খনন করে বের হয়ে তারা আশ্রয় নিলো নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে এবং শেষে জঙ্গল থেকে অন্য কোথাও পালাবার চেষ্টা করলো। ছাউনির সমস্ত সিপাহী বিদ্রোহী হয়েছে। ইংরেজদের ওপর বর্ষার বারিবর্ষণের মতো অবিরাম গুলিবর্ষণ হচ্ছিল। সমস্ত কামান বিদ্রোহীদের দখলে। ক্যান্টনমেন্টে থাকা ইংরেজদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। তারা ক্যান্টনমেন্ট পরিত্যাগ করে মিরাট আম্বালা অথবা কর্ণালের পথে চললো। কিছুদূর গিয়ে তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পথেও তাদের বহুবিধ অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হলো। কখন জঙ্গলের মধ্যে, কখনো ভাঙা জনশূন্য বাড়ির মধ্যে তাদের আত্মগোপন করতে হয়েছিল। এমন কি, ইউনিফর্ম পর্যন্ত খুলে ফেলতে বাধ্য হলো তারা, পাছে কেউ চিনে ফেলে, ধরে ফেলে। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে বিবস্ত্র হয়ে অনাহারে পলাতক ইংরেজ নর-নারীর সে কী অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। অসহ্য কষ্ট আর ক্ষুধার যন্ত্রণায় পথিমধ্যেই অনেকের মৃত্যু হলো।

দিল্লীর দারাগঞ্জ।

বহু ব্যবসায়ী ইংরেজ ও ইউরোপীয় বণিকের এখানে বাস।

বিদ্রোহী সিপাহীদের দিল্লী প্রবেশের সংবাদ পেয়ে তারা একটা বাড়িতে

আশ্রয় নিয়েছিল। অর্গলবদ্ধ দরজার অন্তরালে ছিল পঞ্চাশ জন ইংরেজ। বিদ্রোহীরা সন্ধান পেয়ে, সেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। লোকগুলোকে টেনে টেনে বের করল। তারপর তাদের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে কয়েদ করে রাখল। সে-ঘরের মধ্যে আলো-বাতাস প্রবেশের পথ নেই। একটা জানালাও ছিল না। পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকা—সবশুদ্ধ পঞ্চাশ জন খ্রীষ্টান সেই অন্ধকূপে বন্দী এবং সেই বন্দীজীবনে তাদের ভোগ করতে হয়েছিল অপরিসীম লাঞ্ছনা। চারদিন পরে তাদের সকলকে হত্যা করা হলো। ঐতিহাসিক ম্যালিসন এই হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে :

"১৬ই মে বন্দীদের বধ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। প্রাসাদের প্রহরীরা কারাগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বন্দিগণকে বলিল, 'তোমরা বেরিয়ে এস, তোমাদিগকে ভালো বাড়িতে নিয়ে যাব।' বন্দীরা দলবদ্ধভাবে বাহির হইয়া আসিল। একজনও পলাইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রহরীরা তাহাদের চারিদিক একগাছা দড়ির দ্বারা বেষ্টন করিল। তারপর তাহাদিগকে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। খ্রীষ্টান হত্যা দেখিবার জন্য সেই স্থানে বহুলোক জমা হইয়াছিল। সমবেত জনতার গালিবর্ষণ অসহায় বন্দিগণকে নীরবে সহ্য করিতে হইল। এই সময় হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। মিরাটের বিদ্রোহী তৃতীয় অশ্বারোহীদলের একজন সুবাদারের নেতৃত্বে এই পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সওয়ারেরা বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। গুলি করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তরবারির তীক্ষ্ণ আঘাতে তাহাদের কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। এই রকম নির্মম ভাবে খ্রীষ্টানবন্দী সংহার হইয়া গেল, রক্ষা পাইয়াছিল শুধু মিসেস আলডোয়েল ও তাহার তিনটি শিশুপুত্র। সে নিজেকে মুসলমানধর্ম অবলম্বিনী বলিয়া প্রকাশ করাতে ঘাতকেরা তাহার জীবন সংহার করে নাই। হত্যাকাণ্ডের পর মুর্দফরাসেরা গরুর গাড়িতে মৃতদেহ বোঝাই করিয়া যমুনার জলে নিক্ষেপ করিল।"

•

এগারই থেকে ষোলই মে—এই ছ'দিন ধরে বিদ্রোহীরা দিল্লীর বুকে জাগিয়ে তুলেছিল হত্যা, গৃহদাহ আর লুণ্ঠনের বিভীষিকা। নাদির শাহের দিল্লী-লুণ্ঠনের কথা আজ নতুন করে মনে পড়ল দিল্লীর অধিবাসীদের। মিরাটের দু'হাজার

সিপাহী ভিন্ন দিল্লীর ছ'টা পলটনের সিপাহীই বিদ্রোহী হয়েছিল। এই ছ' দিনেই তারা মোগল রাজধানীতে ইংরেজের সকল চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলেছিল। নগরের রাস্তায় রাস্তায় ইংরেজ নরনারীর অগণিত মৃতদেহ। তারপর শেষ দিনে যে যে-ভাবে পারল গাড়িতে, ঘোড়ায় কিম্বা পায়ে হেঁটে কেউ বা মিরাটের দিকে, কেউ বা কর্ণালের দিকে, পালাতে লাগল। প্রাণের ভয়ে ভয়-বিহ্বল ইংরেজদের সে কী পলায়ন! কেউ বা সর্প-সঙ্কুল, বহুদিনের পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িতে, কেউ বা গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতে লাগল। অনেকে পথের কষ্টে ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করল। নিরুপায় পলাতক ইংরেজদের সে কী ভয়ানক অবস্থা! ১৬ই মে-র পর কি শহর, কি ক্যাণ্টনমেণ্ট—দিল্লীর কোথাও একটি ইংরেজকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। সর্বত্র শ্মশানভূমির নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে উঠছে বিদ্রোহীদের বিজয়োল্লাস। দিল্লীর এই ছয় দিন ব্যাপী ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ঐতিহাসিক ম্যালিসনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরা এই অধ্যায় শেষ করব :

"১৬ই মে তারিখের পর দিল্লী শহরে ও দিল্লীর ক্যাণ্টনমেণ্টে একজনও য়ুরোপীয় রহিল না। মোগল রাজধানীতে ইংরেজদের আর কোনো প্রভুত্বই থাকিল না। ইংরেজ দূরীভূত হইল, তাহাদের স্থলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন দিল্লীর বাদশাহ। সিরাজদ্দৌলার সময়ে অন্ধকূপহত্যার পর ভারতবর্ষে ইংরেজের এমন বিপদ ও অত দুর্দশা আর কখনো ঘটে নাই। এত ইংরেজ এমন নৃশংসভাবে হত্যা হইল, ইংরেজ জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত বিষাদের বিষয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, ইহার কোন প্রতিশোধ লওয়া হইল না। দিল্লীতে বিষাদ, মিরাটে লজ্জা। ছয় দল বিদ্রোহী সিপাহী ও নগরবাসী উন্মত্ত মুসলমান দল তাহাদের বাদশাহের নামে এই সংহারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শাহাজাদারা বিদ্রোহীপক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন, সুতরাং সে অবস্থায় মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য কিছুই করিতে পারে নাই। অল্পলোকের উপর বহুলোকের আক্রমণের ফল এইরূপ শোচনীয়ই হইয়া থাকে। যমুনা সেতুর উপরে বিদ্রোহী সওয়ারদলের অগ্রগামী অশ্বের খুরধ্বনি যখন শ্রুত হইল, সেই সময়ে ইংরেজের মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত ইংরেজেরা আশা

করিয়াছিল, তাহাদের স্বদেশীয়রা অদূরে রহিয়াছে, তাঁহাদের আদেশের অপেক্ষায় কত পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য, তাহারা অবশ্যই স্বদেশবাসিগণের জীবন রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু অস্ত-সাগরে যখন সূর্য ডুবিয়া গেল, তখন তাহাদের সকল আশাভরসা ফুরাইল। তখন পলায়ন ভিন্ন আর পথ ছিল না।"

দিল্লীর সংবাদ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতের সকল সেনানিবাসে এই বার্তা রটে গেল যে, দিল্লীতে সিপাহীরা রণজয়ী হয়েছে, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীশ্বর বলে ঘোষণা করেছে। বিদ্রোহীদের আঘাতে কোম্পানীর শাসনশক্তি অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। আগামী পনর দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে; বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার, ধনাগার ও দুর্গ দখল করবে। এই ভাবে তারা ভারতে শতবর্ষের কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটাবে।

অন্যদিকে রাজধানী কলকাতা থেকে তারযোগে ভারতের সমস্ত সেনানিবাসে সংবাদ প্রেরিত হলো—সতর্ক থাক, সজ্জিত হও।

॥ নয় ॥

মিরাট-দিল্লীর খবর কলকাতায় একটু দেরীতেই এলো।

সিপাহীদের বিদ্রোহ সংবাদে রাজধানীর ইংরেজ নর-নারীর মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মিরাটের খবরে লর্ড ক্যানিং ততবেশী বিচলিত হন নি যতটা বিচলিত হলেন তিনি দিল্লী-পতনের দুঃসংবাদে। দুঃসংবাদ বৈ কি। পলাশি যুদ্ধের পর এই শতবর্ষের মধ্যে ইংরেজ শাসকের কাছে এত বড়ো দুঃসংবাদ আর আসে নি।

মিরাটের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অতি সামান্য সংবাদ কলকাতায় লর্ড ক্যানিং-এর কাছে এলো ১২ই মে। অতি সংক্ষিপ্ত তারবার্তা এল লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর কলভিনের কাছ থেকে :—"মিরাট সেনানিবাসে মহাগোলমাল। সঠিক ও সবিস্তারিত সংবাদ শীঘ্রই পাঠাইতেছি।" আগ্রায় বসে ১১ই মে কলভিন মিরাটের অভ্যুত্থানের খবর পেয়েছিলেন, মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টের জেনারেল হিউয়েটের কাছ থেকে নয়, আগ্রার এক য়ুরোপীয় মহিলার কাছ থেকে। ১০ই মে আগ্রা থেকে মিসেস চ্যাপমানের মিরাট রওনা হওয়ার কথা ছিল। সেইদিনই সন্ধ্যার একটু পরে মিরাট থেকে তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী তারযোগে তাঁকে রওনা হতে নিষেধ করে। সেই তারবার্তায় বলা ছিল—এখন মিরাট আসা বিপজ্জনক, ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীরা সব বিদ্রোহী হয়েছে। এর বেশী আর কিছু ছিল না সেই বার্তায়। এর পর আগ্রা-মিরাটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং বিদ্রোহীরা টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়। পরের দিন উদ্বিগ্নচিত্তে মিসেস চ্যাপম্যান সেই সংবাদ লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরের গোচরে নিয়ে আসেন। কলভিন সেই বার্তা কলকাতায় লর্ড ক্যানিংকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ১২ই মে থেকে এক সপ্তাহকাল ধরে টেলিগ্রাফের তারের ওপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে

ক্রমাগত নিঃশব্দে আসা-যাওয়া করতে লাগল একটির পর একটি চমকপ্রদ সংবাদ।

সংবাদ নয়, দুঃসংবাদ।

সংবাদ এলো মিরাটে ভীষণ বিদ্রোহের আগুন জলেছে, অশ্বারোহী পলটন ক্ষেপেছে, বহু ইংরেজ নিহত হয়েছে—প্রায় সমস্ত ছাউনি ভস্মীভূত। বোঝা গেল মিরাটের বিপদ গুরুতর।

সংবাদ এলো মিরাট-দিল্লীর পথ অবরুদ্ধ। মিরাটের দু'হাজার বিদ্রোহী সিপাহী দিল্লী যাত্রা করেছে। দিল্লীর সিপাহীরা তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ১৪ই মে আগ্রা হয়ে খবর এলো—বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে দিল্লী নগরীর পতন হয়েছে। কমিশনার ফ্রেজার এবং বহু ইংরেজ নর-নারী নিহত। বাদশাহ বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেছেন এবং মোগল-প্রাসাদে বিদ্রোহীদের পতাকা উড়ছে। শহরের রাজপথ ইংরেজ নর-নারীর রক্তে প্লাবিত। দিল্লীর অভ্যুত্থান অবিলম্বে ভারতব্যাপী একটি জাতীয় বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

বিস্মিত বিমূঢ় ক্যানিং ভাবলেন, মিরাটে এত বড়ো সেনানিবাস এবং এত অজস্র অস্ত্রশস্ত্র ও ইংরেজ সৈন্য থাকতে এ-দুর্ঘটনা ঘটল কী করে আর কী করেই বা মোগল-রাজধানী দিল্লী বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো। সমগ্র ভারতে দাবানল জলে উঠতে আর দেরী নেই তাহলে।

ক্লাইভের বঙ্গ-বিজয়ের পর থেকে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব পত্তনের শতবর্ষ মধ্যে ইংরেজ শাসনকর্তার দপ্তরে এমন অপ্রিয় সংবাদ আর কখনো আসেনি। এখন ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে আগুন জলে উঠতে কতক্ষণ আর সেই প্রজ্জলিত আগুন সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে যেতেই বা কতক্ষণ! ভারতের আকাশের এক প্রান্তে এক হস্ত পরিমিত যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তিনি শাসনভার গ্রহণের প্রাক্কালে লক্ষ্য করেছিলেন, আজ সেই মেঘ বুঝি সারা আকাশ জুড়ে দেখা দিয়েছে। এখন আর শুধু মেঘ নয়, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎচমক। স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্যসহকারে সুস্থিরভাবে তিনি সমগ্র পরিস্থিতি আদ্যোপান্ত আলোচনা করলেন। কি উপায়ে উপস্থিত বিপদের প্রতীকার হয়, যেসব স্থান অরক্ষিত, সেই সব জায়গায় অধিবাসীদের কিভাবে রক্ষা করা যায়,

একাগ্রমনে লর্ড ক্যানিং তাই-ই চিন্তা করতে লাগলেন। দূরবর্তী স্থান থেকে য়ুরোপীয় সৈন্য সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্বেই কি প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করছি। এখন মিরাটের বিদ্রোহ ও দিল্লীর পতনের সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতে বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর সভাপতির কাছে তিনি ডেসপ্যাচ পাঠালেন:

"রাজধানীর নিকটবর্তী বারাকপুর হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রার সীমা পর্যন্ত অকস্মাৎ বিপদাপন্ন হওয়ার সংবাদে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বারাকপুর হইতে আগ্রা সাত শত মাইল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে দানাপুরে কেবল একদল য়ুরোপীয় সৈন্য আছে। বারাণসী ও এলাহাবাদে কিছু শিখ সৈন্য আছে, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য একটিও নাই। কিছুদিন পূর্বে যে একশত রুগ্ন দুর্বল ইংরেজ সৈন্যকে এলাহাবাদে পাঠান হইয়াছিল তাহা আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না। ঐ দুই শহরে যে সব সিপাহী আছে, এ-সময় তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। বিদ্রোহী সিপাহীরা এখন পর্যন্ত দিল্লী শহর দখল করিয়া রহিয়াছে। অন্য সেনানিবাসের সিপাহীরা যে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইবে ইহা আদৌ অসম্ভব নয়। সুতরাং আমি দুইটি উপায় ঠিক করিয়াছি: প্রথম, বিদ্রোহীদের তাড়াইয়া দিয়া দিল্লী উদ্ধার করা; দ্বিতীয়, এখানকার ইংরেজ সৈন্যকে বিপজ্জনক স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া।"

কলকাতা তখন শুধু রাজধানীই নয়, ভারতের প্রধান বাণিজ্য-নগরীও বটে। শান্ত উদ্বেগহীন সেই রাজধানীতে এলো মিরাট-দিল্লীর দুঃসংবাদ।

শান্ত ও নিরুপদ্রব এই নগরীতে এক শ বছর ধরে বহু ইংরেজ নর-নারী বাস করছে নির্বিঘ্নে। পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ভারতের আর কোনো শহরে এমন দীর্ঘকাল ধরে শান্তি দেখা যায়নি। এমন কি, এই এক শ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটতে দেখা যায়নি এখানে। একটু আধটু হৈ চৈ বা গোলমাল যা মাঝে মাঝে শহরের জীবনে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ তুলতো, তা হলো ইংরেজ সৈন্যদের মাতলামি। মাঝে মাঝে জাহাজ থেকে নেমে শহরে এসে উদ্‌ভ্রান্ত সৈন্যরা ধর্মতলা বাজারে কি চীৎপুরের রাস্তায় দৌরাত্ম্য করত। নির্বিরোধী নাগরিকেরা নীরবে সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করত

এবং কেউ বা অনুভব করত কৌতুক। ইংরেজের তৈরি এই নতুন শহরে বেসরকারী ইংরেজ বাসিন্দা তখন অনেক। তাদের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী। ভারতবর্ষ কি, তা তারা বুঝত না। বিশাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এই মহানগরী তাদের কাছে মনে হতো অমরাবতী। নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক এইসব ব্যবসায়ী ইংরেজ। কোনো কারণেই তারা কখনো উত্তেজিত হয়ে উঠত না এবং অস্ত্র-ধারণে তারা ছিল নিতান্ত অপটু। তাই তাদের এই নিরুদ্বেগ ও নিরানন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে যখন মে মাসে মিরাট-'দল্লার সংবাদ এলো শহরে, তখন স্বভাবতই তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ক্রমে সেই সংবাদ শত মুখে পল্লবিত হয়ে এমন আকার ধারণ করল যে, তাদের অনেকেই প্রাণের ভয়ে গঙ্গায় জাহাজের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে রইল আর কতক আশ্রয় নিল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে। এই আতঙ্কটা অবশ্য ব্যবসায়ী ইংরেজ মহলে ও পর্তুগীজদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেউ কেউ শহরতলীর বাসস্থান পরিত্যাগ করল, কেউ ইংলণ্ডে চলে যাবার জন্যে জাহাজের টিকিট কাটল, আবার কেউ বন্দুক-পিস্তল সংগ্রহ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থায় সচেষ্ট হলো। শহরে বন্দুক বিক্রীর ধুম পড়ে গেল। শহরের ইংরেজ অধ্যুষিত অঞ্চলের সর্বত্র তখন আলোচনার বিষয় ছিল একটি—দিল্লী-মিরাটের হাঙ্গামা। সকলের মুখেই এক কথা—কী হবে!

—জন্, তোমার কি মনে হয়, কলকাতায় কাটাকাটি হবে?

—যোসেফ্, তোমার কি ধারণা—গভর্ণমেণ্ট আমাদের রক্ষা করবে?

—বিপদ হতে কতক্ষণ, মেরি, বারাকপুর তো এখান থেকে মাত্র ক'মাইলের রাস্তা।

—যা বলেছ, উইলিয়ম, সিপাহীদের বিশ্বাস নেই। দিল্লীতে তারা নাকি একটা ইংরেজকেও বাকী রাখেনি।

এই রকম কথাবার্তা সেদিন ধর্মতলার বাজারে প্রতিদিন শোনা যেত আতঙ্কিত ইংরেজ নর-নারীদের মধ্যে।

তাদের এই আতঙ্ক যে অমূলক ছিল, তা বলা যায় না। বারাকপুরের মঙ্গল পাঁড়ের ঘটনার পর থেকে শহরের চারদিকেই যেন বিভীষিকা। সবচেয়ে বেশী ভয় সিপাহীদের। যে-সিপাহীদের ওপর গভর্ণমেণ্টের এত ভরসা, তারাই আজ লুণ্ঠনকারী ও হত্যাকারীর মূর্তি ধারণ করেছে। কলকাতা থেকে

ব্যারাকপুর বেশী দূর নয়—ব্যবধান অল্প মাত্র। এক রাত্রের মধ্যেই বিদ্রোহী সিপাহীরা দলের সব সিপাহীকে কলকাতায় আনতে পারে, ইংরেজ প্রহরীদের পরাজয় করতে পারে, দুর্গ অধিকার করতে পারে এবং খ্রীষ্টানদের সমূলে উৎখাত করে বীরত্ব প্রকাশ করতে পারে। এ তো গেল এক দিকের কথা। অন্য দিকেও আতঙ্কের কারণ ছিল। রাজধানীর অদূরে গঙ্গার তীরে তখন নজরবন্দী হিসেবে বাস করছিলেন অযোধ্যার গদিচ্যুত নবাব। তাঁর উজীরে-আজম আর অন্যান্য সব কর্মচারী দিনরাত ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত কি না কে জানে। ইংরেজ তাঁকে পদচ্যুত করেছে, তাঁর গৌরব নষ্ট করেছে, কাজেই ইংরেজের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে নবাবের থাকা স্বাভাবিক। ইংরেজ অধিবাসীদের ভয়ের আরো একটা কারণ ছিল। ইতিমধ্যেই গুজব উঠেছিল যে কলকাতা শহরে ইংরেজ ছাড়া নানাদেশের আর যেসব বিদেশী বাস করে, তারা নাকি শহরের গুণ্ডাদের নিয়ে বিষম দৌরাত্ম্য করবে এবং লুটপাট করবে। সবই সম্ভব। মিরাটে ও দিল্লীতে যতটা উপদ্রব হয়েছে তার শতগুণ এখানে হওয়া আশ্চর্য নয়।

রাজধানীর এই মানসিক পরিবেশ, ইংরেজ নরনারীদের এই উদ্বেগ ও আতঙ্ক, লর্ড ক্যানিং বিশেষভাবেই পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনি এই উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাঁর প্রসন্নমুখ দেখেই তারা এই ধারণা করেছিল। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেলের পক্ষে যা করা দরকার, লর্ড ক্যানিং ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই তা করলেন। তাঁর প্রকৃতি অধৈর্য নয়, অত্যন্ত সুস্থির ও শান্ত। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিপদের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করলেন, বাইরে কিন্তু কোনো রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। অন্যের মতো, আতঙ্কের আয়নায় তিনি বিপদের অন্ধকার ছায়ামূর্তি দেখেন নি—তার যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তাঁর তাই দেরী হলো না। দিনের পর দিন যায়। শহরময় ছড়িয়ে পড়ে কত গুজব, ঘনীভূত হয় আশঙ্কা; কিন্তু লর্ড ক্যানিং অটল পর্বতের মতো স্থিরভাবে প্রাসাদে বসে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রতিদিন বিপদের নূতন নূতন সংবাদ শুনবার প্রতীক্ষা করছিলেন আর গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন কি করে বিদ্রোহ দমন করা যায়। বিশপ উইলসনকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন: "বিপদের গুরুত্ব আমি লঘু করিয়া দেখি নাই; তবে এ-বিপদ নিবারণে আমাদের জাতীয় শক্তি

কৃতকার্য হইতে পারিবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। আকাশ ঘোর অন্ধকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এখনো পর্যন্ত তাহা পরিষ্কৃত হইবার লক্ষণ দেখিতেছি না। বুদ্ধি স্থির রাখিয়া আমি বিপদ নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেছি। বিপদের প্রধান কেন্দ্র বর্তমানে তিনটি—আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী। সর্বত্রই আমি উপযুক্ত সৈন্য ও অস্ত্র যোতায়নের ব্যবস্থা করিতেছি। অন্যান্য সেনানিবাসের দায়িত্ব আগ্রা অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত হস্তে ন্যস্ত আছে। এই বিপদ নিবারণে আমরা যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারিব, সে-বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

আগ্রায় কলভিন্‌কে লিখলেন: "কলিকাতা হইতে দূরে থাকিয়া আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই দুশ্চিন্তার কারণ য়ুরোপীয় সৈন্যের অভাব। সেই অভাব চিন্তা করিয়া আমারও হৃদয় অবসন্ন। কলিকাতা অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের যে সব স্থানে বেশী বিপদ, সেইসব স্থানের কথাই আমি বিশেষ করিয়া ভাবিতেছি।"

কলকাতা ভারতের রাজধানী। কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেলের অধীনে তখন দুই দল মাত্র ইংরেজ সৈন্য—ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ৫৩ নম্বর পদাতিক পল্টন আর রেঙ্গুন থেকে নিয়ে আসা ৮৪ নম্বর পল্টন। এই পল্টন তখন গঙ্গার ধারে চুঁচুড়ায় অবস্থান করছিল। বাংলা দেশ রক্ষার জন্যে এই দুই দলের প্রয়োজন। নিকটে আর কোথাও ইংরেজ সৈন্য ছিল না। একদল ছিল দানাপুরে। দানাপুর কলকাতা থেকে চারশো মাইল। বাংলার বহু স্থানের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করার দরকার ছিল। রাজধানীতে রয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, সেখানে বহু অস্ত্রশস্ত্র মজুত। কলকাতা থেকে অদূরে কাশীপুরের বন্দুক তৈরির কারখানা, ইছাপুরের বারুদখানা, দমদমে বন্দুকশিক্ষাগার ও তার সঙ্গে অস্ত্রাদি নির্মাণের ছোট ছোট কারখানা। এ ছাড়া, রাজধানীর সংলগ্ন আলিপুরের জেলখানা, সেখানে ভীষণ প্রকৃতির হাজার হাজার কয়েদী। আলিপুরে সরকারী বনাতগুদাম, এখান থেকেই সৈন্যদলের ইউনিফর্ম ও অন্যান্য বস্ত্রাদি সংগৃহীত হয়। শহরের মধ্যে সরকারী টাঁকশাল, ধনাগার ও ব্যাঙ্ক। কাজেই এইসব স্থান বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার জন্যে রাজধানীতে য়ুরোপীয় সৈন্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মে মাসের দিন যতই অগ্রসর হয়, আতঙ্ক ততই বাড়ে। কলকাতার ব্যবসায়ী ইংরেজদের অনেকেই এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসৈন্যের কাজ করতে চাইল। গভর্ণর-

জেনারেল তাদের আবেদন গ্রহণে সম্মত হলেন না। তিনি জানতেন এসব ইংরেজ নিতান্তই ব্যবসায়ী, স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণে এরা নিজেরাই রিব্রত। কাজেই বিপদের সময়ে এদের দিয়ে যে খুব বেশী কাজ হবে, তা তাঁর মনে হলো না। বণিকসভা, দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ এবং শহরের ফরাসী ও মার্কিন অধিবাসী সকলেই এই সময়ে ইংরেজের বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করল। এই সময়ে বাজারে আর একটা ভয়ানক জনরব উঠল। হিন্দুরা যে পুকুরে স্নান করে, গভর্নর-জেনারেল সেইসব পুকুরে নাকি গরুর মাংস ফেলার হুকুম দিয়েছেন আর রাণীর জন্ম দিনে বাজারের সমস্ত চাল ও ময়দার দোকান বন্ধ রাখা হবে, হিন্দুরা অপবিত্র ও নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজনে বাধ্য হবে। অজ্ঞ জনসাধারণের মনে জনরবের প্রতিক্রিয়া কী সাংঘাতিক হতে পারে, লর্ড ক্যানিং তা বিলক্ষণ জানতেন। ২০শে মে তারিখে এলো গভর্ণরের ঘোষণা: এইসব বিভ্রান্তিকর জনরব নিতান্তই অমূলক। কোম্পানীর সরকার ভারতবাসীর ধর্মে বা জাতিতে হস্তক্ষেপ করার আদৌ চিন্তা করেন না। কেহ যেন কুৎসিত জনরবে বিশ্বাস না করে। যাঁহাদের বুদ্ধিবিবেচনা আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্যকে এই জাতীয় জনরবের অসারতা বুঝাইয়া দিবেন এবং এই জনরব যাঁহারা রটনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি।"

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সম্পর্কে লর্ড ক্যানিং-এর দুশ্চিন্তা হলো বেশী। প্রতিদিন তিনি কাশী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ থেকে সংবাদের জন্য ব্যস্ত থাকতেন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের গোড়াতেই এই সব জায়গা থেকে একটির পর একটি সন্তোষজনক সংবাদ আসতে লাগল। কাশী থেকে খবর এলো, সমস্ত সুস্থির, সৈন্যগণ কর্তব্যকার্যে সমভাবে নিরত। লক্ষ্ণৌ থেকে স্যর হেনরী লরেন্স খবর পাঠালেন, নগরের ক্যান্টনমেন্টে ও প্রদেশমধ্যে শান্তি বিরাজ করছে, ভয়ের কারণ নেই। কানপুর থেকে স্যর হিউ হুইলার খবর দিলেন, এখানে কোন উত্তেজনা নেই, আতঙ্কের ভাবও অনেকটা কমেছে। এলাহাবাদের সংবাদ—সিপাহীরা শৃঙ্খলা ও সদ্ভাব বজায় রেখে চলছে। আগ্রা থেকে লেফটেনান্ট-গভর্ণর সংবাদ পাঠালেন, এখানকার অবস্থা আপাততঃ প্রীতিকর।

এইসব খবর পেয়েই লর্ড ক্যানিং মে মাসের তিন সপ্তাহকাল উত্তর-পশ্চিম নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হলেন না। তিনি রাজধানী ও রাজধানীর

নিকটবর্তী অঞ্চলের আতঙ্ক দূর করিতেই উদ্যোগী হলেন। ৮৪ নম্বর পলটনের কিছু সৈন্য তিনি কাশী পাঠাবার হুকুম দিলেন আর দানাপুরের কমাণ্ডিং অফিসারকে অনুরোধ করলেন, তিনি যদি সেখান থেকে দশ নম্বর পলটনের দুই একদলকে কাশী পাঠাতে পারেন তাহলে ভাল হয়।

২৪ মে, রবিবার। রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন।

রাজধানীতে প্রতি বছরই রাণীর জন্মদিনে উৎসব হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হলো না। তবে রবিবারের বদলে এ বছর সোমবারে উৎসব। লাটসাহেবের বাড়িতে রাত্রে মহাসমারোহে খানাপিনা ও নৃত্য—উৎসবের এইটাই প্রধান অঙ্গ। লেডি ক্যানিং এই উৎসবে শহরের বিশিষ্ট ইংরেজ ও অভিজাত ভারতীয় মহিলাদের আমন্ত্রণ করেন। শহরে এখন এত যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ, লাট-গৃহিণীর মুখ কিন্তু প্রফুল্ল ও হাসিমাখা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নির্ভয়ে তিনি অভ্যাসমত চার-ঘোড়ার ল্যাণ্ডো চড়ে গড়ের মাঠ ও শহরতলীতে হাওয়া খেতেন। এবছরে মহারাণীর জন্মদিবসের উৎসবে তাঁর আগ্রহ তাই সমানই দেখা গেল। নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনায় তিনি তেমনি উল্লসিত সৌজন্য প্রকাশ করলেন। দিল্লী-মিরাটের দুঃসংবাদ তলিয়ে যায় লাট প্রাসাদের উৎসবের উত্তাল তরঙ্গে। ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে বছর বছর যেমন উল্লাসে আনন্দে অনেক বন্দুকের আওয়াজ করা হয়, এ বছর তা বন্ধ রাখবার জন্যে শহরের ইংরেজ অধিবাসীরা গভর্ণর-জেনারেলকে অনুরোধ করলেন। লর্ড ক্যানিং এ-প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। আপত্তি নতুন টোটায়, পুরাতন টোটা ব্যবহার করে তিনি উৎসব সম্পূর্ণ করতে চাইলেন। রাত্রে লাট ভবনে নাচ। সে-নাচের মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন শহরের বহু সম্ভ্রান্ত নর-নারী। যাঁরা উৎসবে যোগ দিলেন না, তাঁদের যুক্তিও ছিল অকাট্য—রাত্রিবেলায় এক জায়গায় এতগুলো ইংরেজ নর-নারী সমবেত হলে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করার উত্তম সুযোগ পাবে, ভীষণ অনর্থও ঘটা অসম্ভব নয়। মহারাণীর জন্মদিনের উৎসব আর মুসলমানদের ঈদের উৎসব সে-বছর একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঈদের উৎসবে কলকাতার রাস্তায় মুসলমানেরা দলে দলে আমোদ করে বেড়ান, আতঙ্কিত ইংরেজ নর-নারী মনে করল এ বোধ হয় মুসলমান-বিদ্রোহের পূর্বলক্ষণ।

দিন যায়। রাজধানীর বুকে আবার উদ্বেলিত হয়ে উঠে নানা রকমের জনরব। আতঙ্ক ঘনীভূত হয় ইংরেজ নর-নারীর মনে।

গভর্ণর-জেনারেলের আশ্বাসেও তারা ভরসা পায় না কিছুতেই। একদিন ফরাসী কনসাল্ স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি স্যর সিসিল বিডনকে এক পত্রে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিকারের ব্যাপারটা কী? উত্তরে স্যার সিসিল বিডন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে লিখলেন—"কলিকাতা এবং ইহার ছয় শত মাইলের মধ্যে উদ্বেগ বা আতঙ্কের কোনো কারণ নাই, জানিবেন।"

কিন্তু তবুও শহরের য়ুরোপীয় নর-নারীর মন থেকে আতঙ্ক দূর হয় না। গভর্ণর-জেনারেল তাঁর কাউন্সিলের সভ্যদের সঙ্গে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আলোচনা করলেন। বর্ষীয়ান সভ্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার জন্ লো। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সভ্যদের একটি বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। তাঁরা পরামর্শ দিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে য়ুরোপীয় সৈন্য সংগৃহীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত মোগল রাজধানী আক্রমণ বা পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটি স্থগিত রাখাই ভালো। অন্য পক্ষে স্যার জন্ লো বললেন, কালবিলম্ব না করে যতশীঘ্র হয় দিল্লী পুনরুদ্ধারের উপায় করা উচিত। লর্ড ক্যানিংও অনুরূপ মত প্রকাশ করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো, ভারতের অন্যত্র যা ঘটে ঘটুক, বিদ্রোহীদের হাত থেকে সকলের আগে দিল্লী উদ্ধার করা প্রয়োজন। তাঁর যুক্তি এই ছিল যে, দিল্লী-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ পরাক্রম বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং ভারতবাসীর মনে এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া মোগল রাজধানী বিদ্রোহীদের দখলে যাওয়ার ফলে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্রোহীরা এতে উৎসাহ বোধ না করে পারবে না। তাদের আন্দোলন আরো বেশী ব্যাপক ও সক্রিয় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সেইজন্যেই দিল্লীর প্রশ্নটিকে লর্ড ক্যানিং অগ্রাধিকার দিতে চাইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কাউন্সিলের সভ্যদের কাছে এই অভিমত প্রকাশ করলেন: "দিল্লী উদ্ধার করা আশু প্রয়োজন। বিদ্রোহীরা যদি দিল্লী দখল না করিত, তাহা হইলে তাহাদের এই উপদ্রবকে স্থানীয় বিদ্রোহমধ্যে গণনা করা যাইতে পারিত। দিল্লী-পতনের পর ইহা আর এখন সিপাহী-বিদ্রোহ নয়, ব্যাপক রাজবিদ্রোহ। [illegible]ই যদি এই বিদ্রোহ শীঘ্র দমন করা না হয়, তাহা হইলে অচিরে

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মহাবিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"

অবশেষে গভর্ণর-জেনারেলের সিদ্ধান্তই কাউন্সিল মেনে নিলেন। সকলের আগে দিল্লী উদ্ধার করাই দরকার। বিদ্রোহের মূলে আঘাত করতে গেলে এ ছাড়া পথ নেই। সুতরাং তিনি অবিলম্বে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন প্রধান সেনাপতির কাছে—সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করুন।

পাঞ্জাব।

পাঞ্জাবের শাসনভার তখন স্যর জন লরেন্সের ওপর ন্যস্ত। লর্ড ওয়েলসলির সুযোগ্য শিষ্য তিনি এবং তাঁরই নীতির অনুসরণ করে তিনি পঞ্জাবে শিখের সামরিক প্রতিভার মেরুদণ্ডে আঘাত করেছিলেন। সমগ্র শিখজাতিকে একরকম নিরস্ত্র করে এদের হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন চাষের লাঙল। বিপ্লবের প্রাক্কালে পাঞ্জাব যে কোম্পানীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারেনি, তার মূলে ছিল স্যর জন লরেন্সের শাসন-নীতি। রণজিৎ সিংহের শিখ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার দশ বছরের মধ্যেই পঞ্চনদের সমরকুশল শিখজাতি কৃপাণের বদলে হাতে তুলে নিয়েছিল লাঙল। যদি বা কেউ কৃপাণ ধরতো তা কোম্পানীর সিপাহী হিসাবে, অন্যভাবে নয়। এই অবস্থায় স্যর জন লরেন্স তাই ভেবেছিলেন, পাঞ্জাব থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু আসন্ন বিপ্লবের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অন্যান্য ইংরেজ অফিসারদের মতই ছিল; অন্ততঃ মে মাসের প্রারম্ভ পর্যন্ত তিনি এর কোন গুরুত্বই সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং পারেন নি বলেই মারীর শৈলশিখরে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের তিনি আয়োজন করছিলেন। এমন সময়ে মিরাট-দিল্লীর সংবাদ পাঞ্জাবকে সচকিত করে তুললো। চীফ কমিশনার লাহোরেই থেকে গেলেন।

এই সময় পাঞ্জাবের অধিকাংশ সৈন্যই থাকত মিঁয়া মির-এ। লাহোরের অতি নিকটেই মিয়াঁমির। লাহোর দুর্গটি দেশীয় সৈন্যদের প্রহরায় ছিল। মিঁয়ামিরের ছাউনিতে দেশীয় সৈন্যের সংখ্যাই বেশী। তবু ইংরেজ অফিসাররা মিরাটের সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কোন রকম সন্দেহ করেনি। কিন্তু এই সংবাদ আসার পর লাহোর সেনানিবাসের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি কর্ণেল রবার্ট মণ্টগোমেরি স্যর জন লরেন্স-এর কাছে প্রস্তাব

করলেন—অবিলম্বে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা আবশ্যক। ১৩ই মে-র সকাল বেলাকার প্যারেডে মিঁয়ামিরের সিপাহীদের সহসা নিরস্ত্র করা হলো। বিস্মিত শিখ-সৈন্যরা এর কারণ বুঝে উঠতে পারল না। আফগানিস্থানের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভে সহায়তা করার এই কি পুরস্কার!—এই শুধু তারা ভাবল। লাহোরেও এক ব্যাটালিয়ন ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা হলো—তারা এসে দুর্গের সিপাহীদের নিরস্ত্র করল এবং তাদের দুর্গ থেকে বের করে দিল। পেশোয়ার, অমৃতসর, জলন্ধর প্রভৃতি পাঞ্জাবের অন্যান্য সেনানিবাসের সিপাহীরা সেই সময়ে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল, কখন মিঁয়ামিরের সিপাহীরা লাহোর দুর্গ আক্রমণ করবে। কিন্তু তার আগেই মণ্টগোমেরি ও লরেন্স দুজনেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সিপাহীদের নিরস্ত্র করে পাঞ্জাবকে বিদ্রোহের আওতা থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হন। অমৃতসরে গোবিন্দগড় দুর্গটির গুরুত্বও বড় কম ছিল না। জনরব উঠল মিঁয়ামিরের নিরস্ত্র সিপাহীরা অমৃতসরের পথে ছুটেছে গোবিন্দগড় দুর্গ অধিকার করতে। ইংরেজ বিপদের আভাস পেয়ে জাঠ ও শিখ কৃষকদের ঐ দুর্গ রক্ষা করতে উৎসাহিত করল। অনুগত দেশদ্রোহীদের হস্তগত করে ইংরেজ সেদিন অমৃতসরের দুর্গ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এইভাবে ১৫ই মে'র মধ্যে লাহোর ও অমৃতসরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে স্যর জন লরেন্স যখন সবে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করবেন, এমন সময়ে এলো দিল্লীর সংবাদ। তখন তিনি সমগ্র পাঞ্জাবের নিরাপত্তাবিধানের জন্য পেশোয়ার ও হোতিমর্দানের সেনানিবাসে অবস্থিত সিপাহীদেরও নিরস্ত্র করার আদেশ দিলেন, যদিও সেখানে বিপ্লবের আশঙ্কা আদৌ ছিল না। হোতিমর্দানের ৫৫ নম্বর পল্টনের মুসলমান সিপাহীরা এবং তাদের কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল স্পটিশউড এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। কর্ণেল আত্মহত্যা করলেন আর সিপাহীরা করলো বিদ্রোহ। এইভাবে সমগ্র পাঞ্জাবের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে স্যর জন লরেন্স প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হতে অনুরোধ করলেন।

স্থান—সিমলা, প্রধান-সেনাপতির নিবাস। সময়—১২ই মে, সন্ধ্যাবেলা। আম্বালা থেকে এক দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটিয়ে তরুণ ক্যাপ্টেন বার্নার্ড এসেছেন

প্রধান সেনাপতি জেনারেল আন্‌সনের কাছে এক দুঃসংবাদ বহন করে। সিমলার শৈলশিখরে বসে তিনি তখন গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করছিলেন।

—কী সংবাদ, ক্যাপ্টেন ?

—ইওর এক্‌সেলেন্‌সি, এ মেসেজ্‌।

—মেসেজ্‌! হোয়াট্‌ মেসেজ্‌ ?

—আমার বাবা, জেনারেল বার্ণার্ড, এই সংবাদ আপনাকে পাঠিয়েছেন, এই বলে, তরুণ ক্যাপ্টেন প্রধান সেনাপতির হাতে একটি শীলমোহর-করা লেপাফা দিলেন। ক্ষিপ্র হস্তে সেটি খুলে জেনারেল আন্‌সন পড়লেন: "দিল্লী হইতে বিষম বিপদের টেলিগ্রাম আম্বালায় পৌছিয়াছে, মিরাটের সিপাহীরা আবার বিদ্রোহী হইয়াছে বার্ণার্ড।" সংবাদটুকু পাঠ করে প্রধান সেনাপতি যার পর নাই বিস্মিত এবং উদ্বিগ্ন হলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই দ্বিতীয় পত্রবাহক এসে উপস্থিত সিমলায়। প্রথম চিঠিতে উল্লিখিত সংবাদের সমর্থন জানিয়ে জেনারেল বার্ণার্ড দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছেন: "মিরাটে ও দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীরা মহা উপদ্রব বাধাইয়াছে।" বিচক্ষণ প্রধান সেনাপতির পক্ষে এই সংবাদের যথার্থ মর্মভেদ করতে দেরী হলো না। মর্মভেদ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর আলস্য ভঙ্গ হলো না। বিপদের গুরুত্ব তিনি বা তাঁর অফিসারদের কেউ উপলব্ধি করতে পারলে না। প্রধান সেনাপতি শুধু বুঝলেন, দিল্লীর য়ুরোপীয়দের জীবন সংকটাপন্ন, তাদের উদ্ধার করা দরকার। তখনি তিনি এই বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁর একজন এডিকংকে আম্বালায় পাঠিয়ে দিলেন এবং কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেলকে লিখিলেন: "আমি এখন আরো নূতন সংবাদের অপেক্ষায় আছি। সংবাদ যদি অধিক প্রতিকূল মনে হয়, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে আম্বালায় যাত্রা করিব।"

সবে মাত্র তিনি পত্রখানি ডাকে পাঠিয়েছেন, এমন সময়ে তৃতীয় টেলিগ্রাম তাঁর হাতে এলো। এই টেলিগ্রামের সংবাদ থেকে প্রধান সেনাপতি বুঝতে পারলেন, আগের রবিবারে মিরাটে কী ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। পরের দিনই জেনারেল আন্‌সন কলকাতায় বার্তা পাঠালেন: "যেমন যেমন সংবাদ পাইব, সেই অনুসারেই কাজ করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তারপর তিনি [illegible] সৈন্যকে আম্বালায় এবং একদল গুর্খাকে মিরাটে যাত্রা করবার হুকুম দিলেন। দিল্লীর অস্ত্রাগার ভস্মীভূত হওয়ার সংবাদে তিনি বিশেষ

বিস্মিত হলেন। অন্যান্য সৈন্যনিবাসের অস্ত্রাগারগুলি যাতে সুরক্ষিত হয়, তার উপায় করবার জন্যে তিনি সেই সেই স্থানে ইংরেজ সৈন্য পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। ১৩ই মে প্রধান সেনাপতি গভর্নর-জেনারেলকে লিখলেন :

"৬১ নম্বর পদাতিক পলটন ফিরোজপুরের দুর্গ রক্ষা করিবে আর ৮১ নম্বর পলটন গোবিন্দগড়ের দুর্গ রক্ষা করিবে, আমি এইরূপ আদেশ পাঠাইয়াছি। ৮ নম্বর পলটনের দুই দলকে জলন্ধর হইতে ফিলোরে যাত্রা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।"

কিন্তু আম্বালার পরবর্তী সংবাদে বিচলিত হয়ে জেনারেল আনসন ১৫ই মে সিমলা থেকে আম্বালায় চলে এলেন। সিমলা ত্যাগের আগের দিন সকালে তিনি লর্ড ক্যানিংকে লিখলেন : "আমি আম্বালায় যাইতেছি। বুঝিতেছি বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। পরিণাম কিরূপ হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। দিল্লী দখল করিয়া বিদ্রোহীরা যদি নগর প্রাচীরে পাহারা বসাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কার্যদক্ষ সৈন্য ও সুশিক্ষিত গোলন্দাজ প্রয়োজন, কর্নাল হইতে তাহা সংগৃহীত হইতে পারিবে। যাহা হউক, আম্বালায় পৌঁছিয়া আমাকে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা আমাকে জানাইবেন।"

১৫ই মে জেনারেল আনসন সিমলার শৈলশিখর থেকে নেমে এলেন। আম্বালায় পৌঁছেই তিনি শুনতে পেলেন নানারকমের জনরব।

পাঞ্জাবের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তাদের ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। আগুন জ্বলে উঠতে পারেনি, কারণ তাদের চারপাশে ঘিরে ছিল বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য। এপ্রিল মাসে ছাউনিতে ইংরেজদের বাংলোয় রাতের বেলায় যেসব অগ্নিকাণ্ড হতো, প্রধান সেনাপতির কাছে এতদিনে তার রহস্যভেদ হলো। সিপাহীদের মনের অসন্তোষ, ইংরেজের ওপর তাদের বিরাগ সেদিন এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। সিপাহীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এতদিন যা ছিল অনুমান, আজ তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। রাওলপিণ্ডি থেকে স্যর জন লরেন্স ইতিপূর্বেই জেনারেল আনসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, দিল্লী যাবার আগে তিনি যেন বিদ্রোহী সিপাহীদের নিরস্ত্র করেন। কিন্তু অন্যান্য অফিসারদের পরামর্শে তিনি তা করেন নি। এখন তিনি উভয় সংকটে

পড়লেন। বুঝলেন কানের কাছে বাঘ। নির্বিঘ্নে এইসব বিদ্রোহী সিপাহীদের দিল্লীতেও নিয়ে যেতে পারেন না, অথচ এদের আম্বালায় রেখে যেতেও সাহস করেন না। তাই একদিন তিনি তাদের শান্ত করবার উদ্দেশ্যে তাদের সকলকে ডেকে অকপটে বললেন: "যে জন্য তোমাদের উদ্বেগ, তা দূর করা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। পূর্বে তোমাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম, তোমাদের চিন্তার কিছু কারণ নাই, ভয়ের কারণও কিছু নাই; এখনও আমি তাহাই বলিতেছি; তোমরা নির্ভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে কোম্পানীর কাজ কর। নূতন টোটা লইয়া আপত্তি, সে আপত্তি আর থাকিতেছে না, তোমাদিগকে আর নূতন টোটা ব্যবহার করিতে হইবে না। ধর্মের দোহাই দিয়া আমি বলিতেছি, তোমাদের জাতিনাশ অথবা ধর্মনাশ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের ছিল না, এখনও নাই। গভর্ণমেণ্ট কদাচ তোমাদের জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রধান সেনাপতির কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তিনি বিবেচনা করলেন যে আম্বালার সেনানিবাসে যে পরিমাণ সৈন্য আছে, দিল্লী উদ্ধারের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সেই অল্প সৈন্য নিয়ে দিল্লী অগ্রসর হতে তাঁর মন চাইল না। ১৭ই মে স্যর জন লরেন্সকে তিনি তাই লিখলেন: "এত অল্প সৈন্য লইয়া দিল্লীতে যুদ্ধযাত্রা করা সুবিবেচনার কাজ কিনা আপনি একবার তাহা বিবেচনা করিবেন। আমার বিবেচনায় ঠিক হইবে না, কেননা উপস্থিতক্ষেত্রে ইহা অপ্রচুর। বড় বড় কামান দিয়া প্রাচীর ভাঙা সহজ হইতে পারে, প্রবেশ-পথও অবাধে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু দিল্লীর মত বিশাল শহরে এত অল্প লোক লইয়া প্রবেশ করিলে, কিরূপ ফল হইবে? শহরের রাস্তা অপ্রশস্ত, অস্ত্রধারী বহু লোকে পরিপূর্ণ। শহরের গলী, ঘুঁজী রন্ধ্র, কেন্দ্র—সবই তাহাদের বিলক্ষণ জানা। এমন অবস্থায় অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রবেশ করা বিপজ্জনক।...আমার ইচ্ছা, আরো অধিক সৈন্য সংগ্রহ হউক, অব্যবহার্য ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র আনা হউক। তখন আমরা পরাজয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া পূর্ণ সাহসে অগ্রসর হইতে পারিব।"

ঐ তারিখেই লর্ড ক্যানিং প্রধান সেনাপতিকে লিখলেন: "সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করিতে আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। যত সৈন্য আপনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগকে লইয়া শীঘ্র যাত্রা করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের

কখন হইতে দিল্লী নগরী মুক্ত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ ইংরেজের ভয় দূর হইবে না, ততক্ষণ অন্যস্থানের সিপাহীরাও অবসর বুঝিয়া বিদ্রোহ করিতে থাকিবে। দিল্লীর পুনরুদ্ধার সাধিত হইলে সাধারণ শঙ্কিত লোকের শঙ্কা দূর হইবে। অতএব যুদ্ধযাত্রা করিতে কালবিলম্ব করা কোন মতেই উচিত হইতেছে না। উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়াছেন, এই সংবাদ পাইলে আমি সুখী হইব।"

এই চিঠির উত্তরে জেনারেল আন্সন লর্ড ক্যানিংকে লিখলেন: "দিল্লী-যাত্রার জন্য এখানে সেনাদল সজ্জিত করিতে আমি সাধ্যমত যত্ন করিতেছি। কিন্তু তাঁবু ও গাড়ি প্রস্তুত নাই, অথচ তাহা না হইলেও কার্য চলিবে না। ফিলোর হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার উপায় করা হইয়াছে, এখানে অস্ত্রাদির অভাব। বড় কামানেরও অভাব।"

১৭ই মে। লর্ড ক্যানিং বিলাতে আবার ডেসপ্যাচ পাঠালেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন: "দিল্লীর বিদ্রোহ চূর্ণ করিবার পক্ষে আমার প্রধান অসুবিধা এই যে, আমাকে প্রায় নয় শত মাইল দূরে থাকিয়া কাজ করিতে হইতেছে। ভারতে এখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল, তথাপি যত শীঘ্র হয় আমি ঘটনাস্থলে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছি। আমি প্রধান সেনাপতিকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গুরুত্ব সম্পর্ক বিশেষভাবে সচেতন করিয়া দিয়াছি, যাহাতে বিদ্রোহ এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিতে না পারে। ক্ষিপ্রতা সহকারে আমি সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছি। আমার ধারণা, দিল্লীর বিদ্রোহ একবার দমন করিতে পারিলে, আমাদের উদ্বেগের আর কোন কারণ থাকিবে না। সৈন্যবৃদ্ধি সম্পর্কে আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি: মাদ্রাজ হইতে শীঘ্রই একদল সৈন্য আসিতেছে; রেঙ্গুন হইতেও একদল আনাইতেছি। পারস্য প্রত্যাগত সৈন্যরা বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিলেই, তাহাদের কলিকাতায় আনিতেছি। স্যর জন লরেন্সের সাহায্যের জন্য করাচী হইতে একদল সৈন্য ফিরোজপুরে রাখিবার নির্দেশ দিয়াছি। সিংহলে স্যর হেনরী ওয়ার্ডকে কিছু সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছি এবং চীনের জন্য প্রেরিত সৈন্যদের আগে ভারতবর্ষে পাঠাইবার জন্য লর্ড এলগিনকে লিখিয়াছেন।

২১শে মে। স্যর জন লরেন্স প্রধান সেনাপতিকে লিখলেন: "গোটা ভারতবর্ষই যে আমাদের বিরুদ্ধে আমি এমন মনে করি না—অন্ততঃ এখান হইতে দিল্লীর

কয়েক মাইলের মধ্যেও নহে। আমি দীর্ঘকাল দিল্লীতে কাজ করিয়াছি, সেখানকার লোকজনকে জানি। আমার ধারণা বেসামরিক কর্মচারিদের সহায়তায় যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে ইংরেজসৈন্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর ফটক খুলিয়া যাইবে। বিদ্রোহীরা যে খুব বেশী দিন দিল্লী অবরোধ করিয়া রাখিতে পারিবে, কিম্বা আমাদের আক্রমণ হইতে উহা রক্ষা করিতে পারিবে, আমার তেমন বিশ্বাস হয় না। আপনি লিখিয়াছেন যে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। ইংরেজ সৈন্য, কামান, বন্দুক, সবই এখন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ হইয়াছে। অসন্তোষ বিস্তার লাভ করিলে বিদ্রোহের বেগ বৃদ্ধি পাইবে। ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখুন—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাহসের সঙ্গে কাজ করিয়া কোথায় আমরা অকৃতকার্য হইয়াছি? আর ভয় ও দ্বিধার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আমরা কোথায় সাফল্য লাভ করিয়াছি? লর্ড ক্লাইভ তাঁহার সহকর্মীদের পরামর্শের বিরুদ্ধে মাত্র বারো শ সৈন্য লইয়া পলাশির যুদ্ধে বিপক্ষের চল্লিশ হাজার সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং কৃতকার্য হইয়াছিলেন—ইহা স্মরণ রাখিয়া আপনি অবিলম্বে দিল্লী যাত্রার আয়োজন করুন। অনেক স্থল হইতেই আমরা সাহায্য পাইব। পাতিয়ালার মহারাজা, ঝিন্দের রাজা, নাভার রাজা প্রভৃতি আমাদের পক্ষে আছেন। অতএব কালহরণ না করিয়া আপনি কার্যে তৎপর হউন।"

এই ভাবে একদিকে স্যর জন লরেন্স অন্যদিকে লর্ড ক্যানিং দুজনেই প্রধান সেনাপতিকে দিল্লী আক্রমণের জন্য জোর তাগিদ দিতে লাগলেন। প্রতিদিনই চিঠি ও তার আসছে-যাচ্ছে। কিন্তু জেনারেল আন্‌সন দেখলেন, তাঁর সৈন্য-সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপরিমিত। সেই ভরসায় দিল্লীযাত্রা নির্বুদ্ধিতা হবে। অথচ স্যর জন ও লর্ড ক্যানিং দুজনেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি দেখলেন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত করে দিল্লী যাত্রা করা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে অসম্ভব। এই কথা কলকাতায় জানালেন তিনি। লর্ড ক্যানিং ব্যস্ত হয়ে ৩১শে মে তারযোগে আবার লিখলেন: "জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের পূর্বে আপনি দিল্লী যাত্রা করিবেন না, এই সংবাদে বিচলিত হইলাম। শুনিলাম বিদ্রোহীরা কানপুর ও লক্ষ্ণৌ দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। দিল্লীর ব্যাপারে ঔদাস্য

প্রকাশ করিলে তাহারা প্রশ্রয় পাইবে। অতএব আপনি একদল য়ুরোপীয় পদাতিক ও একদল অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লীর দক্ষিণাংশে শীঘ্র পাঠাইয়া দিন। অন্যান্য স্থান হইতে শীঘ্রই প্রচুর সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য আসিতেছে।"

কিন্তু কলকাতায় বসে লর্ড ক্যানিং প্রধান সেনাপতির অসুবিধা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলেন না। জেনারেল আনসন মিরাটে জেনারেল হিউয়েটকে এক চিঠিতে লিখলেন: "আমি দুই দল সৈন্য লইয়া ১লা জুন যাত্রা করিতেছি এবং ৫ই জুন নাগাদ বাঘপুটে আসিয়া পৌছিব। এইখানেই আমি মিরাটের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইতে চাহি। তাহা হইলে আমাদের মিলিত প্রয়াস সার্থক হইবে।"

আবার লর্ড ক্যানিং-এর টেলিগ্রাম এলো: "দিল্লী উদ্ধারের উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে এবং বিদ্রোহীদের শাস্তিবিধান কঠোর হওয়া চাই। এই ব্যাপারে কোন কঠোরতাই বেশী মনে করিবেন না। আমি আপনাকে এই বিষয়ে সমর্থন করিব।"

প্রধান সেনাপতি চিন্তিত হলেন।

দায়িত্ব গুরুতর, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণ কোথায়? কোথায় বা সৈন্যবল? কামান, বন্দুক ও রসদ সবই তো পর্যাপ্ত পরিমাণে দরকার। যাই হোক, জেনারেল আনসন দিল্লী যাত্রা করতে ব্যগ্র হলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক কষ্টে পাঁচশো গরুর গাড়ি, দু'হাজার উট ও দু'হাজার কুলি সংগৃহীত হলো এবং ত্রিশ হাজার মণ রসদও মজুত করা হলো।

২৫শে মে য়ুরোপীয় সৈন্যদের নিয়ে জেনারেল আনসন আম্বালা থেকে কর্ণালে যাত্রা করলেন। মিরাট সেনানিবাসের সঙ্গে ঠিক হলো যে, যথাসময়ে মিরাট ও আম্বালার সৈন্য দিল্লী থেকে অল্প দূরে মিলিত হবে এবং সেখান থেকে তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চালাবে সম্মিলিত অভিযান।

॥ দশ ॥

দিল্লী-পতনের সংবাদ এলো মিরাটে।

মিরাট সেনানিবাসের ভয়কাতর ইংরেজ নরনারী এই সংবাদে রীতিমতো বিচলিত হলো।

যে-রাত্রে মিরাটে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হলো, তার পরের দিন সেখানকার সৈনিক পুরুষেরা অবশিষ্ট ইংরেজদের এক জায়গায় এনে জমা করলেন। ক্যান্টনমেন্টের যেসব সম্পত্তি বিদ্রোহীরা লুঠ করতে বা নষ্ট করতে পারেনি, সেগুলো নিরাপদে রক্ষা করবার উপায়ই তাঁরা সর্বাগ্রে করলেন। ছত্রভঙ্গ সৈনাদের ও যূথভ্রষ্ট প্রহরীদের ডাকা হলো।' ছাউনির বাইরে যারা ছিল, তাদেরও ভেতরে আনা হলো। কালেক্টরী থেকে ধনভাণ্ডার সরিয়ে এনে সেনানিবাসের নিরাপদ স্থানে রাখা হলো এবং তার চারদিকে সতর্ক পাহারা বসানো হলো। কিন্তু মিরাট শহরে ও তার আশেপাশে আতঙ্ক ও জনরব দুই-ই ভীষণ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শাসন-ব্যবস্থা এতদূর বিলুপ্ত হয়েছিল যে, সবাই মনে করল, সিপাহীরা মিরাটের সব সাহেবকে কেটে ফেলেছে, একজনও বেঁচে নেই। মিরাটের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে মেজর উইলিয়মের বর্ণনা এই রকম:

"স্থানীয় নালা ও বেগম-সেতুর দক্ষিণ অংশের ব্যারাকগুলিতে একজনও ইংরেজ ছিল না। 'দমদমা' নামে বিখ্যাত সুবৃহৎ আর্টিলারি স্কুলবাড়িতে যাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতে পারে নাই। লুণ্ঠনকারীরা ধনলোভে কালেক্টরী কাছারীর আশে পাশে ঘুরিতেছিল, কারাগারের পলাতক কয়েদীরা লুটপাট করিতেছিল। বহু বিদ্রোহী ক্যান্টনমেন্ট হইতে বাহির হইয়া, আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পথিকের জীবন নিরাপদ ছিল না। বিদ্রোহীরা কেবল

কোম্পানীর সেনাদলভুক্ত সিপাহী ; তাহাদের সহিত জনসাধারণও আসিয়া মিলিত হইয়াছিল।”

মিরাটের ভয়ঙ্কর ঘটনাতেই সাধারণ আতঙ্ক আরো বেড়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের বহু বিস্তারে বিচলিত জেনারেল হিউয়েট ও কালেক্টার সামরিক আইন জারী করলেন। এদিকে দিল্লী থেকেও দিন দিন প্রতিকূল সংবাদ আসতে লাগল। সিপাহীরা সেখানকার ইংরেজদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছে, বাদশাহকে দিল্লীশ্বর বলে ঘোষণ করেছে, নগরের বহু জিনিসপত্র লুঠ করেছে এবং সেইসব লুণ্ঠিত জিনিস নিয়ে বিদ্রোহীরা মিরাটে ফিরে আসছে—দিল্লী থেকে যেসব ইংরেজ মিরাটে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাই এই সব ভয়ানক সংবাদ প্রচার করতে লাগল। হত্যার সীমাসংখ্যা নেই—এমন কথাও তাদের কারো কারো মুখে শুনে মিরাটের ইংরেজদের আতঙ্ক আরো বেড়ে গেল। আগ্রা থেকে লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর লর্ড কলভিন জেনারেল হিউয়েটকে নির্দেশ দিলেন আম্বালায় প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে অবিলম্বে বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি যেন সচেষ্ট হন। তারপর মিরাট-আগ্রা-আম্বালার মধ্যে চললো চিঠি ও তারের বিনিময়। ইতিমধ্যে ১৬ই মে রুড়কী শহরে একটা ঘটনা ঘটে গেল এবং জনসাধারণের মনে রুড়কী-বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াও কম হলো না। মিরাট থেকে ৬০ মাইল দূরে যমুনার তীরে রুড়কী শহর। স্থাপত্য-বিজ্ঞান শিক্ষা ও খাল খনন বিভাগের প্রধান কেন্দ্র এবং সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য রুড়কী তখন প্রসিদ্ধ। বিস্তর সুরম্য অট্টালিকা ও সুদৃশ্য দোকান সেখানে। কলকারখানার কাজ ও কারিগর লোকের কোলাহলে শহরটি সর্বদাই মুখরিত। এই শহরে ক্রমবর্ধনশীল মধুচক্রের মতো শ্রমিকদের বিপুল জনতা। মে মাসে সকল শ্রমিক যখন নির্বিঘ্নে সুনিয়মে দৈনিক কার্য নির্বাহ করছিল, এমন সময়ে মিরাটের সৈন্যাধ্যক্ষের কাছ থেকে কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথের কাছে সংবাদ এলো—মিরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে, তিনি যেন শীঘ্রই সসৈন্যে এখানে উপস্থিত হন। কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ রুড়কী সেনানিবাসের অধ্যক্ষ। গঙ্গার খালপথে অবিলম্বে সৈন্য পাঠাবার জন্যে তিনি স্যাপার-মাইনার রেজিমেণ্টের মেজর ফ্রেজারকে হুকুম দিলেন।

মেজর ফ্রেজার বিনা তর্কে সেই আদেশ পালন করতে সম্মত হলেন। এক হাজার লোক এক সঙ্গে রওনা হতে পারে, দু' ঘণ্টার মধ্যে সেই রকম

কতকগুলো নৌকা খালের মুখে প্রস্তুত হয়ে রইল। ৭১৩ জন সৈন্য সেই সব নৌকায় যাত্রা করবার জন্তে সজ্জিত হলো। এমন সময়ে মিরাট থেকে আবার সংবাদ এলো: "রুড়কী শহর রক্ষার জন্ত দুইদল সৈন্ত যেন সেখানে মোতায়েন থাকে।" সেই অনুসারে পাঁচশো লোক নিয়ে ফ্রেজার রওনা হলেন মিরাটের দিকে।

দিল্লীর দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল রুড়কীতে। স্যাপার-মাইনারের দল মিরাট যাত্রা করেছে। বিরাট একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টোর রুড়কীতে। কর্ণেল স্মিথ সেটি রক্ষা করবার জন্ত সচেষ্ট হলেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের খালখননের কার্যের দায়িত্বও তাঁর ওপর। বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন সৈনিক। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রুড়কী শহর একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করে ফেললেন। ১৩ই মে সকাল বেলায় তিনি প্রায় এক শ ইংরেজ ছেলেমেয়ে ও মহিলাদের শহরের একটি নিরাপদ দোকান ঘরে স্থানান্তরিত করলেন। কেননা, তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশী সিপাহী এখানে আছে, তারাই বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। নগর রক্ষার ব্যাপারে তিনি অবহেলা করলেন না। কলেজের বিরাট বাড়িটি রক্ষার জন্তে কয়েকজন দেশীয় অফিসার নিযুক্ত করলেন। সিপাহীদের মনে অকস্মাৎ এইসব ব্যাপার দেখে জাগে উত্তেজনা, জাগে সন্দেহ। হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আটার জনরব তাদের ভেতর ইতিমধ্যেই প্রচলিত হয়েছিল। এখন তারা ভয়ে ভয়ে বলাবলি করতে লাগল, হয়ত গভর্ণমেণ্ট এবার তাদের নিরস্ত্র করে মেরে ফেলবে। এমন সময় তারা শুনল যে, একদল গোরা সৈন্ত ও একদল গুর্খা সৈন্ত বীরা থেকে মিরাটে আসছে মেজর রীডের তত্ত্বাবধানে এবং তারা রুড়কী হয়ে যাবে। এই সংবাদে রুড়কীর সিপাহীরা অত্যন্ত বিচলিত হলো। ভাবলো, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবার জন্তেই ঐসব পলটন আমদানী করা হচ্ছে। বেয়ার্ড স্মিথ সিপাহীদের মধ্যে এই চাপা অসন্তোষ আর উত্তেজনা লক্ষ্য করে রীডকে লিখে পাঠালেন—"তোমরা রুড়কীতে আসিও না, খালে তোমাদের জন্ত নৌকা প্রস্তুত আছে, সেই সব নৌকায় চড়িয়া সরাসরি মিরাটে চলিয়া যাইবে।" মেজর রীড তাই করলেন। রুড়কীর সেনাদলের ভয় দূর হলো।

মেজর ফ্রেজার নির্বিঘ্নে স্যাপারদের নিয়ে মিরাটে পৌঁছলেন। পথে তারা কোনো রকম অবাধ্যতা বা দুর্ব্যবহার দেখায় নি। মিরাটে পৌঁছেও তারা শান্ত

ছিল। কিন্তু যেই ক্রেজার তাদের বললেন—সমস্ত [illegible] [illegible] গাড়িতে রাখা হবে, তখনই সন্দিগ্ধচিত্ত সিপাহীরা বিপদের আশঙ্কায় ক্ষেপে দাঁড়াল, মালবোঝাই গাড়িগুলোর গতিরোধ করল। একজন পাঠান সিপাহীর গুলিতে ক্রেজারের নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাঁর এক সহকারী অফিসার আহত হলেন এবং একজন দেশীয় অফিসার নিহত হলেন। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

অশ্বারোহী গোলন্দাজ-সৈন্য বিদ্রোহীদলের পিছনে ছুটলো, গোলন্দাজেরা গোলা-গুলী বর্ষণ করতে লাগল, অনেক বিদ্রোহী পালিয়ে গেল, পঞ্চাশ জন পলাতক বিদ্রোহীকে ধরে এনে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হলো। মিরাটের অন্য সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হলো।

এই ঘটনার পর মিরাট কিছুদিনের জন্য নিস্তব্ধ-নিশ্চিন্ত।

মিরাট থেকে আগ্রা—প্রতিদিনই তারবার্তার বিনিময় চলছে।

মিরাটে এই নূতন বিদ্রোহের সংবাদ যখন আগ্রায় কলভিনের কাছে পৌঁছল, তিনি জেনারেল হিউয়েটকে লিখলেন, "আপনার সেনানিবাসে একদল ইংরেজ রাইফেল পলটন, একদল ইংরেজ ড্রাগুন ও দুই দল গোলন্দাজ সৈন্য আছে। ঈশ্বরের দোহাই, এই সময় আপনি কিছু করুন।" কিন্তু হিউয়েটের নিশ্চেষ্টতায় বিরক্ত ও বিচলিত হয়ে লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর ব্রিগেডিয়ার উইলসন্‌কে টেলিগ্রাফ করলেন:—"আপনি সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করুন। বিদ্রোহীরা যেন দোয়াব অঞ্চলে কোন রকম বিপদ ঘটাইতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন।" কিন্তু প্রধান সেনাপতির আদেশ ভিন্ন মিরাট থেকে তিনি কি করে সৈন্য স্থানান্তরিত করবেন—এই কথা ব্রিগ্রেডিয়ার উইলসন উত্তরে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তাছাড়া, এককালে মিরাট সেনানিবাস শূন্য করে সমস্ত সৈন্য নিয়ে দিল্লীর পথে যাত্রা করা কতখানি অবিবেচনার কাজ হবে, সেকথাও জানালেন। অন্যদিকে মিরাটের এই নিষ্ক্রিয়তা দেখে জনপদের লোকেরা ধারণা করল যে, মিরাটে একটিও ইংরেজ সৈন্য নেই। কিন্তু মিরাট ব্রিগ্রেড শীঘ্রই সচল হয়ে উঠল। ব্রিগ্রেডিয়ার উইলসন প্রধান সেনাপতির হুকুমের অপেক্ষা করছিলেন। এখন সেই হুকুম এসে পৌঁছল। অবিলম্বে আম্বালা থেকে কর্ণালের পথ হয়ে লেফটেনেন্ট হডসন্ এলেন মিরাটে প্রধান সেনাপতির পত্র নিয়ে এবং একই [illegible] চিঠির জবাব নিয়ে তিনি দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে ফিরে এলেন।

আর ইতস্ততঃ করবার কারণ রইল না। দিল্লী আক্রমণের জন্য আম্বালা থেকে যেসব সৈন্য আসছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্রিগেডিয়ার উইলসন সসৈন্যে যাত্রা করবার আয়োজন করতে লাগলেন। মিরাট শিবিরে সৈন্যদের মধ্যে আবার দেখা দিল প্রাণচাঞ্চল্য। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ ও রাইফেল সেনাদল নিয়ে গঠিত একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে ২৭শে মে মিরাট থেকে রওনা হলেন তিনি। কয়েকটি কামানও তাঁদের সঙ্গে রইল। আর রইলেন কালেক্টার গ্রেটহেড আর জান ফিসান খাঁ নামে কোম্পানীর অনুগৃহীত এক পাঠান সর্দার।

২৫মে। জেনারেল আনসন তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে আম্বালা থেকে রওনা হলেন।

প্রথম অগ্রগামী একদল সৈন্য আগেই যাত্রা করেছিল। এখন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে প্রধান সেনাপতি কর্ণালে যাত্রা করলেন। কর্ণালের নবাব ইংরেজ পক্ষে। পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দের মহারাজার কাছ থেকেও সৈন্য-সাহায্য চাওয়া হলো। তাঁরা সকলেই ইংরেজ পক্ষে সাহায্যদানে সম্মত হলেন। কর্ণালের সেনানিবাসের সৈন্যদের জন্য গাড়ি ও রসদ সংগ্রহ করে দিলেন ঝিন্দের রাজা। স্যর জন লরেন্সের অনুরোধে পাতিয়ালার মহারাজা থানেশ্বর ও লুধিয়ানায় একদল সৈন্য পাঠালেন। ফিরোজপুরের ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশমত ফরিদপুরের রাজাও কিছু সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন এবং কোটলার নবাবও কিছু সৈন্য নিয়ে লুধিয়ানা যাত্রা করলেন। এইভাবে কোম্পানীর আশ্রিত শিখ সর্দাররা ইংরেজের পক্ষে দাঁড়ালেন।

২৬শে মে। কর্ণাল।

দুর্জয় কলেরা রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হলেন জেনারেল আনসন। প্রাণসংশয় পীড়া। জীবনের আশা নেই। নিরুপায়, নিরাশ্রয়, মৃত্যুশয্যাশায়ী প্রধান সেনাপতি তাঁর সহকারী জেনারেল বার্ণার্ডকে তাঁর শিবিরে ডেকে পাঠালেন। তখনও অল্প অল্প জ্ঞান আছে, বার্ণার্ডকে তিনি চিনতে পারলেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর জেনারেল আনসন অতি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, "বার্ণার্ড! তোমার হাতে আমি সৈন্যাপত্য দিয়ে

গেলাম। কর্তব্যপালনে আমার কতদূর আগ্রহ ছিল, তাহা তুমি সকলকে বলিও। আমি বাঁচিব না—তুমি কৃতকার্য হও—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—বিদায়।"

২৭শে মে। রাত দেড়টার সময়ে প্রধান সেনাপতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে কর্ণাল শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এলো। শোকাচ্ছন্ন চিত্তে স্যার হেনরী বার্ণার্ড তাঁর সহকর্মীর হাত থেকে সৈনাপত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রধান সেনাপতির অসমাহিত মৃতদেহের পাশে বসে সেইদিনই তিনি স্যর জন লরেন্সকে এক চিঠিতে লিখলেন: "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লীতে হানা দিতেছি। সরঞ্জাম ও সৈন্যের বহু অসুবিধা এখনও আছে, তথাপি আমি দিল্লী দখল করিতে পারিব, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 'আমি' শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, জেনারেল আনসন্ মৃত্যুকালে আমার হাতে সৈনাপত্যের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।"

সৈনাপত্য গ্রহণ করে স্যর হেনরী বার্ণার্ড উপস্থিত ক্ষেত্রের সব অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি দৃঢ়সংকল্প হয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। আম্বালার সৈন্যরা একত্র হয়ে দিল্লীতে যুদ্ধযাত্রা করল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সূর্যকিরণ ইংরেজ সেনাদের পক্ষে অসহ্য, তাই তারা দিনের বেলায় মার্চ করতে চাইল না। তাঁবুর মধ্যেও প্রচণ্ড রৌদ্র। সৈন্যরা ঘুমোবার চেষ্টা করে, ঘুম আসে না। তাঁবুর মধ্যে সবাই যেন মৃতবৎ নিশ্চল। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে তারা আবার প্রাণ ফিরে পেত, তাদের অবসন্নতা দূর হতো। সারা রাত ধরে চাঁদের আলোয় তারা মার্চ করত প্রফুল্ল মনে। শত্রুর শোণিত পানে তারা ব্যগ্র। দীর্ঘপথ অতিক্রমে তাদের ক্লান্তি নেই এতটুকু। ইংরেজ সৈন্যদের এই দিল্লীযাত্রা সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এই রকম: "কার্যকাল আর অধিক দূরবর্তী নয়। সকলেরই বিশ্বাস প্রতিশোধের চরম ফল দাঁড়াইবে। অনেক লোকের ধারণা একদিনের যুদ্ধেই বিদ্রোহীদলের ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া যাইবে। আমরা দিনের বেলায় যুদ্ধ করিব, রাত্রিকালে দিল্লীতে বসিয়া মদ খাইব।" বার্ণার্ডের সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাঁর অধীনস্থ সওয়ার সৈন্যেরা শীঘ্র এগিয়ে যেতে ব্যগ্র। কিন্তু তিনি অধৈর্য হলেন না—মিরাটের সৈন্যদের

সঙ্গে পথিমধ্যে মিলিত হবার জন্তে তিনি সৈন্তবাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

হিন্দনের ধারে গাজীউদ্দিন নগর।

এইখানে ৩০শে মে প্রথম সংঘর্ষ বাধলো বিদ্রোহীদের সঙ্গে।

মিরাট থেকে রওনা হয়ে দু'দিন পরে বাহিনী ব্রিগেডিয়ার উইলসন এসে পৌছলেন গাজীউদ্দিন নগরে। বিদ্রোহীরা হঠাৎ বেরিয়ে এসে মিরাট ব্রিগেডের সেনাদলের মুখোমুখি দাঁড়াল। দিল্লী জয়ের উল্লাসে তারা উল্লসিত। একটা উঁচু জায়গার ওপর তারা সাজিয়ে রেখেছে বড় বড় কামান। সেখান থেকে আরম্ভ করল ইংরেজসৈন্তের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। ইংরেজ পক্ষ থেকেও কামানে কামানে সেই সব তোপের উত্তর দেওয়া হতে লাগল। রাইফেল পলটন আরো এগিয়ে বিদ্রোহীদের অদূরে গিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। অশ্বারোহী গোলন্দাজ ও তরবারধারী সেনাদলের সঙ্গে হিন্দন নদ পার হয়ে একজন ইংরেজ সেনাপতি পরপারের বন্ধুর ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ইংরেজ সৈন্তের গোলাবৃষ্টিতে শত্রুপক্ষের বাঁ দিকের সৈন্তশ্রেণী বিমুখ হয়ে গেল। ক্রমাগত গোলাবর্ষণে বিদ্রোহীরা বিপর্যস্ত হয়ে পায়ে পায়ে পিছু হটে গেল এবং অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে কাছাকাছি গ্রামে আশ্রয় নিতে গিয়েছিল, রাইফেলধারী সৈন্যরা তাদের সেখান পেছনে পেছনে তাড়া করল। বিদ্রোহীরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দিল্লীর প্রাচীরের দিকে ছুটে পালাল। তাদের পাঁচটা কামান ইংরেজ সৈন্তের হস্তগত হলো। কিন্তু ইংরেজপক্ষেও ক্ষতি কম হলো না। বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন ইংরেজপক্ষের অস্ত্রপূর্ণ একখানা মাল গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই গাড়ীতে ছিল একটা কামান। ভীম গর্জনে সেই কামান ফেটে অগ্নিবৃষ্টি হলো—একজন ক্যাপ্টেন ও অনেকগুলি ইংরেজ সৈন্ত প্রাণ হারাল। যুদ্ধে পরাজিত বিদ্রোহীরা দিল্লীতে ফিরে গেল বটে, কিন্তু পরের দিনই তারা নতুন সাহসে নতুন ভাবে সজ্জিত হয়ে বিগ্রেড সৈন্তদলের মুখোমুখি দাঁড়াল। সেদিন ছিল রবিবার। আগের দিনের যুদ্ধে নিহতদের সমাধি দেওয়া হলো সামান্ত ভাবে। শোক প্রকাশের অবসর নেই। খবর এলো বিদ্রোহীরা আবার

যুদ্ধ করতে আসছে। বেলা দুপুরের সময় ইংরেজপক্ষে ভেরীধ্বনি করে সংকেত ঘোষণা করা হলো। বিদ্রোহীরা দাঁড়িয়ে আছে হিন্দন নদের দক্ষিণ তীরে উচু জায়গার ওপর। দুই দলের মধ্যে এক মাইলের ব্যবধান মাঝখানে একটা সেতু। প্রথমে বিদ্রোহীরা শুরু করল গোলাবর্ষণ। বিপক্ষের তোপের উত্তর দিল ইংরেজ গোলন্দাজ দল। সেতুমুখে এসে দাঁড়াল রাইফেল পল্টন কামান নিয়ে। গোলায় গোলায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধ। বিপক্ষের গোলাতে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ধরাশায়ী হলেন। অশ্বারোহী ও পদাতিকদলের অবস্থা শোচনীয়—জমির ওপর শত্রুপক্ষের কামানের আগুন, মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্যকিরণের প্রখর আগুন। মে মাসের শেষ। রৌদ্রের ভীষণ উত্তাপ। তার সঙ্গে এসে মিশেছে দগ্ধগ্রামের জলন্ত আগুনের ভীষণ উত্তাপ—সেই উত্তাপে আরো প্রখর হয়েছে সূর্যের তেজ। উইলসনের সৈন্যরা তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ। অসহ্য উত্তাপ। কেউ কেউ মারা গেল সর্দিগর্মিতে, কতক মারা গেল তৃষ্ণায়, কতক বিপক্ষের গোলায়—তুমুল হুলস্থূল পড়ে গেল ইংরেজ শিবিরে। যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলল না। দারুণ গ্রীষ্মের তাপে সিপাহীরাও আর বেশীক্ষণ যুদ্ধ করতে পারল না। তারা কামানবন্দুক নিয়ে দিল্লী ফিরে গেল। ইংরেজ শিবিরে উঠল আনন্দের কোলাহল।

দুদিনের যুদ্ধের ফলাফল দেখে বিগ্রেডিয়ার উইলসন কিন্তু উল্লসিত হলেন না। ইংরেজসৈন্য প্রশংসনীয়রূপে যুদ্ধ করেছে এবং দুদিনই তাদের জয়লাভ হয়েছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইংরেজসৈন্যরা কাতর হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহীরা যদি আবার বেশী লোক নিয়ে আক্রমণ করে, তাহলে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে কিনা, ভাবলেন উইলসন। জুন মাস সমাগত। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজ-সৈন্যের দলপুষ্টি হলো—বুলন্দ শহর থেকে ক্যাপ্টেন রীডের অধ্যক্ষতায় পাঁচশো গুর্খা সৈন্য হিন্দনের তীরে এসে উপস্থিত হলো। ওদিকে জেনারেল বার্ণার্ডের সৈন্যদল দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে দিল্লীর দিকে। ৫ই জুন জেনারেল বার্ণার্ডের সৈন্যরা আলিপুরে এসে পৌছল। আলিপুর দিল্লী থেকে ১২ মাইল। মিরাটের সৈন্যদের সঙ্গে এইখানে তাদের মিলবার কথা, তাই তাদের প্রতীক্ষায় সেদিন তারা সেখানেই রইল। হিন্দনের যুদ্ধের পর ব্রিগেডিয়ার উইলসন প্রধান সেনাপতির হুকুমের অপেক্ষা করলেন। ৪ঠা জুন নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সসৈন্যে দিল্লীর পথে অগ্রসর হলেন এবং মধ্য রাত্রেই বাঘপুটে যমুনা পার

হলেন। আম্বালার সৈন্য তার দুদিন পরেই সংযোগস্থলে এসে পৌছল এবং মিরাট সৈন্যদল ৭ই জুন এসে তাদের সঙ্গে সেইখানে মিলিত হলো। ৮ই জুন সকালবেলায় আরম্ভ হলো সম্মিলিত বাহিনীর দিল্লীযাত্রা।

পথিমধ্যে জেনারেল বার্ণার্ড সংবাদ পেলেন, মিরাট ও দিল্লীর খুব নিকটেই আছে বিদ্রোহীরা। সংবাদ সত্য। বিদ্রোহীরা এসে জমা হয়েছে বদলী-সরাইতে। দিল্লী থেকে দু'মাইল দূরে এই স্থানটি। ইংরেজরা সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করতে আসছে শুনে বিদ্রোহীরা দিল্লীর বাইরেই তাদের অভ্যর্থনা জানায় অস্ত্রের মুখে। এইখানেই তারা ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দেবার জন্যে ত্রিশটা কামান নিয়ে পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। পদাতিক সৈনা, আর আছে অশ্বারোহী সৈন্য। সকলেরই বন্দুকে গুলিভরা, সকলেরই তলোয়ারের খাপখোলা। সকলেই ইংরেজের শোণিত-পিপাসু রণোন্মত্ত। প্রাণপণ যুদ্ধ করবার জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বদলী-সরাইতে অনেক পুরাতন অট্টালিকা ও প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর উদ্যান। একসময়ে মোগল বাদশাহী দরবারের প্রধান প্রধান অমাত্য এবং আমীর-ওমরাহেরা এইখানে বাস করতেন।

৮ই জুন সকালবেলা।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে মার্চ করে চলেছে জেনারেল বার্ণার্ডের সৈন্য-বাহিনী। রাস্তার একদিকে নদী, অন্যদিকে পশ্চিমবাহিনী যমুনার খাল। ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্ট অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ দল নিয়ে যমুনা খাল পার হয়ে এসে মিললেন বার্ণার্ডের দলের সঙ্গে। বিদ্রোহী সিপাহীরা সকলেই তোপ দাগতে আরম্ভ করল। গোলার আঘাতে অনেক ইংরেজ অফিসার ও অনেক সৈন্য নিহত হলো। সিংহনাদ করে প্রবল বিক্রমে বিরাট কামান চালায় তারা। কামান-বন্দুকেই তারা প্রকাশ করল তাদের পরাক্রম। ইংরেজের কামানগুলি তুলনায় অনেক ছোট, তাই বিশেষ কোন সুবিধা তারা করে উঠতে পারল না। বিদ্রোহীরা কামান দাগতে আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাল। প্রধান সেনাপতি সেই অগ্নিক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়িয়ে অনুভব করলেন, কালো চামড়ার তলায় রয়েছে প্রতিজ্ঞামূলক তেজস্বিতা। ইংরেজের কাছে তারা যে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিল, তা বৃথা হয়নি। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তারা যুদ্ধ করতে লাগল অকুতোভয়ে।

হঠাৎ ইংরেজ সৈন্য চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করল। নিরুপায় সিপাহীরা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলো। বিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণে আর গোলাবর্ষণে আকস্মিক ভয়ে অভিভূত বিদ্রোহীরা নৈরাশ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দিল্লী থেকে নিয়ে আসা কামান গোলাবারুদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র সব পড়ে রইল। ইংরেজ সৈন্য তা দখল করল। প্রথম যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভ হলো।

সকালের সূর্য আরো তীব্র হয়ে উঠল। জুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র দেখতে দেখতে দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সৈন্যরা রাতে মার্চ করে বহু দূর পথ অতিক্রম করেছে, তারপর সকালেই যুদ্ধ করেছে। তারা তাই অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত। তার ওপর অসহ্য রৌদ্রের তাপ। সূর্যের তাপে আর ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তারা সবাই কাতর। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণ ও তৃষ্ণাশান্তির অবকাশ অল্পই। জেনারেল বার্ণার্ড ভূয়োদর্শী সেনাপতি। তিনি দেখলেন, বিদ্রোহীরা যদিও বদলী-সরাই-এর যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে গেছে, কিন্তু তারা যে আর যুদ্ধ করবে না, এমন সিদ্ধান্ত করা ভুল। নিশ্চয়ই তারা নতুন উদ্যমে নতুন বল সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। রাজধানীর প্রাচীরের সামনে আসাতেই কার্য শেষ নয়—আরো গুরুতর কার্য রয়েছে ভাবলেন জেনারেল বার্ণার্ড।

এইসব ভেবে-চিন্তে তিনি শিবিরে শৈথিল্য প্রদর্শনে বিরত হলেন। সমানবেগে সৈন্য চালনা করাই সঙ্গত বিবেচনা করলেন। এখন দরকার সৈন্য সমাবেশের জন্য একটা নিরাপদ স্থান, যেখান থেকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের সর্বদা প্রস্তুত রাখা যায়। বদলী-সরাই থেকে দুটো রাস্তা দুদিকে গিয়েছে; একটা রাস্তায় বরাবর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে সবজীমণ্ডীর শহরতলী পর্যন্ত যাওয়া যায় আর দ্বিতীয় রাস্তাটা গিয়েছে পুরানো ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত। যেখান থেকে রাস্তা দুটো আরম্ভ হয়েছে, সেইখানে ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের ওপর একটা উঁচু জমি, তার ওপর দাঁড়ালে দিল্লী শহর দেখতে পাওয়া যায়। বার্ণার্ড সেইখানে সৈন্যদের দুই দলে ভাগ করলেন, একদল নিয়ে ব্রিগেডিয়ার উইলসন যাবেন সবজীমণ্ডির পথে, অন্যদল নিয়ে তিনি নিজে দ্বিতীয় রাস্তায় সাবেক ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে যাবেন। এই ঠিক হলো। দুই দল দুই দিকে যাত্রা করল। জেনারেল বার্ণার্ড একটু অগ্রসর হয়েই দেখলেন, বিদ্রোহীরা বড় বড় কামান নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে রয়েছে। দুই

পক্ষেই চললো গোলার বিনিময়। বিদ্রোহীরা এবার বেশীক্ষণ যুদ্ধ করতে পারল না। তারা উপায়ান্তর না দেখে দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। ওদিকে বিগ্রেডিয়ার উইলসনও সবজীমণ্ডীর পথে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন, বিদ্রোহীরা সে-দিকেও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজ সৈন্য পুরাতন ক্যান্টনমেণ্টের কাছাকাছি সিপাহী ছাউনীতে আগুন লাগিয়ে দিল। দূর থেকে বিদ্রোহীরা সবিস্ময়ে দেখল সেই সধূম অগ্নিশিখা। সেদিনের যুদ্ধের পর শহরের প্রাচীরের বাইরে বিদ্রোহীদের আর আশ্রয়স্থান ছিল না। বদলী-সরায়ের যুদ্ধে যেসব ইংরেজ অফিসার নিহত হন তাদের মধ্যে প্রধান সেনাপতির পুত্র তরুণ কাপ্টেন বার্ণার্ড একজন।

বেলা পাঁচটার মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। বিদ্রোহীদের ২৩টি কামান ইংরেজদের হস্তগত হলো। সেইখানেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে জেনারেল বার্ণার্ড সন্ধ্যায় কলকাতায় লর্ড ক্যানিংকে ডেসপ্যাচ পাঠালেন—"প্রথম দিনের যুদ্ধের ফলে বিদ্রোহীরা শহরের মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এইবার দিল্লী-আক্রমণ ও উদ্ধারের পর্ব শুরু হইবে।"

॥ এগার ॥

মে মাস শেষ হয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে যে খবর পেয়ে লর্ড ক্যানিং নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, এখন আবার উদ্বেগজনক সংবাদ আসতে আরম্ভ করেছে। রাজধানীর ইংরেজ নরনারীর আনন্দ তিরোহিত হলো। খবর এলো সং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ঘনঘন তারবার্তা আসছে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান থেকে। তারবার্তা নয় বিপদ-বার্তা। ভয়ঙ্কর সেসব খবর। গভর্ণর-জেনারেল সজাগ হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ থেকে সসৈন্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন কর্ণেল নীল। কর্ণেল জেমস জর্জ নীল। বহু যুদ্ধের বীরযোদ্ধা তিনি। সতর বছর বয়সে সৈন্যদলে ভর্তি হন। ত্রিশ বছর কাজ করে উপস্থিত সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্যে যখন তিনি কলকাতায় এলেন, তখন তাঁর বয়স সাতচল্লিশ বছর। পারস্য উপসাগর থেকে যেসব সৈন্য মাদ্রাজে ফিরেছিল, তাদেরই একদলকে নিয়ে কর্ণেল নীল এলেন রাজধানীতে। সেই দলের মোট সৈন্যসংখ্যা ন'শো। লর্ড ক্যানিং-এর নির্দেশ মত তিনি সেই সব সৈন্য নিয়ে কাশী রওনা হলেন। তখন রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল। তারপর সেখান থেকে গরুর গাড়ি কিম্বা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ি-ঘোড়ার ডাকে রাণীগঞ্জ থেকে কাশী যেতে পাঁচ দিন লাগত।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে ঐসব উদ্বেগজনক সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যরা উপস্থিত বিপদ নিবারণে সজাগ হয়ে উঠলেন। লর্ড ক্যানিং দেখলেন চারদিকে যে রকম অরাজক কাণ্ড চলছে, তাতে বিপদাপন্ন যারা তাদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয়। ইংরেজের সংখ্যা কম, বিদ্রোহীর সংখ্যা বেশী। বিপ্লবের দিনে প্রচলিত বিধান অচল। ফলে, দিন দিন বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব

বিবেচনা করে একটা নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা কাউন্সিলে স্বীকৃত হলো এবং সেই অনুসারে তার পাণ্ডুলিপিও তৈরি হলো। ৩০শে মে এই আইনের পাণ্ডুলিপি সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গভর্ণর-জেনারেলের মঞ্জুরির জন্ত পাঠান হলো। ৮ই জুন আইন পাশ হলো। নূতন আইনটি এই রকম:

"বিদ্যাবুদ্ধি এবং বয়স নির্বিচারে গভর্ণমেণ্টের কার্য-নির্বাহক সমস্ত কর্মচারী ফৌজদারী ক্ষমতা ধারণ করিবেন। ইংলণ্ডের রাণী অথবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত যাহাদের রাজা-প্রজা সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে যাহারা কোন স্থানে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবে কিম্বা প্রচলিত আইন অমান্ত করিয়া বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, উপরোক্ত কর্মচারিগণের বিবেচনায় তাহাদিগকে ফৌজদারী বিচারাধীনে আনা যুক্তিসিদ্ধ হইবে, উপযুক্ত কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। কমিশন সরাসরি আসামিগণের বিচার করিতে পারিবেন; অপরাধ বিশেষে আসামিগণের প্রাণদণ্ড, নির্বাসনদণ্ড অথবা কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহাদের দণ্ডাজ্ঞাই চূড়ান্ত হইবে। তাহার উপর আর আপিল থাকিবে না। প্রত্যেক ইংরেজকেই এই ক্ষমতা দেওয়া এই আইনের উদ্দেশ্য। কেবল অসৈনিক কর্মচারীরাই ঐ ক্ষমতা প্রাপ্ত; অতএব হুজুর কাউন্সিলে শ্রীযুক্ত গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুর এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর সমস্ত প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা কি দেশীয় কি য়ুরোপীয়, কিম্বা উভয় মিশ্রিত সর্বপদস্থ লোকেরা আবশ্যক বুঝিলেই সামরিক বিচারালয় বসাইবেন, সেই সেই বিচারালয়ে পাঁচজন করিয়া বিচারক থাকিবেন; তাঁহারা যাহাদের প্রতি যেরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন, তাহাই বলবৎ হইবে।"

এই আইন সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে তুলে দিল অসম্ভব ক্ষমতা।

আর সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগও হলো চূড়ান্তভাবে।

কথায় কথায় কোর্ট-মার্শাল আর দণ্ড মানেই প্রাণদণ্ড।

এই আইনের স্টীমরোলার সেদিন ভারতের মাটিতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ ভারত-বাসীর প্রাণকে নির্মমভাবে নিঃশেষিত করে কী প্রচণ্ড বেগে ছুটেছিল, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে সে এক মর্মান্তিক অধ্যায়। যথাস্থানে আমরা তার বিবরণ দেব।

বিদ্রোহ-বিস্তারে উদ্বিগ্ন হলেন লর্ড ক্যানিং।

এখন তাঁর চিন্তার বিষয় কেবলমাত্র দিল্লী নয়—উত্তরপশ্চিম অঞ্চল। এই অঞ্চলে গঙ্গা ও যমুনার তীরে অবস্থিত প্রত্যেকটি শহর—কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর—একরকম অরক্ষিত বললেই হয়। একমাত্র দানাপুর ও আগ্রায় দুটি ইংরেজ পলটন ছিল আর ছিল গুটিকতক গোলন্দাজ সৈন্য। বাকী সবই দেশীয় সৈন্য। এক কানপুর নিয়ে দুশ্চিন্তা কম নয়। গঙ্গার তীরে কানপুর। বহু ইংরেজের বাস এখানে। এখানকার ক্যাণ্টনমেণ্টটিও অতি বৃহৎ। কয়েক দল দেশীয় সৈন্য এবং অতি অল্প সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য। গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই সব অরক্ষিত সেনানিবাসগুলির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করলেন লর্ড ক্যানিং। এই স্থানগুলির নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করছে এক বিশাল ভূখণ্ডের নিরাপত্তা—অসংখ্য ইংরেজ নর-নারীর জীবন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এইসব জায়গায় মে মাসের গোড়াতেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেনি। তা যদি করত, তাহলে ভারতে ইংরেজের চিহ্ন থাকত না। দিল্লী-পতনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব স্থানে বিদ্রোহ হয়নি, তবে শহরে ও সেনানিবাসে উত্তেজনা প্রবল ছিল। মিরাট ও দিল্লীর মত এসব স্থানের জনসাধারণের মধ্যেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তা শুনে গভর্ণর-জেনারেল সর্বদাই আশঙ্কা করছিলেন, মিরাট-দিল্লীতে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, অন্যান্য স্থানে তার চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর ঘটনা হওয়া বিচিত্র নয়।

কলকাতা থেকে চারশো ষাট মাইল দূরে কাশী।

গঙ্গার তীরে শোভা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে এই অপরূপ সুন্দর নগর। হিন্দুর সর্ব্বকালের প্রিয় তীর্থ। কোম্পানীর আমলেই কাশীর লোকসংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। সমসাময়িক এক ইংরেজ লেখকের বর্ণনায় তখনকার বারাণসীর রূপ এই:

"ভাগীরথী-তীরে বারাণসী নগরী মনোহারিণী শোভা বিস্তার করিতেছে। বেগবতী নদীতীরে যেসব নগরী অবস্থিত, তাহাদের সকলের অপেক্ষা কাশীর শোভা অতি চমৎকার, সকলের নয়নরঞ্জন, বর্ণনায় অতুলনীয়। কাশীর সৌধাবলী সুদৃশ্য। অগণিত দেব-মন্দিরে সুশোভিত এই নগরী। পুরাতন কালের ও আধুনিক স্থপতি ও ভাস্করগণের শিল্প-নৈপুণ্যের অতি

উজ্জ্বল স্বাক্ষর এই নগরীর প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডে বিদ্যমান। মন্দির ও মসজিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এক পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, বারাণসীতে এক হাজার চারি শত চুয়াত্তরটি দেব-মন্দির আর দুই শত বাহাত্তরটি মসজিদ আছে। হিন্দুজাতির একটি প্রধান তীর্থ কাশী। এই পুণ্যতীর্থে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকূলে অসংখ্য সোপান-বিশিষ্ট অসংখ্য ঘাট। সেই সকল ঘাটে প্রতিদিন বহু নরনারী স্নান করেন, বহুলোকে পবিত্র গঙ্গাজল তুলিয়া গৃহে গৃহে লইয়া যায়। নানাদেশের বহুলোক নানা কাজের জন্ম এইখানে বাস করে। কাশীর বাজারে বহুদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, শিল্প-সম্ভার ও মূল্যবান বস্ত্রাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। বহুদেশ হইতে তীর্থযাত্রী কাশীতে সমাগত হয়। কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হইবে, এই বিশ্বাসে বহু হিন্দু নর-নারী বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী হইয়া থাকেন। হিন্দু-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বারাণসীর একটি পবিত্র নাম মুক্তিক্ষেত্র। বেদাধ্যয়ন ও দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনার জন্ম কাশীর খ্যাতি সারা ভারতে। এখানে অসংখ্য পণ্ডিতের বাস। দেশ-বিদেশের বিদ্যার্থী ছাত্রেরা তাঁহাদের নিকটে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে। কাশীর অধিবাসী সংখ্যা তিন লক্ষ। লর্ড মেকলে অনুমান করেন পাঁচ লক্ষ। এই শহরের জনসাধারণের শতকরা নব্বই জনই হিন্দু।"

১৮৫৭-তে কাশীর বাজারে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হলো। জনসাধারণের বিশ্বাস, কোম্পানীর শাসনদোষেই এমন হয়েছে। তখনকার কাশীর কালেক্টারের মতে এই সময় (মার্চ, ১৮৫৭) কাশীতে একটি ছোটখাট দুর্ভিক্ষই হয়েছিল এবং সেই দুর্ভিক্ষের ফলে দরিদ্র সিপাহীদের বিশেষ কষ্ট হয়। এ ছাড়া, দিল্লীর ক্ষয়িষ্ণু মোগল বংশের যাঁরা এই সময়ে কাশীতে ছিলেন, তাঁরাও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার করেন। শুধু অসন্তোষ নয়, ইংরেজ-বিদ্বেষও। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন নজর-বন্দী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত শিখ, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমান। এঁরা সবাই ভেতরে ভেতরে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করার ষড়যন্ত্র করতেন। এমন কি, দিল্লীর মোগল বংশের লোকেরা কাশী ও মির্জাপুরের বহু ব্যবসায়ী শ্রেণীকে পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে উৎসাহিত করে তুলেছিল। এর ওপর নতুন বন্দুক ও টোটার প্রচলনে ধর্মলোপ হবার আশঙ্কায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

কাশীর উত্তর-পশ্চিম তিন মাইল দূরে সিক্রোল। সেইখানেই ইংরেজের ক্যান্টনমেন্ট, দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত, জেলখানা, গির্জা, গোরস্থান, কলেজ, মিশনারীদের স্কুল—সব কিছু। সেনানিবাসে অর্ধ পল্টন ইংরেজ সৈন্য আর তিন দল সিপাহী। তিন দলের সংখ্যা দু' হাজার। ইংরেজ কামানরক্ষক মাত্র ত্রিশ জন। *ব্রিগেডিয়ার জর্জ পন্‌সন্‌বি এই সৈন্যদলের অধিনায়ক।* ইনিই কাবুলের যুদ্ধে আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর অশ্বারোহীদলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করে বিলক্ষণ গৌরব অর্জন করেছিলেন। হেনরী টাকার তখন কাশীর কমিশনার। সিভিলিয়ান কিন্তু সৈনিকপুরুষের মতই পরাক্রান্ত। বিচারপতি ফ্রেডারিক গাবিন আর ম্যাজিষ্ট্রেট মিস্টার লিণ্ড। কমিশনার, জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মিরাট ও দিল্লীর দুঃসংবাদ জানতে পারলেন, তখন তাঁরা তিনজনেই ব্রিগেডিয়ার পন্‌সন্‌বির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মিরাট ও দিল্লীতে যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে, তা স্মরণ করেই তাঁরা শহরের ইংরেজ অধিবাসীদের বিশেষ করে শিশু, নারী, অক্ষম ও পীড়িতদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করলেন। আঠার মাইল দূরে চুণার দুর্গ। সামরিক অফিসাররা চুণার দুর্গে এদের স্থানান্তরিত করতে চাইলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সে-প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, আমরা চুণারে চলে গেলে মহা গোলমাল বাঁধবে, আমরা জনসাধারণের বিশ্বাস হারাব, বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে। জনসাধারণ ও সিপাহীরা আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। কাজেই এই অবস্থায় এক পা-ও নড়া উচিত নয়।

কমিশনার যথাসময়ে লর্ড ক্যানিংকে লিখলেন: "কলিকাতা ও দানাপুর হইতে এখানে কি সৈন্য আসিয়া পৌছিবে না? ইংরেজ সৈন্য চাই।" এই সময় কলকাতা ও দিল্লীর মধ্যবর্তী সমস্ত সেনানিবাস থেকেই, বিশেষ করে কানপুর থেকে, গভর্ণর-জেনারেলের কাছে ক্রমাগত অনুরোধ আসতে লাগল—"ঈশ্বরের দোহাই, কিছু ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়ে দিন।" যাই হোক, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের চেষ্টায় শীঘ্রই কাশীর বাজার দর কমে গেল। সিপাহীরা টাকায় পনর সের করে আটা পেতে লাগল, বেসামরিকেরা বার সের করে। সিপাহীরা একটু সস্তা দরে আটা পেতে লাগল বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় সেনাদের দুর্ভাবনা দূর হলো না। তাদের দৃষ্টি দানাপুর আর কলকাতার দিকে—ইংরেজ সৈন্য না আসা পর্যন্ত তাদের মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। এমন সময়ে

কলকাতা থেকে ৮৪ নম্বর পল্টনের কিছু ইংরেজ সৈন্য কাশীতে এসে পৌঁছতেই সেখানকার ইংরেজ সৈন্যরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু কানপুরের প্রয়োজন বেশী। স্যর হেনরী লরেন্স লক্ষ্ণৌ থেকে কাশীতে সংবাদ পাঠালেন: "কানপুর বিপদবেষ্টিত। বিদ্রোহী দল জেনারেল হুইলারকে ভয় দেখাইতেছে, অতএব কানপুরে য়ুরোপীয় সৈন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন।" কমিশনার টাকার ও ব্রিগেডিয়ার পন্সন্‌বি দুজনেই পরামর্শ করলেন। কাশীর বিপদকে আপাততঃ উপেক্ষা করে তাঁরা কানপুরে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। কমিশনার টাকার গভর্ণর-জেনারেলকে লিখলেন: "৮৪ নম্বর পল্টনের যে কয়জন সৈন্যকে পাঠাইয়াছেন, তাহা পর্যাপ্ত নহে। স্যর হেনরী লরেন্স লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, 'আপনারা যত সৈন্য পাঠাইবার সুবিধা বিবেচনা করেন, শীঘ্র কানপুরে পাঠাইবেন।' এখানে কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, অগ্রে কানপুরের সাহায্য করা অতি আবশ্যক।" উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে য়ুরোপীয় সৈন্যের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝলেন লর্ড ক্যানিং এবং কানপুরের বিপদের কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করলেন। দানাপুরে নির্দেশ গেল অবিলম্বে কিছু সৈন্য কানপুরে পাঠাবার জন্যে এবং অন্যান্য পল্টনের কলকাতায় এসে পৌঁছবার জন্যে তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কাশীর কমিশনার, লক্ষ্ণৌর স্যর হেনরী লরেন্স, ও কানপুরের জেনারেল হুইলার—প্রত্যেককেই গভর্ণর-জেনারেল সাহস দিয়ে চিঠি দিলেন। সকলকেই বিপদে ধৈর্য না হারাতে উপদেশ দিলেন।

আজিমগড়। কাশী থেকে ষাট মাইল দূরে।

ইংরেজরা যখন কাশীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সচেষ্ট, তখন দারুণ দুঃসংবাদ এলো আজিমগড় থেকে। সেখানে ছিল ১৭ নম্বর পল্টন। কাশীর সিপাহীরা আজিমগড়ের সিপাহীদের সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করছিল। অন্যদিকে এলাহাবাদের সিপাহীরা প্রতীক্ষা করছিল কাশীর সিপাহীদের সংকেতের জন্য। ছাউনিতে ছাউনিতে সিপাহীদের এই যে গোপন আয়োজন ও চক্রান্ত—সামরিক কর্তৃপক্ষ তা একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। এইভাবে যে কাশী থেকে কানপুর অবধি বিদ্রোহের জাল বিস্তৃত হয়েছিল, তার পেছনে যাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা সেদিন ইংরেজের অলক্ষ্যে সক্রিয় ছিল, তিনি নানাসাহেব এবং এই নানাসাহেবের কূটনীতি এমনই দুর্ভেদ্য ছিল যে, স্যর হেনরী লরেন্স ও জেনারেল

ছইলারের মত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞেরা পর্যন্ত তা আদৌ বুঝে উঠতে পারেন নি। ভারতব্যাপী বিদ্রোহ-পরিচালনায় নানাসাহেব সেদিন এমন দক্ষতা দেখিয়েছিলেন বলেই মিরাটের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আসন্ন বিদ্রোহের নিঃশব্দ পদসঞ্চার এবং তার অতর্কিত আত্মপ্রকাশ ইংরেজদের বিস্মিত বিমূঢ় না করে পারে নি। ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুল ছিল নানার পরিকল্পনা। এলাহাবাদের বিদ্রোহ তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সংবাদ এলো আজিমগড়ের সিপাহী পল্টন বিদ্রোহী হয়েছে। উপলক্ষ সেই টোটা।

৩রা জুনের আজিমগড়ের বিদ্রোহে সিপাহীরা কোম্পানীর সাত লক্ষ টাকা লুঠ করল।

গোরক্ষপুর থেকে আসছিল পাঁচ লক্ষ টাকা আর আজিমগড়ের দু'লক্ষ—এই মোট সাত লক্ষ টাকা এক ইংরেজ লেফটেনান্ট-এর প্রহরায় কাশীতে পাঠান হচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে ১৩ নম্বর অশ্বারোহী দলের কিছু সৈন্য ছিল। ৩রা জুনের দুপুর বেলায় ভোজনাগারে বসে সস্ত্রীক অফিসারেরা সহসা শুনলেন কামানের গর্জন, সঙ্গে সঙ্গে ডঙ্কাধ্বনি। সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে একথা বুঝতে আর কারো দেরী হলো না। সকলের মনেই বিস্ময়, সকলের মনেই আতঙ্ক। তাড়াতাড়ি সবাই গিয়ে আশ্রয় নিলেন কাছারী বাড়িতে। ইতিমধ্যে কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে ছাউনির সীমানা ছাড়িয়ে, উত্তেজিত সিপাহীরা দ্রুতপায়ে ছুটল কাশীর পথে টাকা লুঠ করতে। আজিমগড়ে পুলিশও বিদ্রোহী হলো। পুলিশের দলও বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চালানী টাকা লুঠ করতে রাস্তার দিকে ছুটল। বিদ্রোহীরা টাকা লুঠ করে ক্যান্টনমেণ্টে ফিরে এসে দেখল সব ফাঁকা। সিপাহীদের এই আকস্মিক অভ্যুত্থানে হতবুদ্ধি য়ুরোপীয় অফিসারেরা আজিমগড় ছেড়ে গাজীপুরে পালিয়ে গেলেন। শহর খালি—একটি ইংরেজও নেই। সবাই আজিমগড় খালি করে চলে গিয়েছে। উৎসাহী বিদ্রোহীরা ছুটল ফৈজাবাদের দিকে।

আজিমগড়ের খবর এল কাশীতে।

য়ুরোপীয় মহল আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়।

কাশীর সেনানিবাসে তখন সিপাহীদের সংখ্যা দুহাজার। এরা সবাই ৩৭ নম্বর পল্টনের সৈন্য। আর ইংরেজ সৈন্যের মোট সংখ্যা মাত্র আড়াই শো।

বহুযুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি কর্নেল নীল একদল মাদ্রাজী সৈন্য নিয়ে ইতিমধ্যে কাশীতে এসে পৌঁছেছেন। ওদিকে দানাপুর থেকেও একদল ইংরেজ সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্য এসেছে। প্রচুর ইংরেজ সৈন্যের সমুপস্থিতিতে সাহস পেয়ে ক্যান্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষ কাশীর সিপাহীদের নিরস্ত্র করা স্থির করলেন। সিপাহীদের আদেশ দেওয়া হলো কাওয়াজের স্থানে এসে দাঁড়াবার জন্যে। তাদের সামনে কামান, পেছনে বন্দুকধারী ইংরেজ সৈন্য। যদি সিপাহীরা কোন রকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তবে তাদের সবাইকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে, এই ছিল কর্নেলের উদ্দেশ্য। সন্দেহ, আশঙ্কা আর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠে সিপাহীরা। চক্ষের নিমেষে তাদের হাতের বন্দুক গর্জে উঠল—দশ-বারোজন ইংরেজ নিহত হলো। ওদিকে ইংরেজ গোলন্দাজরাও কামান দাগতে লাগল—কয়েকজন সিপাহী নিহত হয়। নিমেষ মধ্যে সিপাহীরা ছড়িয়ে পড়ে নগরে ও নিকটবর্তী লোকালয়ের এখানে-সেখানে। বিদ্রোহীরা পালিয়ে গেল, কিন্তু নিরস্ত হলো না। দূর থেকে অবিশ্রান্ত কামানবন্দুকের আওয়াজ ইংরেজদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করল। অনেকেই প্রাণের ভয়ে টাঁকশালে আশ্রয় নিলেন, মিশনারীরা গেলেন রামনগরের পথ দিয়ে চুণারে। কেউ রইলেন কাশীর মিশন-হাউসে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে। সিভিলিয়ান অফিসারেরা তাঁদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আশ্রয় নিলেন কালেক্টারীর কাছারীর ছাদে। কিন্তু এখানে তাঁদের ভয়ের একটা কারণ ছিল। শিখ সিপাহীরা কালেক্টারীর ধনাগারে পাহারা দেয়। চাকরী করলেও ইংরেজদের ওপর তাদের মনে মনে বিষম বিদ্বেষ। ইংরেজ তাদের বহু স্বজাতীয়ের জীবন নাশ করেছে, স্বাধীন শিখ রাজ্য বিলোপ করেছে, সে-কথা তারা ভোলে নি। ভোলে নি তাদের নির্বাসিতা রাণী ঝিন্দনের মুকুটের বহুমূল্য মণিরত্নরাজী এই কালেক্টারীতে সঞ্চিত আছে। শিখরা ইংরেজদের মারতে পারে, কাছারী জ্বালিয়ে দিতে পারে।

ইংরেজদের মনে সেই ভয়। ৪ঠা জুন রাত্রে কাশীর রাজা ইংরেজ মিশনারীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান করেছিলেন। এমন কি, অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করতেও তিনি কৃপণতা করেন নি। শহরে জনতা, আতঙ্ক ও গোলমাল। মুসলমানেরা উড়িয়েছে সবুজ পতাকা। কয়েদীরা মুক্ত হয়েছে জেলখানা থেকে। কাশীর চারদিকে বিদ্রোহীরা দলে দলে ঘুরে বেড়িয়ে জনসাধারণের মধ্যে এই

কথা প্রচার করতে লাগল : "তোমরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও ; ইংরেজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়ে এলো বলে।" জনরব। জনরবের সঙ্গে অরাজকতা। দুই-ই অত্যন্ত ভয়প্রদ। এমন সময় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন কর্ণেল নীল। সিপাহীদের ওপর পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে তিনি দৃঢ় সংকল্প। কঠিন হস্তে তিনি বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কেয়ি লিখেছেন : "যে সকল সিপাহী আপনাদের আবাসগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা তাড়িত ও নিহত হইল। যাহারা নির্জন কুটীরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা সেই সকল কুটীরের সহিত ভস্মীভূত হইল। বারাণসীতে সামরিক আইন প্রচারিত হইল। এই আইনের অপপ্রয়োগে বারাণসীর অধিবাসীদের চরম দুর্দশা হইল। বহুলোকের ফাঁসী হইল, পল্লীতে পল্লীতে নির্মম বেত্রাঘাত বেপরোয়াভাবে চলিল। সারি সারি ফাঁসীকাষ্ঠে বহু নির্দোষীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কর্ণেল নীলের নির্দেশে ইংরেজ সৈনিক কর্মচারীরা কাশীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার বহু লোককে রাস্তার দুইধারের গাছে গাছে ফাঁসী দিয়া লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে লাগিল।"

কাশীর বিদ্রোহে বহু শিখ সৈন্য নিহত হয়েছিল। তবু এই ভয়াবহ কঠোরতা বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারল না। জ্বালাময়ী শিখা আরো লেলিহান হয়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ছেয়ে ফেলল।

দু'একদিনের মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল জৌনপুর ও এলাহাবাদে। কাশীর চল্লিশ মাইল দূরে জৌনপুর শহর। লুধিয়ানার শিখ পলটনের একদল তখন এখানে ছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাদের অবিচলিত ভক্তি। কিন্তু তারা যখন শুনল, ইংরেজেরা কাশীতে তাদের স্বজাতীয়দের গুলি করে মারছে, তখন তারা বেঁকে দাঁড়াল। শিখের ইংরেজ-বিদ্বেষ নতুন করে ঝিলিক মেরে ওঠে। পঞ্চনদের বীর সন্তানদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ইংরেজরা ভয়ে কাছারী বাড়িতে আশ্রয় নিল। জৌনপুরের কমাণ্ডিং অফিসার লেফটেনাণ্ট ম্যারা দাঁড়িয়েছিলেন কাছারীর বারান্দায়। হঠাৎ তাঁর বুকে একটা গুলি এসে লাগল। তিনি পড়ে গেলেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট চ্যাপেজ সাহেব কারাগারে যাচ্ছিলেন কয়েদীদের দেখতে। পথিমধ্যে বিদ্রোহীর গুলিতে তিনিও মারা পড়লেন। সিপাহীরা ট্রেজারী লুঠ করল। ইংরেজদের মনে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হলো। তারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে নীলকুঠির নিরাপদ স্থানে আশ্রয়

নিতে বাধ্য হলো। বিদ্রোহীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকেরা যোগ দিল। সকলে মিলে তখন ইংরেজের পরিত্যক্ত বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগাল, নগর লুঠ করতে আরম্ভ করল। বিদ্রোহীরা টাকার তোড়া মাথায় করে অযোধ্যার পথে চলে গেল। প্রায় তিন লক্ষ টাকা শিখ সৈন্যদের হস্তগত হলো।

কলকাতায় বসে লর্ড ক্যানিং আজিমগড়, কাশী ও জৌনপুরের বিদ্রোহের খবর পেলেন।

৩রা জুন আজিমগড়, ৪ঠা জুন কাশী, ৫ই জুন জৌনপুর। এমন আশ্চর্য ও নির্ভুল পরিকল্পনা মতো বিদ্রোহ লর্ড ক্যানিংকে উদ্বিগ্ন করে তুললো।

তিনি বুঝলেন, পশ্চিম অঞ্চলেই এখন সৈন্য পাঠান দরকার। এলাহাবাদ ও কানপুরের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কাশীর কমিশনার লর্ড ক্যানিংকে লিখলেন—"বিদ্রোহ ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। সৈন্য দরকার। যানবাহনের অভাব। রসদও উপযুক্ত পরিমাণে নাই। য়ুরোপীয় সৈন্যদের জন্য আটা ও রম্ দরকার। আজিমগড় ও জৌনপুর হইতে ইংরেজরা অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছেন। কাশী আপাতত নিরাপদ; তথাপি জনসাধারণের ধারণা বৃটিশ প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছে।"

বৃটিশ প্রভুত্বের অবলুপ্তি!

শতবর্ষের মধ্যে ভারতের বুকে ক্লাইভ, ওয়েলেসলি প্রভৃতির চেষ্টায় যে সাম্রাজ্য-সৌধ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, আজ তার ভিত্তিভূমি কী নড়ে উঠল? লর্ড ক্যানিং চিন্তা করেন গভীর ভাবে। আজিমগড়, কাশী আর জৌনপুরের বিদ্রোহের আগে ফিরোজপুর, আলিগড়, মৈনপুরী, এটোয়া প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। মে মাসের শেষেই তিনি সে সব সংবাদ পেয়েছেন। নতুন নতুন সৈন্য যেমন যেমন কলকাতায় এসে পৌছচ্ছে, গভর্ণর-জেনারেল সঙ্গে সঙ্গে তাদের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যানবাহনের ঘোরতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। রাণীগঞ্জ থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে প্রতিদিন আঠার থেকে কুড়ি জনের বেশী সৈন্য পাঠান যায় না; গরুর গাড়িতে একশো, কিন্তু তার গতি অত্যন্ত মন্থর। উপায় নেই। এই ভাবেই ৩রা জুন থেকে দলে দলে ইংরেজ সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তিনি।

সমগ্র কাশী প্রদেশ সেদিন এই ভাবে বিদ্রোহে ঝাঁপ দিয়েছিল। কাশী শহরটি ইংরেজরা সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রদেশের সর্বত্রই বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদার, চাষী ও সিপাহী—সকলেই এক মন এক প্রাণ হয়ে সেদিন ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক চার্লস মিড্-এর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য: "কাশী প্রদেশে সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের প্রত্যেকটি পর্বে এই সত্যটাই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জনসাধারণের মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ যেমন গভীর তেমনি তীব্র প্রতিহিংসা। লুঠ করিবার ইচ্ছাটি ছিল গৌণ—সর্বত্র ইংরাজ অধিবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করাই ছিল এই বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাতে বিদ্রোহীরা যে কৃতকার্য হইয়াছিল তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জৌনপুরের বিদ্রোহ।"

স্থান—এলাহাবাদ। ৬ই জুন।

সাতান্নর বিপ্লবের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় তারিখ।

কাশী থেকে সত্তর মাইল দূরে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদ শহর।

১২ই মে তারিখে মিরাটের বিদ্রোহ-সংবাদ এসে পৌঁছল এলাহাবাদে এবং তার দু'তিন দিন বাদেই এল দিল্লীর দুঃসংবাদ। দিল্লীতে ইংরেজরা পরাজিত হয়েছে, সেখানে মোগল রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এই সংবাদে উদ্বেলিত হয়ে উঠল এলাহাবাদের সেনানিবাস। তখন এখানে ছিল কেবল মাত্র ছ নম্বর পল্টনের সিপাহী আর ফিরোজপুরের এক শিখ পল্টনের দুশো শিখসৈন্য। তাদের আনুগত্যের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল কর্ণেল সিম্পসনের। তিনিই এলাহাবাদ সেনানিবাসের অধিনায়ক। এ ছাড়া, স্যার হেনরী লরেন্সের আদেশে অযোধ্যার দু' দল ঘোড়সওয়ার সৈন্যও এলাহাবাদে এসে সিপাহীদের দলবৃদ্ধি করে।

ক্যান্টনমেণ্ট থেকে তিন মাইল দূরে এলাহাবাদের বিখ্যাত দুর্গ। যেমন সুদৃশ্য তেমনি সুদৃঢ়। প্রচুর অস্ত্র সেই দুর্গে। অজস্র বন্দুক কামান আর রসদ। ইংরেজদের সতর্ক দৃষ্টি আর মনোযোগ ছিল এই দুর্গের নিরাপত্তার ওপর। মিরাট-দিল্লীর ভয়াবহ কাণ্ডের সংবাদ যখন এলাহাবাদে পৌঁছল, তখন শহরের সর্বত্র এই নিয়ে চললো আন্দোলন আর ইংরেজদের চোখের

সামনে ফুটে উঠল বিপ্লবের করাল ছায়া। কেঁপে উঠল তাদের অন্তরাত্মা। সিপাহীদের কিছু দুর্গের মধ্যে, কিছু ছাউনিতে অবস্থান করত। কাশীতে যেমন হিন্দুর সংখ্যা বেশী, এলাহাবাদে তেমনি জনসাধারণের বেশীর ভাগই মুসলমান। এলাহাবাদের তালুকদারদের অধিকাংশই মুসলমান এবং হিন্দুরা ছিল তাদের প্রজা। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাই ভেবেছিলেন যে, এখানে হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে কখনই তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। কিন্তু এলাহাবাদের বিদ্রোহ নির্মম ভাবেই তাঁদের সে ধারণা ভেঙে চুরে দিল। শহর, শহরতলী ও সুদূর গ্রামাঞ্চলে—এলাহাবাদের সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমান সেদিন একই উদ্দেশ্যে ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এলাহাবাদের অভ্যুত্থান তাই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবজনক অধ্যায়। মুসলমানদের মধ্যে একটা জনরব প্রবল হয়ে দেখা দিল—ইংরেজরা এবার স্থানীয় লোকদের জোর করে খ্রীষ্টান করবে, কিম্বা অন্যভাবে তাদের জাত মারবে। এই জনরবের মূলে ছিলেন চুক্রবাগের এক মৌলভী। নাম লিয়াকৎ আলি। তিনিই মুসলমানদের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ প্রচার করেন। এই জনরবের সঙ্গে মিলেছিল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল। বাতাসে বাতাসে প্রচার হচ্ছিল নানা রকমের অদ্ভুত জনরব এবং লোকের মনে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। সকলেরই বিশ্বাস, দেশের লোকের ধর্মের ওপর নিদারুণ আঘাত করা হবে। এই জনরবের গতি সামরিক কর্তৃপক্ষ কেউ-ই রোধ করতে পারেন নি। তবু কর্নেল সিম্পসন ও সেনানিবাসের সমস্ত ইংরেজের বিশ্বাস ছিল, ছ নম্বর পল্টনের সিপাহীরা সর্বাংশে রাজভক্ত, তাদের আনুগত্য সন্দেহাতীত। তারা বিশ্বাসী।

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কোর্ট একদিন কর্নেল সিম্পসনকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সিপাহীদের বিশ্বাস করবেন না।

—কেন? আমরা তো তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছি। তারা সবাই আমাদের স্নেহে বশীভূত।

—কিন্তু লোকের মনে প্রবল অবিশ্বাস।

—লোকের সঙ্গে আমাদের অনুগত সিপাহীদের সম্পর্ক কি?

—সেটা তো কাশী-জৌনপুরের বিদ্রোহেই বোঝা গেছে। বিদ্রোহীদের কুমন্ত্রণায় সিপাহীদের মন টলতে কতক্ষণ?

—কিন্তু আমাদের সিপাহীরা তো আমাদের কাছে এই সব বাজারগুজবের প্রতিবাদ করেছে।

—সে প্রতিবাদ মৌখিক, জানবেন। আমার অনুমান এলাহাবাদে অচিরে বিদ্রোহ উপস্থিত হবে, সিপাহীরা ক্ষেপবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের এই সতর্কবাণী কর্ণেল সিম্পসন একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তারপর সিভিল ও মিলিটারি উভয় দলের কর্তৃপক্ষের এক সভা হলো। সেই সভার ঠিক হলো যে, স্ত্রীলোক ও শিশুদের দুর্গ মধ্যে স্থানান্তরিত করাই উচিত। এই সময় আবার জনরব উঠল—সিপাহীদের চর্বি-টোটা ব্যবহার করতে বাধ্য করা হবে। সিপাহীরা চঞ্চল হয়। ইংরেজ পক্ষে জনরব উঠল, দুর্গ থেকে ধনাগার উঠিয়ে নিয়ে যাবার সময়ে সিপাহীরা বাধা দেবে। শিখ সৈন্যরা ষড়যন্ত্র করেছে, সব দেশীয় সৈন্য একত্রিত হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে। সিপাহীরা জেলখানা ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করে দেবে। এই ভাবে দুই পক্ষের জনরব দুই পক্ষকেই চঞ্চল ও সন্দিগ্ধ করে তুললো। এই জনরবের মধ্যে দিয়ে এল ২৫ মে-র ঈদ্ পর্ব। আবার শহরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এই উৎসবের অবসরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে—ইংরেজরা এই আশঙ্কা করলেন। কিন্তু বিনা উপদ্রবেই ঈদ্ পর্ব অতিবাহিত হলো। এই সময়ে একদিন ছ' নম্বর পল্টনের সিপাহীরা তাদের কর্ণেলকে জানাল—দিল্লীর বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য তারা এখনি দিল্লী যেতে প্রস্তুত। এই তো আনুগত্যের নিদর্শন, ভাবলেন কর্ণেল সিম্পসন। কলকাতায় তারযোগে এই শুভ সমাচার তিনি পাঠিয়ে দিলেন লর্ড ক্যানিং-এর দরবারে এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও দিলেন যে, অন্তত এলাহাবাদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখানকার সিপাহীরা বেশ শান্তভাবেই আছে। ধন্যবাদ পাঠালেন গভর্ণর-জেনারেল। এই ভাবে একপক্ষ দেখছিলেন শান্তি, অপর পক্ষ চিন্তা করছিলেন বিদ্রোহ। এই পরিবেশের মধ্যেই কাশী বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌছল এলাহাবাদে।

কাশীর সংবাদে কর্ণেল সিম্পসন বিচলিত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

দুর্গের দরজা দিবারাত্র বন্ধ থাকবে ; পাশপোর্ট নিয়েও কেউ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে বা দুর্গ থেকে বাইরে আসতে পারবে না। সন্দেহভাজন লোকদের এলাহাবাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কাশীর বিদ্রোহী-সিপাহীরা এলাহাবাদ আসার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; অতএব তাদের আগমন-পথ রোধ করবার ব্যবস্থা হলো। গঙ্গার পরপার থেকে এলাহাবাদে আসবার জন্যে দারাগঞ্জের কাছে যে নৌ-সেতু ছিল, সেই সেতুমুখে ৬ নম্বর সিপাহী পলটনের একদলকে পাহারা রাখা হলো। দুটো কামান নিয়ে তারা সেখানে অবস্থান করতে লাগল। ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে কোনো বিদ্রোহী সিপাহী প্রবেশ করতে না পারে, সেইজন্যে সেতু ও সেনানিবাসের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড জায়গায় অযোধ্যার অশ্বারোহীদলের কতকগুলি সৈন্যকে মোতায়েন রাখা হলো। এই ভাবে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়ে ইংরেজেরা ৫ই জুন এলাহাবাদের দুর্গে আশ্রয় নিলো।

৬ই জুন। রাত্রি ন'টা।

হঠাৎ ভেরী বেজে ওঠে। সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেনানিবাসের ইংরেজেরা চমকে ওঠেন। এযে তাঁদের কাছে অপ্রত্যাশিত। কেননা আজ সকালের প্যারেডেই তো কর্নেল সিম্পসনের অনুরোধে কমিশনার সাহেব সকলের সামনে গভর্ণর-জেনারেলের ধন্যবাদ-পত্র পড়ে সবাইকে শুনিয়েছেন। বড়লাট তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন—এই কথা শুনে সিপাহীরা উৎসাহিত হয়ে সমবেতকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করেছে। সে কী তবে সিপাহীদের ছলনা! আনুগত্যের মুখোশ পড়ে তারা কী তবে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল ?– ভাবেন কর্নেল সিম্পসন। কিন্তু তখন চিন্তা করবার অবকাশ কোথায় ? রাত্রির এই অতর্কিত তূর্যধ্বনি স্পষ্টভাবে বিদ্রোহই ঘোষণা করছে, অন্য কিছু নয়। সেতুমুখে ছিল শিখসৈন্য—তাদের ওপর কর্নেলের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। লক্ষ্ণৌ থেকে স্যার হেনরী লরেন্স আর কানপুর থেকে স্যার হিউ হুইলার দুজনেই তাঁকে এবিষয়ে পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করে লিখেছিলেন : "শিখ সৈন্যদের বিশ্বাস করবেন না, এলাহাবাদে যত য়ুরোপীয় সৈন্য পাওয়া যায় তাদের দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত করিবেন।" দুর্গ অবশ্য আপাততঃ সুরক্ষিতই আছে, ভাবলেন কর্নেল, কিন্তু এই রাত্রে অকস্মাৎ ভেরীর আওয়াজ! অফিসারদের মেস

থেকে নৈশভোজন সমাধা করে তিনি চলেছিলেন তাঁর বাংলোয়। অকস্মাৎ তূর্যধ্বনি শুনে তাঁর মন বিচলিত হয়। তাড়াতাড়ি বাংলোয় এসে ঘোড়ায় চড়লেন। ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে এলেন কোয়ার্টার গার্ডের কাছে। দেখলেন, তাঁর আগেই অনেক অফিসার এসে সেখানে সমবেত হয়েছেন। শুনলেন, বিশ্বাসী শিখ সৈন্যরাই বিদ্রোহী হয়েছে।

এলাহাবাদের বিদ্রোহের সূচনা এই রকম। যেসব শিখসৈন্য দারাগঞ্জে সেতুমুখে পাহাড়া দিচ্ছিল, তারা যখন শুনল যে কাশীতে শিখ পল্টনের সামনে তোপ দাগা হয়েছিল, তখন আর তারা স্থির থাকতে পারল না, বিরোধী হলো। সেতুমুখে দুটো কামান বসান হয়েছিল। ক্যাপ্টেন বার্চের অনুরোধে সেদিন কর্ণেল সিম্পসন সেই কামান দুটো দুর্গের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার হুকুম দিয়েছিলেন। শিখসৈন্যরা কিছুতেই কামান কেল্লায় নিয়ে যেতে দেবে না। তারা বাধা দিল ভীষণ মূর্তি ধারণ করে। একজন ইংরেজ লেফটেনান্টের ওপর এই কাজের ভার ছিল। তিনি বাধা পেয়ে গেলেন অশ্বারোহীদলের অফিসারের কাছে। তিনি কিছু ঘোড়সওয়ার সৈন্য নিয়ে এলেন তাঁর সাহায্যে এবং বিপদের আশঙ্কা করে একজন সংবাদবাহককে দিয়ে দুর্গমধ্যে সংবাদ দিলেন। তারপর? তারপরের বর্ণনা ঐতিহাসিক হেনরী মীড এইভাবে দিয়েছেন :

"দমাদম শব্দে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। অফিসার দুইজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। দ্রুতগতিতে তাঁহারা সেনাদলসহ বিদ্রোহীদলের সম্মুখীন হইলেন। ঘোড়সওয়ারদের আওয়াজ করিবার হুকুম দিলেন। তাহারা শত্রুপক্ষে যোগ দিল। একজন বিদ্রোহীর গুলিতে অশ্বারোহীদলের অফিসার মারা গেলেন। তাঁহার প্রাণশূন্যদেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। অন্য অফিসারটি অশ্বের জন্য বাঁচিয়া গেলেন। বিদ্রোহীরা ইতিপূর্বেই সেনানিবাসের অন্যান্য সিপাহীদের এবং শহরে সংবাদ দিবার জন্য দুইজন সিপাহীকে পাঠাইয়াছিল, এখন তাহারা সংকেতসূচক হাউই ছুড়িল। কয়েকজন বিদ্রোহী কামান লইয়া ছাউনিতে ফিরিয়া গেল। যখন তাহাদের কর্ণেল আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহারা জলন্ত ক্রোধে মহাবিদ্রোহী।"

কর্ণেল সিম্পসন তখন কামান আনবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সিপাহী গুলী চালিয়ে তার উত্তর দিল। বেগতিক দেখে কর্ণেল দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। বন্দুকধারী অনেক সিপাহী একসঙ্গে ক্রমাগত আওয়াজ করতে লাগল। দূর থেকে কর্ণেল সিম্পসন দেখলেন, সিপাহীরা প্যারেডের মাঠে তাদের অফিসারদের গুলি করে মারছে। কর্ণেল প্রাণ নিয়ে দুর্গ মধ্যে পলায়ন করলেন। ধনাগারটি রক্ষা করার কথা একবার তাঁর মনে হলো। কিন্তু তখন তাঁর চারদিকে গুলিবৃষ্টি। ধাঁ করে একটা গোলা এসে কর্ণেলের মাথার টুপি উড়িয়ে দিল। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গেলেন। মেস্‌বাড়ির সামনে দিয়ে যখন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কেল্লার দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে ফটকের প্রহরীরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর গুলিবর্ষণ করল। ঘোড়াটি আহত হলো, কর্ণেল আঘাত পেলেন বাহুমূলে। আহত অশ্ব দুর্গদ্বার পর্যন্ত তার প্রভুকে বহন করে এনে তারপর নিজে ভূতলশায়ী হলো। ইতিমধ্যে সিপাহীরা যে-ইংরেজকে দেখতে পেল, তাকেই গুলি করে মারল। আটটি তরুণ ইংরেজ যুবক সবে মাত্র যুদ্ধবিভাগের কাজে যোগ দেবার জন্য এসেছিল, তারাও নিহত হলো।

দুর্গের মধ্যে এসেই কর্ণেল সিম্পসন সিপাহীদের নিরস্ত্র করবার হুকুম দিলেন। ছ নম্বর পলটনের একদল সিপাহী এখানে ছিল। বাইরে কামান ও বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা ভাবল কাশীর বিদ্রোহীরা বুঝি এলাহাবাদে এসে উপস্থিত হয়েছে, এখানকার সিপাহীরা তাদের অভ্যর্থনার জন্য তোপধ্বনি করছে। কিন্তু সহসা দুর্গমধ্যে রক্তাক্ত কলেবর কর্ণেলকে আসতে দেখে তাদের ধারণা বদলে গেল।

—ডিজার্ম দেম্—ওদের নিরস্ত্র কর। আদেশ দিলেন কর্ণেল সিম্পসন লেফটেনান্ট ব্রেজিয়ারকে। দুর্গের শিখ সেনাদলের অধিনায়ক ব্রেজিয়ার। পাঞ্জাব যুদ্ধে এই দল তাঁর অধীনে ছিল। এদের ওপর তাঁর প্রভূত ক্ষমতা। সশস্ত্র সিপাহীদের সামনে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র শিখ-সৈন্য। তাদের পেছনে কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সৈন্য। সিপাহীরা শান্তভাবে অস্ত্রত্যাগ করল। তারপর দুর্গের বাইরে এসে তারা বিদ্রোহী দলের শক্তিবৃদ্ধি করল। দুর্গ আপাততঃ নিরাপদ। এই সময়ে যদি দুর্গের শিখ সৈন্য ও সিপাহীরা পরস্পর মিলিত হতো, তাহলে দুর্গের মধ্যে যে সব ইংরেজ

নরনারী ও শিশু আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের কারো রক্ষা পাবার উপায় থাকত না। দুর্গের মধ্যে শুধু আশ্রয়প্রার্থী ইংরেজ নরনারীই ছিল না, বহুমূল্য যুদ্ধাস্ত্রও ছিল। সেগুলো যাতে বিদ্রোহীদের হস্তগত না হতে পারে তার জন্যও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রয়োজন হলে, দিল্লীর মতো এলাহাবাদের ম্যাগাজিনও বারুদে আগুন দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতলব ছিল ইংরেজদের। নিরস্ত্র সিপাহীরা চলে যাবার পর তার প্রয়োজন হলো না। তাই কর্ণেল সিম্পসন মনে করলেন দুর্গ আপাততঃ নিরাপদ।

দেখতে দেখতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল সেনানিবাস থেকে শহরে।

সারা এলাহাবাদ যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নিমেষ মধ্যে শহরতলী পর্যন্ত বিদ্রোহের শিখা পরিব্যাপ্ত হলো। আইন ও শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু রইল না। সমস্ত রাত্রি লুঠ চললো। সিপাহীরা জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে দিল। তারপর তাদের সঙ্গে এসে মিলল জনসাধারণ। সবাই মিলে ছুটল ইংরেজদের বাংলোয়। পথে যে-সব ইংরেজদের তারা দেখতে পেল, তাদের হত্যা করল নির্মম ভাবে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ইংরেজদের বাংলোগুলো। আগুনের শিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে দূরে আকাশপথ। বিদ্রোহীরা রেলের কারখানা ধ্বংস করল। কেটে দিল টেলিগ্রাফের তার। দুর্গের বাইরে যেখানে যত ইংরেজ ছিল তাদের প্রায় সবাই নিহত হলো। কোতোয়ালির মাথায় উড়ল মুসলমানের সবুজ পতাকা। বিদ্রোহীদের তোপে তোপে রেল ইয়ার্ডের ইঞ্জিনগুলো চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। চারদিকেই ভীষণ গর্জন, হল্লা গোলমাল। এমন কি, কোম্পানীর বৃত্তিভোগী সিপাহীরা পর্যন্ত এই বিদ্রোহে যোগ দিল। হত্যা, লুণ্ঠন আর গৃহদাহের ভেতর দিয়ে বিদ্রোহের লেলিহান শিখা ৬ই জুনের রাত্রিকে যে রকম বিভীষিকাময়ী করে তুলেছিল, এলাহাবাদের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ইংরেজের আইন নিমেষ-মধ্যে ধূলিসাৎ হলো। রাজপুরুষদের ক্ষমতা হোলো পদদলিত।

এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী এক ইংরেজ লেখকের বিবরণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম: 'ক্ষণেকের মধ্যেই সমগ্র নগরে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সংক্রামক রোগ যেমন দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপে সেই বিদ্রোহানল শহরগুলিতে ও কাছাকাছি গ্রামগুলির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, রাজপুরুষগণের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার চেষ্টা বিফল

হইয়া গেল। বিদ্রোহ কেবল সিপাহীদলের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। এলাহাবাদে তখন নানাদেশীয় নানাজাতীয় লোকের সমাবেশ। ভারতের অন্য কোন নগরে সেরূপ ছিল না। মুসলমানই বেশী। সকলেই বিদ্রোহে মাতিয়া উঠিল। মোগল বংশের যেসব লোক শহরে আসিয়া বাস করিতেছিল, তাহারাও নিজেদের দুর্দশা স্মরণ করিয়া ইংরেজ শাসনের অবসান কামনা করিতেছিল এবং সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া তাহারা প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের পোষকতা করিতে লাগিল। নগরে ও ছাউনিতে যত গোলমাল, যত আতঙ্ক, পূর্বে আর কখনো তেমন দেখা যায় নাই। ৬ই জুনের সমস্ত রাত্রি নগরমধ্যে কেবল লুঠপাট ও লুঠপাটের হুকুম। এই একরাত্রে যে কত ইংরেজ নিহত হইল তাহার হিসাব নাই। আর কী বিভীষিকাময় সেই হত্যা। জীবন্ত মানুষকে অর্ধদগ্ধ করিয়া কাবাব করা হইল, ছোট ছোট ছেলেদের ঊর্ধ্বপথে ছুঁড়িয়া দিয়া সঙীনের তীক্ষ্ণাগ্র মুখে লুফিয়া ধরা হইল। শিশুগুলি সঙীনে বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ হারাইল।"

পরের দিন বিদ্রোহীরা এলাহাবাদের ট্রেজারী লুঠ করল।

ত্রিশ লক্ষ টাকা তাদের হস্তগত হলো। বিদ্রোহীদের ইচ্ছা ছিল এই টাকা দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে তারা বাদশাহকে উপঢৌকন দেবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লুঠের টাকা তারা নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে নিলো। এক একজন সিপাহী তিন চারটে করে হাজারী তোড়া নিয়েছিল। যেসব তালুকদারের ভূসম্পত্তি হস্তচ্যুত হয়েছিল, ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়েছে মনে করে, তারাও পল্লীবাসী কৃষাণদিগকে উত্তেজিত করতে লাগল। লিয়াকৎ মৌলভির জ্বালাময়ী বক্তৃতাও তাদের হৃদয় কম উদ্বেলিত করেনি। এমনি করে নগরের বাইরে সুদূর পল্লীগ্রাম ও জনসাধারণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ আর বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। গ্রামে গ্রামে দেখা দিল অরাজক কাণ্ড।

এলাহাবাদের সংবাদ পৌঁছল কলকাতায়।

উদ্বিগ্নচিত্তে লর্ড ক্যানিং কর্ণেল নীলকে কাশীতে টেলিগ্রাম করলেন—"অবিলম্বে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়া আপনি সেখানকার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করুন।" গভর্ণর-জেনারেলের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল সসৈন্যে এলাহাবাদ যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আরো কিছু সৈন্য কাশীতে এসে গিয়েছিল। ১৮ই জুন সেনাপতি নীল সসৈন্যে কাশী থেকে

এলাহাবাদ দুর্গে প্রবেশ করলেন। কাশী থেকে এলাহাবাদে আসবার সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন গঙ্গার তীরে সমস্ত দেশ যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞ সেনাপতি নীল, তবুও এই বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে তিনি একটু বিচলিত না হয়ে পারলেন না। এতো শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়, এ যে সমগ্র জনসাধারণের রাজদ্রোহ।

১৮ই জুন। সকালবেলায় দুর্গের ফটকের কাছে কর্ণেল নীলকে দেখবামাত্র ইংরেজ প্রহরীরা আনন্দ ধ্বনি করে উঠল। জুন মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মতাপে প্রাণ সঙ্কট, তা গ্রাহ্য না করেই কর্ণেল নীল এলাহাবাদ দুর্গের সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন। তখন দুর্গের মধ্যে কোনো সুনীতি-সুশৃঙ্খলা ছিল না। যেসব ইংরেজ সখের সৈন্য হয়েছিল তারা ও শিখ সৈন্যরা মিলে মালগুদাম লুঠ করে ও নিয়ত সুরাপান করে যথেচ্ছ ব্যবহার করছিল। প্রথমে তিনি শিখদের দুর্গ থেকে বের করে দিলেন এবং তারপর দুর্গের ভেতর যেসব ইংরেজ মহিলা ও শিশু আশ্রয় নিয়েছিল তাদের তিনি একটা জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। দারাগঞ্জের কাছে অনেক বিদ্রোহী সিপাহী আছে, এই খবর পেয়ে কর্ণেল নীল দুর্গ থেকে দারাগঞ্জের ওপর তোপ মারবার হুকুম দিলেন। বিদ্রোহীরা একটা পল্লী'তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তারপর একটা বড় ষ্টীমারে কামান সাজিয়ে, সেনাপতি গঙ্গার দুই তীরের পল্লীর দিকে গোলাবর্ষণ করে জনগণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে লাগলেন। জনরব উঠল, ইংরেজরা কামান দিয়ে সমস্ত শহরটা ধ্বংস করবে। ভীতিবিহ্বল শহরবাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চারদিকে পালিয়ে যেতে লাগল। নগর জনশূন্য হলো। বিদ্রোহ আরম্ভের প্রায় একপক্ষ কাল বাদে জনশূন্য এলাহাবাদে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো অতি কষ্টে এবং অনেক লোকক্ষয়ের পর।

কানপুর—১৮৫৭
গঙ্গা নদী
পুরাতন কানপুর
সতীচৌরা ঘাট
এলাহাবাদের দিকে
দিল্লীর দিকে

॥ বারো ॥
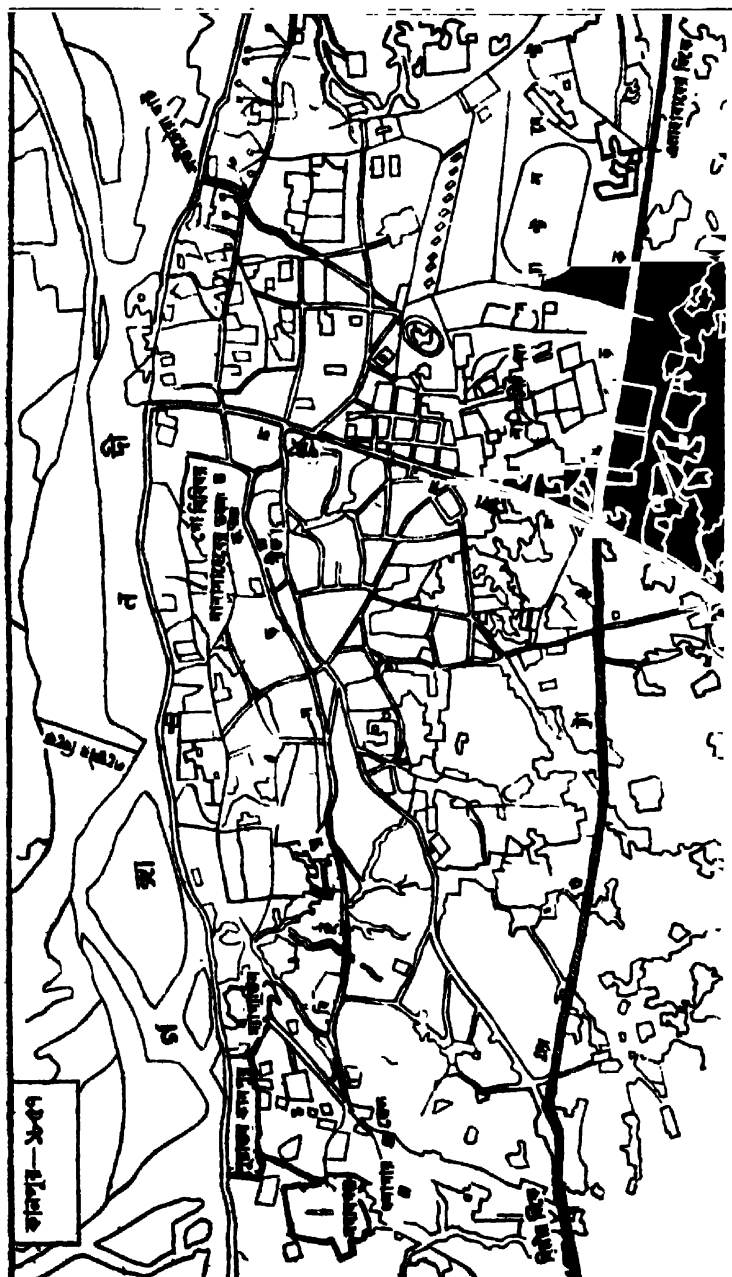
স্থান—কানপুর, বিঠুর-দরবার। সময়—১৬ই মে, সকাল-বেলা।

এই দরবার গৃহের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে সাতান্নর অগ্নিক্ষরা বিপ্লবের জন্ম। এইখানে বসেই নানাসাহেব বিপ্লবের নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করেন ইংরেজের অজ্ঞাতসারে। আজ দরবারে উপস্থিত আছেন নানাসাহেব, তাঁর দুই ভাই বাবাসাহেব ও বালাসাহেব এবং ভাগিনেয় রাও সাহেব; আর আছেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া তোপী ও আজিমুল্লা খান। দরবার-গৃহের কারুকার্যখচিত দেওয়ালে বিলম্বিত বাজীরাও এবং শিবাজীর তৈলচিত্র। বাইরে বিশস্ত-প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে; ভেতরে রুদ্ধ-দ্বারগৃহে চলছে গভীর আলোচনা। সে-আলোচনার বিষয় দিল্লী ও মিরাটের অভ্যুত্থান। গতকাল এক সৈনিক এই সংবাদ নিয়ে বিঠুরে এসেছে। কানপুর সেনানিবাসের অধিনায়ক স্তর হিউ হুইলার এখনো দিল্লী-মিরাটের সংবাদ শোনেন নি। নির্ধারিত তারিখের আগে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে, এখন আর বিপ্লবের গতি প্রতিরোধ করা চলে না, এই মত প্রকাশ করলেন দরবারে নানাসাহেব। এপ্রিল মাসেই আজিমুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর ভারতের সকল প্রধান শহরই নানাসাহেব ঘুরে এসেছেন এবং সর্বত্রই তিনি আসন্ন বিপ্লবের কর্মপন্থা প্রচার করে এসেছেন। সর্বত্রই তিনি ঐক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছেন। বিপ্লবের নির্দিষ্ট তারিখ ছিল রবিবার, ৩১শে মে। ঐ দিন ভারতের সকল সেনানিবাস এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কিন্তু মিরাট-দিল্লীর সংবাদ পাবার পর অবস্থার পরিবর্তন হলো এবং বিঠুর-দরবারে সেদিনের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো যে, অবিলম্বেই এই অবস্থার সুযোগ নিতে হবে। ৩১শে মে-র জন্ত আর অপেক্ষা করা চলবে না।

আজিমুল্লা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্‌ পথে এই সুযোগ নেওয়া উচিত? দিল্লীর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা, না পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করা? সকলের মতে ঠিক হলো যে, জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। আলোচনার শেষে নানাসাহেব বললেন, —বিদ্রোহের এই বেগ ও আবেগকে কিছুতেই স্তিমিত হতে দেওয়া হবে না। ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত নয়, কলকাতা থেকে নতুন সৈন্য এসে পৌঁছবার আগেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিদ্রোহকে সফল করে তুলতেই হবে।

মিরাট-দিল্লীর দুঃসংবাদ কানপুরে এলো ১৮ই মে।

বিদ্রোহীরা টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল। জেনারেল হুইলার তাই সঠিক সংবাদ অবগত হবার জন্যে বার্তাবহ সৈনিক পাঠিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে একজন বিদ্রোহী সিপাহী কানপুরে আসছিল। পথে তার সঙ্গে এক ইংরেজ স্কাউটের দেখা। সিপাহীর কাছ থেকে সে দিল্লীর খবর জানতে চায়, সিপাহী কিছুই বলে না—বলা নিষেধ ছিল। যাই হোক, মিরাট-দিল্লীর সংবাদ কানপুর সেনানিবাসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে হুইলার উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলেন না। তাঁর উদ্বেগের প্রধান কারণ সেনানিবাসে ইংরেজসৈন্যের স্বল্পতা। তিন হাজার দেশীয় সৈন্যের মধ্যে মাত্র একশ' ইংরেজসৈন্য। এক হাজারের কিছু বেশী বেসামরিক ইংরেজ তখন এই শহরের অধিবাসী ছিল। এই তিন হাজার সিপাহী যদি বিদ্রোহী হয়, তাহলে কানপুর কতক্ষণ?

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কানপুর শহর।

এখানকার ক্যান্টনমেন্ট অতি বৃহৎ; আয়তনে দু'শ মাইল।

কাশী, এলাহাবাদ বা আগ্রার মতো কানপুরের কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধি নেই। বাণিজ্য ব্যাপারে কেবল স্থানীয় চর্মকারেরাই উল্লেখযোগ্য; ঘোড়ার সাজ ও সবরকম জুতার জন্যেই কানপুরের যা কিছু খ্যাতি। গঙ্গার শোভা অবশ্যই চিত্তহারিণী। নানা আকারের ও নানাপ্রকারের নৌকা নিয়ত গঙ্গাবক্ষে ভাসমান। অনেক রকম জিনিসের আদান-প্রদান, নানান দেশের নানান জাতের লোকের জনতা। বহু লোকের কোলাহলে শহরটি সর্বদাই

মুখর। গঙ্গার তীরে সুপ্রসিদ্ধ ঘাটের দুই দিকেই নানারকম পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। শহরের লোকসংখ্যা ষাট হাজার। যাওয়া-আসার রাস্তা ভাল নয়। অযোধ্যার নিকটবর্তী বলে কানপুরের আশেপাশে তস্কর প্রকৃতির লোকের আধিক্যই বেশী।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ফয়জাবাদের চুক্তির পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যা রক্ষার জন্যে কানপুরে একদল সৈন্য নিযুক্ত করেন। অযোধ্যার কোষাগার থেকেই এই সৈন্যদলের বেতন নির্বাহ হতো। তারপর ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি অযোধ্যা অধিকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই কানপুর একটি প্রথম শ্রেণীর সেনানিবাসে পরিণত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কানপুর সেনানিবাসের গুরুত্ব ও খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অযোধ্যা অধিকার করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, তাই নব-অধিকৃত এই রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যেই কানপুর সেনানিবাসের প্রয়োজন ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে য়ুরোপীয় সেনানিবাস। কাছেই লক্ষ্ণৌ যাবার নৌ-সেতু। শহরের অধিবাসী যারা তাদের বাসগৃহের বিশেষ কোন শৃঙ্খলা ছিল না। দূরে দূরে এক একস্থানে লোকের বাড়ি ও ইংরেজদের দপ্তর-কাছারী অবস্থিত। ক্যাণ্টনমেণ্টের উত্তর-পশ্চিম অংশে বিঠুরে যাবার রাস্তা। কানপুর থেকে বার মাইল দূরে বিঠুর। দিল্লী যাবার রাস্তার মাঝখানে সিভিলিয়ানদের বাসগৃহ, সরকারী ট্রেজারী, জেলখানা ও মিশন হাউস। এসব বাড়ি ক্যাণ্টনমেণ্টের বাইরে। এদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অস্ত্রাগার ও বারুদখানা। শহর ও গঙ্গাতীরের মাঝখানে ইংরেজের গির্জা, থিয়েটার বাড়ি, টেলিগ্রাফ অফিস ও অন্যান্য সরকারী বাড়ি। শহরের চাঁদনী চক প্রসিদ্ধ।

কানপুর সেনানিবাসের সেনাপতি তখন স্যর হিউ হুইলার। কোম্পানীর সামরিক বিভাগের খ্যাতিমান এবং বর্ষীয়ান কর্মচারী তিনি। সিপাহীদের প্রকৃতি সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞ অফিসার তখন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাই মিরাটের খবর যখন কানপুরে এলো, সেখানকার সিপাহীরা স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং তারা গোপনে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। কিন্তু অভিজ্ঞ সেনাপতি হুইলার মনে করলেন যে, এ উত্তেজনা শীঘ্রই কমেযাবে। সুদীর্ঘ সৈনিক-জীবনে হুইলারের বিচারে

এই প্রথম ভুল হলো। কেননা কানপুর শহরে ও সিপাহীদের ব্যারাকে প্রত্যেকের মনে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, ভারতে ইংরেজ-শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাদের এই ধারণার মূলে ছিল দেশব্যাপী বিদ্রোহের আয়োজন এবং আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানীর সরকার এই আয়োজনের বিন্দুবিসর্গও পূর্বাহ্নে জানতে পারেন নি। সেই কারণেই বোধ হয় জেনারেল হুইলারের মত অভিজ্ঞ সেনাপতি মিরাট-দিল্লীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খবর পাবার পরও তাঁর অধীনস্থ সিপাহীদের বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যে কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করলেন না।

পনরই জুনের পর থেকে কানপুরের চেহারা অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল।

শহরে হিন্দু-মুসলমানদের বড় বড় সভা।

ব্যারাকে সিপাহীদের গোপন সম্মেলন।

স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা।

বাজারের বিপণিতে পর্যন্ত আলোচনার বিষয় একই।

একদিন সকালে চাঁদনীচকের একটা দোকানে ক্যান্টনমেন্টের এক মেমসাহেব সওদা করতে এসেছেন। শ্বেতাঙ্গিনী-সুলভ উদ্ধত মেজাজ দেখিয়ে তিনি দোকানীর সঙ্গে কথা বলেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। পথচারী একজন এসে শ্বেতাঙ্গিনীকে সম্বোধন করে রূঢ় ভাষায় বলে—তোমাদের এই উদ্ধত প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি। শীঘ্রই তোমাদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যায় সেনানিবাসের ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে চলে এই নিয়ে গভীর আলোচনা এবং পরামর্শ।

ক্রমে জেনারেল হুইলার বুঝলেন যে, পটভূমিকার রং পাল্টে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকা নির্বুদ্ধিতা। তাই তিনি সেনানিবাস রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আগ্রা থেকে কলভিন সংবাদ দিলেন—"অবস্থা বিপজ্জনক। আমরা বারুদস্তূপের উপর বসিয়া আছি। আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সতর্ক এবং নির্ভুল হওয়া চাই। কানপুরের নিরাপত্তার উপর সমগ্র গাঙ্গেয় প্রদেশের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে।"[২]

হুইলার চিন্তিত হন। বুঝলেন মিরাট ও দিল্লীতে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে, কিন্তু তা যে কতদূর সাংঘাতিক, তা তিনি কানপুরে বসে ঠিকমত উপলব্ধি

করতে না পারলেও প্রাথমিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন। শুধু বৃদ্ধ সেনাপতি সময়ে সময়ে ভাবেন, তাঁর দলের সিপাহীরা বিদ্রোহী হবে! এ যে তাঁর কল্পনার বাইরে। ১৮ই মার্চ তিনি লর্ড ক্যানিংকে ডেসপ্যাচ পাঠালেন: "কানপুরে সব শান্ত। শান্ত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। আমি সেনানিবাস সংরক্ষণের জন্ত যথাসাধ্য যত্ন লইতেছি। এই সময়ে আমাদের ধীরভাবে অগ্রসর হওয়াই উচিত।"

প্রথম প্রথম যেখানে যেখানে যত ঘটনা হচ্ছিল, জেনারেল হুইলার আগে তার কিছুই জানতে পারেন নি। কিন্তু মে মাস যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, তাঁর অফিসারেরা দিন দিন ততই অশুভ সংবাদ তাঁর গোচরে আনতে লাগল। মিরাট ও দিল্লীর সমাচার কানপুরে পৌঁছবার কয়েকদিন পরে হুইলার ভাবলেন, এখানকার সিপাহীদের মনে যখন আপাতত কোনো অসন্তোষ বা বিরাগের লক্ষণ নেই, তখন তাদের যদি ভালো কথায় বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তারা আশ্বস্ত হতে পারে। কিন্তু জনরবের মুখ তিনি কি করে চাপা দেবেন? শহরে অদ্ভুত জনরব—এক এক জায়গায় প্যারেডের মাঠে সিপাহীদের একত্র করে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জনরবের তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সিপাহীদের মধ্যে। এ আতঙ্কের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য—বুঝলেন বর্ষীয়ান সেনাপতি। যতই দিন যেতে লাগল, ততই তিনি বুঝতে পারলেন, সিপাহীদের উত্তেজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনরব সেই উত্তেজনার ইন্ধন জোগাচ্ছে।

বিরাট দায়িত্ব তাঁর মাথায়। কানপুরের ইংরেজদের নিরাপত্তা তাঁর চিন্তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বাইরে থেকে আরো বেশী ইংরেজ সৈন্য আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন তিনি। সেই সঙ্গে অস্ত্রাগারটির কথাও ভাবলেন। কিন্তু অস্ত্রাগারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। তা করতে গেলে সিপাহীদের অবিশ্বাস করতে হয়। সিপাহীদের রাগিয়ে দিলে বিপদ অনিবার্য। স্যর হুইলার এই সময়ে স্যর হেনরী লরেন্সকে এক চিঠিতে লিখলেন: "এখানে শীঘ্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার পূর্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতএব আপনি কিছুদিনের জন্ত লক্ষ্ণৌ হইতে ৩২ নম্বর পলটনের দুই এক দল য়ুরোপীয় সৈন্ত এখানে পাঠাইয়া দিন।"

অযোধ্যায় তখন ঘোর অশান্তি।

সৈন্য পাঠানো অসম্ভব।

তবু হেনরী লরেন্স কানপুরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলেন। ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের নেতৃত্বে ৩২ নম্বর পল্টনের চুরাশীজন সৈন্যকে কানপুরে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে কানপুর ও আগ্রার মধ্যবর্তী রাস্তার নিরাপত্তার জন্য অযোধ্যার দু'দল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। এই দুই দলের সঙ্গে দুটো কামান সহ একজন লেফটেনান্টের অধ্যক্ষতায় অযোধ্যার একদল গোলন্দাজ সৈন্যও প্রেরিত হলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দারুণ গ্রীষ্মতাপে দগ্ধাঙ্গ হয়ে, তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হয়ে ফ্লেচার সসৈন্যে কানপুরে এসে পৌঁছলেন। কানপুর দুর্গদ্বারে স্যর হুইলার তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আপাতত কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ভাবলেন তিনি।

আর একজনের কথা ভাবলেন জেনারেল হুইলার।

তিনি বিঠুরের নানাসাহেব।

নানা তাঁর নিকট প্রতিবেশী। বহু ইংরেজ তাঁর গৃহে বহুবার আতিথ্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত এবং সবাই তাঁকে ইংরেজের বন্ধু বলেই জেনেছেন। তাই যে সময়ে তিনি স্যর হেনরী লরেন্সের কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠালেন, সেই সময়ে নানা-সাহেবের কাছ থেকেও হুইলার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর অল্প কয়েকদিন আগেই নগরভ্রমণ-ব্যপদেশে নানাসাহেব লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। ভ্রমণ উপলক্ষ্য, নানার আসল লক্ষ্য ছিল অযোধ্যার রাজধানীতে গিয়ে সেখানকার জনসাধারণের মনের ভাব কি রকম, তা অবগত হওয়া। নানা বুঝলেন, সিপাহীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও আতঙ্ক। এসবই বিদ্রোহের পূর্বলক্ষণ। অযোধ্যার রাজধানীতে বসেই তিনি ভারতব্যাপী আসন্ন বিদ্রোহের আভাস পেলেন। বুঝলেন শুধু অযোধ্যায় নয়, উত্তর-ভারতের সমস্ত স্থানেই বিদ্রোহের আগুন প্রধূমিত। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর আজীবন বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার শুভ অবসর উপস্থিত। সেই অপূর্ণ-মনোরথ মারাঠা বীরের অন্তরে সেই সময়ে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই কানপুর থেকে জেনারেল হুইলারের অনুরোধ যখন তাঁর কাছে এলো, তিনি আজিমুল্লা ও তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে সেই বিষয়ে পরামর্শ করলেন। কোম্পানীর ইংলণ্ডের

দরবারে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে, এবং লর্ড ডালহৌসি তাঁর বৃত্তি বৃদ্ধি করতে অস্বীকার করেছিলেন, আজিমুল্লা অতীতের সেই বেদনাময় ইতিহাস নানাসাহেবকে এই সময়ে একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

—কিন্তু ইংরেজপ্রীতি আমার মুখোশ, সে কথা তোমরা জান।

—জানি বলেই তো বলছি, এক্ষুণি এর সুযোগ নিয়ে আপনি আপনার অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হোন।

—তাই তো ভাবছি, ইংরেজকে আঘাত করবার এই তো সুযোগ। তাহলে হুইলারের প্রার্থনা মঞ্জুর করি, কি বলো?

—নিশ্চয়ই। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি এখন বিপাকে পড়ে আপনার কাছেই সাহায্য চাইছে, অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে।

ঠিক হলো নানাসাহেব এখন পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব রক্ষা করে আসছেন, সেই বন্ধুত্ব রক্ষা করেই তিনি অগ্রসর হবেন। তাঁর বন্ধুত্বে হুইলারের সন্দেহ নেই। বিঠুর থেকে দূত গেল কানপুরে হুইলারের কাছে। নানাসাহেব তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে সম্মত আছেন—এই সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ সেনাপতি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। দেশীয় লোকের উপর নানাসাহেবের অত্যন্ত প্রভাব, কাজেই এই বিপদের সময়ে তাঁর সাহায্যের মূল্য আছে। লক্ষ্ণৌতে তিনি এই খবর জানিয়ে দিলেন।

সর্বনাশ! নানাসাহেবের সাহায্য! স্যর লরেন্স জেনারেল হুইলারকে তখনি লিখলেন: "নানাসাহেবকে আদৌ বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহার সদিচ্ছায় আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ। কাজেই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, আপনি তাঁহার উপর নির্ভর করিবেন না।"

কিন্তু লরেন্সের এই সতর্কবাণী নিষ্ফল হলো। ২১শে হুইলার লিখলেন: "আজ সকালে বিঠুরের মহারাজা আমার সাহায্যের জন্য দুইটি কামান, তিন শত সৈন্য—ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক পাঠাইয়াছেন।"

ইতিমধ্যে জেনারেল হুইলার মাটির প্রাচীর তুলে ছাউনির হাসপাতালটিকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের মত করে তুলেছিলেন। চার ফুট উঁচু সেই প্রাচীরের চারদিকে দশটি কামান বসান হয়েছিল। মহিলা, বালক-বালিকা ও বেসামরিক ইংরেজদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হলো। পঁচিশ দিনের মত রসদ সেখানে মজুত রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব ঠিকাদারের ওপর এই

রসদ সরবরাহের ভার ছিল, তারা নানাসাহেবের নির্দেশে উপযুক্ত পরিমাণ রসদ সরবরাহে বিরত ছিল। সামনেই ঈদের উৎসব, সেইজন্য আগে থেকেই হুইলার এই সাবধানতা অবলম্বন করলেন।

বিঠুরের রাস্তার অল্প দূরে কানপুরের ট্রেজারী। সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্ট অনেক দূর। কালেক্টার হিলার্সডন জেনারেল হুইলারের সঙ্গে ট্রেজারীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য পরামর্শ করলেন। ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে যদি ধন-ভাণ্ডার সুরক্ষিত হয় তাহলে বিদ্রোহীরা তা লুঠ করতে পারবে না। কিন্তু ধনাগারের পাহারায় যেসব সিপাহী ছিল তারা মৌখিক রাজভক্তি দেখিয়ে বললো—আমাদের পাহারায় ধনাগার নিরাপদে থাকবে। ধনাগার স্থানান্তরিত করা হলো না। নানাসাহেবের সৈন্যরা এসে কানপুরের নবাবগঞ্জে আড্ডা করল। সেইখান থেকে ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার বেশ নজরে হয়। নানাসাহেব কালেক্টারকে মৌখিক আশ্বাস দিয়ে বললেন, তাঁর সৈন্যরা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এই দুটি নিরাপদ। কালেক্টার ও জেনারেল হুইলার দুজনেই নানাসাহেবের বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করলেন সম্পূর্ণভাবেই এবং তাঁর ওপরেই ধনাগার ও অস্ত্রাগার রক্ষার ভার দেওয়া হলো। দিনকতক বাদে নানাসাহেব নিজে কানপুরে এলেন কালেক্টারের আহ্বানে। কানপুর শহরের মধ্যেই নানার নিজের একখানা বাড়ি ছিল। বিদ্রোহ পরিচালনায় জন্য সেইটাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রধান শিবির।

আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার এই সব ব্যবস্থা করে জেনারেল হুইলার একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

২২শে মে। বাজারের দোকানপাট সব বন্ধ ভয়ানক জনরব।

সেনানিবাসে বসে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই সব জনরব শুনে উদ্বিগ্ন হলেন জেনারেল হুইলার। পরের দিন ভোর ছটার সময়ে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন তার নিজের কথায় এই রকম: "সকাল ছটায় সময় গাত্রোত্থান করিয়া শহরের নানাস্থান আমি দর্শন করি। যাহা দেখিলাম, ভারতে আসিয়া অবধি সেইরকম ভীষণ ব্যাপার আর কখনো আমি চক্ষে দেখি নাই। ব্যাপারে বেবন্দোবস্ত, বিশৃঙ্খলা, চারিদিকে গোলমাল, চারিদিকে আতঙ্ক। সেনানিবাসের প্রাঙ্গণে সকল বর্ণের মানুষের বিরাট জনতা। সকলের মুখে অজ্ঞাত কল্পিত শত্রুর

নানাসাহেব

আক্রমণের ভয়ের চিহ্ন। অফিসার, অফিসারদের পত্নী ও ছেলেমেয়ে সকলেই শশব্যস্ত। লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া নানারকমের গল্প করিতেছে। বুঝিলাম বিদ্রোহ ঘটিতে আর বিলম্ব নাই।"

সাত দিন বাদে কানপুরের অবস্থার বিবরণ দিয়ে হুইলার গভর্ণর-জেনারেলকে লিখলেন : "এলাহাবাদ হইতে সৈন্য আনিবার জন্য আমি চার জায়গায় গো-শকট পাঠাইয়াছি। আশা করি আত শীঘ্রই কানপুর নিরাপদ হইবে। এখন যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি লক্ষ্ণৌ নগরকে সাহায্য করিতে পারিব। ঈদের পর্বে মুসলমানরা হাঙ্গামা বাধাইবে অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু ২৬শে যে নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়াছিল। বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমি এখন নবনির্মিত আশ্রয়স্থানে বাস করিতেছি। কানপুরে এখন ভয়ানক গরম। গ্রীষ্মের উত্তাপজনিত সিপাহীদের জ্বরের প্রকোপ কমিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অবিশ্বাস ও উত্তেজনার ভাব হ্রাস পাইলেও পূর্ণ মাত্রায় কমিতেছে না। সিপাহীদের মঙ্গলের জন্য আমরা যাহা কিছু করিতেছি, তাহারা তাহাতেই সন্দেহ করিতেছে। সাবধানে সুবিবেচনাপূর্বক যেসব কার্যে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি, ভ্রান্ত সিপাহীরা তাহাতেও সন্দেহ করিতেছে। সে সন্দেহ আমি দূর করিতে পারিতেছি না, ইহাই আমার এখন উদ্বেগের কারণ। অর্দ্ধশতাব্দী কাল যাবৎ আমি সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেছি, আমার প্রতি সিপাহীদের অসীম অনুরাগ। তাই আমার আশা হয় কানপুর আমি নিরাপদে রাখিতে পারিব।"

কিন্তু জেনারেল হুইলারের এই আশা নির্মূল করে দিয়ে এলো ৪ঠা জুন।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী দল ও একনম্বর পদাতিক দলের সিপাহীরা বিদ্রোহী হলো। এর ঠিক দু'দিন আগে এক ইংরেজ অফিসার মত্তাবস্থায় দ্বিতীয় অশ্বারোহী দলের একজন প্রহরীকে গুলি করে মারল। বিচারে অসাবধানতার অজুহাতে সেই অফিসার বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পায়। এই বিচারের ফল সিপাহীদের ক্ষিপ্ত করে তুলল। তারাও বলল—তবে দৈবাৎ আমাদের বন্দুকের গুলিও অসাবধানে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

তাই হলো। ৪ঠা জুনের রাত।

ক্যান্টনমেন্টের মাঠে হঠাৎ শোনা গেল ঘন ঘন গোটাকতক পিস্তলের আওয়াজ।

বন্দুকের আগুনের আভায় সুড়ঙ্গপথ আলোকিত হয়ে ওঠে।

কানপুরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদ্রোহের সূচনা এইভাবেই।

কানপুরে সিপাহীদের মধ্যে প্রথমে দ্বিতীয় অশ্বারোহী দলই প্রকাশ্যে বিদ্রোহের পরিচয় দেয়। সেই দলের বেশীর ভাগ সৈন্যই মুসলমান। ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল হুইলারের নির্দেশে যখন মাটির প্রাচীর তুলে, কামান পেতে, ইংরেজদের এক জায়গায় সমবেত করা হয়, তখনই এই পল্টনের সিপাহীদের সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা মনে করল, ইংরেজ তাদের ধর্ম তো নষ্ট করেছেই, এবার বুঝি তাদেরকে ধ্বংস করবে। তারা অশান্ত হয়ে উঠল। সুবেদার দেবকীনন্দন তাদের শান্ত রাখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সিপাহীরা তাঁকে তরবারীর আঘাতে আহত করে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে।

সেই রাত্রেই ট্রেজারীর টাকা এবং অস্ত্রাগারের গোলাগুলি ও বারুদের লোভে উন্মত্তপ্রায় অশ্বারোহী সিপাহীদল নবাবগঞ্জের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তাদের পেছনে পেছনে চললো এক নম্বর পদাতিক দলের সিপাহীরা। কর্ণেল ইওয়ার্ট সিপাহীদের নিরস্ত করবার জন্য বৃথাই বললেন—বাবা লোক! শান্ত হও। বিদ্রোহীরা তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলনা। যেখানে অস্ত্রাগার, ধনাগার ও জেলখানা, উত্তরপশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে তারা সেইদিকেই ছুটে চললো।

আগের দিন রাত্রে বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন—শামসউদ্দীন খান, টীকা সিং, জওলাপ্রসাদ আর মহম্মদ আলি—নবাবগঞ্জে নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। সুবেদার টীকা সিং নানাকে বললেন—আপনি ইংরেজদের ধনাগার ও অস্ত্রাগার রক্ষা করতে এসেছেন। কিন্তু আমরা হিন্দু-মুসলমান ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। সমস্ত বাঙালি পল্টন আজ একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েছে। আপনি কি বলেন?

—আমিও তোমাদের একজন, বললেন নানাসাহেব।

তারপর আসন্ন বিদ্রোহের পরিকল্পনা বিরচিত হলো নানার কানপুরের নবাবগঞ্জের প্রাসাদে বসে সেই ৩রা জুনের রাত্রে। আর দেরী নয়—আগামী কালই আঘাত হানতে হবে। সেই ৩রা জুনের রাত্রে কানপুর থেকে শেষবারের মতো টেলিগ্রাফ করে জেনারেল হুইলার গভর্ণর-জেনারেলের সেক্রেটারীকে জানালেন: "আগ্রা-কানপুরের টেলিগ্রাফ লাইন হয়ত আগামী কল্যই ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিদ্রোহের পরিপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তত্র সেনারা

করেন উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমি তাঁহাকে এইমাত্র দুইজন অফিসার সহ চুয়াল্লিশজন ইংরেজ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছি। ইহার বেশী পাঠাইবার মতন যানবাহনের অভাব। ইহাতে আমি কিছু দুর্বল হইয়া পড়িলাম, তবে এলাহাবাদ হইতে আরো য়ুরোপীয় সৈন্য এখানে আসিয়া পৌঁছান না পর্যন্ত আমি বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি।"

৪ঠা জুনের রাত্রেই সেই বিদ্রোহী দুই দল সিপাহী নানাসাহেবের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলো। তারা ধনাগার লুট করল, জেলখানার ফটক খুলে দিল, কয়েদিদের খালাস করে দিল। সরকারী কর্মচারীদের খুন করে মারল, অফিসের খাতাপত্র জ্বালিয়ে দিল। অস্ত্রাগারের কামান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো। জেনারেল হুইলারের তখনো পর্যন্ত ধারণা নানাসাহেব ইংরেজদের পক্ষে আছেন। অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু তা কাজে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। বিদ্রোহের খবর চকিতে সমস্ত সেনানিবাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সকালেই ৫৪ ও ৫৬ নম্বর পল্টনের সিপাহীরাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে।

সমস্ত বিদ্রোহী সৈন্য নবাবগঞ্জে এসে নানাসাহেবকে তাদের অধিনায়কপদে বরণ করল। কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীতে গিয়ে সেখানকার সৈন্যদের সঙ্গে মিলে বাদশাহের আনুগত্য করবে ঠিক করেছিল। তাদের টাকা ছিল, যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যানবাহন ছিল, দিল্লীর বাদশাহী থেকে আরো অনেক সাহায্য পাবে, এমন আশা ছিল। আজিমউল্লা কিন্তু বিদ্রোহীদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। নানাসাহেবও হলেন না। কিন্তু সিপাহীরা যখন তাঁর হাতে লুণ্ঠিত পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দিয়ে বললো—চলুন, আমরা দিল্লী যাই, তখন উত্তেজনার মুখে তিনি সিপাহীদের সঙ্গে আর তর্ক করলেন না। নানাকে নিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা সেইদিনই কানপুর ত্যাগ করল।

ছ'সাত মাইল যাবার পর বেলা শেষ হয়ে এলো। জায়গাটার নাম কল্যাণপুর। নানাসাহেব বললেন, আজকের রাতটা এখানেই থাকা যাক, কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে। সিপাহীরা আপত্তি করল না। রাত্রে কল্যাণপুরেই বিদ্রোহীদের তাঁবু পড়ল। সারা রাত্রি তাঁবুতে বসে নানাসাহেব চিন্তা করলেন,

দিল্লী যাবেন কি না। দিল্লী গেলে নিজের প্রভুত্ব থেকে বঞ্চিত হতে হয়, বাদশাহের অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকতে হয়, এবং সবচেয়ে যা তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক তা হলো মোগল রাজধানীতে ঈর্ষাকলুষিত মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে মাথা নত করে থাকা। মোগল-মারাঠার অতীতের তিক্ত ইতিহাস স্মরণ করে নানার মনে হলো, সেখানে বাহাদুর শাহ তাঁকে অবজ্ঞাও করতে পারেন। কানপুর তাঁর কর্মের কেন্দ্র। এখানে তাঁর অপ্রতিহত প্রাধান্য। এখানে তিনি তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষা করে সেই প্রাধান্য বজায় রাখতে পারবেন। ব্যক্তিগত কারণ ভিন্নও দিল্লী না যাওয়ার পক্ষে আরো একটি প্রবল কারণ ছিল। ইংরেজ পক্ষের দুর্বলতা তিনি তখন বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং কোন্ রন্ধ্র-পথে আক্রমণ করলে তাদের সেই শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া যাবে, তাও তাঁর ভাল রকম জানা ছিল। বিপদের বেড়াজালে কানপুর বেষ্টিত। লক্ষ্ণৌও বিপদাপন্ন; এমন অবস্থায় লক্ষ্ণৌ থেকে কোন সাহায্য আসবে, এমন আশা করা যায় না। কাশী, এলাহাবাদ ও আগ্রা থেকেও জেনারেল হুইলার কোন সাহায্য পাবেন, এমন আশাও নেই। চার দল সুশিক্ষিত বিদ্রোহী সৈন্য, তাঁর নিজের বিঠুর সৈন্য, উপযুক্ত কামান বন্দুক, প্রচুর যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অর্থ—এখন কিছুরই অভাব নেই কানপুরে। এর সাহায্যে তিনি কি না করতে পারেন? কল্যাণপুর শিবিরে রাত্রির সেই নিস্তব্ধ প্রহরে এইসব কথা চিন্তা করতে করতে নানাসাহেবের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

বাজীরাও-এর বংশধর তিনি—পেশবা-পদ তো তাঁরই প্রাপ্য। সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের এই তো সুবর্ণ সুযোগ। আজিমউল্লা তাঁকে বলেছেন, য়ুরোপেও ইংরেজদের পরাক্রম খর্ব হয়ে এসেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে—সে আগুন নির্বাপিত হবে কোম্পানীর শতবর্ষের রাজত্বের অবসানের ভেতর দিয়ে—এই তিনি কল্পনা করলেন। ভারতে বৃটিশ-শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার এই তো প্রকৃষ্ট অবসর। কার্যকৌশল তাঁর নিজেরই হস্তগত। এক আঘাতেই মারাঠার উচ্চ আশা এবং ঈর্ষাবিদ্বেষের প্রতিশোধ চরিতার্থ হতে পারবে এবং কানপুরে বসেই তা সম্ভব। এইখানে থেকেই তিনি বিদ্রোহের পরিচালনা করবেন এবং অন্যান্য স্থানের ...দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

রাত্রি শেষ হলো। বিদ্রোহীদের দলপতিদের নানাসাহেব ডাকলেন তাঁর তাঁবুতে। অসামান্য যুক্তিজাল বিস্তার করে তাদের দিল্লী যাত্রায় উভয়ে তিনি বাধা দিলেন। সিপাহীরা নানাসাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হলো। তারা কানপুরে ফিরে এল।

৬ই জুন, শনিবার। সকালবেলা।

নানাসাহেবের একখানা চিঠি এসে পৌঁছলো জেনারেল হুইলারের হাতে। চিঠিখানা পড়ে চমকে ওঠেন বৃদ্ধ সেনাপতি। চিঠিতে মাত্র একটি লাইন লেখা ছিল: ."আমি আপনাদের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প।" এও কি সম্ভব! ভাবলেন হুইলার। ইংরেজের বন্ধু নানাসাহেব তাঁদের আক্রমণ করবেন! গত পনর দিন যাবৎ যেসব ইংরেজ নর-নারী ও শিশুদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, হুইলার ভাবছিলেন এদের তিনি শীঘ্রই এলাহাবাদ বা কলকাতায় স্থানান্তরিত করবেন। কিন্তু নানাসাহেবের চিঠি পাবার পর তিনি সে আশা ত্যাগ করলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী চলে গেছে এই সংবাদেও তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। অচিরেই শুনলেন, দিল্লীর পথ থেকে বিদ্রোহীরা আবার কানপুরে ফিরে এসেছে। এইবার তারা নানাসাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজদের আক্রমণ করবে। বৃদ্ধ সেনাপতির সুখস্বপ্ন ভেঙে যায়। তাঁর অন্তর কেঁপে ওঠে। দুর্গমধ্যে অক্ষম, অসহায় ইংরেজ নর-নারী যারা তাঁর ওপর নিরাপদে প্রাণরক্ষার আশা করেছিল, তারাও ভীষণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল। আর সময় নষ্ট করবার অবসর নেই। এইবার প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষা করবার জন্যে কামানগুলোতে গোলা ভরা হলো, ইংরেজ পদাতিক সৈন্যরা সঙ্গীনযুক্ত গুলিভরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল। গোলন্দাজেরা প্রাচীরের বাইরে কামানে আগুন লাগাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। প্রত্যেক সমর্থ ইংরেজকেই অস্ত্রধারণ করতে হলো। কিছু পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং আগামী কয়েকদিনের আহারোপযোগী যা কিছু খাদ্য সামগ্রী পাওয়া গেল, তাই নিয়ে এক হাজার ইংরেজ নরনারী সেই আশ্রয়স্থানে সমবেত হলো। মাটির দেয়াল, সেই দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নেবার স্থান। যেখানে যেখানে যে যে অস্ত্র রেখে যেসব সৈনিকদের পাহারা দেওয়া দরকার, জেনারেল হুইলারের নির্দেশে সে সব ব্যবস্থা হলো।

বিদ্রোহীদের পক্ষেও আক্রমণের আয়োজন চলছিল পূর্ণ উৎসাহে।

নানাসাহেব প্রথম বিদ্রোহ পরিচালনার ভার দিলেন সুবাদার টিকাসিংহ, জমাদার দলগঞ্জন সিংহ এবং গঙ্গাদীন সিংহের ওপর। টিকাসিংহকে জেনারেল উপাধি আর বাকী দুজনকে কর্ণেল উপাধি দেওয়া হলো। আতঙ্ক সূচিত হবার কয়েক ঘণ্টাকাল ইংরেজেরা সম্ভবমত প্রস্তুত হয়ে থাকল। প্রতি মুহূর্তেই তারা আক্রমণের আশঙ্কা করে। কিন্তু ও পক্ষে কোন সাড়াশব্দ নেই। বেলা দুটোর আগেই কামান গর্জন শোনা গেল। বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে। ন পাউণ্ড কামানের একটা গোলা আশ্রয়-দুর্গের মধ্যে এসে পড়ল। পরক্ষণেই বিউগল বেজে ওঠে। ইংরেজ সৈন্যরা নিজের নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ায়। বেলা যতই শেষ হয়ে আসে, ততই শোনা যায় ঘন ঘন বিদ্রোহীদের গোলা-বৃষ্টি আর মেমসাহেব ও ইংরেজ-শিশুদের অবিরাম সভয় ক্রন্দনধ্বনি। সহসা সব নিস্তব্ধ। অতি ভয়াবহ সেই নিস্তব্ধতা।

বিদ্রোহীরা চারদিক অবরোধ করল।

এই অবরোধ চলেছিল এক আধ দিন নয়—তিন সপ্তাহ।

ইতিহাস-বিখ্যাত এই অবরোধের অতি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক ট্রেভলিয়ান ও নানকচাঁদ নামে কানপুরের জনৈক উকিল। প্রথমে আমরা ট্রেভেলিয়ানের বর্ণনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেব। তিনি লিখেছেন: "যাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। একটিমাত্র যন্ত্রণা—প্রাণের ভয়। সে-ভয় দূর হইবার আশা অল্পই। তাহার উপর অসহনীয় সূর্যোত্তাপ। জুন মাসের আকাশে যেন অগ্নিময় চন্দ্রাতপ বিস্তৃত, সেই সঙ্গে প্রবাহিত প্রচণ্ড উত্তাপ বায়ু। জলন্ত লৌহখণ্ড স্পর্শ করা যেমন দুঃসহ ব্যাপার, বন্দুকের উত্তপ্ত চোঙ স্পর্শ করাও সেই রকম দুঃসহ। ভারতের প্রখর সূর্যের উত্তাপে ইংরেজ সৈন্যদের শক্তি কমিয়া আসে। দিনের পর দিন তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইংরেজ মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রাত্যহিক জীবনের সকল রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবরোধকালে একান্ত দুর্লভ। কাজেই স্বপ্নের মতন পূর্বসুখস্মৃতি মনে মনে স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিজেদের একটু প্রবোধ দিতে লাগিলেন। চারিদিকে কামান-বন্দুকের গর্জন, চারিদিকে করাল কৃতান্তের বিভীষণ মূর্তি, চারিদিকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিভীষিকা।"

ট্রেকিল নামকর্টায় লিখেছেন; "শিবির অবরোধের এক সপ্তাহ পরে আর একটা ভয়ানক ঘটনা। সেনা ব্যারাকে অনেক বৃদ্ধ লোক, পীড়িত লোক, অক্ষম দুর্বল লোক, স্ত্রী ও বালকবালিকা জমা হইয়াছিল। একটা ব্যারাকে ছাদ ছিল না, খণ্ড খণ্ড ইষ্টক ও খাপরেল দিয়া ছাওয়া। বহু দাহ্য পদার্থ ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো। একরাত্রে হঠাৎ সেই গৃহে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে সময় যে ভয়ানক দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যাহারা যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল এবং যাহারা পীড়িত ছিল, তাহারা সেই ঘরে শুইয়া ছিল। নড়িবার শক্তি নাই, পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার সাধ্য নাই। সেই হতভাগ্য লোকেরা জলন্ত আগুনে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অতি যন্ত্রণাদায়ক সেই মৃত্যু। বিদ্রোহীরা অন্ধকার রাত্রিতে সেই অগ্নিক্ষেত্রের উপর অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইংরেজদের দুই জন গোলন্দাজ সেই গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইল। অবরুদ্ধদিগের বিপদ অবর্ণনীয়। বহু স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা বহুকষ্টে বাহির হইয়া উন্মুক্ত স্থানে ও মদের সিন্দুকের ভিতরে প্রাণভয়ে আশ্রয় লইল। কয়েক দিন কয়েক রাত্রি সেই ভাবে তাহারা নিরাশ্রয় রহিল। বহু খাদ্য ও ঔষধ সেই ব্যারাকে সঞ্চিত ছিল। আগুন লাগিয়া সবই ভস্ম হইয়া গেল। হাসপাতালের বহু মূল্যবান জিনিসপত্রও সেই আগুনে নষ্ট হইল।"

স্থান—সবেদা কুঠি, কানপুর।

নানাসাহেবের প্রধান শিবির এইখানে।

প্রকাণ্ড বাড়ি। তার সেনাপতি টিকা সিংহের শিবিরও এইখানে। তাঁতিয়া তোপী ও আজিমউল্লাও আছেন। এই সবেদা কুঠিতে বসেই তাঁরা সকলে মিলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন কূটমন্ত্রণা করতেন এবং বিদ্রোহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। সেদিন এখান থেকেই হিন্দু-মুসলমান এক যোগে ইংরেজদের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসংকল্প হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ-কানপুর পথের উপর সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বিদ্রোহের এক সপ্তাহ পরে টিকাসিংহ একদিন নানাসাহেবকে বললেন, কোম্পানীর অস্ত্রাগার থেকে আমরা যে-সব কামান ও অন্যান্য উপকরণ লুঠ করেছিলাম, তা নিঃশেষ হয়ে যাবার

সম্ভাবনা আছে। নানাসাহেব বললেন, আমি সে-ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। রুড়কীতে পাঠাবার জন্তে যেসব কামান ও অন্তান্ত সরঞ্জাম কানপুরের ঘাটে রাখা ছিল, তা আমরা আগেই দখল করেছি।

এই সংবাদে বিদ্রোহীরা উল্লসিত হয়।

তারা নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করে।

দিন যায়। অবরুদ্ধ ইংরেজরা এলাহাবাদ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্ত নানা চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তবু তারা আশা ও উত্তম ত্যাগ করে না। এদিকে খাদ্যদ্রব্য কমে আসতে লাগল। বহু চেষ্টা করেও তারা বাইরে থেকে খাদ্য জোগাড় করতে পারল না। কেউ যদি রাত্রে গোপনে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেত, তারা উন্মত্ত সিপাহীদের কাছে নিষ্কৃতি পেতনা। শেষে অবরুদ্ধ ইংরেজদের অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াল যে, ষাঁড়, ঘোড়া, কুকুর—কিছুই বাদ যায়নি। নিরুপায় হয়ে এদের মাংস আহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে তাদের দ্বিধা হয়নি। জলকষ্ট হয়েছিল সবচেয়ে মারাত্মক। অবরুদ্ধ স্থানে একটি মাত্র কূপ। ষাট-সত্তর ফুট নীচে তার জল। কেউ জল তুলতে গেলেই, তাকে বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যেত, সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত না। এই ভাবে অবরুদ্ধ ইংরেজদের সকল রকমেই দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। তিন সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধ ইংরেজরা আড়াই শো নিহত ইংরেজকে ঐ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হলো। কূপ নয়, সর্বজনীন কবর।

পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পরে এই সিপাহী বিদ্রোহ। উল্লাসে উত্তেজনায় বিদ্রোহীরা একমন, একপ্রাণ। ২৩-এ জুন বিদ্রোহীরা মহামারী উপস্থিত করল। মুসলমান সিপাহীরা নানাসাহেবের শাসনে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলো—ফিরিঙ্গী লোক কো মারো। সেদিন তারা অনেক ইংরেজের প্রাণবধ করেছিল।

দিন যায়। ইংরেজ সৈন্তরা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ল।

বিপক্ষেরা দিন দিন প্রবল হয়ে ক্রমাগত গোলাগুলি বর্ষণ করে।

মৃতের ওপর মৃত জমা হচ্ছে। কালেক্টর হিলার্সডনের প্রাণশূন্য ছিন্ন-ভিন্ন শরীর এসে লুটিয়ে পড়ল তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর পদতলে। পরের দিন ভগ্ন গৃহের প্রাচীরের ইটের চাপে মারা গেলেন কালেক্টর-পত্নী। জেনারেল

হুইলারের ছেলে লেফটেনান্ট হুইলার আহত হয়ে ব্যারাকের একটা ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ ভীম গর্জনে একটা ঘূর্ণায়মান কামানের গোলা এসে পড়ল সেই ঘরের মধ্যে। তাঁর মাথাটা নিমেষ মধ্যে উড়ে গেল। পিতামাতা ও পরিজনের চোখের সামনেই এই মর্মান্তিক দৃশ্য ঘটল। আর একটা গোলার জলন্ত বারুদ মেজর লিণ্ডের মুখে এসে পড়ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হয়ে যান এবং পরের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে পরের দিনই স্বামী ও পিতার অনুগমন করতে হয়। কর্নেল ইয়ার্ট আহত হয়ে দু-তিন দিন বেঁচেছিলেন। ক্যাপ্টেন হ্যালিডে তাঁর উপবাসিনী স্ত্রীর জন্ত একটু ঘোড়ার মাংসের জুষ আনতে শিবিরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে বিদ্রোহীরা তাঁকে গুলি করে মারল। এই ভাবে জেনারেল হুইলারের অনেকগুলি ভাল ভাল অফিসার বিদ্রোহীদের অব্যর্থ গুলির আঘাতে প্রাণ হারালেন। তাঁর চোখের সামনে প্রতি নিয়ত সৈন্তরা মারা যেতে লাগল। দিনের বেলায় যত লোক মরত, প্রতি রাত্রে কূপের মধ্যে তাদের মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়া হতো। এই প্রাণান্তকর অবরুদ্ধ অবস্থায় অনেকে পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছিল। শৃগাল-শকুনি-পরিবৃত ধ্বংসের সেই বিভীষিকাময় শ্মশানে এই ভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল।

শুধু মৃত্যু নয়, সেই সঙ্গে ক্ষুধার জালাও সেনানিবাসের সবাইকে অস্থির করে তুললো। সবাই ক্ষুধায় অবসন্ন, কাতর। ক্ষুধা যেন তার করাল দাঁত বের করে ক্ষুধার্তদিগকে চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করল। রসদ নিঃশেষিত প্রায়, খাদ্য দুষ্প্রাপ্য। খাদ্যাখাদ্যের বিচার রইল না। প্রাণধারণের জন্তে পচা মাংস সুস্বাদু বলে মনে হলো। বিড়াল-কুকুরের মাংস তখন সুখাদ্য। ক্ষুধার সঙ্গে পিপাসা। জুন মাসের প্রখর সূর্য-কিরণে সকলেরই প্রবল তৃষ্ণা। ক্ষুধা তবু সহ্য হয়, কিন্তু তৃষ্ণা তো সহ্য হয় না। ভরসা একটি মাত্র কূপের জল। কিন্তু জল আনবে কে? বিদ্রোহী গোলন্দাজদের সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা সেই জলের কুয়োর ওপর। জল আনতে গেলেই মৃত্যু অবধারিত। তবু জল না এনে উপায় নেই—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে শিশুদের তালু শুকিয়ে ওঠে। ইংরেজ সৈন্যরাই ভিস্তির কাজ করে। যে জল আনতে যায় সে আর ফেরে না।

সবেদা কুঠিতে বসে নানাসাহেব এই সব সংবাদ পান। তিলে তিলে ক্ষুধাতৃষ্ণার যন্ত্রণা ভোগ করছে অবরুদ্ধ ইংরেজরা। এমন সময়ে হুইলারের

কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালে কেমন হয়?—ভাবলেন নানাসাহেব। কোনো দিক থেকেই তাদের বাঁচবার আশা নেই। প্রতিহিংসায় তাঁর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। অভীষ্ট সিদ্ধি আর কত দূরে?

তিন সপ্তাহ অতীত হয়ে গেল।

লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন জেনারেল হুইলার। অতি গোপনে অতি কষ্টে সেখানে অবরোধের সংবাদ পাঠান হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সাহায্যের জন্যে একজনও সৈন্য তো এখনো পর্যন্ত এলনা। হুইলার আশা করেছিলেন সাহায্য আসবে, সে কেবল আশা মাত্র। মনের ভ্রম। দিন দিন ক্ষীণবল হয়ে পড়ছে সৈন্যরা। কামানগুলি হয়ে যাচ্ছে অকর্মণ্য। রসদ ও অস্ত্র দুই-ই নিঃশেষিতপ্রায়। দুর্ভিক্ষ যেন ভীষণ মূর্তি ধরে অবরুদ্ধ অসহায় ইংরেজ নরনারীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। এ-অবস্থায় আর বেশী দিন থাকা অসম্ভব, ভাবলেন বৃদ্ধ সেনাপতি। ক্রমে নৈরাশ্যের ছায়া নেমে আসে তাঁর চার দিকে।

তিন সপ্তাহের পর একদিন। ২৫শে জুন। সকাল বেলা।

একখানা পালকী এসে থামলো ইংরেজের অবরুদ্ধ আশ্রয়-দুর্গের সামনে। পালকির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক শ্বেতাঙ্গিনী। নাম মিসেস গ্রীনওয়ে। তিনি এসেছেন নানাসাহেবের শিবির থেকে জেনারেল হুইলারের সঙ্গে দেখা করতে। বিস্মিত সেনাপতি অভ্যর্থনা করেন অপরিচিতা শ্বেতাঙ্গিনীকে। নানার শিবিরে তিনি বন্দিনী ছিলেন। নানাসাহেবের স্বাক্ষরিত একখানা চিঠি তিনি দিলেন হুইলারের হাতে। চিঠিতে লেখা ছিল: "লর্ড ডালহৌসির কার্যাবলীর সহিত যাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং যাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতে সম্মত আছেন, তাঁহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন।" লিপিতে আজিমউল্লার হস্তাক্ষর। পত্রের মর্ম আত্মসমর্পণ। কিন্তু নানাসাহেবকে বিশ্বাস করতে মন চাইল না সেনাপতির।

—নো, আই শ্যাল নেভার সারেণ্ডার, বলেন জেনারেল হুইলার।

পত্রবাহিকাকে তিনি বিদায় দিলেন এই বলে যে, পরে তিনি এর উত্তর পাঠাবেন। তারপর তিনি পরামর্শ করেন সহকর্মী অফিসারদের সঙ্গে।

তরুণ অফিসাররা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবার সংকল্প করলেন; বয়স্ক অফিসাররা বিপরীত মত প্রকাশ করলেন।

—উই কান্‌ট হোল্ড এনি লংগার, বেটার উই সারেণ্ডার, বললেন ক্যাপ্টেন মুর।

সেদিনও তিনি নানাসাহেবের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেদিনও তাঁর ধারণা ছিল কানপুরে বিশেষ কিছু হবে না। আজ বৃদ্ধ সেনাপতির সে ভুল ভাঙল। আজ তিনি বুঝলেন যে, কানপুর-বিদ্রোহের অধিনায়কত্ব নানাসাহেবই করছেন। কাজেই তাঁর বাইরের মিষ্ট আচরণে ভোলা তাঁর পক্ষে কোনমতেই উচিত হয়নি। কিন্তু এখন অনুশোচনা নিষ্ফল, এ-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতেই হবে। শিবিরে বসে নিজের মনে এইসব কথা চিন্তা করতে লাগলেন সেনাপতি হুইলার।

ইংরেজশিবির থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আক্রমণ স্থগিত রইল। পরের দিন সকালে আজিমউল্লা ও নানাসাহেবের অশ্বারোহীদের অধিনায়ক জোয়ালাপ্রসাদ এলেন ইংরেজ শিবিরে। ক্যাপ্টেন মুর, ক্যাপ্টেন হুইটিং প্রভৃতি তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। স্থির হলো যে, ইংরেজরা তাদের কামান ও অন্যান্য অস্ত্র এবং সঞ্চিত অর্থ পরিত্যাগ করে যাবেন, তবে তাঁদের নিজের বন্দুক ও যাটবার গুলী করা যায় এই পরিমাণ টোটা সঙ্গে রাখতে পারবেন। নানাসাহেব সকলকেই নিরাপদে এলাহাবাদ যাত্রা করতে দেবেন। গঙ্গার ঘাটে নৌকা প্রস্তুত থাকবে এবং উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য দেওয়াও হবে তাঁদের সঙ্গে। ইংরেজদের তখন সঙ্গীন অবস্থা। বিদ্রোহীদের শর্তই মেনে নিতে হয়। আত্মসমর্পণের এই শর্তগুলোতে স্বাক্ষর করলেন হুইলার এবং আজিমউল্লার হাতে দেওয়া হলো সেই আত্মসমর্পণ-পত্র। সেই সন্ধিপত্র নিয়ে আজিমউল্লা হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন নানাসাহেবের শিবিরে। উভয়পক্ষের কামানই নীরব হলো। বেলা দুটোর সময়ে নানার শিবির থেকে একজন অশ্বারোহী এসে হুইলারকে খবর দিল যে, নানাসাহেব অঙ্গীকৃত সর্তে রাজী হয়েছেন। অতিরিক্ত সর্ত ছিল এই: "ইংরেজেরা যেন সেই রাত্রেই তাঁদের শিবির খালি করিয়া দেন।" সেনাপতি সেই রাতের মতো সময় চাইলেন। তবে কামানগুলি সন্ধ্যার পূর্বেই বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিলেন। হুইলারের আত্মসমর্পণের পর নানাসাহেবের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জোয়ালাপ্রসাদ এসে

কানপুর দুর্গে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। দুর্গ-শিখর থেকে ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ফেলা হলো এবং তার পরিবর্তে সেখানে উড়ল পেশবার ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পতাকা।

২৭শে জুন। সকালবেলা। সতীচৌরা ঘাট।

কথা ছিল এই সতীচৌরা ঘাট থেকেই ইংরেজরা নৌকায় উঠবে। এই ঘাটটাই কাছে পড়ে। কিন্তু সে সুবিধা নানাসাহেব দেখেন নি। তিনি দেখেছিলেন যে, এ-ঘাটের দুদিকে উঁচু পাড় আছে, আর সে-পাড়ে আছে অসংখ্য ঝোঁপ-ঝাড়। ঘাটের ওপরে এক শিবের মন্দিরও আছে। সে-মন্দিরেও লুকিয়ে থাকা যায়। নানা হুকুম দিলেন, দু'দল সিপাহী গিয়ে এইসব ঝোঁপে ঝাড়ে লুকিয়ে থাকবে, দু'একটা হাল্কা কামানও বসানো হলো জায়গা বুঝে। এ ছাড়া গঙ্গার ওপারে এবং এপারে যতদূর পর্যন্ত—যেখানে যেখানে হতভাগ্য অসহায়ের দল আশ্রয়ের জন্যে যেতে পারে, সর্বত্রই সিপাহী এবং কামান সাজানো হলো।

সিপাহীদের জানানো হলো যে সাহেবরা নৌকোয় চাপলেই তাদের ইঙ্গিত করা হবে এবং ইঙ্গিত পাবা মাত্র তারা কামান এবং বন্দুক চালাবে ঐসব অসহায় আশ্রিত পলাতকদের ওপর। কোনো সিপাহী প্রতিবাদ করল না।

প্রায় পাঁচশো ইংরেজ নরনারী সেনানিবাস থেকে চলেছে সেইখানে। পথে অত্যধিক ভীড়। কৌতূহলী জনতা—সাহেব মেমদের পারিপাটি দেখবার জন্যে উৎসুক। তাদের কানে তখনো আসল খবর পৌঁছয়নি, তারা শুধু জানে যে সাহেবেরা এইবার বাঁচল; তারা পালাচ্ছে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ পালকীতে, কেউ গাড়ি করে। এলাহাবাদে গিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হবে, এমনি তাদের মনের আশা। কিন্তু তাদের একজনও বুঝতে পারল না যে এই যাত্রা তাদের শেষ যাত্রা—যেন জীবনাবসানের সমাধিযাত্রার মিছিল। বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার কিনারায় সারি সারি নৌকা প্রস্তুত। আট দাঁড়ি বজরা। প্রত্যেক বজরার মাথায় খড়ের চাল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে নৌকো নয়, খড়ের গাদা। তখন গঙ্গায় জল খুব কম; এখানে ওখানে চর জেগেছে। নৌকো তীরে আসতে পারেনি।

সকলকেই হাঁটু জল ভেঙে নৌকোয় উঠতে হলো। বেলা ন'টার সময়ে নৌকোয় ওঠা শেষ হলো। তখন তারা ভাবল দয়াময় ঈশ্বর এবারো রক্ষা করলেন। কিন্তু নৌকো ছাড়ে কই? সকলেই অধৈর্য সহকারে নৌকো ছাড়ার হুকুমের প্রতীক্ষা করে রইল। তাঁতিয়া তোপি, আজিমউল্লা ও টিকা সিংহ অশ্বারোহী সৈনিক ও গোলন্দাজদের নিয়ে গঙ্গার তীরেই ছিলেন।

কিন্তু ওগুলো তো নৌকো নয়, নানাসাহেবের কাঁতিকল। কলে পড়বার আগের মুহূর্তেও ইঁদুর যেমন বুঝতে পারে না যে এটা কাঁতিকল— তেমনি ইংরেজরা বুঝতে পারল না যে এই নৌকোয় করে তারা এলাহাবাদ যাবে। যদিও কালকের রাতে তারা নিজেরা দেখেছে যে প্রত্যেকটা নৌকোয় দাসপাতা দিয়ে ছই করে দেওয়া হয়েছে, পাছে মেমসাহেবদের কষ্ট হয়। তারা দেখেছে এইসব নৌকোয় তোলা হয়েছে জলের কলসী, আটার বস্তা, চিনি, মাখন আরো কত কি। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে এ শুধু ছলনা এবং নানাসাহেবের ছলনার আয়োজনে খুঁৎ ছিল না এতটুকু।

হঠাৎ ভেরী বেজে ওঠে। মাঝিরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে। দুই তীর থেকে নৌকোর ওপর গোলাবৃষ্টি হতে লাগল। খড়ের ছই দাউ দাউ করে জলে ওঠে। গঙ্গার জল লালে লাল হয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দ ও আর্তনাদ মিশে একটা ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করল। চারদিকে শুধু মুহুর্মুহু গুলির শব্দ এবং অসহায় নরনারী আর্তনাদ। উনচল্লিশখানা নৌকো মুহূর্তমধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সবেদা কুঠিতে বসে নানাসাহেব এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের খবর পেলেন। তিনি আজিমউল্লাকে বলে পাঠালেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। বাকী সব ইংরেজদের বন্দী করে নিয়ে আনার হুকুম দিলেন তিনি। অন্ততঃ কানপুরে তিনি ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন—এ চরিতার্থতা কম নয়।

সন্ধ্যাবেলা। সতীচৌরাঘাটে কোলাহল ও আর্তনাদ দুইই তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। আবার গঙ্গার বুকে নেমে আসছে অন্ধকার—শান্তির ছায়া। গঙ্গার তীরে হত্যাকাণ্ড শেষ হলে পরে যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদের সবাইকে

বন্দী করে কানপুরে নিয়ে আসা হলো। যে পথ দিয়ে তারা নৌকোয় উঠতে গিয়েছিল, বিদ্রোহীরা বন্দীদের সেই পথ দিয়েই নিয়ে এল। চল্লিশখানা নৌকোর মধ্যে একখানা বেঁচে ছিল। এতে আগুন লাগেনি। মেজর ভাইবার্ট, ক্যাপ্টেন টমসন ও মুর প্রভৃতি ছিলেন এই নৌকায়। নিহত ও আহতরা নৌকার তলায় পড়ে রইল। হাল কিম্বা দাঁড় কিছুই ছিল না—স্রোতে নৌকো ভেসে চললো। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে এই হতভাগ্য ইংরেজরা শুধু গঙ্গার জল খেয়ে জীবন ধারণ করলেন। পরের দিন দুপুরবেলায় বজরাখানি নজরগড়ে পৌঁছল। বিদ্রোহীরা সেখানেও গুলি চালাতে বিরত ছিল না। গোলাগুলির আগুনে বজরার চালে আগুন জ্বলে উঠল। আরো কয়েকজন ইংরেজ অফিসার নিহত এবং আহত হলেন। সূর্যাস্তসময়ে কানপুর থেকে একখানা নৌকা, সেই জলন্ত বজরার অনুসরণে এসে উপস্থিত হয়। সেই নৌকোয় ষাট জন সশস্ত্র সিপাহী ছিল। বজরায় উঠে জীবিত ইংরেজদের গুলি করতে হবে—এই ছিল তাদের ওপর হুকুম। হঠাৎ বিদ্রোহীদের নৌকো চড়ায় লেগে অচল হয়ে যায়। দুই দলের মধ্যে একটা ছোটখাটো নৌযুদ্ধ হয়। বিপন্নাপন্ন ইংরেজরা সে-যুদ্ধে জয়লাভ করে।

অন্ধকার রাত। ঘোর অন্ধকার পলাতক ইংরেজদের নৌকো ভেসে চলেছে। কোন্ দিকে যাচ্ছে তারা ঠিক করতে পারলো না। আহার্য ফুরিয়ে গেছে। উপবাসীদের অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা ঘুমায় নি তারা জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিল, তাদের বাঁচাবার জন্য যেন সাহায্যকারী নৌকো আসছে। প্রভাতে স্বপ্নভঙ্গ। সম্মুখে ভীষণ নৈরাশ্যের মূর্তি। নৌকোটা গঙ্গার স্রোত থেকে ছিটকে ক্ষুদ্র একটি নালার মধ্যে এসে পড়ল। বিদ্রোহীদের গুলি সেখানেও তাদের সম্বর্ধনা জানাল। ক্যাপ্টেন টমসন চৌদ্দ জন সৈনিক সহচর সহ তীরে লাফিয়ে পড়লেন। নৌকো স্রোতে ভেসে গেল। বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকেন। ছুটতে ছুটতে তিন মাইল দূরে গিয়ে তাঁরা একটা মন্দির দেখতে পেলেন। সঙ্গীন খাড়া করে তাঁরা সেই নির্জন মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। নানাসাহেবের কাছে এ সংবাদ গেল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা শুকনো কাঠ একত্র করে মন্দিরের সামনে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রতিকূল বাতাসে ধোঁয়া আর আগুন মন্দিরের দিক থেকে অন্যদিকে উড়ে যেতে লাগল। বিদ্রোহীরা তখন বস্তা বস্তা বারুদ

ঢেলে দেয় আগুনের ওপর। নিরুপায় ইংরেজেরা সেখান থেকে বেরিয়ে নদী তীরের দিকে ছুটতে থাকে। তীরে পৌছবার আগেই সাতজন আর তীরে পৌছে আরো তিনজন বিদ্রোহীদের গুলিতে প্রাণ দিলেন। বাকী চারজন বন্দুক ফেলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় তাঁরা অযোধ্যার রাজা দিগ্বিজয়ী সিংহের আশ্রয়ে এসে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোম্পানীর অনুরক্ত দিগ্বিজয়ী সিংহ তাঁদের আশ্রয় দিলেন।

আশী জন ইংরেজ বন্দীকে কানপুরে নিয়ে আসা হলো।
পুরুষদের প্রাণদণ্ড হলো। মহিলা ও শিশুদের সবেদা কুঠিতে অবরুদ্ধ করে রাখা হলো। তার আগে সতীচৌরা ঘাট থেকে যাঁদের বন্দী করে আনা হয়েছিল, তাঁদের ও এই নূতন বন্দীদের সবাইকে এক জায়গায় রাখা হলো। নানাসাহেব বিঠুরে ফিরে গেলেন।
বিঠুর প্রাসাদে ১লা জুলাই ললাটে রাজটীকা ধারণ করে তিনি সগৌরবে 'পেশবা' বলে ঘোষিত হলেন।
নূতন পেশবার রাজ্যাভিষেকে তোপধ্বনি হলো।
সিপাহীদের মধ্যে বিতরিত হলো এক লক্ষ টাকা।
সমস্ত কানপুর সন্ধ্যা থেকে আলোমালায় ঝলমল করতে লাগল। হাজার হাজার আতসবাজী দিকমণ্ডল আলোকিত করে আকাশের নক্ষত্রপথ পর্যন্ত ছুটল। নানাসাহেবের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হলো।

৩০শে জুন। এলাহাবাদে কর্ণেল নীলের কাছে কানপুরের দুঃসংবাদ এলো। সেই সংবাদ তিনি অবিলম্বে পাঠালেন কলকাতায় লর্ড ক্যানিং-এর কাছে। সেই দিন তিনি একদল সৈন্য দিয়ে মেজর রেনডকে কানপুরে পাঠিয়ে দিলেন। চারশো ইংরেজ সৈন্য, তিনশো শিখ, একশ অশ্বারোহী সৈন্য এবং দুটো কামান নিয়ে মেজর রেনড তিরিশে জুন দুপুরে কানপুর উদ্ধারে যাত্রা করলেন। মেজর রেনডকে কর্ণেল নীল লিখিত অনুমতি দিলেন: "শত্রুপক্ষের মধ্যে যাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন। যাত্রাপথের দুইধারে যেসব বিদ্রোহীকে দেখিতে পাইবেন, তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন করিবেন না—সঙ্গে সঙ্গে সংহার

করিবেন।" মেজর রেনড জানতেন যে কর্ণেল নীলের প্রতিহিংসা এরই মধ্যে কী রকম সংহার মূর্তি ধারণ করেছে। তিনিও অনুরূপ সংকল্প নিয়েই যাত্রা করলেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিদ্রোহ লর্ড ক্যানিংকে দিনের পর দিন উদ্বিগ্ন করে তোলে। এলাহাবাদের সংবাদের পর কর্ণেল নীলের ওপর আর ভরসা করা যায় না। আরো যোগ্য লোক দরকার। ওদিকে দিল্লী অবরুদ্ধ, এদিকে বিদ্রোহের আগুন শত শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সময়ে পারস্যযুদ্ধ-বিজয়ী জেনারেল হেনরী হ্যাভলকের মত বীরকেই লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহ দমনের জন্য যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করলেন। তিরিশে জুন এলাহাবাদে পৌঁছে জেনারেল হ্যাভলক কর্ণেল নীলের হাত থেকে সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন। বহু অভিজ্ঞ বীরপুরুষ তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সৈন্য বিভাগে রণদক্ষতায় হেনরী হ্যাভলক অতুলনীয়। শ্রীরামপুরের পাদ্রী মার্শমানের একটি কন্যাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। বীর কিন্তু অত্যন্ত ধর্মভীরু। কিছুদিন পরেই হ্যাভলক সসৈন্যে কানপুর যাত্রা করলেন।

॥ তেরো ॥

নানাসাহেব পেশবা নাম ধারণ করলেন।

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড টমসন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব ললাটে রাজটীকা ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু নিজে কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে পারিলেন না। প্রকৃত প্রভুত্ব রহিল আজিমউল্লার হাতে এবং কানপুর হইতে চলিয়া আসিবার পর, তথায় তাঁহার প্রতিপত্তিও কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইল। কানপুরে মুসলমানেরাই প্রবল। ইংরেজদের শিবির অবরোধের সময়ে নদী নবাব নানাসাহেবকে বিশেষ সহায়তা করেন। ইনি একজন উচ্চবংশীয় বিখ্যাত মুসলমান। কিন্তু বিদ্রোহের প্রারম্ভে নানাসাহেব সেই নবাবকে বন্দী করেন। পরে অবশ্য তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং নানাসাহেব নবাবকে একটি সেনাদলের সৈনাপত্য প্রদান করেন। ইংরাজকুল নির্মূল হইলে নবাবকে কানপুরের গভর্নর করিয়া দিবেন—নানাসাহেব তাঁহাকে এই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।"

কাশী ও এলাহাবাদ কঠোর নিষ্ঠুর হাতে শাসন করে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য আসছে কানপুরের দিকে। চোখে তাদের জিঘাংসা, ওষ্ঠের কঠিন রেখায় প্রতিহিংসা। কানপুরের কাহিনী এরই মধ্যে তাদের কানে পৌঁচেছে। এলাহাবাদ থেকে দলে দলে নূতন সৈন্য আসছে; তারা এসে নূতন করে যুদ্ধ বাধিয়ে ইংরেজ-হত্যার প্রতিশোধ নেবে। সেই সব সৈন্য আসতে আসতে পথে যাকেই দেখতে পাচ্ছে, তাকেই গাছের ডালে ফাঁসী দিচ্ছে। বিঠুরে বসে এই খবর ও জনরব শুনলেন নূতন পেশবা। শুনলেন, কানপুর অধিবাসীরা ভয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ সৈন্য আসছে শুনে সিপাহীরাও নাকি শঙ্কিত হয়েছে। শহরবাসীদের আশ্বাস দিলেন নানাসাহেব আর টাকা দিয়ে সিপাহীদের করলেন উৎসাহিত।

হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকজন প্রতিনিধির ওপর কানপুরের শাসনভার অর্পিত হয়েছিল। এই সময়ে তাঁরা নানাসাহেবকে কানপুরে আহ্বান করলেন। তিনি কানপুরে এলেন। একদিন নানাসাহেব তাঁর অনুগত লোকদিগকে এক বিরাট ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। নৃত্য, গীত আর নানাপ্রকার আমোদ-কৌতুকে তাদের মন থেকে ভয়ের ভাব দূর করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। গুপ্তচরদের মুখে সংবাদ এলো, ইংরেজ গোলন্দাজরা কামান নিয়ে এগিয়ে আসছে। এইকথা শুনে নানাসাহেব হুকুম দিলেন এক বিরাট কুচকাওয়াজের। নানার সৈন্যরা পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরল—তুমুল বাদ্যধ্বনির সঙ্গে তাদের সেই সম্মিলিত কুচকাওয়াজ নগরবাসীর মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করল। ভয়ব্যাকুল জনসাধারণের ভয় দূর করবার জন্যে নগরমধ্যে নতুন পেশবার এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হলো: ইংরেজের গর্ব খর্ব হয়েছে। তাদের চেয়ে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির অসাধারণ বিক্রমে ইংরেজ সৈন্যেরা হতবীর্য হয়ে গিয়েছে। ভগবানের কৃপায় হতাবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যরা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। কানপুরের জনসাধারণ একটু আশ্বস্ত হলো। তাদের বিশ্বাস হলো, হতবীর্য ইংরেজেরা আর তাদের কিছুই করতে পারবে না, ইংরেজকে ভয় করবার আর কোনো কারণ নেই।

জুলাই মাস এগিয়ে আসতে লাগল।

নানাসাহেব খবর পেলেন, এলাহাবাদ থেকে দলে দলে ইংরেজ সৈন্য আসছে। আবার আয়োজন শুরু হয় যুদ্ধের। মহারাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের নূতন পত্তন হয়েছে—কানপুরের গঙ্গাতীরে আবার একটা জয়লাভ হবে—এই আশ্বাসে, এই বিশ্বাসে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে ওঠে নানাসাহেবের ঠোঁটে। গভীর আত্মপ্রসাদে তিনি স্থির করলেন—জয়লাভের সব উপকরণ তাঁর নিজের হাতে। আজিমউল্লা, তাঁতিয়া তোপি ও অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে পরামর্শ করলেন এবং লক্ষ্ণৌ-কানপুরের পথে কিভাবে ইংরেজ সৈন্যদের বাধা দেওয়া যায় তারই পরিকল্পনা রচনায় মনোনিবেশ করলেন তিনি। সেনাপতি হ্যাভলক সসৈন্যে কানপুরে আসছেন—তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্যে বিদ্রোহীদের তিনি প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর হাতে বহু ইংরেজ বন্দী—সম্ভবত এদের উদ্ধারের জন্যে হ্যাভলক আসছেন। কিন্তু তিনি যদি একবার জানতে পারে[illegible] যে কানপুরে একটি ইংরেজও জীবিত নেই, তাহলে ইংরেজ-সৈন্য কি

আর এত দূর হানা দেবে? মনের মধ্যে একটা মতলব ঠিক করলেন নানাসাহেব এবং সেই অনুসারে বন্দীদের সবেদাকুঠি থেকে বিবিঘরে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন তিনি তাঁতিয়া তোপিকে।

বিবিঘর।

একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে নগরের হিন্দুস্থানী পল্লী—এরই মাঝখানে বিবিঘর। নানাসাহেবের নূতন বাসস্থান থেকে বেশী দূরে নয়। কথিত আছে, একদা এক ইংরেজ অফিসার তাঁর একটি হিন্দুস্থানী উপপত্নীর জন্যে এই ভবনটি তৈরি করিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানী বিবির বাসস্থান, তাই লোকে এর নাম দিয়েছিল বিবিঘর। সেই বিবিঘরে বন্দীদের স্থানান্তরিত করা হলো। খুব ছোট্ট বাড়ি। একটি পরিবারের লোকের সংকুলান হতে পারে অতি কষ্টে। সেই ক্ষুদ্র আয়তন গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ ইংরেজ স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের এনে রাখা হলো। তাদের সংখ্যা দুশোর বেশী। ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান এই বিবিঘরের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: "ভেড়ার খোঁয়াড়ের মধ্যে কশাইরা যেমন বধ্য মেষপালকে বাঁধিয়া রাখে, বিবিঘরের ইংরেজ বন্দীগণের অবস্থাও সেইরূপ। এই গৃহটিতে দুখানি বড় বড় ঘর; দৈর্ঘে বিশ ফুট, প্রস্থে দশ ফুট। এ ছাড়া, জানালাবিহীন ছোট কুঠরী কয়েকখানি। বাড়ির সামনে পনর গজ চওড়া একটি প্রাঙ্গণ। এইখানেই প্রাচ্যের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ে এক পক্ষ কাল দুইশত ছয়জন হতভাগ্য ইংরেজ মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন মাত্র পুরুষ ছিলেন।"

কানপুরের পতনের সময় কয়েকজন ইংরেজ ফতেগড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন স্ত্রীপুত্র নিয়ে প্রাণরক্ষা করবার জন্যে আবার কানপুরে ফিরে আসেন। বিদ্রোহীদের হাতে তাঁরা পথিমধ্যে ধৃত হন। তাঁদের কানপুরে নিয়ে আসা হলো। পুরুষরা কেউই নিষ্কৃতি পেলেন না—নানাসাহেবের সম্মুখেই তাদের হত্যা করা হয়। স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বিবিঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিবিঘরের হতভাগ্য বন্দিনীরা ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ। বাজারে যেসব সামান্য জিনিস পাওয়া যায়, তাই তাদের আহার্য। অসহ্য যন্ত্রণা। এমন অবস্থায় দেখা দিল পেটের অসুখ। সেই অসুখেই কয়েক জনের মৃত্যু হলো। সমসাময়িক অনেক ইংরেজের দিনলিপি দেখে ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন: "একজন মহিলা রোগের যন্ত্রণা সহ্য

করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন। একজন স্থানীয় চিকিৎসকের রিপোর্টে প্রকাশ অসুখে আটাশ জনের মৃত্যু হয়—কলেরায় নয়জন, উদরাময়ে নয়জন, রক্ত আমাশয়ে একজন, অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণায় তিনজন এবং অজ্ঞাতরোগে আরো পাঁচজন আর একটি নবজাত ছুইদিনের শিশু।...ইংরেজ মহিলাদের সতীত্ব নষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাহাদিগকে দাসীত্ব করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে গম পিষিতে হইত। নানাসাহেবের আবাসের প্রাঙ্গণেই তাহারা যাঁতা ঘুরাইত। ময়দা পেশা শেষ হইলে বিবিরা তাহাদের উপবাসী পুত্রকন্যাদের জন্য কিঞ্চিৎ আটা লইয়া কারাগারে ফিরিয়া যাইত। সেই কারাগারে কোনো আসবাবপত্র ছিল না, বিছানা ছিল না, খড় পর্যন্ত নয়। (কঠিন বাঁশের দরমা তাহাদের শয্যা। বিবিঘরে অবরুদ্ধ ইংরেজ বান্দনীদের প্রহরায় ছিল একজন ভারতীয় মহিলা। দীর্ঘদেহ গৌরাঙ্গী সেই মেট্রনের বয়স আটাশ কি ত্রিশ হইবে। তাহাকে সবাই বেগম বলিয়া ডাকিত। বেগমের তত্ত্বাবধানে ঝাড়ুদারনীরা মহিলাদের আহার্য পরিবেশিত হইত। বন্দিনীদিগকে তাহাদের অপরিষ্কার বস্ত্রাদি নিজেদের হাতে ধুইয়া লইতে হইত।")

এই বিবিঘরের অদূরেই নানাসাহেবের ভবন।

সেই ভবনের দ্বারপথে দুটি কামান। তাঁহার নিজস্ব সৈন্যের একদল সর্বদাই উন্মুক্ত সঙ্গীনসমেত বন্দুক হস্তে দ্বারপথ রক্ষা করত। জনসাধারণের অভ্যর্থনার জন্য প্রশস্ত একটি সুসজ্জিত হলঘর। এই ভাবেই রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে বাস করতেন নূতন পেশবা ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। রাত্রিকালে বিঠুররাজের আমোদ-উৎসবে তাঁর বাসগৃহ উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত হতো, দ্বারে দ্বারে মশাল জ্বলত। বিবিঘরের হতভাগ্য বন্দী ও বন্দিনীরা সেই উজ্জ্বল দৃশ্য দেখত এবং শঙ্কিতচিত্তে তাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা স্মরণ করত।

ইংরেজ সৈন্যদের আসন্ন আগমনের জনরবে কানপুরের অধিবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। চাঞ্চল্য এবং আতঙ্ক। নূতন পেশবার আশ্বাসে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাই অনেকেই দলে দলে শহর ছেড়ে যাবার উপক্রম করে। ৫ই জুলাই নানাসাহেব জনসাধারণকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন:

"আমরা জানিতে পারিলাম যে, এলাহাবাদ হইতে ইংরেজ সৈন্য কানপুরে আসিতেছে, এই জনরবে বিচলিত হইয়া শহরের অধিবাসীরা শহর ত্যাগ

করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে শহরের ছোট বড় প্রত্যেক রাস্তায় অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য মোতায়েন রাখা হইয়াছে এবং এলাহাবাদ বা ফতেপুর যেখান থেকেই ইংরেজসৈন্য আসুক না কেন, আমাদের সৈন্যরা তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং সকলেই যেন নির্ভয়ে শহরে বাস করে এবং নিজের নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকে।"

স্থান—এলাহাবাদ সেনানিবাস। সময়—৫ই জুলাই, সকালবেলা।

জেনারেল হ্যাভলক কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেলের কাছে এই চিঠি পাঠালেন :

"কানপুর আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, সেই স্থানের উদ্ধার আশু কর্তব্য। সেখান হইতে লক্ষ্ণৌনগরে সাহায্য পাইবার সুবিধা হইবে। এখন বর্ষাকাল— এই অঞ্চলে প্রায়ই বৃষ্টি প্রচণ্ড, সোজাপথ ভিন্ন অন্যপথে-যুদ্ধযাত্রা করিবার অনেক অসুবিধা। কানপুরের পুনরুদ্ধারে আমি সবিশেষ যত্ন করিব। সরাসরি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চৌদ্দ শত য়ুরোপীয় পদাতিক সৈন্য ও ছুইটা কামান লইয়া অবিলম্বে কানপুর যাত্রা করা আমার ইচ্ছা। কর্ণেল নীল আর একদল সৈন্য লইয়া আমার অগ্রগামী হইবেন। মেজর রেনড কর্ণেল নীলের আদেশে ইতিপূর্বেই কানপুরের দিকে সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন।"

৭ই জুলাই বিকেলবেলায় জেনারেল হ্যাভলক এলাহাবাদ থেকে যাত্রা করলেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য মিলে মোট এক হাজার চার শো সৈন্য তাঁর সঙ্গে। এই সৈন্যদের মধ্যে একশো ত্রিশ জন শিখ ছিল। অফিসার ও সৈন্য—সকলেই আশা, উৎসাহ এবং প্রতিহিংসা ভরপুর। সকলেরই ধারণা তাদের বিপক্ষে যত সিপাহীই থাকুক না কেন, এযুদ্ধে তারা জয় লাভ করবেই। প্রথম দুদিন তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে হ্যাভলকের বাহিনীর দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল। এমন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ইংরেজ সৈন্যদের চক্ষে নূতন। ডাইনে ও বাঁয়ে যত দূর তাদের দৃষ্টি যায়, জলপ্লাবিত এক বিরাট অঞ্চল। জনমানবশূন্য সেই নির্জন স্থানে অসংখ্য বন্য শূকরের গর্জন আর পোকা-মাকড়ের গুঞ্জন ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। নেবুগাছের গন্ধে বাতাস ভারী। রহস্যময় ভারতবর্ষের পথঘাট তাদের ভালো জানা নেই। অনেকেই ক্লান্ত হয়ে

পিছনে পড়ে রইল, কেউ কেউ পায়ের তলা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি চলতে পারল না। জেনারেল হ্যাভলক কিন্তু পূর্ণ সাহসে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিন দিন বাদে জল ও কাদা ভেঙে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হতে হতে হ্যাভলক বুঝতে পারলেন যে শত্রু সামনেই এবং মেজর রেনডকে একান্ত অসহায় ভাবেই এক বিপুল শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখন আকাশ পরিষ্কার কিন্তু সূর্যের উত্তাপ অসহ্য।

১১ই জুলাই। রাত্রিকাল। নির্মেঘ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের আলো। সেই আলোয় পথ করে নিয়ে জেনারেল হ্যাভলক রেনডের সৈন্য দলের সঙ্গে মিলিত হলেন। মেজর রেনড এগিয়ে এসে জয়ধ্বনি করতে করতে নূতন সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করলেন। পরের দিন সকালে এখান থেকে তাঁদের আরম্ভ হলো সম্মিলিত অভিযান। দুজনের মিলিত সৈন্য ও সরঞ্জাম দাঁড়াল এই রকম: দেড় হাজার ইংরেজ সৈন্য, ছশো দেশীয় সহকারী সৈন্য এবং আটটি কামান। ফতেপুর থেকে পাঁচ মাইল আগে তাঁদের তাবু পড়ল বিলীন্দ নামক একটা জায়গায়। এইখানেই তাঁদের সম্মুখীন হতে হলো নানাসাহেবের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে। হ্যাভলকের আগমন সংবাদ তিনি পূর্বেই গুপ্তচর মুখে পেয়েছিলেন এবং অনেক সৈন্য নিয়ে তিনি ফতেপুরে ইংরেজ সেনাপতির অভ্যর্থনার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন।

সৈন্যরা ক্লান্ত। তাদের পায়ের তলা ক্ষত-বিক্ষত; একটু বিশ্রামের অবকাশ দিলেন তাদের হ্যাভলক। অস্ত্রশস্ত্র একস্থানে স্তূপীকৃত হয়ে রইল। সৈন্যরা প্রাতরাশ খাবার জন্যে প্রস্তুত। এমন সময়ে হঠাৎ একটা চব্বিশ পাউণ্ডের গোলা জেনারেল হ্যাভলকের পায়ের তলায় এসে পড়ল। সৈন্যদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উড়ে গেল। এই অতর্কিত আক্রমণের প্রসঙ্গে জেনারেল হ্যাভলক তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন: "কাহাদের গোলা, কোথা হইতে আসিল, শীঘ্রই সে সংশয় ভঞ্জন হইয়াছিল। কর্ণেল টিট্‌লার কয়েকজন প্রহরী লইয়া সংবাদ লইতে বাহির হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে স্যর হেনরী লরেন্সের প্রেরিত কয়েকজন চরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চরমুখে তিনি বার্তা পাইলেন, বিদ্রোহীরা ফতেপুরে আসিয়া জমা হইয়াছে। সৈন্যদের আর খাওয়া হইল না, আহারের কথা আর তাহাদের মনেও থাকিল না। অদূরে শত্রুসৈন্য, এখনই যুদ্ধ

রাখিবে। আদেশ পাওয়া মাত্র আমাদের সৈন্যরা শ্রেণীবদ্ধভাবে শত্রু-শিবিরের দিকে উৎসাহ ভরে ধাবিত হইল।"

ইতিমধ্যে ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দেবার জন্যে নানাসাহেবের নির্দেশে সেনাপতি জওলাপ্রসাদ ও টীকাসিংহ দেড় হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজ, পাঁচশো অশ্বারোহী এবং দেড় হাজার সশস্ত্র সাধারণ লোকসহ এলাহাবাদ যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বারোটা কামানও ছিল। নানাসাহেবের এই সৈন্যদল ফতেপুরে শিবির স্থাপন করেছিল। ১২ই জুলাই হ্যাভলকের সৈন্যদল জওলাপ্রসাদের সৈন্যদলের সম্মুখীন হলো। বিপক্ষের গুপ্তচরের সংবাদে একটু ভুল ছিল। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল কেবলমাত্র মেজর রেনড্ই সসৈন্যে এসেছেন, তাঁর পেছনে বুঝি আর কোন সৈন্য নেই। কিন্তু ওদিকে যে হ্যাভলকের আদেশে এককালে বহু সৈন্য কামান নিয়ে পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসছিল, এটা তারা জানতেই পারে নি। তাই যুগপৎ বহু ইংরেজ সৈন্য এবং কামানের সমাবেশ দেখে বিদ্রোহীরা বিস্মিত হলো। কিন্তু নানাসাহেবের সৈন্যরা "শিকারী কুকুর"; জীবন-মরণ তুচ্ছ করে তারা মহাবিক্রমে ইংরেজ সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফতেপুরের যুদ্ধে জোয়ালাপ্রসাদের অশ্বারোহী দল অসাধারণ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখাল। কিন্তু ইংরেজের কামান ও বন্দুকের পাল্লা বেশী ছিল বলে, সেনাপতি হ্যাভলকই শেষে এই ফতেপুরের যুদ্ধে জয় লাভ করলেন। বিদ্রোহীরা কামানগুলো ফেলে পালিয়ে গেল। ইংরেজের এই জয়ের পূর্বে ফতেপুর পাঁচ সপ্তাহ কাল নানাসাহেবের অধীনতা স্বীকার করেছিল। এলাহাবাদ ও কানপুরের দু'দল বিদ্রোহী যে মাসে ফতেপুরে প্রবেশ করেছিল। তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান। এখানেও উত্তেজিত সিপাহীরা যথারীতি কয়েদীদের মুক্ত করে, ধনাগার লুণ্ঠন ও কাছারীগৃহ অগ্নিসাৎ করে এবং অনেক ইংরেজকে প্রাণে মারে। এইবার ইংরেজ তার প্রতিশোধ নিল ঠিক সেই ভাবেই—সেই লুণ্ঠন আর গৃহদাহ। অধিকন্তু, তোপের মুখে তারা ফতেপুরের বড় বড় অট্টালিকা ধ্বংস করল।

ঐতিহাসিক কেয়ি ফতেপুর যুদ্ধের বিবরণ এইভাবেই দিয়েছেন: "ইংরেজের এনফিল্ড রাইফেল ও দুর্জয় কামানসমূহ বিপক্ষ দলকে প্রকৃত যুদ্ধ করিবার অবসর দিল না। গোলন্দাজদলের ক্ষিপ্রকারিতা প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। সেই

রঙ্গভূমিতে একজন নূতন যোদ্ধা সমুপস্থিত। ভারতের লোকেরা ইতিপূর্বে সেই বীরপুরুষের নাম শোনে নাই। সেই বীরপুরুষের নাম বিদ্রোহীদের কাছে ভীষণ আতঙ্কের কারণ হইল। তিনি জেনারেল হেনরী হ্যাভলক।... বিদ্রোহীদের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। নানাসাহেবের কামান ও গোলন্দাজ, আমাদের কামান ও গোলন্দাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, ইংরেজ সৈন্যের গোলাবর্ষণের সম্মুখে সুস্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। আমাদের সৈন্যরা বন্দুক চালায় নাই, তলোয়ার চালায় নাই, কেবল এনফিল্ড রাইফেল ও কামানের সাহায্যে শত্রুদলন করিয়াছিল। ইংরেজের গোলাবৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী সিপাহীরা নগরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যাইবার সময়ে তাহারা কয়েকটা কামান ফেলিয়া গিয়াছিল।”

কানপুরে বসে নানাসাহেব ফতেপুরের সংবাদ পেলেন।

সংবাদ নয়—দুঃসংবাদ। সম্পূর্ণ পরাজয়। নানাসাহেব ক্রুদ্ধ এবং বিচলিত হলেন।

ফতেপুরের এই পরাজয় সম্পর্কে তাঁতিয়া তোপির উক্তি: “সিপাহীরা নানাসাহেবকে সঙ্গে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি সম্মত হন নাই। আমি ও নানাসাহেব কানপুরে ছিলাম। তাঁহার প্রতিনিধি জোয়ালাপ্রসাদ বিদ্রোহীদলের সহিত ফতেপুরে আসিয়াছিলেন: দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের সেনাপতি টীকাসিংহও জোয়ালাপ্রসাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এলাহাবাদের মৌলভী লিয়াকৎ আলিও নানাসাহেবের সিপাহীদলের সঙ্গে ছিলেন। ফতেপুর যুদ্ধের সৈনাপত্য ছিল জেনারেল টীকাসিংহ এবং জোয়ালাপ্রসাদের উপর। লিয়াকৎ ছিলেন পরামর্শদাতা। ইহাদের কেহই জানিতে পারেন নাই যে ইংরেজ সেনাপতি মেজর রেনডের পিছনে সবাহিনী জেনারেল হ্যাভলক আছেন। এই কারণেই এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে পরাজয় ঘটিয়াছিল।”

বিদ্রোহীদের পরাজয় হলো বটে, কিন্তু তারা ফতেপুরকে একরকম শ্মশানেই পরিণত করে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে ফতেপুরের পলাতক ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার শেরিয়ারের একটি বিবরণ উল্লেখযোগ্য। ইনি এই সময়ে হ্যাভলকের শিবিরে ছিলেন। শেরিয়ার লিখছেন: “পর্যটন কালে যে যে স্থান আমার

চক্ষে পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থানেই পথের দুধারেই বাড়িগুলি ভস্মীভূত, অনেক গ্রামে জনমানবের চিহ্ন নাই।...রাস্তার দুই ধারে জলাভূমি। গরীব লোকের কুটীরের ভগ্নাবশেষ মানুষের সাড়াশব্দ নাই। শ্রমজীবীদের কাজের কোন সাড়াশব্দ নাই। সে সবের পরিবর্তে ব্যাঙের আওয়াজ, ঝিল্লীর কলরবধ্বনি আর সোঁদাভূমির গহ্বরস্থ পতঙ্গকুলের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে। নিমগাছের তলায় রাশীকৃত নিমফলের দুর্গন্ধ, স্থানে স্থানে বায়ুপ্রবাহে বিষ্ঠাস্তূপের দুর্গন্ধ, গ্রাম্য শূকরেরা সেই সব বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে। সমগ্র ফতেপুর জনশূন্য। রাস্তায় জনমানব নাই। ধারে ধারে দোকানঘর ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। কোন কোন বাড়িতে ও দোকানে টাকাকড়ি ও জিনিসপত্র মজুত আছে, লুণ্ঠনকারীদের ভয়ে অধিকারীরা তাহা লইয়া যাইতে পারে নাই। ইংরেজ-সৈন্য ও শিখ-সৈন্যরা একদিনের মধ্যে সেই সব পরিত্যক্ত দ্রব্য লুঠ করিয়া লইল এবং পরে নগরে আগুন ধরাইয়া দিল।"

এবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানাসাহেব পাঠালেন বালারাওকে। তাঁর সঙ্গে দিলেন প্রচুর অস্ত্র ও সৈন্য।

বালারাও রণনিপুণ ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি কানপুর থেকে বাইশ মাইল দূরে দক্ষিণে আওঙ নামে একটা জায়গায় তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। আওঙ গ্রামের বাইরে পাণ্ডুনদী। নদীর অপর পারে বড় বড় কামান নিয়ে বালারাও তাঁবু ফেললেন। নদী পারাপারের জন্য একটি সেতু আছে। কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে সেতুটা উড়িয়ে দেবেন, এই ছিল বালারাওয়ের সংকল্প। আকারে ছোট হলেও বর্ষার জলে নদীটি পরিপূর্ণ, স্রোতের বেগও প্রখর। গুপ্তচর মুখে হ্যাভলক খবর পেলেন, বিদ্রোহীরা পারাপারের সেতুটি এখনো ভাঙেনি, তবে ভাঙবার মতলবে ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাভলকের একটু ভরসা হলো। তাঁর সৈন্যরা শ্রান্ত ক্লান্ত। সেনাপতির উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হয়ে তারা সেতুরক্ষায় সচেষ্ট হলো। হ্যাভলকের শিবির থেকে পাণ্ডু নদী দু'মাইল।

প্রভাতেই ইংরেজসৈন্য নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের পরিচালনা করলেন ক্যাপ্টেন মড্। হ্যাভলকের সৈন্যদলের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ বাধল। ক্যাপ্টেন মডের ব্যাটারী থেকে ঘন ঘন তোপগর্জন

নির্জন নদীর তীর কাঁপিয়ে তোলে; বালারাওয়ের কামান তার উত্তর দেয়। বিদ্রোহীদের কণ্ঠে রণোল্লাসের ধ্বনি—মারো ফিরিঙ্গি লোক্‌কো। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ। নানাসাহেবের সৈন্যরা এবারেও রণনৈপুণ্য ও পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল, কিন্তু ইংরেজের উন্নত ধরণের কামান ও বন্দুকের অগ্নিবর্ষণে কিছুই করতে পারল না। তবু বালারাওয়ের সৈন্যদল অপূর্ব কৌশলে বিপক্ষকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল। দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো। ইংরেজ সৈন্য স্বচ্ছন্দে নদীপার হলো। মেজর রেনড নিহত হলেন আর আহত বালারাও ফিরলেন কানপুরে। জেনারেল হ্যাভলক সসৈন্যে নির্বিঘ্নে সেতু পার হয়ে কানপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

হ্যাভলক এবার সত্য সত্যই কানপুরে আসছেন।

এ আর অনুমান বা জনরব নয়—নির্মম কঠিন সত্য। নানাসাহেব আহত বালারাওয়ের মুখে ১৫ই জুলাই বিকেলে এই সংবাদ পেলেন—জেনারেল হ্যাভলক বহু সৈন্য ও রণসম্ভার নিয়ে তাঁর রাজধানী কানপুর আক্রমণ করতে আসছেন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই পেশবার ভবনে বসল জরুরী পরামর্শ সভা। পরামর্শ-দাতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কেউ বলল বিঠুরে গিয়ে বিদ্রোহ পরিচালনা করা ভাল, কেউ বলল ফতেপুরে চলে যাওয়া ভাল; আবার কেউ পরামর্শ দিল, যে-পথ দিয়ে ইংরেজ সৈন্য আসছে কানপুর থেকে সেই পথে উপস্থিত থাকাই যুক্তিসঙ্গত। অনেক তর্কবিতর্কের পর কানপুরেই হ্যাভলকের সৈন্যদলকে বাধা দেওয়া ঠিক হলো।

—কিন্তু বন্দীদের কী করা যায়? জিজ্ঞাসা করলেন নানাসাহেব।

—বলিদান, পরামর্শ দিলেন আজিমউল্লা খান।

—ঠিক কথা। ওদের মুক্ত করতেই ওরা আসছে, বললেন তাঁতিয়া তোপি।

—কিন্তু বন্দীরা যে জীবিত, সে কথা তো হ্যাভলক জানেন না, বলেন নানাসাহেব।

—হয়ত জানেন, নয় ত জানেন না। তবে ওরা যে প্রতিশোধ নিতে আসছে, তাতে সন্দেহ নেই। বললেন মৌলভি লিয়াকৎ খাঁ।

—তা হলে বিবিঘরের বিবিদের হত্যা করতে হয়, কি বলো আজিমউল্লা? জিজ্ঞাসা করেন নানাসাহেব।

—কিন্তু এতগুলো অসহায় স্ত্রী ও বালক-বালিকাদের হত্যা করে লাভ কী? আবার জিজ্ঞাসা করেন নানাসাহেব।

—লাভ এই যে সাক্ষী দেবার জন্যে ইংরাজ এক জনকেও পাবে না, বলেন আজিমউল্লা।

ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান বলেন, নানাসাহেব এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তখন আজিমউল্লাই সর্বেসর্বা, তিনি নিরস্ত হলেন না। প্রায় দু'শো অবরুদ্ধ ইংরেজ মহিলা ও বালক-বালিকাকে নির্মম এবং নৃশংসভাবে বিবিঘরে হত্যা করা হলো। এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ট্রেভেলিয়ান এই ভাবে দিয়েছেন:

"বন্দীদের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটি পুরুষ ছিল। বৈকাল চারটার সময়ে পুরুষ-বন্দীদিগকে নানাসাহেবের সম্মুখে আনা হইল। শাখাপ্রশাখা সংযুক্ত একটি নেবুগাছের তলায় নানাসাহেবের দরবার বসিয়াছিল। অস্তগামী সূর্যের আলোয় তাঁহার মাথার স্বর্ণখচিত পাগড়ী ঝলমল করিতেছিল। জোয়ালা প্রসাদ, তাঁতিয়া তোপি, আজিমউল্লা, বালারাও—সবাই নানার দুই পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে সেই চার-পাঁচটি ইংরেজকে গুলি করিয়া বধ করা হইল। আধ ঘণ্টা পরে বেগম নাম্নী সেই মহিলা প্রহরী বিবিঘরে গিয়া বন্দিনীদের বলিয়া আসিল যে, নানাসাহেব তাহাদের মারিবার হুকুম দিয়াছেন। হতভাগিনীরা এই সংবাদে শিহরিয়া উঠিল। তারপর সিপাহীদের প্রতি হুকুম হইল, বিবিঘরের জানালার ফাঁক দিয়া বন্দিনীদের গুলি করিয়া মার। সিপাহীরা ইতস্ততঃ করিল। পরে অগত্যা গৃহের ভিতর দিকের ছাদ লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তখন নানাসাহেবের মন্ত্রীরা বাজার হইতে জনকতক মুসলমান কসাইকে ডাকাইয়া আনিলেন। নিষ্ঠুর কসাইরা সুতীক্ষ্ণ তরবারী ও বড় বড় ছোরা হাতে লইয়া সংহার-মূর্তিতে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যে ভাবে নিরীহ মেষশাবককে জবাই করে, হতভাগ্য বন্দিনীদের ও অসহায় শিশুদের ঠিক সেই ভাবেই জবাই করিয়া ফেলিল। ১৫ই জুলাই রাত্রিকালে বিবিঘরে সেই ভীষণ সংহারকার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এইভাবে সেই স্বল্প-পরিসর কারাগৃহ বধ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৬ই জুলাই সকাল-বেলায় সেই সব মৃতদেহ এবং প্রায় মৃত নিষ্পন্দ জীবন্তদেহ

বাহির করিয়া নিকটবর্তী একটি কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; দুই তিনটি শিশুর অঙ্গে আঘাত লাগে নাই, নিষ্ঠুর কসাইরা তাহাদিগকেও রেহাই দেয় নাই—রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডগুলির সহিত টানিয়া টানিয়া সেই সমাধিকূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেদিন কানপুরে আর একটি ইংরেজও জীবিত ছিল না।"

নানাসাহেব রণসজ্জা করতে লাগলেন।

১৬ই জুলাই দুপুরবেলায় তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য আর সাতটি কামান নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। চার মাইল দূরে সৈন্য সমাবেশ করা হলো। পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—সব রকম সৈন্য নিয়ে হ্যাভলককে বাধা দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। যেখানে নানাসাহেবের শিবির, সে স্থানটি বেশ প্রশস্ত। সেনাপতিদের নির্দেশে সৈন্যরা দাঁড়াল শ্রেণীবদ্ধভাবে। কামান সাজান হলো। মাত্র তিন ঘণ্টা আগে কানপুরে কী ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে, জেনারেল হ্যাভলক তার কোন খবরই পেলেন না। প্রচণ্ড সূর্যের তাপে দগ্ধপ্রায় হয়ে তিনি সসৈন্যে কানপুরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যেখানে নানাসাহেব ব্যূহ রচনা করলেন, সেখান দিয়েই ইংরেজসৈন্যের কানপুরে আসবার পথ। বহুদর্শী রণনিপুণ সেনাপতি হ্যাভলক সৈন্য-সমাবেশে নানাসাহেবের নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল এক হাজার য়ুরোপীয় ও তিন শো শিখ সৈন্য। এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করতে সাহস পেলেন না।

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র। তারই মধ্যে হ্যাভলক সৈন্যপরিচালনা করে চললেন অবিরাম গতিতে। কানপুর আর বেশী দূর নয়।

বিপক্ষের রণসজ্জার সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়ে হ্যাভলক বুঝলেন নানাসাহেব সমর-বিজ্ঞানে কতদূর পারদর্শী। তাঁর সৈন্যরা সরাসরি বড় রাস্তা ধরে মাঝপথে সমমণ্ডলে এসে উপস্থিত হলো। দু'দিকে দুটো বড় রাস্তা। বাঁদিকের রাস্তাটা গিয়েছে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে, ডান দিকেরটা চলে গেছে শেষে দিল্লীর দিকে। প্রবল উৎসাহে ইংরেজসৈন্য মার্চ করে চলেছে কানপুরের রাস্তায়। প্রতিহিংসায় উত্তপ্ত তাদের রক্ত। বাঁ দিকে গঙ্গা, সেই দিকে নীচু জমির ওপর বড় বড় কামান সাজান। রাস্তার দক্ষিণে সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত একখানা গ্রাম। গ্রামের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আমের বাগান। নানাসাহেবের

নির্দেশে বিদ্রোহীরা সেই বাগানের নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। সেখানেও বড় বড় কামান সাজান।

জেনারেল হ্যাভলক গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসবেন, নানাসাহেব নিশ্চিতভাবে তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং ইংরেজসৈন্যদের অভ্যর্থনার জন্যে রাস্তার দু'ধারে বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য রেখে দিয়েছিলেন। তাদের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল দু'নম্বর অশ্বারোহী দলের দুঃসাহসী সৈন্যরা। বিপক্ষের এই সৈন্যসমাবেশ দেখে হ্যাভলক বুঝলেন, হঠাৎ এদের সম্মুখীন হলে বিপদ। শুধু বিপদ নয়, পরাজয়ের সম্ভাবনা বিলক্ষণ। এনফিল্ড রাইফেলের দূরগামী গুলি ও ক্যাপ্টেন মডের কামানের অব্যর্থ গোলার সাহায্যে তিনি পূর্বেকার প্রত্যেকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। এখন কি ভাবে যুদ্ধ করতে হবে, হাতের তরবারীর অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে রেখা এঁকে, সেনাপতিদের তা তিনি দেখিয়ে দিলেন। তিনিও খুব কৌশলের সঙ্গে সৈন্য-সমাবেশ করলেন।

—ফায়ার! মার্চ অন্। আদেশ দিলেন জেনারেল হ্যাভলক।

—মারো ফিরিঙ্গি লোককো। আদেশ দিলেন ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব।

যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

হ্যাভলকের পুত্র ক্যাপ্টেন হ্যাভলকের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ ঘোড়সওয়ার সৈন্য অগ্রসর হয়। পেছনে পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য। পথের ধারে গভীর অরণ্য; সেই অরণ্যকে আড়াল করে তারা অগ্রসর হয় বিপক্ষের দৃষ্টির অগোচরে। বিদ্রোহীদের অগ্নিমুখে সর্বপ্রথমে এসে দাঁড়ায় ইংরেজ ঘোড়সওয়ার সৈন্য। বনের ভেতর দিয়ে যে সব সৈন্য মার্চ করে যাচ্ছিল বিরল বৃক্ষ ব্যবধানে নানাসাহেব তাদেরকে দেখতে পেলেন। বুঝলেন হ্যাভলক কৌশলী। নানাসাহেবের গোলন্দাজ সৈন্যরা তোপ দাগতে লাগল, ইংরেজ-সৈন্য কোন ক্রমেই তাদের তোপ বন্ধ করতে পারল না। কিন্তু তবু তাদের গতিভঙ্গ হয় না, সমানভাবেই তারা অগ্রসর হতে থাকে। জেনারেল হ্যাভলকের দিন-লিপিতে এই যুদ্ধের বর্ণনা এই ভাবে দেওয়া হয়েছে:

"আমাদের সেনাদলের শেষাংশ বৃক্ষরাজির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দৃঢ় সংকল্পে সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। নানাসাহেবের শ্রেণীবদ্ধ

সৈন্যদল, যাহাদের দৃঢ়তা ও দক্ষতার উপরে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আতঙ্কে অভিভূত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের বেশী নির্ভর কামানের উপর। আমাদের কামান অপেক্ষা বিপক্ষদিগের কামানের সংখ্যাও বেশী, সে সকল কামান আকারেও বৃহৎ, ওজনেও ভারী। কানপুরের বিখ্যাত অস্ত্রাগার হইতে সেই সব বড় বড় কামান তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা সেই সকল কামানে তোপ মারিতে লাগিল, ঘন ঘন গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, ক্যাপ্টেন মডের ব্যাটারী কর্ষণ করিত ভূমির উপর অতি কষ্টে চালিত হইতেছিল। ভারবাহী পশুরাও কর্দমাক্ত পথে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বিপক্ষের তোপের প্রত্যুত্তরদানে আমাদের একটু বিলম্ব হইল। তারপর আমাদের পক্ষ হইতে শুরু হইল তোপের উপর তোপ—আর গোলাবৃষ্টি। আশ্চর্যের বিষয়, সে সব কামানের মুখেও সিপাহীদের কামান অটল।”

হার-জিৎ ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষণকাল দু'দিকেই জয়ধ্বনি।

সিপাহীদের আনন্দ—তাদের কামানের প্রাধান্য।

ইংরেজদের আনন্দ—তাদের রণনৈপুণ্য।

ইংরেজপক্ষে কেবলমাত্র কামান গর্জন নয়, সেই সঙ্গে রণবাদ্যধ্বনি।

কর্ণেল হ্যামিল্টনের হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদল সগৌরবে তোপধ্বনি করে। ওদিকের নানার নির্ভীক গোলন্দাজেরা তার উত্তর দেয়। ক্যাপ্টেন হ্যাভলকের পদাতিক সৈন্যরা গুলিবৃষ্টি করতে করতে অগ্রসর হয়। সঙ্গীন দিয়ে আক্রমণ করে তারা বিদ্রোহীদের কামান দখল করে। কানপুরের অশ্বারোহী দল ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলল, কিন্তু উপযুক্ত চালকের অভাবে তারা নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। হাইল্যাণ্ডার দলের দাপটে গ্রাম ত্যাগ করে ও কামান ফেলে, অনেক সিপাহী নিরুৎসাহ হয়ে পলায়ন করে। সংঘর্ষ প্রবল হয়ে ওঠে। কেন্দ্রস্থলে একটা বিরাট কামান ছিল। হুহুঙ্কারে সিংহনাদ করতে করতে হাইল্যাণ্ডার সৈন্যরা প্রাচীর-ঘেরা স্থানের দিকে ধাবিত হয়। তাদের পেছনে ৬৪ নম্বর পদাতিক সৈন্য। ইংরেজ-সৈন্য কামানটি দখল করে নিল। সিপাহীরাও পালিয়ে গেল।

নানাসাহেব বুঝলেন অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

তবু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বিরত হলেন না। উৎসাহ বচনে তিনিও তাঁর সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর অধিকারে তখন একটা চব্বিশ পাউণ্ড কামান আর দুটো ছোট কামান ছিল এবং তাঁর সহায়তা করবার জন্যে সে সময়ে আরো নতুন সৈন্যদল এসে মিলেছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত জেনারেল হ্যাভলকের বাহুবল পরীক্ষা করবেন বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। উভয় পক্ষেই ক্ষণকালের বিরতির পর আবার নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়। নানাসাহেবের শিবিরে ঘন ঘন রণভেরী ও জয়ডঙ্কা বাজছিল, ইংরেজ শিবিরে পদাতিক সৈন্যরা শুয়ে শুয়ে তাই শুনছিল। জয়ধ্বনি আর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় মনুষ্য মূর্তি, কামানের মুখে অগ্নি বর্ষণ করতে করতে বিদ্রোহীরা কোলাহল করে এগিয়ে আসছে। জেনারেল হ্যাভলক বুঝলেন, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

—সোলজার্স ফল্ ইন্। কুইক্ মার্চ এ্যাণ্ড চার্জ দি এনিমি। হুকুম দিলেন শ্বেতকেশ বৃদ্ধ জেনারেল।

আর দু'মাইল দূরেই কানপুর। ইংরেজ-সৈন্য নবীন উৎসাহে যুদ্ধ করে। বিদ্রোহীদের অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে তারা নির্ভয়ে অগ্রসর হয়। সারাদিন ধরে তারা যুদ্ধ করছে, একটু বিশ্রামের জন্য তারা ব্যগ্র হয়। তৃষ্ণায় অনেকেই কাতর। জল কোথায়? একটু আধটু কর্দমাক্ত ঘোলা জল পান করে তারা তৃষ্ণা মেটায়। সেনাপতির হুকুম বিপক্ষ দলের সৈন্যকে আর সুযোগ দেওয়া হবে না। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর জয়ের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করলেন নানাসাহেব। কোথায় গেলেন কেউ জানে না। নানাসাহেবের পলায়ন বিদ্রোহীদের একেবারে নিরুৎসাহ করে দিল। তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। নানাদিকে তারা পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাবার আগে তারা কানপুরের শূন্য অস্ত্রাগার বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেল।

১৭ই জুলাই। সেনাপতি হ্যাভলক কানপুর অধিকার করলেন।

দেড়মাস পরে কানপুরে আবার বৃটিশ পতাকা উড়ল।

কলকাতা থেকে লর্ড ক্যানিং কানপুর-বিজয়ী হ্যাভলককে অভিনন্দন জানালেন এই বলে: "আপনি সত্যই যোগ্য সেনাপতি। এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিবার পর দশ দিন ধরিয়া ভারতের প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে দীর্ঘ ১২৬ মাইল

পথ অতিক্রম করিয়া আপনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়াছেন। কোন সেনাপতিই এমন দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালনা করেন নাই। আপনি নিঃসন্দেহে কোম্পানীর সামরিক বিভাগের বিচক্ষণ সেনানায়কের গৌরব অর্জন করিলেন। সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় একমাত্র আপনার সমর-দক্ষতায় আমাদের জয়লাভ হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সেনাপতি গভর্ণর-জেনারেলের এই অভিনন্দনে কৃতার্থ বোধ করলেন। কিন্তু বিশ্রামের অবসর কোথায়? লক্ষ্ণৌ বিপদাপন্ন, আগ্রা অবরুদ্ধ, দিল্লী বিদ্রোহীদের হাতে। লক্ষ্ণৌ রক্ষা করতে হবে, আগ্রা নিরাপদ করতে হবে, দিল্লী উদ্ধার করতে হবে—হ্যাভলকের বিশ্রাম নেই।

কানপুরে বিদ্রোহের যবনিকা পতন হলো।

"লক্ষ্ণৌ বিপদাপন্ন। অবিলম্বে আপনি সেখানে যাত্রা করুন।"

কলকাতা থেকে লর্ড ক্যানিং তারযোগে এই সংবাদ পাঠালেন কানপুরে জেনারেল হ্যাভলকের কাছে। বৃদ্ধ সেনাপতি বিদ্রোহের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। লক্ষ্ণৌর সংবাদে তিনিও কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তাই মুহূর্তের বিশ্রাম গ্রহণ না করেই তিনি লক্ষ্ণৌ যাত্রার উদ্যোগ করলেন। কানপুরে যত সৈন্য ছিল, তার মধ্যে শ' তিনেক সেখানে রেখে, বাকী সব সৈন্য নিয়ে হ্যাভলক লক্ষ্ণৌ যাত্রা করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কার ওপর কানপুরের ভার দেওয়া যায়? তিন দিন পরেই সকাল বেলায় কর্ণেল নীল এলাহাবাদ থেকে কানপুর এসে পৌছলেন। হ্যাভলক তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর পাঁচ দিন পরে তাঁর হাতে কানপুরের সৈনাপত্য অর্পণ করে তিনি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে গঙ্গা পার হলেন।

কানপুরে নীলের প্রথম কাজ হলো বিবিঘর দর্শন।

সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কানপুর বিদ্রোহের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী নানকচাঁদ লিখেছেন:

"কর্ণেল নীল দেখিলেন গৃহে গৃহে শোণিতপ্লাবন। এক একটি ঘরে আজানু রুধির কর্দম। স্থানে স্থানে হতভাগ্য নারীগণের মস্তকের গুচ্ছ গুচ্ছ

ছিন্ন কেশ, খণ্ড খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র, রক্তমাখা ছোট ছোট পাদুকা। কোথাও শিশুদের খেলার সামগ্রী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সবই রক্তমাখা। এই সব বিয়োগান্ত চিহ্ন দেখিয়া কর্ণেল নীলের সর্বাঙ্গের রক্ত গরম হইয়া উঠিল; শোকে, বিষাদে ও ক্রোধে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভীষণ প্রতিশোধের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল।"

মর্মান্তিক বেদনায় আত্মহারা হয়ে কর্ণেল নীল বললেন—আই মাসট্ অ্যাভেঞ্জ ইট্।

কি ভাবে তিনি এই হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তার একটি বর্ণনা ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন দিয়েছেন এই ভাবে:

"কয়েকজন হত্যাকারীকে কর্ণেল নীল ধরিয়াছিলেন, তাহাদের প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত। আইন তাঁহার সহায়, তাহার উপর আর কথা ছিল না। ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিলেই হয়। কিন্তু বিবিঘরের নিহত নারীগণের ও শিশুগণের রক্তে সেখানকার গৃহতল কলুষিত। ইংরাজসৈন্যরা সে-সব ঘর পরিষ্কার করিতে রাজী হইবে না, সে কাজ করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করাও যাইতে পারিবে না, ইহা স্থির করিয়া কর্ণেল নীল এক নূতন ধরণের ব্যবস্থা করিলেন। যাহারা নিজ নিজ হস্তে কসাইবৃত্তি করিয়াছিল, তাহারাই নিজেদের জিভ্ দিয়া সেই রক্ত চাটিয়া লইবে, তারপর ঝাড়ুদারের ঝাড়ু হাতে লইয়া তাহা ধুইয়া দিবে। প্রথম আসামী ৬ নম্বর পদাতিক পল্টনের একজন সুবাদার। বন্যশূকরের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট, জাতিতে ব্রাহ্মণ। সেই লোকটিকে সকলের আগে রক্ত চাটাইবার জন্য বিবিঘরে লইয়া যাওয়া হয়। জেনারেল হ্যাভলক কয়েকদিন পূর্বে অপরাধিগণের দণ্ডবিধানের জন্য একজন পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। সুবাদার রক্ত চাটিতে রাজী হইল না। নীলের ইঙ্গিতে সুবাদারের পৃষ্ঠে চটাচট বেত্রাঘাত হইল। লোকটি আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। আর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা রক্ত চাটিতে রাজী হয়। এক হস্ত পরিমিত স্থান সে জিভ্ দিয়া চাটিয়া লইল। তারপর স্থানটি জল দিয়া ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিল। নিকটেই ফাঁসিকাঠ প্রস্তুত ছিল। রক্ত চাটা শেষ হইলে সেই লোকটিকে বাহিরে আনিয়া ফাঁসিকাঠে লটকাইয়া দেওয়া হয়। প্রাণ বাহির হইলে দেহটা নামাইয়া বহু লোকের সম্মুখে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়। দ্বিতীয়

আসামী একজন মুসলমান কসাই। সেও প্রথমে রক্ত চাটিতে অস্বীকার করে। অমনি সপাসপ্ বেত্রাঘাত। লোকটির পরিত্রাহি চীৎকার। অবশেষে রাজী। তাহাকে দিয়াও একহাত পরিমিত স্থান পরিষ্কার করাইয়া লওয়া হইল এবং পরে তাহাকে ফাঁসি দিয়া কবর দেওয়া হইল। এইভাবে বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইয়া কর্ণেল নীল নিকটবর্তী কূপের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহারই মধ্যে নিহত নারীগণের ও শিশুগণের দেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কর্ণেলের আদেশে কয়েকজন য়ুরোপীয় সৈন্য কূপের মুখটি ঢাকিয়া ফেলিল।

এই বিবিঘর ও কূপের স্মৃতি কানপুরে আজো বর্তমান।

॥ চৌদ্দ ॥

জুন মাসের শেষেই সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। অযোধ্যার সমস্ত লোকই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

এখানকার শাসনকর্তা হেনরী লরেন্স বহু পূর্বেই এই আশঙ্কা করেছিলেন। মে মাসের শেষে লর্ড ক্যানিংকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "অযোধ্যার সকলেরই ইংরেজের ওপর দারুণ আক্রোশ। নবাবের পুরাতন অমাত্যেরা, প্রতিপত্তিশালী তালুকদারগণ, নবাবের সৈন্যবৃন্দ—সকলেই এক কথা বলে—ইংরেজ আমাদের পদ-দলিত করিয়াছে। গ্রামবাসীরা পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত। আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্ণৌ নগর শান্ত; অচিহ্নিত সৈন্যরা বিদ্রোহী পল্টনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অসম্মত নয়। কিন্তু দিনের পর দিন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে দুই একদিনে না হউক, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিপদ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ধর্মনাশের ভয় এবং ইংরেজ-বিদ্বেষ—এ সবই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রবল। কোম্পানীর প্রতি জনসাধারণ বিরূপ থাকিলেই হয়। দিন দিন এই প্রদেশে আমাদের মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে।"

অযোধ্যার অধিবাসীদের অসন্তোষ একান্তভাবে ইংরেজের সৃষ্টি—ডালহৌসির পররাজ্য-গ্রাস নীতির প্রত্যক্ষ ফল, সে কথা আগেই বলেছি। গোমতী নদীর তীরে অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ ছিল সেদিন এই প্রদেশের বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। এই সময়ে অযোধ্যার অবস্থা সম্পর্কে অযোধ্যার রাজস্বসচিব মার্টিন গবিনের একটি ডেসপ্যাচ উল্লেখযোগ্য। জুন মাসের শেষে তিনি গভর্ণর-জেনারেলকে লিখলেন: "এই প্রদেশের প্রত্যেক সেনানিবাসের প্রত্যেক সেনাদল বিদ্রোহী হইয়াছে। সর্বত্রই অরাজকতার লক্ষণ। তালুকদারেরা জোর করিয়া তাঁহাদের পূর্বাধিকৃত গ্রামগুলি দখল করিতেছে; যাহারা বাধা দিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের বাসস্থান জ্বালাইয়া

দিয়েছে। গ্রাম্যলোকেরা পর্যন্ত বন্দুক কামান লইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। বিদ্রোহীরা পদে পদে জেলার প্রধান অফিসারকে বলপূর্বক সদর ষ্টেশন পরিত্যাগে বাধ্য করিতেছে ; থানাদার ও তহশীলদারদের ক্ষমতাও যেন লোপ পাইয়াছে। জোর জবরদস্তি ও অরাজক কাণ্ড দিন দিন প্রবল হইতেছে। বিদ্রোহীরা এখন লক্ষ্ণৌ আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছে। সীতাপুর, মহম্দী ও মলায়ন গ্রামের ইংরেজরা এককালে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। সাজাহানপুর ও মহম্দীতে বিদ্রোহীরা অনেক ইংরেজকে বধ করিয়াছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কিছু পদাতিক সৈন্য দিল্লী চলিয়া গিয়াছে। সর্বত্রই তাহারা তালুকদারদের উস্কানী দিতেছে। লক্ষ্ণৌবিভাগের লক্ষ্ণৌ, উনাও ও দরিয়াবাদের মধ্যে কেবল লক্ষ্ণৌ ও ইহার চারিদিকে আট মাইল স্থান এখনো শান্ত আছে। আমাদের আশ্রয়স্থান এখন দুইটি—রেসিডেন্সী ও মচ্ছীভবন আর গোটাকতক সেনানিবাস। মচ্ছীভবনে কেবল নগরবাসী ইংরেজদের থাকবার ব্যবস্থা। জনরব এই যে, বিদ্রোহীরা এই স্থান অবরোধ করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। রেসিডেন্সীর প্রাচীরাদি সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এইখানে স্যর হেনরী লরেন্স ও আমার আবাস। মনে হয় এইস্থান হইতে আমরা বিদ্রোহীদের বেশ কিছুদিন বাধা দিতে পারিব। দরিয়াবাদ, ফৈজাবাদ ও সুলতানপুর—কোথাও আর ইংরেজ নাই। সকল স্থানই পরিত্যক্ত।"

এই ডেসপ্যাচে মার্টিন গবিন একটা কথার উল্লেখ করেন নি। সেটা হলো অযোধ্যার কৃষকদের অসন্তোষ। এই সময়ে সমগ্র প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায় এক নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং এর ফলে তাদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই অসন্তুষ্ট চাষীরাও বিদ্রোহে কিছু ইন্ধন জুগিয়েছিল।

গোড়াতেই বলেছি যে অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলিকে পদচ্যুত করা হয়।

পদচ্যুত হবার পর নবাবকে রাজধানী কলকাতার অদূরে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহের প্রারম্ভে ক্যানিং-এর কাছে একটা জনরব এল যে, অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব ও তাঁর মন্ত্রীরা ষড়যন্ত্র করছেন, ইংরেজের সিপাহীদেরকে কুপরামর্শ দিয়ে বিদ্রোহে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছেন। মুসলমান সিপাহীরা যাতে

মাঝে তাঁর মন্ত্রীদের কাছে গিয়ে মন্ত্রণা করে আসছে। অযোধ্যার একজন তালুকদার, রাজা মানসিংহ, মুচিখোলায় এসে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। লর্ড ক্যানিং প্রথমে এইসব গুজবে বিশ্বাস করেন নি। তিনি জানতেন রাজা মানসিংহ ফৈজাবাদে নজরবন্দী, ইতিমধ্যে তাঁর কলকাতায় আসার সংবাদ মিথ্যা। কিন্তু শীঘ্রই গভর্নর-জেনারেলের ভুল ভাঙল। তিনি জানতে পারলেন, গুজব একেবারেই অমূলক নয়। যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে লর্ড ক্যানিং-এর ভুল ভাঙে সেই ঘটনাটি এই: নবাবের একজন লোক সিপাহীদের লোভ দেখিয়ে বিদ্রোহী হবার উত্তেজনা জোগায়। সেই লোকটি ধরা পড়ে এবং কোর্ট-মার্শালের বিচারে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। ১৫ই জুন সকালবেলায় তার ফাঁসি হবার কথা, কোন গতিকে ১৪ই জুন রাত্রে সে লোকটি পালিয়ে যায়। সেই ১৫ই জুন তারিখেই নবাবকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন লর্ড ক্যানিং।

জজ এড্‌মনস্টোনকে পাঠান হলো মুচীখোলায়। তাঁর সঙ্গে গেল আরো কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও প্রহরী। ফটকে উপস্থিত হয়ে এড্‌মনস্টোন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সংবাদ পাঠালেন। উত্তর এলো—নবাব সাহেব স্নান করছেন; সাক্ষাতের একটু বিলম্ব হবে। গভর্নর-জেনারেলের প্রতিনিধিকে অপেক্ষা করতে হয়। কিছুক্ষণ পরে নবাব স্নান সেরে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে এলেন। একটা কৌচের ওপর বসে আছেন তিনি, কাছে পারিষদবর্গ। এড্‌মনস্টোন এলেন। নবাব তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন আন্তরিকতা দিয়ে। ইংরেজ প্রতিনিধি বললেন: গভর্নর-জেনারেল খবর পেয়েছেন যে, আপনার অধীনস্থ গুপ্তচরেরা ভারতের নানাস্থানে ঘুরে আমাদের সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করে তুলছে। অতএব গভর্নর-জেনারেলের ইচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন।

নবাব ওয়াজেদ আলি চমকে ওঠেন, কিন্তু ধৈর্য ধরে বলেন, এ অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা। দোষ যদি সপ্রমাণ হয়, তাহলে গভর্ণমেন্ট আমাকে যে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন, সেই দণ্ড গ্রহণে আমি প্রস্তুত।

এড্‌মনস্টোনের উত্তর: সে বিষয়ের মীমাংসা করাবার হুকুম আমার ওপর নেই। আমার ওপর যে রকম আদেশ আছে, তাই পালন করতে আমি এসেছি।

নবাব দেখলেন তর্কবিতর্ক নিষ্ফল। কয়েকজন পারিষদকে সঙ্গে নেবার জন্যে নবাব অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেলেন। ইংরেজ প্রতিনিধির হাত ধরে নবাব ওপর থেকে নেমে এলেন। চকিতে মনে পড়ল এক বছর আগের কথা। সেদিনও তিনি লক্ষ্ণৌ দরবারে কর্ণেল আউট্রামের হাত ধরে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। ফটকে লাটসাহেবের গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতেই সপারিষদ নবাব কলকাতায় এলেন। গাড়িতে এডমনষ্টোনকে তিনি শুধু একটি কথা বললেন—ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবার ইচ্ছা যদি আমার থাকতো, গোড়াতেই আমি তা করতে পারতাম। যখন আমার অধীনে বিশ লক্ষ লোক ছিল, তখন আমি তা করিনি। জেনারেল আউট্রামকে জিজ্ঞাসা করবেন, স্থিরভাবে নীরবে আমি তাঁর হাতে রাজ্য সমর্পণ করেছিলাম কিনা। কোরাণ শপথ করে বলতে পারি, ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি নেই।
সপারিষদ ওয়াজেদ আলি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে রাজবন্দী হয়ে রইলেন।
নবাবকে বন্দী করা ও ব্যারাকপুরের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা—দুটি প্রায় একই সময়ের ঘটনা। অতঃপর কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ইংরেজদের মনের ভয় কিছুটা কমেছিল।

লক্ষ্ণৌ।
সাহেবরা কোন্ সময়ে খাবে, সিপাহীদের তা জানা ছিল। তাই তারা অফিসারদের মারবার জন্যে ভোজনাগারের দিকে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু অফিসাররা তার আগেই প্যারেডের মাঠে রওনা হয়ে গিয়েছে! বিদ্রোহীরা তাই বেশী ইংরেজকে মারতে পারেনি, কেবল লুটপাট আর গৃহদাহ করেই তারা সন্তুষ্ট হলো। যারা বিদ্রোহী হয়নি, তারা তাদের অফিসারদের সম্মুখে মুখ ভারী করে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে রাজী হয় নি।
সেই রাত্রেই ব্রিগেডিয়ার হ্যাণ্ডকোম সেখানে উপস্থিত হলেন। সিপাহীদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র একজন বিদ্রোহীর গুলির অব্যর্থ আঘাতে তাঁর প্রাণহীন দেহ ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ৩০শে মে'র এই বিদ্রোহ-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হেনরী মীড লিখেছেন: "সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজের বিবিরা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সে সময়ে ক্যান্টনমেন্ট হইতে বাহির হইয়া

গিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। পরদিন রবিবার, ৩১শে মে। সেই দিন সকাল বেলায় সিপাহীদের আক্রমণ। সাহেবরা গির্জায় উপাসনা করিতে যাইবে, সেই সময়েই হুকুম তামিল করিতে হইবে। কিন্তু স্যর হেনরী লরেন্সের কিছু সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বিদ্রোহীরা সেদিন অধিক ক্ষতি করিতে পারে নাই। অনেক সিপাহী ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল। বাকী সিপাহীদের নিরস্ত্র করিবার জন্য অনেকে স্যর হেনরী লরেন্সকে পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই।"

লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

এই সংবাদ সমগ্র অযোধ্যায় উত্তেজনার সঞ্চার করল।

সীতাপুরে সিপাহীরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ল। অবস্থা খারাপ দেখে য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাদের নিয়ে, কমিশনারের বাংলোতে তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সশস্ত্র পুলিশ কমিশনারের বাংলো পাহারা দিচ্ছিল। তারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন উপায় না দেখে ইংরেজরা প্রাণভয়ে নদীর দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেই কমিশনার, তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তান এবং আরো অনেক ইংরেজ বিদ্রোহীদের গুলিতে মারা যায়। কেউ কেউ ভাগ্যের জোরে বেঁচে যায়। মোহাম্মদীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। ৪ঠা জুন সিপাহীরা ট্রেজারী লুঠ করল, কয়েদীদের ছেড়ে দিল। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। ইংরেজরা আওরঙ্গাবাদের দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সিপাহীদের গুলিতে পথেই তাদের প্রায় সকলেই নিহত হয়। অযোধ্যার ফৈজাবাদ বিভাগেও অন্যান্য স্থানের মতো বিদ্রোহ দেখা দিল। এখানকার ইংরেজরা আগে থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত ছিল।

ফৈজাবাদ বিদ্রোহের বর্ণনা ঐতিহাসিক কে'র দিয়েছেন এইভাবে: ৮ই জুন সন্ধ্যায় ফৈজাবাদে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারপর যথারীতি লুণ্ঠন এবং গৃহদাহ। কিন্তু অফিসারদের কোন অনিষ্ট কেহ করে নাই। বরং সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজদের পলায়নের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা সিপাহীরা করিয়া দিয়াছিল। সিপাহীরা এরূপ না করিলে ফৈজাবাদে কোন ইংরেজই নিষ্কৃতি পাইত না। কিন্তু ত্রিশ মাইল দূরে গিয়া তাহারা বিপদে পড়িল। বিদ্রোহী পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদিগকে তাঁহারা ঘর্ঘরার তীর দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। নদী পার হইয়া পলাইবার

বৃত্তিতে তাঁহাদের চলে না; সুতরাং তাঁহারা মনে মনে ইংরেজের প্রতি বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। নূতন বন্দোবস্তে ক্ষমতাশালী তালুকদারগণের ধন গৌরব ও ক্ষমতা কমিল, প্রজারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। যেসব সৈন্য নবাব সরকারে চাকরী করিত, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। তাহারাও অন্তরে অন্তরে প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিয়াছিল; আর যাহাদিগকে সেনাদলে চাকরী দেওয়া হইয়াছিল, ইংরেজদের প্রতি তাহাদের আদৌ আনুগত্য ছিলনা। বেতনেও তাহারা তুষ্ট ছিল না। সকলের উপর ছিল করভার। অতিরিক্ত করভারের জন্য প্রজার কষ্ট, প্রজার অসন্তোষ। এই ভাবে অনেক কারণ একত্রিত হওয়াতেই সম্ভাবিত বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছিল।"

মে মাসের প্রথমেই সিপাহীদের মধ্যে ও অন্যান্য অসন্তুষ্ট প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১২ই মে হেনরী লরেন্স এক দরবার করলেন। ইংরেজ সৈন্য ও দেশীয় সিপাহী সকলেই দরবারে উপস্থিত। দেশীয় ও য়ুরোপীয় অনেক ভদ্রলোকও দরবারে সমবেত। তাদের সকলকে সম্বোধন করে হেনরী লরেন্স বললেন: "শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকলেই জানিতে পারিয়াছেন যে, ইংরেজেরা এদেশের কোন জাতির ধর্মে অথবা সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কখন করিবেন না। যে-সব সিপাহী পুরুষানুক্রমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিতেছে, তাহারা ইহা জানে, তাহাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত। সিপাহীরা আমাদের অনুগত বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। এই বিশ্বাস স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

কিন্তু তবু হেনরী লরেন্স নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। লক্ষ্ণৌতে তখন বহু সহস্র সিপাহী ও অস্ত্রধারী লোকের বাস। শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সেনানিবাস। গোমতীর তীরে একটি পাহাড়ের ওপর অযোধ্যার চীফ কমিশনার স্যর হেনরী লরেন্সের প্রাসাদতুল্য বাসভবন। রেসিডেন্সীর সীমানার মধ্যেই সরকারী ধনাগারে বহু টাকা ছিল। দেশীয় সিপাহীদের পরিবর্তে বহু সংখ্যক ইংরেজ প্রহরীর ওপর সমগ্র রেসিডেন্সী রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। এখানেই শহরের যে-সামরিক ইংরেজদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থাও হলো।

৩০শে মে, রাত্রি ন'টা।

রেসিডেন্সীর একটা ঘরে বসে স্যর হেনরী লরেন্স কয়েক জন অফিসারের সঙ্গে নৈশভোজনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে তোপের আওয়াজ শোনা গেল। কাঁটা-চামচ হাতেই রইল, রেসিডেন্ট এই তোপধ্বনির মধ্যে আসন্ন বিদ্রোহের সংকেত পেলেন। পরমুহূর্তেই একজন সিপাহী এসে খবর দিল, ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

লরেন্স তখনি অফিসারদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে সিপাহী-ছাউনির দিকে গেলেন। যে দিকে ৭৩ নম্বর পলটন ছিল, সেদিক থেকেই ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ আসতে লাগল। সেই ছাউনির দক্ষিণ দিকে একদল য়ুরোপীয় সৈন্য কামান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল; সিপাহীরা তাদের প্রাণসংহার করে জিনিসপত্র লুঠ করতে প্রবৃত্ত। তারা অনেক বাংলো জ্বালিয়ে দিল।

২৯শে জুন।

চরমুখে স্যর হেনরী লরেন্স খবর পেলেন, নগরের আট মাইল দূরে চিন্‌হাট নামক স্থানে বিদ্রোহীরা সমবেত হয়েছে। তাদের সঙ্গে বারটা কামান, নয় দল পদাতিক ও এক দল অশ্বারোহী সৈন্য। লরেন্স বিদ্রোহীদের ভয় দেখাবার জন্যে কিছু সৈন্য পাঠাবার হুকুম দিলেন। ৩০শে জুন সকাল বেলায় তিন শো ইংরেজ সৈন্য, দুশো পদাতিক সৈন্য ও একশো কুড়ি জন অশ্বারোহী চিন্‌হাটে যাত্রা করল। সব শুদ্ধ সাতশো সৈন্য। তাদের সঙ্গে সাতটা কামান। সমগ্র সেনাদলের সেনাপতি স্যর হেনরী লরেন্স। সকাল থেকে সৈন্যরা মদ খেতে পায়নি। বর্ষায় কর্দমাক্ত রাস্তায় তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ককারালি সেতুর কাছে গিয়ে তারা সেইখানে আড্ডা করল। কাছাকাছি কোন বিদ্রোহীকে দেখা গেল না। মদ্য সংগ্রহের চেষ্টা হলো, মদ্য সে স্থানে দুর্লভ, ভরসা কেবল ভিস্তির জল। লক্ষ্ণৌ ফিরে যাওয়াই ভালো। ইংরেজ সৈন্যরা নগরের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াল। —মার্চ ফরোয়ার্ড; দি রিবেলস্ আর এ্যাবাউট। হুকুম দিলেন সেনাপতি। সৈন্যরা অগ্রসর হলো। বেলা ন'টার সময়ে তারা ইসমাইলগঞ্জ গ্রামে এসে পৌঁছল। অদূরেই বিদ্রোহী শিবির। তাদের কামানের উড়ন্ত গোলা এসে পড়তে লাগল ইংরেজদের ওপর, ইংরেজের কামানও তার উত্তর দিল। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ। বিদ্রোহীদের কামানের অব্যর্থ সন্ধান।

ইংরেজ-সৈন্য অস্থির। ইংরেজ পক্ষের সিপাহী গোলন্দাজেরা তোপ দাগল না, দুটো কামান উল্টে ফেলে রাখল। একজন কর্ণেল নিহত হলেন এবং বহু ইংরেজ সৈন্য আহত হলো। কেউ কেউ সেখানেই মরল। স্যর হেনরী লরেন্স বাকী সৈন্য নিয়ে লক্ষ্ণৌ নগরে ফিরে এলেন। ইংরেজের পাঁচটা কামান বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো। চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় বিদ্রোহের গতিকে আরো তীব্র করে তুললো।

ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল।

বিদ্রোহীরা গোমতী-তীরে পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করল।

সেতু পার হয়ে বিদ্রোহীরা যাতে নগরে প্রবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সেতু মুখে কামান বসান হলো। কিন্তু বিদ্রোহীরা নৌকাযোগে অন্য স্থানে পার হলো। গোলা বর্ষণ করতে করতে এবং ক্রমাগত বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে রেসিডেন্সী বাড়ির চারদিক তারা ঘিরে ফেললো। বেলা দুটোর মধ্যেই নগরের রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ। শহর নিস্তব্ধ। কেবল বন্দুকের শব্দ শোনা যেতে লাগল। চারদিকে কেবল যুদ্ধের কোলাহল। লক্ষ্ণৌ দুর্গ ঘোর অন্ধকার রেখে জুন মাস বিদায় নিল। রেসিডেন্সী অবরুদ্ধ হলো। হেনরী লরেন্স কাশীর কমিশনারকে এই বিপদের সংবাদ দিলেন এবং জেনারেল হ্যাভলককে অবিলম্বে লক্ষ্ণৌতে আসার জন্য তাঁর নামে এক খানা ছোট চিঠি পাঠালেন।

এদিকে উত্তেজিত সিপাহীরা ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণ করল। এই আশ্রয়-দুর্গের নাম মচ্ছীভবন। এখানে অনেক ইংরেজ আশ্রয় নিয়েছিল। বেগতিক দেখে স্যর হেনরী লরেন্স মচ্ছীভবন পরিত্যাগ করে সেখানকার ইংরেজদের রেসিডেন্সী বাড়িতে আনবার পরামর্শ দিলেন। এই স্থানান্তরের কাজ কিন্তু খুব সহজ ছিল না। একদিকে মচ্ছীভবন, অন্যদিকে রেসিডেন্সী, মাঝখানের জায়গায় বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন: "বিদ্রোহীরা ক্ষণকালের জন্য কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছিল, সেই অবকাশে মচ্ছীভবনের লোকেরা সরকারী ধনভাণ্ডার ও কামান লইয়া রেসিডেন্সী বাড়িতে প্রবেশ করিল। মচ্ছীভবনের মধ্যে অস্ত্রাগার, বারুদ, কমিশেরিয়েট, রসদ-ভাণ্ডার ও অন্যান্য অস্ত্রাদি ছিল। কামান ছিল ত্রিশটা। পলাইবার সময়ে ইংরেজরা কেবল টাকা ও কামান সরাইতে পারিয়াছিল,

বাকী জিনিসগুলি লইয়া আসিতে পারে নাই। সে সব জিনিস বিদ্রোহীদের হস্তগত হইলে বহুল পরিমাণে তাহাদের বলবৃদ্ধি হইবে এই আশঙ্কায় স্যর হেনরী লরেন্স মচ্ছীভবন ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিলেন।"

সেই মত কাজ হলো। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। রাত্রি দুটোর কিছু আগে প্রচণ্ড শব্দে মচ্ছীভবনের একাংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। সমস্ত আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল—চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। কিছুক্ষণ বাদেই বহু দ্রব্যপূর্ণ বৃহৎ অট্টালিকা এককালে ভস্মসাৎ হলো। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত মচ্ছীভবন উড়ে গেল।

২রা জুলাই। সকাল বেলা।

উন্মত্ত সিপাহীরা রেসিডেন্সী লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল।

স্যর হেনরী লরেন্স প্রমাদ গণলেন। তাঁর দৃষ্টি তখনো কানপুরের দিকে। প্রতি মুহূর্তেই তিনি আশা করছেন জেনারেল হ্যাভলক সসৈন্যে এলেন বলে। অভ্যাস মতো সকালে উঠে হেনরী লরেন্স সেনানিবাস দর্শন করলেন, যেখানে যেখানে কামান স্থাপন করা হয়েছিল, তা পর্যবেক্ষণ করলেন, যাকে যাকে যেমন উপদেশ দেবার, তা দিলেন। সূর্য উঠল, রৌদ্র ক্রমশঃ প্রখর হয়ে এলো। শরীর দুর্বল ছিল। আর বেশী ক্ষণ বাইরে না থেকে তিনি রেসিডেন্সীতে ফিরে এলেন। নিজের বসবার ঘরে বিশ্রাম নেবার জন্যে একখানা কৌচের ওপর শয়ন করলেন। দেহের বিশ্রাম, মনের নয়। কি ভাবে কাজ করতে হবে, মনে মনে তারই আলোচনা। কানপুরের পতনের সংবাদে বিচলিত হয়ে তিনি লর্ড ক্যানিংকে লিখেছিলেন যে, কানপুরের পরাজয়ের প্রতিবিধান না করতে পারলে, লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী কেন, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে না। আজ রেসিডেন্সীর নিরাপত্তা তাঁর সকল চিন্তা আচ্ছন্ন করে রইল। ভ্রাতুষ্পুত্র জর্জ লরেন্স পাশের একটি কৌচে শুয়ে। ক্যাপ্টেন উইলসন একটি রিপোর্ট পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। একজন হিন্দুস্থানী খানসামা গৃহের অদূরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা তুমুল শব্দ শোনা গেল। ঘরটা ধোঁয়ায় ও ধুলোয় ভরে গেল। চারদিক অন্ধকার। সে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না। ক্যাপ্টেন উইলসন মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি

চেঁচিয়ে উঠলেন—স্যর হেনরী! আপনার শরীরে কি আঘাত লেগেছে? কোনো উত্তর নেই। ঘর নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—আই য়্যাম ডাইং, উইলসন।

৪ঠা জুলাই স্যর হেনরী লরেন্সের মৃত্যু হলো।

লক্ষ্ণৌ অবরোধের প্রথম বলি লরেন্স। কানপুরে বসে হ্যাভলক এই শোকাবহ সংবাদ পেলেন। হ্যাভলকের সঙ্গে লরেন্সের বহু দিনের বন্ধুত্ব। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে আফগান যুদ্ধে কাজ করেছিলেন, দুজনে পরস্পরের স্নেহ ও সদ্ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাই প্রিয় বন্ধুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে হ্যাভলক স্বভাবতই কাতর হলেন। কিন্তু শোক করবার অবসর নাই; সম্মুখে মহাসঙ্কট এবং গুরু দায়িত্ব। তাই বিপন্ন ও অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী উদ্ধার করবার জন্য হ্যাভলক অবিলম্বেই কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রার আয়োজন করলেন।

লরেন্সের মৃত্যুতে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। সেই সঙ্গে নৈরাশ্যেরও। চীনহাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও লরেন্স ভগ্নোদ্যম হন নি। তিনি প্রাণপণে রেসিডেন্সী রক্ষার আয়োজন করেছিলেন। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল এখানে এবং দীর্ঘকালের অবরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার উপযুক্ত সৈন্যও ছিল লরেন্সের। এক হাজার ইংরেজ সৈন্য ও একশো দেশীয় সৈন্য নিয়ে তিনি শেষ চেষ্টা করবেন ঠিক করেছিলেন। অতর্কিত ভাবে মৃত্যু এসে তাঁর সকল চেষ্টা, সকল আশা ব্যর্থ করে দিল।

ইংলণ্ডে ডিরেক্টর-সভায় লর্ড ক্যানিং যথাসময়ে স্যর হেনরী লরেন্সের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে দিলেন। ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদ যাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল, মৃত্যু তাঁর সে আশা ব্যর্থ করে দিল।

চীনহাটের যুদ্ধে পরাজয় এবং তারপর স্যর হেনরী লরেন্সের মৃত্যু—এই দুটি ঘটনার পরেই অযোধ্যায় ইংরেজ শাসন অবলুপ্ত হয় এবং অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। লরেন্সের মৃত্যুর পরে মেজর ব্যাঙ্ক অযোধ্যার চীফ কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ তখন কলকাতায় ইংরেজের বন্দী। বিদ্রোহীরা তাই তাঁর এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসাল এবং নাবালক

নবাবের পক্ষে শাসনদণ্ড পরিচালনা করলেন বেগম হজরত মহল, যুবরাজের মা। দিল্লীতে যেমন সম্রাট বৃদ্ধ বলে বেগম জিন্নৎ মহল তাঁর পক্ষে শাসন দণ্ড পরিচালনা করছিলেন, অযোধ্যার শাসন-ব্যবস্থায় ঠিক তাই করা হলো। বেগম হজরৎ মহল যথাসময়ে দিল্লীতে সংবাদ পাঠালেন যে অযোধ্যা এখন ইংরেজ-শাসনমুক্ত। দিল্লী থেকে বেগম জিন্নৎ মহলও তাঁকে অভিনন্দিত করে পত্র পাঠালেন। অযোধ্যার দরবারে সেই অভিনন্দন-লিপি পঠিত হলো। অযোধ্যার সঙ্গে দিল্লী হাত মেলালো। অযোধ্যার দরবারে ঠিক হলো, ২০শে জুলাই অবরুদ্ধ রেসিডেন্সী আক্রমণ করা হবে।

তখনো কিছু সিপাহী ইংরেজ-পক্ষে ছিল। বিদ্রোহীদের সুবেদার কেতনলাল গোপনে সেই সব সৈন্যদের বলে পাঠালেন—কোথায় তোমরা শহীদ হবে, না এইভাবে নিমকহারামি করছ। নানাসাহেবের হুকুম—তোমরা অবিলম্বে ইংরেজপক্ষ ত্যাগ কর। দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা সর্বত্র আমরা স্বাধীন-ভারতের পতাকা উড়িয়েছি, এখন তোমরা যদি এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা কর, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তোমাদের অগৌরবের সীমা থাকবে না।

বেগমের স্বাক্ষরে এই চিঠি পাঠান হয়েছিল। এই চিঠিতে কিছু ফল হয়েছিল। অবরুদ্ধ রেসিডেন্সী থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন সিপাহী রাত্রির অন্ধকারে কেবলমাত্র বন্দুকের ওপর নির্ভর করে পালিয়ে আসে এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গাবিন্স-এর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য :—"বিদ্রোহীদের সকলেই যে এক সঙ্গে বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল তাহা নহে। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মিরাট, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহু সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অনেকদিন পরে বিদ্রোহী দলে যোগদান করে। নানাসাহেব কুশলী সেনাপতির ন্যায় এই সব সংবাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং তিনি বিদ্রোহে যোগদান করে নাই এমন সব সিপাহীদের একটি তালিকা পর্যন্ত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পরে প্রত্যেক সেনানিবাসে এই সব সিপাহীর নায়কদের নিকট গোপনে নানার স্বাক্ষরিত ইস্তাহার প্রেরিত হয়। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছিল যে, যাহারা এই সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদান না করিয়া নিমকহারামি করিবে,ভবিষ্যতে তাহাদের সম্পর্কে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, ইহা যেন তাহারা বিশেষভাবে স্মরণ

রাখে। আবার কোন কোন ইস্তাহারের ভাষা নরম ছিল, এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী আহ্বান জানান হয়। এই সব ইস্তাহার নিষ্ফল হয় নাই। পরে বহু সিপাহী, যাহারা ইংরেজদের পক্ষে ছিল, বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছিল।"

২০শে জুলাই।

বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী আক্রমণ করল। উপর থেকে গোলাবর্ষণ আর তলা থেকে বিস্ফোরক—এইভাবে আক্রমণ শুরু হয়। এই প্রচণ্ড আক্রমণে রেসিডেন্সীর ইংরেজরা প্রমাদ গণল। সর্বত্র মাইন পাতা, পদে পদে বিস্ফোরণের বিপদ। ব্রিগেডিয়ার ইন্‌স্-এর মতে বিদ্রোহীরা উনত্রিশ বার ডিনামাইট দিয়ে রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। লক্ষ্ণৌ অবরোধের প্রথম দিনই অনেক ইংরেজ নিহত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক ইংরেজ সৈন্য বিপক্ষের আক্রমণের ফলে প্রাণ হারায়।

দিন দিন রেসিডেন্সীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

সকলেই এখানে আশ্রয় নিয়েছে, আর তিল ধারণের স্থান ছিল না।

প্রতিদিনই সেখানে অনেকে হতাহত হতে লাগল। ক্রমে ইংরেজদের চরম দুর্দশা হয়।

এই ভাবে প্রায় দশ মাস রেসিডেন্সী অবরুদ্ধ ছিল।

এই পটভূমিকায় সেনাপতি হ্যাভলক লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন।

তাঁরও আসার পথ সুগম ছিল না। পথে দু'জায়গায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেও, হ্যাভলকের সৈন্যসংখ্যা ক্রমে কমে যায় এবং তাদের মধ্যে মহামারীরূপে অসুখ দেখা দেয়। আর অগ্রসর হওয়া কঠিন। হ্যাভলক আবার কানপুরে ফিরে এলেন।

কিছুদিন পরে ভাল ভাবে প্রস্তুত হয়ে হ্যাভলক আবার লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন। পথে আবার সেই স্থানে—সেই বসিরথগঞ্জে যুদ্ধ হলো। সিপাহীরা হারল বটে, কিন্তু ইংরেজ পক্ষকেও খুব দুর্বল করে দিল। সেনাপতি আবার কানপুরে ফিরলেন। আবার প্রস্তুত হয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন। এবারও পথে বসিরথগঞ্জে যুদ্ধ হলো। জয়লাভ করলেও হ্যাভলককে আবার কানপুরেই ফিরে আসতে হলো। এবার তিনি বিঠুরে অভিযান করলেন। তিনি

দেখলেন লক্ষ্নৌ উদ্ধারের সংকল্প শীঘ্র সুসিদ্ধ হবে না। এই সময়ে তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিঠুরে নানাসাহেব কানপুর পুনরাক্রমণের উদ্যোগী হয়েছেন এবং তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করে কানপুরের দিকে এগিয়ে আসছেন। তখন আগষ্ট মাস। জেনারেল হ্যাভলক লক্ষ্নৌ যাত্রা স্থগিত রেখে আপাততঃ কানপুর রক্ষায় মন দিলেন।

ইতিমধ্যে 'কলিকাতা গেজেটে' তিনি একটি সংবাদ পাঠ করলেন: "আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণরের শাসিত সর্বপ্রদেশের সেনাদলের উপর অধ্যক্ষতা করিবার জন্য স্যর জেমস আউট্রাম নিযুক্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন না, বরং এই ভেবে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন যে, তাঁর ওপরে কর্তৃত্ব করতে আর এক জন আসছেন। লক্ষ্নৌ রেসিডেন্সী অবরোধের পর প্রায় দু'মাস উত্তীর্ণ হলো, তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি, সম্ভবতঃ এই কারণে গভর্ণর-জেনারেল আউট্রামকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে এই প্রদেশে পাঠাচ্ছেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্যর জেমস্ আউট্রাম মেজর-জেনারেলের ক্ষমতা ধারণ করে কানপুরে উপস্থিত হলেন। স্যর জেমস-আউট্রাম কানপুরে উপস্থিত হওয়ামাত্র জেনারেল হ্যাভলক তাঁর হাতে সৈন্যাপত্য তুলে দিলেন। গুণগ্রাহী আউটরাম হ্যাভলকের কাজের পরিচয় পেয়ে সানন্দচিত্তে বললেন: "ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যাভলক যেরূপ কার্য করিয়াছেন, অন্যের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য। আমি হ্যাভলকের সঙ্গে লক্ষ্নৌ যাইব; কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য করিব না। এ অভিযানের সেনাপতি তিনিই।"

বিঠুরে অসীম তেজ ও অমিত পরাক্রম দেখিয়ে সিপাহীরা অতি কৌশলের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যই বিজয়ী হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বরই লক্ষ্নৌ যাত্রা স্থির হলো।

এবার হ্যাভলক একা নন—হ্যাভলক, আউট্রাম ও নীল, এই তিন জন সমরদক্ষ সেনাপতি একত্রে লক্ষ্নৌর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে অভিযান করলেন। ঐতিহাসিক গাব্বিনস্ লিখেছেন, এই অভিযানের সময় ইংরেজ পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল এই রকম: 'মোট সৈন্য তিন হাজার একশত উনআশী।

বেগম হজরত মহল

ইংরেজ পদাতিক—২৩৮৮ জন; অশ্বারোহী সৈন্য ১০৯ জন; ইংরেজ গোলন্দাজ ২৮২ জন; শিখ পদাতিক ৩৪১ জন, অচিহ্নিত অশ্বারোহী সিপাহী ৫৯ জন। জেনারেল হ্যাভলক এই দলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; দুই দল পদাতিক ও একদল অশ্বারোহী। এক দলের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার নীল; দ্বিতীয় দলের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার হ্যামিলটন এবং তৃতীয় দলের সেনাপতি মেজর কুপার।

জেনারেল হ্যাভলক, জেনারেল আউট্রাম ও জেনারেল নীল এই সব সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন। পথে মঙ্গলবর, বসিরথগঞ্জ, উনাউ, আলমবাগ, চারবাগ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা ইংরেজের এই অভিযানকে বাধা দিল। কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও শতাধিক ইংরেজ-সৈন্য নিহত হলো; কিন্তু ইংরেজের গোলাগুলির প্রভাবে বিদ্রোহী দলের অনেক লোকও মরল; বাকী সব পালিয়ে গেল। বিদ্রোহীদের পাঁচটা কামান ইংরেজদের হস্তগত হলো।

১৭ই সেপ্টেম্বর।

জেনারেল হ্যাভলক পরামর্শ করলেন, সদর রাস্তা দিয়ে লক্ষ্ণৌ প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সেখানে বিদ্রোহীদের প্রবল ঘাঁটি, বরং অপ্রশস্ত বক্র পথে নগরে প্রবেশ করাই যুক্তিসিদ্ধ। ইংরেজ সৈন্য সেইভাবেই অগ্রসর হলো। কিন্তু সেপথও নিরাপদ ছিল না। স্থানে স্থানে বিদ্রোহীদের শিবির, তারা লক্ষ্ণৌ প্রবেশপথে ইংরেজ সৈন্যদের বিপর্যস্ত করে তুলল। বিদ্রোহীদের অবিশ্রান্ত বন্দুকের গুলিতে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ইংরেজ সৈন্যরা গুলিবৃষ্টি করে বিদ্রোহীদের বিমুখ করল। সামনেই একটা ক্ষুদ্র খালের সেতু। সেতুর অপর দিকের ভূভাগ অতি উচ্চ। সেখান থেকে বিদ্রোহীরা ঘন ঘন গুলিবর্ষণ করে বার বার সেতুমুখ অতিক্রমে বাধা দিল। বহু কষ্টে ইংরেজ সৈন্য সেই বাধা অতিক্রম করল। সেতু পার হয়ে তারা ছত্রমঞ্জীলের কয়েদখানা খালি বাড়ীতে ও ফরিদবক্স প্রাসাদে বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন করল। সমরদক্ষ সেনাপতিত্রয় পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় মন দিলেন।

স্থান—ছত্রমঞ্জিলে ইংরেজ শিবির। সময়—সকালবেলা।

সেনাপতি আউট্রাম, সেনাপতি হ্যাভলক ও সেনাপতি নীল অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ উদ্ধার সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

আউট্রাম। আমার মতে পেছনের সেনাদল ও আহত লোকেরা যতক্ষণ এসে না পৌছয়, ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করলেই ভালো হয়।

হ্যাভলক। বাট্ আই ওয়াণ্ট টু রীচ্ রেসিডেন্সী য়্যাজ সুন্ য়্যাজ পসিবল্—যত তাড়াতাড়ি রেসিডেন্সীতে পৌছান যায়, ততই ভালো।

নীল। উই হ্যাভ টু ফেস এ টাফ্ অপোজিসন্ ফ্রম দি এনিমি—শত্রুপক্ষের প্রবল বাধার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। নানা হ্যাজ সেণ্ট এ লার্জ ফোর্স ফ্রম বিঠুর, আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড—নানাসাহেব বিঠুর থেকে এক বিরাট বাহিনী পাঠিয়েছেন, আমি খবর পেলাম।

আউট্রাম। দি হোল অব আউধ ইজ্ ইন্ ফ্লেমস্—সারা অযোধ্যায় বিদ্রোহের আগুন জলে উঠেছে।

হ্যাভলক। ইন ফ্যাক্ট, দি রিবেলিয়ান হ্যাজ স্প্রেড টু হোল অব ইণ্ডিয়া—সত্যি কথা বলতে, সারা ভারতবর্ষেই এই বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করেছে। উই হ্যাভ টু হিট্ হার্ড য়্যাণ্ড হিট্ কুইক টু চেক্ ইট—এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে আমাদের দ্রুত এবং কঠিন আঘাত করতে হবে।

নীল। দি ডিফিকাল্টি ইজ্ ছাট উই ল্যাক্ ইন্ ম্যান পাওয়ার য়্যাণ্ড অলসো ইন্ আর্মস্—মুস্কিল এই যে, আমাদের সৈন্যবল ও অস্ত্রবল প্রচুর নয়।

আউট্রাম। গভর্ণর-জেনারেল আমাকে জানিয়েছেন যে কলকাতা থেকে জেনারেল নেপিয়ার কিছু সৈন্য ও কামান নিয়ে আসছেন।

হ্যাভলক। আর উই টু ওয়েট সো লং ?

আউট্রাম। অফ কোর্স নট্—নিশ্চয়ই না। বিশ্রামের কথা বলছিলাম শুধু বিদ্রোহপক্ষের মনোভাবটা বুঝবার জন্যে। হোয়েদার দে আর ইন্ অফেনসিভ অর ডিফেনসিভ মুড্।

নীল। সার্টেনলি দে আর ইন অফেনসিভ মুড। মাই এক্সপিরিয়েন্স য়্যাট এলাহাবাদ—সেনাপতি নীলের কথা শেষ হবার আগেই একজন ক্যাপ্টেন এসে জেনারেল আউট্রামের হাতে গভর্ণর-জেনারেলের একটি চিঠি দিলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা খুলে ফেললেন।

লর্ড ক্যানিং লিখছেন: "লক্ষ্ণৌর অবরোধ এবং স্যর হেন্‌রী লরেন্সের মৃত্যু সংবাদে আমি অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন। পাঞ্জাবের অবস্থাও উদ্বেগজনক।

কাজেই আপনারা যত শীঘ্র পারেন লক্ষ্ণৌ-উদ্ধারে আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন।"

রাত্রি ঘোর অন্ধকার।

সেই অন্ধকারেই ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হতে থাকে।

আগে আগে সেনাপতি নীল। লক্ষ্ণৌ প্রবেশের প্রতিটি ইঞ্চি পথ তাদের সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হয়। খাসবাজারের ভিতর দিয়ে নগরে যাবার পথ। বাজারের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথগুলি খিলান করা; বিদ্রোহীরা এইখানে দলবদ্ধ ছিল। ইংরেজসৈন্য নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তারা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। সম্মুখেই ছিলেন নীল। তিনি সেইখানে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়ালেন। পেছনে তাকিয়ে দেখেন, গোলন্দাজ পলটনের যে দলটি তাঁর সঙ্গে আসছিল, তাদের কোনো নিশানা নেই। তারা পথ ভুলে গেল নাকি?—ভাবেন নীল। তখনি তিনি তাঁর এডিকং গর্ডনকে বললেন—শীঘ্র ঘোড়া ছুটিয়ে যাও, গোলন্দাজেরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে গিয়েছে, তাদেরকে এখনি নিয়ে এস।

ক্যাপ্টেন গর্ডন চলে গেলেন।

আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নীল ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেইদিকে মুখ করে চেয়ে রইলেন যেদিক দিয়ে আসবে গোলন্দাজেরা। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি গুণছেন। হ্যাভলক অগ্রসর হয়েছেন আলমবাগের পথ দিয়ে। তিনি কতদূর অগ্রসর হতে পারলেন, তা জানবার জন্যেও নীলের ব্যাকুলতা ছিল। আজ পঁচিশে সেপ্টেম্বর—রেসিডেন্সী আজ প্রায় দু' মাস অবরুদ্ধ। না জানি, সেখানে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের খাদ্যসামগ্রী আর কতদিন চলবে—এ কথাও একবার চিন্তা করলেন সেনাপতি। এইভাবে নীল যখন চিন্তামগ্ন ছিলেন, তখন খিলানের মাথার ওপর থেকে একজন বিদ্রোহী সিপাহী তাঁর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। অব্যর্থ সন্ধান। গুলি তাঁর বাঁ কানের পেছন দিক দিয়ে মাথা ভেদ করল। সেই আঘাতেই গতজীবন হয়ে দুঃসাহসী ব্রিগেডিয়ার নীল ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। গর্ডন ফিরে এসে দেখেন সেনাপতির রক্তাক্ত বিগতপ্রাণদেহ ভূমিতলে; আরোহীশূন্য ঘোড়াটি প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে।

বহুযুদ্ধের বিজয়ী বীর এবং সাহসী ও অভিজ্ঞ নীলের মৃত্যুতে ইংরেজ শিবিরে গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। শোকার্ত ইংরেজসৈন্যরা বিদ্রোহীদের অবিরাম গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। শহরের পথে নানাস্থানে সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে আউট্রাম ও হ্যাভলক সসৈন্যে রেসিডেন্সীতে উপনীত হলেন। রেসিডেন্সীতে বহুকণ্ঠের আনন্দধ্বনি উঠল। যেসব সৈন্য পিছনে ছিল, তারাও এসে রেসিডেন্সীর চারদিকে সমবেত হলো। আনন্দধ্বনির সঙ্গে জয়ধ্বনির ভীষণ গর্জন। এতদিনে অবরুদ্ধ ইংরেজ নর-নারীরা উদ্ধারের নতুন আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদ্রোহীপক্ষের প্রস্তুতি বড় কম ছিল না।

কানপুরের অভিজ্ঞতা তারা এইখানে প্রয়োগ করল এবং নানাসাহেব নিজে নেপথ্য থেকে লক্ষ্ণৌ অবরোধের যাবতীয় পরিকল্পনা রচনা করে, সিপাহীদের সেইভাবে আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য যেমন ছিল তাদের, তেমনি ছিল সৈন্যবল। গোমতী নদীর তীরে সেদিন ইংরেজের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় বিদ্রোহীরা যেন কৃতসংকল্প। এইখানে ইংরেজ তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে, এমন অনুমান তারা আগে থেকেই করেছিল এবং যখন তারা সংবাদ পেল যে লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করতে একজন নয়, বড় বড় তিন জন ইংরেজ সেনাপতি কানপুর থেকে আসছে, তখনই তারা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করল। ইংরেজ সৈন্যের অভ্যর্থনার জন্যে তারা নগরের স্থানে স্থানে কামান সাজিয়ে রাখল এবং রেসিডেন্সীর চার পাশে এমন ব্যূহ রচনা করল যা ভেদ করতে ইংরেজের লেগেছিল সাতাশী দিন এবং প্রায় এক হাজার সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে এই দুরূহ উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে সেনাপতি নীল নিহত হন এবং সেনাপতি আউট্রামের বাহু গুলিবিদ্ধ হয়।

অবশেষে বহু সৈন্যসহ কর্নেল নেপিয়ার লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো দুই পক্ষে। হ্যাভলক ও আউট্রাম বহু চেষ্টা করেও বিদ্রোহীদের লক্ষ্ণৌ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে পারলেন না। তারা লক্ষ্ণৌয়ের নানা স্থানে পূর্ণ বিক্রমে আধিপত্য করতে লাগল। রেসিডেন্সীর দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ কলকাতায় লর্ড ক্যানিংকে উদ্বিগ্ন করে তুললো।

॥ পনর ॥

১৭ই জুলাই হ্যাভলক কানপুর অধিকার করেন।

সেইদিন রাত্রিবেলায় তাঁর তরুণ পুত্র ক্যাপ্টেন হ্যাভলকের সঙ্গে নৈশভোজনে বসে বৃদ্ধ সেনাপতি মনে মনে ভাবছিলেন—কি করা যায়? কানপুর বিদ্রোহের নায়ক নানাসাহেবকে ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়? নানাসাহেব পলাতক, তাঁর সৈন্যরাও অদৃশ্য। তারা যদি অলক্ষিতে গুপ্তভাবে এসে অপ্রস্তুত ইংরেজ সেনার ওপর আক্রমণ করে, তাহলে ঘোর অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা।

কানপুরে বিজয়লাভে সেনাপতি হ্যাভলক বিশেষ আনন্দবোধ করতে পারেন নি। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড শুনে অবধি তাঁর মন শোকে অভিভূত হয়। সমস্ত সৈন্যদের মনেই শোকের গভীর ছায়া। তারা যদি সে সময় কানপুরে উপস্থিত থাকত তাহলে হয়ত এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড তারা প্রতিরোধ করতে পারত। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। নগরের মধ্যে প্রবেশ করে তারা লুণ্ঠনকার্য আরম্ভ করেছিল, নানাসাহেবকে ও বিদ্রোহীদলকে খুঁজে বেড়িয়েছিল, একজনকেও দেখতে পায়নি। যখন সেনাপতিকে তারা এসে জানাল যে নানাসাহেবকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা, তখন হ্যাভলক বললেন—যত কিছু অনর্থ ঘটেছে, তার মূল নানাসাহেব। তিনিই বিদ্রোহী দলের দলপতি।

ঐতিহাসিক ম্যালিসন লিখেছেন: "কানপুরের হত্যাকাণ্ডে ইংরেজ সৈন্যেরা খুবই উত্তেজিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই এবং উত্তেজনার বশে তাহারা বহু নিরাপরাধ বালকবালিকা, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকদিগকেও যে হত্যা করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। সকল দেশের উত্তেজিত সৈন্যদের ইহাই প্রকৃতি। কানপুরের হত্যাকাণ্ড তাহার এক উজ্জ্বল প্রমাণ।"

পলাতক নানাসাহেব হ্যাভলকের উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্রোহের দলপতিকে ধরতে না পারলে বিদ্রোহ দমনের সম্ভাবনা নেই। ওদিকে লক্ষ্ণৌ বিপদাপন্ন, এদিকে নানাসাহেব নিখোঁজ—এমন অবস্থায় সেনাপতির চিত্ত যখন সাহসে ও ভাবনায় দোদুল্যমান, তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, নানাসাহেব বিঠুরে। পাঁচ হাজার বন্দুক ও তরবারী, ৪৫টা কামান, ও সেই অনুপাতে সৈন্য এবং প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সরঞ্জাম তাঁর আয়ত্তাধীন। বিঠুর আক্রমণ করবেন, একবার ভাবলেন হ্যাভলক, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে-আশা ত্যাগ করলেন। কেননা, তিনি শুনেছেন বিঠুর প্রাসাদ অত্যন্ত সুরক্ষিত। নানার লোকবলের সঙ্গে তুলনায় অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য সেই সুদৃঢ় দুর্গ ভেদ করতে পারবে, তেমন সম্ভাবনা অল্প। পুত্রের সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে পরামর্শও করলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাভলক বললেন—উই নিড নট অ্যাটাক বিঠুর।

—হোয়াই নট, মাই সন্?

—যেহেতু আমরা নানাসাহেবের দলকে পদে পদে হারিয়েছি, অনেক অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছি। কাজেই আমার মনে হয় গোটাকতক ভাঙা কামান নিয়ে নানাসাহেব আর নতুন করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে সাহস পাবেন না।

কানপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে নানাসাহেব বিঠুর চলে এলেন, এ-কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সঙ্গে ছিল জনকয়েক বিশ্বাসী সৈন্য। ইংরেজ ঐতিহাসিক একে পলায়ন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল পশ্চাদ্ অপসরণ। বিদ্রোহ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে, এর গতি তখন সারা উত্তর ভারতে দুর্বার হয়ে উঠেছে এবং ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিদ্রোহের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে—এ-কথা তিনি অবগত ছিলেন। এমন অবস্থায় কানপুরের বিপর্যয়ের পর নানাসাহেব কিছুকাল নেপথ্যে থেকেই বিদ্রোহ পরিচালনা করবেন বলে আত্মগোপন করলেন। ইতিহাসে বিদ্রোহীদের ইহাই চিরাচরিত রীতি। রণক্ষেত্র ত্যাগ করে গেলেও তখনো নানাসাহেবের মনে আশা—বিদ্রোহ সফল হবেই। কোম্পানীর রাজত্বের অবসান অবধারিত।

ঘোড়া ছুটিয়ে কানপুরের ভেতর দিয়ে বিঠুরে প্রত্যাবর্তন করলেন নানা সাহেব। সঙ্গীদের উৎসাহ দিয়ে বললেন—ইংরেজ প্রায় নির্মূল হয়েছে, তোমরা ভয় পেও না।

ইংরেজদের অস্ত্রমুখ থেকে যারা বেঁচে এসেছিল, তাদের মধ্যে যারা যারা প্রধান পুরস্কার দেবার লোভে নানাসাহেব তাদের উৎসাহিত করলেন। বিঠুরে উপস্থিত হয়ে তিনি বুঝলেন এই বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা কত বেশী এবং এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ শেষ চেষ্টা করবেই। ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে আগুন তিনি জালিয়েছেন, তাতে শেষ আহুতি দেবার জন্যে নির্ভীক নানাসাহেব প্রস্তুত হলেন। অন্তরে আশা—সেই আশার কল্পনায় তিনি দেখতে পেলেন—ইংরেজের বহু সৈন্য বিঠুর আক্রমণ করতে আসছে। কিছুতেই নানাসাহেবের মন স্থির হয় না। সংকল্প করলেন, পরিবারের স্ত্রীলোকদের নিয়ে রাত্রিযোগে গঙ্গায় নৌকা করে ফতেগড়ে যাবেন। প্রকাশ্যে প্রচার করে দিলেন—আত্মবিনাশ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। যে গঙ্গাজলে বহুতর ইংরেজ নরনারীদের সমাধি দিয়েছেন, সেই গঙ্গাজলে তিনি নিজে ডুবে মরবেন। সাধারণের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক করবার জন্যে অন্ধকার রাতে গঙ্গার জলে তিনি একটা আলোক-চিহ্ন রেখে দেবেন, তা দেখে লোকে মনে করবে—এই সময়ে এইখানে নানাসাহেব গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। শীঘ্রই চারদিকে এই জনরব প্রচারিত হয়ে গেল। বহুলোক গঙ্গার তীরে সমবেত হয়ে এই বলে বিলাপ করতে লাগল—হায়! নানাসাহেব মারা গেছেন! এই জনরবের অন্তরালে কৌশলে আত্মগোপন করে নানাসাহেব নৌকা ফিরিয়ে গঙ্গার অপর তীরে উত্তীর্ণ হলেন। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি নিরাপদে অযোধ্যার দিকে পলায়ন করলেন।

নানাসাহেব বিঠুর পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, এই সংবাদ পেয়ে সেনাপতি হ্যাভলক একদল ইংরেজ সৈন্যকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। জনশূন্য অরক্ষিত বিঠুর প্রাসাদ ইংরেজ সৈন্যরা অতি সহজেই লুণ্ঠন করে ধ্বংস করে ফেলল। দেবমন্দির তোপে উড়িয়ে দিল। ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন: "লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে ছাগচর্ম নির্মিত দস্তানা, ভাল ভাল শ্যাম্পেন ও ভাল ভাল বই। সৈন্যরা সেগুলি হস্তগত করল। যেসব সরকারী টাকা নানাসাহেবের জিম্মায় ছিল, তা পাওয়া গেল না। চতুর নানাসাহেব সে সব আগেই হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন। রাণী মহলের রত্ন অলঙ্কার কিছুই পাওয়া গেলনা।"

গঙ্গাতীরের রাস্তা পরিষ্কার। স্থানীয় লোকের উপরে নানাসাহেবের যে প্রভুত্ব ছিল তা বিলুপ্ত। রাজপ্রাসাদ বিনষ্ট—জনশূন্য। কেবল এক জন মাত্র ছিলেন

বিঠুর প্রাসাদে। তিনি সুবাদার রামচন্দ্র পন্থের পুত্র নানা নারায়ণ রাও। কানপুরের ইংরেজেরা ও অন্যান্য লোকেরা এই নারায়ণরাওকে বিলক্ষণ চিনত। অনেকে ভুল করে তাঁকেই নানাসাহেব বলে সন্দেহ করেছিল। ইনিই নানাসাহেবকে গঙ্গার পরপারে রেখে বিঠুরে ফিরে এসে প্রচার করেছিলেন: গঙ্গায় নানাসাহেবের নৌকা ডুবে গেল, তারপর আমি বিঠুরে ফিরে এলাম। সানুচর নানাসাহেব বিঠুর প্রাসাদ পরিত্যাগ করে গিয়েছেন—নারায়ণ রাওই সর্বপ্রথমে এই সংবাদ জেনারেল হ্যাভলকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। হ্যাভলক এই কথায় বিশ্বাস করে নারায়ণ রাওকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন। তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে হ্যাভলকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—ভবিষ্যতে হয়ত অনেক বিষয় তিনি তাঁর কাছ থেকে জানতে পারবেন। (ইংরেজ বহু চেষ্টা করেও নিরুদ্দিষ্ট নানাসাহেবের আর কোনো সংবাদ জানতে পারেনি। অতঃপর নানাসাহেব আত্মগোপন করে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে লাগলেন। কানপুরে বিদ্রোহের ওপর যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে নানাসাহেবের প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার ওপরও সেদিন যবনিকা নেমে এসেছিল এইভাবে।)

স্থান—কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেলের প্রাসাদ। সময়—আগষ্ট মাসের অপরাহ্ন।

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লর্ড ক্যানিং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ পাঠ করছিলেন আর তাঁর চক্ষের সামনে দেশের অবস্থা ভেসে উঠছিল। নানা জায়গা থেকে নানা বিপদের সংবাদ আসছে। দিন দিন নতুন নতুন বিপদের বিস্তৃতি। প্রতিদিন নতুন বিদ্রোহ, নতুন নতুন নরহত্যা ও নতুন নতুন লুঠতরাজের সংবাদ। আসছিল নানা রকম বিপদের সমাচার, কিন্তু সকলের ওপর ছাপিয়ে উঠছে কানপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। প্রত্যেক সেনাপতির কাছ থেকেই রিপোর্ট আসছে—বিদ্রোহ আয়ত্তের বাইরে। বিদ্রোহ সারা ভারতবর্ষে। কানপুর থেকে সংবাদ এসেছে ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহী দলের নেত্রী হয়ে রণভূমিতে দেখা দিয়েছেন, সেখানেও অনেক ইংরেজের মৃত্যু হয়েছে। বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের প্রায় সমস্ত জায়গার লোকেরা ইংরেজদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছে। গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে উপদ্রব আরম্ভ করেছে। রোহিলাখণ্ডেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। দেশ শুদ্ধ

লোকই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। খাঁ বাহাদুর খাঁ নামে একজন মুসলমানকে বিদ্রোহীরা রোহিলাখণ্ডের শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করেছে। ঝাঁসীতেও ছিসারে হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আগ্রা, দিল্লী, নিমাচ ও নাসিরাবাদে ভয়ঙ্কর উপদ্রব। বিদ্রোহী দল আগ্রা বেষ্টন করেছে। লেফটেনান্ট-গভর্ণর কলভিন ও তাঁর প্রধান প্রধান কর্মচারীরা নগরমধ্যে শত্রু-বেষ্টিত। ইংরেজের সুশাসন সর্বত্র বিশৃঙ্খল ও অবসন্ন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব বিলুপ্ত প্রায়।

টেবিলের ওপর প্রসারিত ভারতের মানচিত্রের ওপর লর্ড ক্যানিং-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর হাতের আঙুল গিয়ে পড়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজের ওপর। বিক্ষুব্ধ ভারতের মধ্যে এই দুটি প্রদেশের সেনাদল এখনো পর্যন্ত রাজভক্ত আছে—এই যা ভরসা। কিন্তু সময় গতিকে কি দাঁড়াবে, তাহা বলা কঠিন। সেই একহস্ত পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আজ বিস্তার লাভ করে সারা ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। অল্পদিন পরেই খবর এল, বোম্বাই পলটনের একদল সিপাহী বিদ্রোহী হয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে সেখানকার লোকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করেছে। কাউন্সিলের সভ্যদের কারো কারো অনুমান এই রকম যে, সেতারার রাজবংশের পুরাতন অমাত্যেরা বিঠুরের নানাসাহেবের অনুকরণে সিপাহী ক্ষেপাতে সমুদ্যত। উপযুক্ত সেনাপতিরা বোম্বাইয়ের শান্তি বিধানকল্পে সর্বদা সচেষ্ট; সেখানকার লেফটেনান্ট-গভর্ণর লর্ড এলফিনস্টোন চারদিকে সমান দৃষ্টি রেখে সময়োচিত কার্যে মনোযোগী। তবে পশ্চিম ভারতেও শীঘ্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে, লক্ষণ দেখে অনেকেই সেই আশঙ্কা করছিলেন এবং সেই অনেকের আশঙ্কার সঙ্গে লর্ড ক্যানিং তাঁর নিজের আশঙ্কাও মিলিয়ে দিলেন।

দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দাক্ষিণাত্যের ওপর।

দাক্ষিণাত্যকে কি বিশ্বাস করা চলে? ভাবেন গভর্ণর-জেনারেল। দিল্লীর সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে দাক্ষিণাত্যের নিরাপত্তা। সুবিজ্ঞ রাজমন্ত্রী স্যর সালার জঙের পরামর্শে হায়দরাবাদের প্রতিপত্তিশালী নিজাম এখনো পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে সখ্যভাব বজায় রেখে চলছেন, কিন্তু দিল্লী যদি শীঘ্র উদ্ধার করা না যায়, তাহলে নিজামের সৈন্যদল এখনকার মত বশীভূত থাকবে কি না, স্যর সালার জঙ তাদেরকে ঠিকভাবে রাখতে সমর্থ হবেন কি না, সে বিষয়ে

বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। দক্ষিণ হাতের সঞ্চরণশীল আঙুল এসে থামে রাজপুতনার ওপর। এখনো পর্যন্ত রাজপুতনা শান্ত আছে, প্রধান প্রধান রাজা ও সর্দাররা এখনো কোনো রকম বিপরীত লক্ষণ দেখান নি, কিন্তু পশ্চিম-ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজপুতনাতেও তা সংক্রামিত হতে কতক্ষণ! যদি সে রকম অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকে যে কিরকম অনর্থ ঘটে উঠবে, তা অনুভব করে লর্ড ক্যানিং বিচলিত হলেন।
দৃষ্টি পড়ে নেপালের ওপর।
নেপাল ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এবং নেপাল গভর্ণমেণ্ট এখনো পর্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করে আসছেন, তবু সেনাপতিদের কেউ কেউ অনুমান করেন সিপাহী সৈন্যদের বিদ্রোহ যদি প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিস্তার লাভ করে তাহলে নেপালী সৈন্যরা নিশ্চয়ই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।
সর্বশেষে তাঁর দৃষ্টি এসে থেমে যায় অযোধ্যার ওপর। চকিতে মনে পড়ে যায় স্যর হেনরী লরেন্সের কথা—তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যু। বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে ইতিমধ্যে অনেকের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে শুনতে হয়েছে, কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ, বর্ষীয়ান হেনরী লরেন্সের মৃত্যু লর্ড ক্যানিংকে সবচেয়ে বেশী ব্যথিত করে তুলেছিল।
এই ভাবে সমগ্র মানচিত্রখানির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে লর্ড ক্যানিং দেখলেন যে ভারতের কোনো দিকেই শান্তির আভাস দেখা যায় না। বিদ্রোহের আগুন শত শিখায় যেন ভারতকে পরিবেষ্টিত করেছে। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নেমে আসে রাজধানীর ওপর—নেমে আসে গভর্ণর-জেনারেলের প্রাসাদের ওপর। সন্ধ্যার সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ডেসপ্যাচগুলি বন্ধ করে, লর্ড ক্যানিং স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আর চিন্তা করতে লাগলেন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ।

॥ ষোলো ॥

পাঞ্জাব।

মিরাটের অভ্যুত্থানের সংবাদ শিহরণ জাগিয়ে তুললো পঞ্চনদের কূলে কূলে।

চেনাব, ঝিলাম, রাবি, শতদ্রু ও বিয়াসের তীরে তীরে প্রতিধ্বনিতে হয়ে ওঠে বিদ্রোহের শঙ্খধ্বনি।

পাঞ্জাব হয়ে ওঠে উদ্বেলিত—বিক্ষুব্ধ।

চঞ্চল হয়ে ওঠে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর। মিরাটে অনেক ইংরেজ নিহত হয়েছে, প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে আরো অনেক—এই নিদারুণ সংবাদ এলো মিরাট থেকে লাহোরে ১১ই মে। সেই সংবাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে পরের দিন এলো দিল্লীর দুঃসংবাদ। মোগল রাজধানীতে বাদশাহী পতাকা উড়েছে, দিল্লীতে একটিও ইংরেজ নেই। বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে।

পঞ্চনদের বিভিন্ন সেনানিবাসের সিপাহীরা শুনলো এই সংবাদ।

আর শুনলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা স্যর জন লরেন্স। তিনি তখন রাওলপিণ্ডিতে।

কলকাতায় লর্ড ক্যানিং চিন্তিত হয়ে ওঠেন পাঞ্জাব সম্পর্কে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের বিশাল ভূভাগ এই পাঞ্জাব। একদা এই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন রণজিৎ সিংহ· আট বছরের কিছু বেশী হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুক্ষিগত হয়েছে এই রাজ্য—গোড়াতেই আমরা সে কথা বলেছি। ইংরেজ পাঞ্জাব অধিকার করেছিল বটে, কিন্তু পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ শিখ জাতির বীরত্ব ও সাহসের বিলয় হয় নি। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর পাঞ্জাবের সৈন্য দলের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার। এদের মধ্যে শিখ বা খালসা সৈন্যই ছিল [illegible] হাজার, সাত হাজার পাঞ্জাবী মুসলমান, চার হাজার পাহাড়ী রাজপুত,

চার হাজার হিন্দুস্থানী আর এক হাজার গুর্খা। এই সব সৈন্য ছাড়া, পাঞ্জাবের অনেক জায়গাতেই রণজিৎ সিংহের বাহিনীর বহু সৈন্য ছিল। তারা এখন নিরস্ত্র। নিরস্ত্র কিন্তু নির্বীর্য নয়। সর্দারেরা ইংরেজের শাসনে সুখে ছিলেন, কিন্তু অসন্তুষ্ট ছিল এই সব নিরস্ত্র সৈন্য। বিদ্রোহের সূচনায় তারাই জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং দলবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। ভারতের প্রধান সেনানিবাস পাঞ্জাবে। উত্তেজনার সময় সিপাহীরা যদি নিরস্ত্র শিখদের সঙ্গে হাত মেলায়, তাহলে পাঞ্জাবে একটা প্রচণ্ড অগ্ন্যুদগারের সমূহ সম্ভাবনা। পাঞ্জাব সম্পর্কে লর্ড ক্যানিং-এর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ ছিল এই। তিনি জানতেন চিনিয়াবালার যুদ্ধে খালসা সৈন্য কি রকম রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল। সে গৌরবকাহিনী তাদের স্মৃতিপটে আজো জাগরূক। স্বদেশের জন্য তারা যে কোন মুহূর্তে অস্ত্রধারণ করতে পারে—এই আশঙ্কা করেই লর্ড ক্যানিং স্যর জন লরেন্সকে এক ডেসপ্যাচে লিখলেন—"পাঞ্জাবের গুরুত্ব যেন কদাচ লঘু করিয়া দেখিবেন না। সব সময়ে মনে রাখিবেন, পাঞ্জাব শিখদের দেশ। সর্বদা সজাগ, সতর্ক ও সক্রিয় থাকিবেন।"

শুধু পাঞ্জাব সম্বন্ধেই দুশ্চিন্তা নয়।

আশঙ্কার আরো একটা কারণ ছিল।

পাঞ্জাবের উত্তর প্রান্তে আফগানিস্থান। সেখানে যুদ্ধপ্রিয় জাতির বসতি। বিদেশী রাজার বশীভূত তারা নয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘুষ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, নানাভাবে তাদের বশে রেখেছিলো। দুর্ধর্ষ আফগানেরা শিখদের সঙ্গে মিলিত হলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। ভরসার মধ্যে দোস্ত মহম্মদ। কাবুলের এই আমীরের সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে রীতিমত অর্থ পেতেন। অর্থের লোভ দোস্ত মহম্মদের খুবই ছিল। অর্থের বিনিময়ে ইংরেজের বিরাগভাজন হওয়া তাঁর আদৌ অভিপ্রেত নয়। তবু লর্ড ক্যানিং পূর্বেকার সন্ধি আরো দৃঢ়তর করে প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিয়ে, দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে ইংরেজের বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেছিলেন। এই সংকটের সময়ে আফগানরা যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না—বিচক্ষণ লর্ড ক্যানিং এ সত্য আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। আফগানিস্থান সম্পর্কে বর্তমানে তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না।

কিন্তু সমগ্রভাবে পাঞ্জাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন। কেননা, এখানে তিনটি প্রধান জাতির বাস—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নব্বুই হাজার লোকের বাস। বেশীর ভাগই শিখ ও মুসলমান। শিখ ও মুসলমানের মধ্যে তেমন সদ্ভাব নেই এবং ইংরেজ কোম্পানী এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে তৎপর ছিল। দিল্লীর প্রতি শিখদের কোন দিনই উৎসাহ, আনুগত্য বা সমবেদনা ছিল না। সেদিন শিখ ও মোগলের মধ্যে ভেদনীতি চালিয়ে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দুটি জাতিকে পৃথক করে রেখেছিল। এই পার্থক্যই বিদ্রোহের সূচনায় পাঞ্জাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শিখদের মেরুদণ্ড ডালহৌসি ভেঙে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের বেশীর ভাগই এখন নিরস্ত্র। যে হাত একদিন কৃপাণ ধরত, সেই হাত দিয়ে এখন তারা মাঠে হল চালনা করছে। এক কথায়, পাঞ্জাবের যোদ্ধা শিখ এখন শান্ত কৃষকে পরিণত হয়েছে। পঞ্চনদের সে বীরত্ব গরিমা আজ নেই। তথাপি শিখদের সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন ছিল। এই প্রসঙ্গে স্যর জন লরেন্সের একটি অভিমত এখানে উল্লেখযোগ্য :

"দিল্লীর বিদ্রোহীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, শিখেরা এই সংবাদে কোন প্রকার আনন্দ বা সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। ভারতে মুসলমান জাতি পুনরায় প্রবল হয়, মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়া আসে, শিখেরা তাহা পছন্দ করে না। কিন্তু বিদ্রোহের সূচনাতেই শিখদিগের একটা বড় অংশের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। হাজার হাজার শিখকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। এই নিরস্ত্র শিখেরা কটিদেশে কৃপাণ ঝুলাইয়া বাহির হইতে পারে না, ঘরে ঘরে আগ্নেয় অস্ত্র রাখাও নিষেধ। নিরস্ত্রকরণ কার্যটা সর্বাংশে সুফলপ্রদ হয় নাই। যেসব শিখকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল, তাদের অনেকে মাটির নীচে, খড়ের গাদার মধ্যে ও ঘরের চালার ভিতর বন্দুক ও তলোয়ারাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিল; উপযুক্ত অবসরে প্রয়োজন বুঝিলেই তাহারা সেই সব অস্ত্র বাহির করিয়া সজ্জিত হইতে পারিবে, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। ইংরেজের পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া সে সব গুপ্তস্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই নিরস্ত্র এবং আপাত-দৃষ্টিতে শান্ত-শিষ্ট শিখেরা রাজ্যের অসন্তুষ্ট লোকদিগের দলপুষ্টি করিয়া ইংরেজদের বিপদে ফেলিতে সচেষ্ট ছিল।"

পাঞ্জাবের এই পটভূমিকায় ১১ই মে মিরাটের সংবাদ এলো লাহোরে। ১২ই মে সকালবেলায় তার চেয়েও ভয়াবহ সংবাদ এলো দিল্লী থেকে। পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার তখন স্যর জন লরেন্স। আর বিচার বিভাগীয় কমিশনার রবার্ট মণ্টগোমারি। দুজনেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। এঁদের দুজনার যোগ্যতার ওপর লর্ড ক্যানিং-এর অগাধ বিশ্বাস। এঁরা দুজনে পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখ জনসাধারণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ডালহৌসির ঔদ্ধত্যের ফলে পঞ্চনদের জনসাধারণের মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া এক সময়ে দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী কালে তা এঁদের তোষণ-নীতির ফলে অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। পাঞ্জাব ছিল ডালহৌসির প্রিয় প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের সামরিক গুরুত্বও ছিল সেই সময়ে সবচেয়ে বেশী। তাঁর চোখের ওপর মিরাট-দিল্লীর ব্যাপার সংঘটিত হলেও, লর্ড ক্যানিং নিশ্চিন্ত ছিলেন যে লরেন্স ও মণ্টগোমারি যতক্ষণ পাঞ্জাবের শাসনরজ্জু ধরে আছেন, ততক্ষণ এই প্রদেশে বিদ্রোহের কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু ডালহৌসি যেভাবে রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্য গ্রাস করেছিলেন, তার বেদনাদায়ক স্মৃতি শিখদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তাই মিরাট-দিল্লীর বিদ্রোহের সঙ্কেত পাঞ্জাবের একাধিক সেনানিবাসের সিপাহীদের মনে যে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল, কর্তৃপক্ষ তার অল্পই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

মিরাট-দিল্লীর সংবাদ যখন লাহোরে এলো, স্যর জন লরেন্স তখন রাওলপিণ্ডিতে। সেখানে বসে ১৩ই মে তিনি এই বার্তা পেলেন। মোগলের রাজধানী সিপাহীদের হস্তগত হয়েছে। সেখানকার য়ুরোপীয়রা দলে দলে নিহত বা পলায়িত। মিরাটের ইংরেজদের অনেকে নিহত বা পলায়িত—রাওলপিণ্ডিতে বসে বিস্মিতচিত্তে এইসব সংবাদ একের পর এক শুনলেন কমিশনার। আরো শুনলেন যে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তখন অনুশোচনা বা বিস্ময় প্রকাশের সময় ছিল না। রাওলপিণ্ডি থেকেই তিনি মণ্টগোমারিকে যথাযথ নির্দেশ পাঠালেন। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর থেকে এক মাইল দূরে আনারকলিতে ছিলেন মণ্টগোমারি। আনারকলি সিভিল ষ্টেশন। অন্যান্য রাজপুরুষেরা এখানে থাকেন। খবর পেয়েই মণ্টগোমারি লাহোরে ফিরলেন। পাঞ্জাবে বহু সিপাহী। এখানকার শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে

বীরত্বের অবশিষ্ট এখনো রয়েছে। অনতিদূরে দুর্ধর্ষ আফগানরা রয়েছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। তাই মণ্টগোমারি মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে এদের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হলেন। অন্যান্য রাজপুরুষদের সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে পরামর্শ করলেন। ঠিক হলো সিপাহীরা গুলি, বারুদ ও বন্দুকের ক্যাপ রাখতে পারবে না। লাহোরের দুর্গে অতিরিক্ত সৈন্য রাখা হবে। নগর-প্রাচীরের মধ্যে লাহোর দুর্গ। একদল য়ুরোপীয় সৈন্য, একদল ইংরেজ গোলন্দাজ সৈন্য এবং ছাব্বিশ নম্বর পলটনের কয়েকজন সিপাহী।

লাহোরের ছ'মাইল দূরে মিয়াঁমীর সেনানিবাস। বেশীর ভাগ ইংরেজ সৈন্য এইখানেই থাকে। মাঝে মাঝে লাহোরের সৈন্যদলের কতকাংশ বদলী হতো, সেই নিয়মে কতক সৈন্য সেই সময়ে মিয়াঁমীরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মিয়াঁমীর সেনানিবাসে তখন তিন দল পদাতিক সৈন্য ও দুই দল অশ্বারোহী য়ুরোপীয় গোলন্দাজ। আর সিপাহী ছিল য়ুরোপীয় সৈন্যের চারগুণ। ছাব্বিশ আর উনপঞ্চাশ—এই দুই পলটনের সিপাহীদের মোট সংখ্যা ছিল এক হাজার একশো। দিল্লী ও মিরাটের সংবাদ যখন লাহোরে এলো, মণ্টগোমারি বুঝলেন বিপদ গুরুতর। কিন্তু ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান তিনি; তাই সংবাদে বিস্মিত হলেও বিচলিত হলেন না। বুঝলেন—সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করছে পাঞ্জাবের নিরাপত্তার ওপর। দিল্লীর মূল্যবান ম্যাগাজিন উড়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীরা পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের অস্ত্রাগারও নষ্ট করতে পারে। বিদ্রোহীরা এক স্থানে সফলতা লাভ করলে, পাঞ্জাবের সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

এমন সময়ে লাহোরের সিপাহীদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন মণ্টগোমারি। ষড়যন্ত্রটা এই রকম। নগরের শান্তিরক্ষা করা আর ধনাগার রক্ষা করা—এই ছিল লাহোর দুর্গের সিপাহীদের প্রধান কাজ। মাসের মাঝামাঝি মিয়াঁমীর ও লাহোরের মধ্যে পাহারা বদল হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা নাকি এই ঠিক করেছিল যে, ১৫ই মে মিয়াঁমীর থেকে উনপঞ্চাশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা যখন লাহোর দুর্গের ভার নিতে আসবে, তখন এখানকার ছাব্বিশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অফিসারদের আক্রমণ করবে ও দুর্গের দরজা অধিকার করবে। পরে তারা অস্ত্রাগার ও ধনাগার লুঠ করবে। তারপর হাসপাতালের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে।

তখন মিয়াঁমীরের বাকী সিপাহী এই আগুন দেখে বুঝতে পারবে যে লাহোর দুর্গের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে তারাও অস্ত্র ধারণ করবে। তারপর জেলখানার দু'হাজার কয়েদীকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এইভাবে বিদ্রোহীরা মিলিত হয়ে সমস্ত ইংরেজকে বিনষ্ট করে ফেলবে। তারপর ফিরোজপুর, ফিলোর, জলন্ধর ও অমৃতসরে এই বিদ্রোহর বিস্তার হবে।
কিন্তু আসলে এটা ষড়যন্ত্র না জনরব তা সঠিক নির্ধারণ করবার জন্ত মণ্টগোমারি একটা কৌশল অবলম্বন করলেন।
ক্যাপ্টেন রিচার্ড লরেন্স তখন পঞ্জাবের পুলিশ ও ঠগী বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ। মণ্টগোমারি একদিন লরেন্সকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর মতলবের কথা ব্যক্ত করলেন। ক্যাপ্টেন বুঝলেন যে, সিপাহীদের মনের ভাব কি রকম, অভিসন্ধি কি রকম, তা জানবার পক্ষে এটা উত্তম প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব মত তিনি তাঁর প্রধান মুন্সী চন্দন সিং দোবেকে ডেকে পাঠালেন। দোবে জাতিতে ব্রাহ্মণ, অযোধ্যার লোক, অনেকদিন সে এই বিভাগে মুন্সীগিরি করছে। সিপাহীদের চালচলন তার বিলক্ষণ জানা আছে। তাকেই গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হলো। প্রভুভক্তির বশম্বদ অযোধ্যাবাসী সেই ব্রাহ্মণ সুচারুরূপে তার কর্তব্য সাধন করল। দু'একদিনের মধ্যেই চন্দন সিং তার তদন্তের ফল ক্যাপ্টেন সাহেবের গোচর করল। বলল—সাহেব! মিয়াঁমীরের সিপাহীরা গভর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়ে উঠেছে। সকলের মধ্যেই রাজদ্রোহিতার ভাব। সকলেই বিদ্রোহী হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করছে।
—তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কতখানি বুঝলে? জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যাপ্টেন লরেন্স।
ব্রাহ্মণ তার গলা পর্যন্ত হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে—এই এতখানি।
মুন্সী বিশ্বস্ত। তার কথায় ক্যাপ্টেন সাহেব সন্দেহ করলেন না।
মণ্টগোমারি নিঃসন্দেহ হলেন পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আশু সম্ভাবনা সম্পর্কে। এখনি একে অঙ্কুরে বিনাশ করা দরকার। উপায়? কমিশনার রাওলপিণ্ডিতে। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই তিনি ঠিক করলেন, সিপাহীদের নিরস্ত্র করাই উচিত। মিয়াঁমীর সেনানিবাসের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার করবেটের কাছে এলেন মণ্টগোমারি। বললেন তাঁকে মিরাট-দিল্লীর কথা আর এখানকার সিপাহীদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কথা। ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্ট করবেট

কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় সেনাদলে প্রায় চল্লিশ বছর চাকরী করছেন। সব শুনে তিনি বললেন—সমস্ত সিপাহীকে নিরস্ত্র করুন। শুধু গুলি বারুদ কেড়ে নিলেই হবে না। একেবারে সব রকম সামরিক চিহ্ন থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

ঠিক হলো নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টা ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করা হবে না। ১৩ই মে সকালে প্যারেড হবে—সিপাহীদের ব্যারাকে এই আদেশ প্রচারিত হলো।

হঠাৎ প্যারেডের কী প্রয়োজন হলো?

সিপাহীরা বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে।

সাহেবেরা ভয় পেলো নাকি? না—আজ রাতের নাচের মজলিশ দেখে মনে হয় না তো যে কিছুমাত্র আশঙ্কা বা দুশ্চিন্তা এদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তবে প্যারেডের আদেশ কেন অসময়ে?

সত্যিই সিপাহীদের মনের সন্দেহ নিরসন করবার জন্যেই ১২ই মে রাত্রে সৈনিকনিবাসে একটা নাচের মজলিশের অনুষ্ঠান হলো। সেই রাত্রের মজলিশে সৈনিকনিবাসের চিরাচরিত রূপ, রঙ আর জৌলুষের পারিপাট্যের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সাহেব ও বিবিদের নাচ। নাচের উপযুক্ত সাজসজ্জা সকলেরই—সকলেই নৃত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে ব্যগ্র। আলোকমালায় উদ্ভাসিত নাচঘর। সেই আলোর বন্যায় বিচিত্র বেশধারিণী, নৃত্যপটিয়সীদের সৌন্দর্যতরঙ্গ খেলে বেড়াতে লাগল। সেই নিদাঘের নিশীথে সকলেই উল্লাসে উৎফুল্ল—সকলেই উৎসবে উন্মত্ত হয়ে নৃত্যরঙ্গে নিশাযাপন করল। সেনানিবাসের স্থানে স্থানে যেসব সিপাহী শাস্ত্রী পাহারায় ছিল, আমোদপ্রিয় ইংরেজের মুখের ভাব দেখে তারা তখনো পর্যন্ত সাহেবদের মধ্যে কোন প্রকার উদ্বেগ বা অবিশ্বাসের লক্ষণ বুঝতে পারেনি। ঐতিহাসিক মেলিসন লিখেছেন:

"যদি মিঁরামীরের সিপাহীরা ইংরেজদিগের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এই সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। তাহাদের বৈর-নির্যাতন স্পৃহা এ সময়ে অবশ্যই বলবতী হইত। তাহারা এ সময়ে ইংরেজদিগকে এইরূপ নিশ্চিন্ত ও নিরস্ত্র দেখিয়া অস্ত্রধারণ পূর্বক নিঃসন্দেহে তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত। সুতরাং সিপাহীদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের সংবাদ অমূলক ছিল।"

আনন্দ-উৎসবের রাত্রি অবসান হলো।

১৩ই মে সকালবেলা মিরাটমীরের কাওয়াজের মাঠে সিপাহীরা সমবেত।

প্যারেডের প্রশস্ত মাঠে এসে পড়েছে সকালের স্নিগ্ধ আলো।

ব্রিগেডিয়ারের আদেশে য়ুরোপীয় সৈন্যদল সিপাহীদের আগেই সেখানে এসে সমবেত হয়েছে। সিপাহীরা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে সমস্ত ব্রিগেড-সৈন্যে জায়গাটা ভরে গেছে। তাদের সম্মুখে পেছনে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্য আর গোলাভরা কামান। এমন ধরণের প্যারেড ত কখনো হয় না। আনারকলি থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন স্বয়ং মণ্টগোমারি আর অন্যান্য রাজপুরুষেরা। প্রথমেই সিপাহীদের সামনে ব্যারাকপুরের ঘটনার অনুরূপ ঘটনা—নিরস্ত্রীকরণের সেই সরকারী আদেশ পঠিত হলো। এই ভূমিকার পর আরম্ভ হয় সেদিনের প্রভাতী প্যারেডের। তারপর একজন ইংরেজ অফিসার বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে ব্রিগেডিয়ারের হুকুম পাঠ করে শোনালেন। শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান সিপাহীরা নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শোনে: "একণে অন্যান্য সৈনিকদলে বিদ্রোহভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে অনেক উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষের সর্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। মিয়াঁমীরের সৈনিকদল গভর্ণমেন্টের কার্য সুনিয়মে সম্পন্ন করিতেছে। এই সৈনিকদল যাহাতে বিদ্রোহভাবে পরিচালিত না হয়, সেই জন্য তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করাই স্থির হইয়াছে। এই হেতু সিপাহীদের আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র একস্থানে স্তূপাকার করুক।"

আদেশলিপি পড়া শেষ হলো। সামনে গোলা-ভরা কামান, পেছনে বন্দুকধারী ইংরেজসৈন্য। কামানের পাশে জলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে গোলন্দাজদল। অন্যদিকে বন্দুকধারী ইংরেজ সৈন্যরা বন্দুকে বারুদ ঠাসতে উদ্যত। শিকের ঠকাঠক শব্দে প্রত্যেক বন্দুকেই অব্যর্থ মৃত্যুবানসন্ধান। ক্ষণকালের ইতস্ততঃ—হুকুম পালন করবে কি না। তারপর সিপাহীরা নিঃশব্দে আদেশ পালন করল। সবাই ধীরে ধীরে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে এক জায়গায় রাখল। কেউই বিরুদ্ধভাবের পরিচয় দিল না, কেউ দোলায়মানচিত্ত হলো না। অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের তরবারিসমেত কোমরবন্ধ খুলে দিল। নিরস্ত্র সিপাহীরা শান্তভাবে ব্যারাকে ফিরে গেল। এইখানে সেদিন কৌশলে যাত্রা

ছ শো ইংরেজ সৈন্সের সাহায্যে আড়াই হাজার সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হলো। মিয়াঁমীর সম্বন্ধে আপাতত নিরুদ্বেগ হওয়া গেল।

কিন্তু ছাব্বিশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা তখনো লাহোর দুর্গে রয়েছে। ১৫ই পর্যন্ত তাদের পাহারায় থাকবার কথা। ১৪ই মে সকালবেলায় কয়েকজন ইংরেজসৈন্য নিয়ে কর্ণেল স্মিথ সহসা লাহোর দুর্গে প্রবেশ করলেন। সিপাহীরা বিস্মিত, হতচকিত। হঠাৎ এত ইংরেজ সৈন্য! সিপাহীদের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই কর্ণেল আদেশ দিলেন: গিভ্ আপ ইওর আর্মস্— তোমাদের অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

বিনা উত্তেজনায় তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করল। ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে তারা দুর্গ ছেড়ে মিঁয়ামীরের ব্যারাকে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে তারা দেখ্‌ল, কেবল ইংরেজসৈন্যের হাতে বন্দুকের সঙ্গীন সূর্য্যের আলোয় ঝকমক করছে। সকল দিকেই টহলদার ইংরেজ সৈন্য। ইংরেজদের ব্যারাকে বিবিদের ও শিশুদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। সিপাহীদের চিঠিপত্র আটক করা হলো। হিন্দুস্থানীদের বদলে পুলিশ বিভাগের পাঞ্জাবী লোকদের পাহারার কাজে নিযুক্ত করা হলো। পাঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাসে সতর্কতা-মূলক সংবাদ প্রেরিত হলো।

কেবল লাহোর রক্ষার ব্যবস্থা করে মণ্টগোমারি নিরস্ত হলেন না। মিরাটের ভুলের পুনরুক্তি তিনি এখানে হতে দিলেন না। তিনি জানতেন—তাঁরা বিস্ফোরক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, কেবলমাত্র লাহোরের নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়, সমগ্র প্রদেশের কথাই এখন চিন্তা করতে হবে। মিঁয়ামীরের কিছু সৈন্য লাহোর দুর্গে রেখে, বাকী সৈন্য তিনি অন্য স্থানের বিপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

লাহোর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে গোবিন্দ গড় দুর্গ।

গুরু গোবিন্দের স্মৃতিপূত এই গোবিন্দ গড় দুর্গ।

অমৃতসর পাঞ্জাবের আধ্যাত্মিক তীর্থ। শিখদের পুণ্যতীর্থ। এখানকার স্বর্ণমন্দির তাদের ধর্মানুশীলনের কেন্দ্র। অতীত গৌরবের নিদর্শন অমৃতসর। কথিত আছে, তেগবাহাদুর স্বধর্মরক্ষার জন্যে যেমন প্রতাপান্বিত মুঘলসম্রাট ঔরংজীবের শাসনে নিজের মাথা দিয়েছিলেন, গুরু গোবিন্দ তেমনি তরুণ

বয়সে ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়ে, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্তে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ প্রবল পরাক্রমে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে যুগপৎ আফগান ও ইংরেজকে স্তম্ভিত করেছিলেন। অমৃতসরের সঙ্গে সেই সব অতীত স্মৃতি বিজড়িত। শিখেরা তাই অমৃতসরের মতো আর কোন শহরের ওপর এত শ্রদ্ধা দেখায় না। এখানকার দুর্গ গোবিন্দগড় গুরু গোবিন্দের নামে খ্যাত। ইংরেজের অধিকারে চলে যাবার আগে একদিন এই দুর্গের মধ্যে ছিল ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ কোহিনূর হীরক। কাজেই গোবিন্দগড় সম্পর্কে ইংরেজের আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। রবার্ট মণ্টগোমারি তাই সকলের আগে গোবিন্দগড় রক্ষায় সচেষ্ট হলেন।

দিল্লীর দুঃসংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্টগোমারি অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনারকে সতর্ক করে দিয়ে লিখলেন—"উপস্থিত বিষয়ে এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। সিপাহীরা যাহাতে সন্ত্রস্ত বা উত্তেজিত হয়, এমন কাজ করিবেন না। গোবিন্দগড় রক্ষার ভার যে সব সিপাহীর উপর আছে, তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়।"

ওয়েলেসলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মণ্টগোমারি পাঞ্জাব রক্ষায় সচেষ্ট হলেন। গোবিন্দগড়ে সিপাহীদের সংখ্যাই বেশী। কামান-রক্ষক ইংরেজ সৈন্য মাত্র কয়েকজন ছিল। সহসা অমৃতসরে জনরব উঠল যে, লাহোরের নিরস্ত্র সিপাহীরা গোবিন্দগড় দখল করতে দলে দলে আসছে। ডেপুটি কমিশনার কয়েকজন বিশ্বস্ত শিখ ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দুর্গদ্বার পাহারা দিতে লাগলেন। লাহোর-অমৃতসর রাস্তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হলো, স্থানে স্থানে সশস্ত্র ইংরেজ প্রহরী মোতায়েন করা হলো। উদ্দেশ্য—এই পথ দিয়ে বিদ্রোহীরা এলে তাদের গতি রোধ করা হবে। জাঠরা ছিল ইংরেজের সহায়। মাঠে মাঠে প্রচুর শস্য—জাঠ কৃষকদের সন্তোষের সীমা নেই। কোন রকম বিপ্লবে এই শস্য-সম্পদ বিনষ্ট হয়, এ তারা চায় না। তাই তারা লাঙল, কোদাল ও কাস্তে হাতে করে বিদ্রোহীদের আসার পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে রইলো সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য। কিন্তু বিদ্রোহীরা কেউ এলো না। তাদের বদলে লাহোর থেকে এলো কিছু ইংরেজ সৈন্য। গোবিন্দগড় রক্ষার জন্তে তাদের পাঠান হয়েছিল। অমৃতসরের রাজপুরুষেরা আশ্বস্ত

হলেন। রাত্রিশেষে লাহোরের সাহায্যকারী সৈন্যদল এসে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করল। গোবিন্দগড়ের দুর্গ আপাতত নিরাপদ।
লাহোর ও অমৃতসর নিরাপদ।

কিন্তু অন্যান্য স্থানের সেনানিবাসে আরো হাজার হাজার সিপাহী রয়েছে। বিশেষ করে দুটি বিপজ্জনক স্থান হলো ফিরোজপুর ও ফিলোর। এই দুটো জায়গাতেই ছিল গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম। ফিরোজপুরের ম্যাগাজিনে প্রচুর বারুদ ও গুলি-গোলা। আবার এই দুই স্থানেই ইংরেজ সৈন্য ছিল মুষ্টিমেয়, সিপাহীরাই সংখ্যায় বেশী। ফিলোর ও ফিরোজপুরের সিপাহীদের ওপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মেছিল। প্রতি মুহূর্তেই বিপ্লবের আশঙ্কায় এই দুই জায়গায় ইংরেজেরা বিচলিত হয়েছিল।
১২ই মে, রাত্রিবেলা।
মিরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ সংবাদ নিয়ে একজন বার্তাবহ লাহোর থেকে ফিরোজপুরে এসে পৌঁছল।
ব্রিগেডিয়ার ইনস্ তখন ফিরোজপুর সেনানিবাসের অধ্যক্ষ লাহোরের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হবে—এ সংবাদও তিনি পেলেন। এখানকার সিপাহীদের মনের ভাব জানবার জন্যে ব্রিগেডিয়ার অকসন প্যারেডের অনুষ্ঠান করলেন। কাওয়াজের প্রশস্ত মাঠে সিপাহীরা এসে দাঁড়াল। মিরাট-দিল্লীর সংবাদে তারা উত্তেজিত ছিল। প্যারেডে তারা তাই খুব বেশী উৎসাহ দেখাল না। বিমর্ষ গম্ভীর মুখ সিপাহীদের দেখে অভিজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার বুঝলেন ব্যাপার সুবিধাজনক নয়। সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লবের আভাস পেয়ে ইংরেজরা আতঙ্কে শিউরে উঠল—ফিরোজপুর বুঝি দ্বিতীয় মিরাটে পরিণত হয়। সেই দিন রাত্রেই কৌশলে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা সাব্যস্ত হলো। ঠিক হলো, সবাইকে এক সঙ্গে নিরস্ত্র না করে, দলে দলে ভাগ করে ছাউনির দূরবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে নিরস্ত্র করা হবে। সাতান্ন নম্বর পল্টনের সিপাহীরা দ্বিরুক্তি না করে অস্ত্র পরিত্যাগে সম্মত হলো; কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল পঁয়তাল্লিশ নম্বরের সিপাহীরা। অধিনায়কের আদেশ অমান্য করে তারা বাজারের ভেতর দিয়ে চলে গেল।

বাজারের লোকজনের মুখেও তখন বিপ্লবের আলোচনা। তাদের মুখে ঐ কথা শুনে সিপাহীরা আগের চেয়ে বেশী সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সামান্য ফুৎকারেই যেমন আগুন জলে ওঠে, তেমনি বিদ্রোহী সিপাহীদের মন এই সব নানা কথায় মুহূর্তমধ্যে উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়ে উঠল। বাজার দিয়ে যাবার সময় অদূরে ইংরেজ সৈন্য ও গোলন্দাজদের অস্ত্রাগারের সামনে সমবেত দেখে, তারা চেঁচিয়ে ওঠে—বিশ্বাসঘাতক। তখনি তারা নিজেদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করে ছুটলো অস্ত্রাগারের দিকে।

ফিরোজপুর বিদ্রোহী হলো।

ইংরেজ প্রমাদ গণল।

ফিরোজপুরের এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক কেয়ি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো: "অস্ত্রাগারের বাহিরের অংশ তেমন সুরক্ষিত ছিল না। উহার পরিখা জলশূন্য ছিল। সুতরাং সিপাহীরা সহজে পরিখা উত্তীর্ণ হইল, প্রাচীরে উঠিল এবং উহার ভিতরে প্রবেশ করিল। যে গৃহে অস্ত্রাদি থাকিত, তাহা ছয় ফুট উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ইংরেজ সৈন্যরা উহার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা এই সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল। সৈন্যদলের অধ্যক্ষ আহত হইলেন। ইতিমধ্যে আরো ইংরেজ সৈন্য অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। সিপাহীদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত হইল। অস্ত্রাগার রক্ষা পাইল। কিন্তু সৈনিক-নিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুসাধ্য হইল না। অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্যদ্বারা দুই দিক রক্ষা করে চলে না। সুতরাং অবিলম্বে বাজারে ও সিপাহী ব্যারাকে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। উত্তেজিত জনসাধারণ বাজারে লুঠতরাজ করিতে লাগিল, সৈনিকনিবাসে য়ুরোপীয় অফিসারদিগের বাংলো, ভোজনগৃহ, গির্জা প্রভৃতি বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে উত্তেজিত জনতার ভয়াবহ কোলাহল এবং গগনব্যাপী ধোঁয়ার স্তূপ ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ব্যতীত আর কিছু দেখা যাইতেছিল না বা শুনা যাইতেছিল না।...যখন রাত্রি প্রভাত হইল তখন ব্রিগেডিয়ার বুঝিলেন অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে—সিপাহীদিগকে আর বশীভূত রাখা যাইবে না। অস্ত্রাগারের চারিদিকে বিদ্রোহী সিপাহীর দলে দলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। শীঘ্রই বুঝিতে পারা গেল যে তাহারা অস্ত্রাগার আক্রমণ করিবে। ব্রিগেডিয়ার অস্ত্রাগার বিনষ্ট করিবার

আদেশ দিলেন। অবিলম্বে আদেশ কার্যে পরিণত হইল। বজ্রধ্বনির দুই বার দুই স্থানে ভয়ানক শব্দ উঠিল। ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার উড়িয়া গেল।"

বিদ্রোহীরা বিজয়গর্বে পতাকা উড়িয়ে দিল্লীর পথে যাত্রা করল।

কয়েক দল ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য দুটো কামান নিয়ে তাদের অনুসরণ করল। জনশূন্য জঙ্গলের মধ্যে সিপাহীরা আশ্রয় নেয়। ইংরেজ সৈন্যরা সেখানে পর্যন্ত তাদের তাড়া করে। কতক ধরা পরে, কতক পালিয়ে দিল্লীতে গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়।

জলন্ধর ও লুধিয়ানার মাঝখানে ফিলোর।

এখানেও একটি প্রসিদ্ধ সেনানিবাস ছিল। এখানকার দুর্গও সুদৃঢ়। দিল্লী যাবার বড় রাস্তার ওপারেই দুর্গটি অবস্থিত। ফিলোর সম্বন্ধে তাই মণ্টগোমারির দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল। ফিলোর দুর্গে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ। স্যর জন লরেন্সের মতে ফিলোরের দুর্গ পাঞ্জাবের চাবী। কিন্তু আর সব জায়গার মতন এই চাবিটি সুরক্ষিত ছিল না। যুদ্ধের অনেক উপকরণ এখানে ছিল বটে, কিন্তু তা রক্ষা করবার মতন উপযুক্ত ইংরেজ সৈন্য ছিল না। দুর্গের অনতিদূরে সেনানিবাস। সেখানে ছিল তিন নম্বর পদাতিক দল। মিরাটের সংবাদ টেলিগ্রাফে জলন্ধর হয়ে লাহোর যায়। বিপ্লবের আশঙ্কায় ফিলোরের ইংরেজরা বিচলিত হয়ে ওঠে—প্রতি মুহূর্তেই তাদের ভয়, এই বুঝি সিপাহীরা আক্রমণ করতে আসছে। তবু ইংরেজ সেনানায়ক আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন। সিপাহীদের অজ্ঞাতসারে জলন্ধর থেকে একদল ইংরেজ সৈন্য ফিলোরে নিয়ে আসা হয়। ইংরেজ সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পালা করে দুর্গের দরজায় পাহারা দিতে লাগল। কেউ কেউ প্রাচীরে উঠে অদূরবর্তী সৈনিক নিবাসে সিপাহীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সৈনিক নিবাস শান্তিপূর্ণ রইল। দুর্গেও কোন গোলমাল হলো না। নিরুদ্বেগে রাত কেটে গেল।

ফিলোর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে জলন্ধর।

পাঞ্জাবের আর একটি সেনানিবাস।

পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সব রকম ইংরেজ সৈন্যই এখানে ছিল। জনরব শোনা গেল জলন্ধরের সিপাহীরা তিন নম্বর পদাতিক দলের সঙ্গে মিলে ফিলোর দুর্গ আক্রমণের মতলব করছে। কামান ও অন্যান্য অস্ত্র লুঠ করবে, এমন পরিকল্পনাও তাদের আছে। প্রথমে সিপাহীদের নিরস্ত্র করার কথা হয়, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোন আপত্তি করেন। তিনি এই যুক্তি দিলেন যে, জলন্ধরের আশেপাশে ছোট ছোট যেসব সেনানিবাস আছে সে-সব জায়গায় শুধু দেশীয় সৈন্যই আছে। এখানকার সিপাহীদের যদি নিরস্ত্র করা হয়, তাহলে হোসিয়ারপুর, কাঙারা, নুরপুর ও ফিলোরের সিপাহীরা দলে দলে জলন্ধরে এসে পৌঁছবে এবং তাদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হবে।
মণ্টগোমারি তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাঁর আশঙ্কা জলন্ধরের আশেপাশে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। এই সঙ্কট সময়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ল কর্পূরতলার ওপর। তিনি কপুরতলার মহারাজা রণধীর সিংহের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। এগার বছর আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন জলন্ধর দোয়াব অধিকার করেন, তখন কর্পূরতলা রাজ্যের কিছু অংশ তাঁরা গ্রহণ করেন। কর্পূরতলার তরুণ অধিপতি রণধীর সিংহ ইংরেজদের সাহায্য করতে বিমুখ হলেন না। তিনি অবিলম্বে পাঁচ শো সৈন্য ও দুটো কামান জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনারের হাতে সমর্পণ করলেন। শুধু কর্পূরতলা নয়, পাঞ্জাবের চারদিকে ইংরেজেরা যখন বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে এমনি করে বিপন্ন, তখন ঝিন্দ, নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতির রাজারা তাঁদের নানা প্রকারে সাহায্য করে রাজভক্তির পরিচয় দেন। বিঠুরে বসে নানাসাহেব কর্পূরতলার এই রাজভক্তির সংবাদে বিস্মিত হলেন। পাঞ্জাবের দেশীয় নৃপতিদের ওপর তাঁর অনেকখানি ভরসা ছিল। বিদ্রোহ আরম্ভ হলে তাঁরা এগিয়ে আসবেন, তাঁদের সৈন্যরা বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবে—এই ছিল তাঁর আশা। রণধীরের রাজভক্তি নানাসাহেবের সেই আশা নির্মূল করে দিল। নিষ্ফল আক্রোশে তিনি শুধু বলে উঠলেন—অপদার্থ শিখ!

॥ সতেরো ॥

সুবিস্তৃত পঞ্চনদের প্রান্তভাগে পেশোয়ার।

ভারতের শেষ সীমান্ত শহর। এই দুর্গম গিরিপথ দিয়ে কতবার হানা দিয়েছে বিদেশী দস্যুদল।

পাঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এই পেশোয়ার সেদিন, বিদ্রোহের সূচনায়, ইংরেজের বিশেষ উদ্বেগের বিষয় ছিল। উদ্বেগের প্রধান কারণ—সেই সময়ে এইখানে প্রচুর দেশীয় সৈন্য ছিল। পেশোয়ার বিভাগে তখন য়ুরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা আড়াই হাজার আর ভারতীয় সৈন্য দশ হাজার। দুর্ভাবনার বিষয় বৈ কি। সৈনিক নিবাসের সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে সঞ্চিত অজস্র যুদ্ধোপকরণ—উদ্বেগের দ্বিতীয় কারণ।

এই শহর আগে ছিল যুদ্ধপ্রিয় আফগানদের অধিকারে। রণজিৎ সিংহ এবং পরে ফুলসিংহের অসামান্য পরাক্রমে আফগানদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়ারে শিখদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তারপর ইতিহাস-বিধাতার নেপথ্য বিধান রণজিৎ সিংহের পঞ্চনদে নিয়ে এল ঘোরতর পরিবর্তন— পাঞ্জাব হলো বৃটিশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত। পাঞ্জাবের সঙ্গে পেশোয়ারও এল ইংরেজের অধিকারে এবং এইখানে তারা স্থাপন করল একটা সুরক্ষিত সেনানিবাস। তবু পেশোয়ার পেশোয়ার। আফগানদের বীরত্বের নিদর্শন— তাদের অতীত প্রাধান্যের পরিচায়ক। সিন্ধুনদ থেকে চল্লিশ মাইল এবং খাইবার গিরিসঙ্কট থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত এই শহর ইংরেজ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হলেও, আমাদের অধিবাসীরা আচারে-ব্যবহারে— সর্ব বিষয়েই আফগানিস্থানের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে চলত এবং এর সর্বাংশ ব্যেপে ছিল আফগানিস্থানের কঠোর পার্বত্য প্রকৃতি। শহরের রাজপথের দুধারে গাছের সারি। বেদানা, আঙুর, কিসমিস প্রভৃতি

পেশোয়ারের বাজারে সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রী হয়। শহরের অধিবাসীদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে আফগান ঐতিহ্যের পুরোদস্তুর ছাপ।

পেশোয়ারের সেনানিবাসটি আয়তনে প্রকাণ্ড। এর প্যারেডের মাঠে ছ'হাজার সৈন্যের স্থান সঙ্কুলান হয়। চারদিক প্রাচীরবেষ্টিত। ক্যান্টনমেন্টের রাস্তাগুলো শ্রেণীবদ্ধ সরল রেখার মত। য়ুরোপীয় অফিসারদের ব্যারাকগুলো লাল রঙের আর সিপাহীদের ব্যারাক মাটির প্রাচীরে ঘেরা, ঘাস দিয়ে ছাওয়া ঘর। শহরের অধিবাসী বেশীর ভাগই মুসলমান। তারপর সীমান্তভাগেই দুর্ধর্ষ ও লুণ্ঠনপ্রিয় পার্বত্য জাতি। একদিকে দশ হাজার সিপাহী, অন্যদিকে এরা—পেশোয়ার সেনানিবাসের পক্ষে কম উদ্বেগের বিষয় নয়। এছাড়া, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আশঙ্কার আরো একটা বিষয় ছিল। গিরিসংকটের বাইরে কাবুল ও কান্দাহার। আফগানেরা সেখানে বাস করে। আমীর দোস্ত মহম্মদ যদিও এখন অর্থের বিনিময়ে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ, তবু পেশোয়ারের স্মৃতি তাঁর মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। নওশেরার রণক্ষেত্রে রণজিৎ সিংহের হাতে পরাজয়ের বৃত্তান্ত আজো আমীরের স্মৃতিপটে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। পেশোয়ারের উপত্যকায় শিখের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে কত আফগান বীর প্রাণ হারিয়েছে—সে-বেদনার স্মৃতি কী সহজে বিস্মৃত হওয়া যায়? আফগানিস্থানের সেই অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ পতাকা পেশোয়ারের বুকে আবার সগৌরবে উড়বে—এমন দুরন্ত কল্পনা যে দোস্ত মহম্মদ মাঝে মাঝে করেন না—তাই বা কে বলতে পারে? কাজেই আমীরের সম্বন্ধেও ইংরেজ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল সেদিন।

ঐতিহাসিক মেলিসন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "পেশোয়ারে যদি যুগপৎ সিপাহীরা আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াইত, আমীর যদি আক্রমণ করিতেন এবং পার্বত্য জাতিরা তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিত, তাহা হইলে সেই উপত্যকা প্রদেশে ইংরেজের অস্তিত্ব থাকিত না।...উত্তেজিত সিপাহীদের সহিত মুসলমানদিগের সমুত্থানে পেশোয়ার উপত্যকায় ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইত। আমরা তাহার প্রতিকূলে কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিতাম না। পেশোয়ার আমাদের অধিকারের বাহিরে চলিয়া যাইত এবং সেই সঙ্গে পাঞ্জাবও বৃটিশ কোম্পানীর অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত।"

তাই সেদিন পেশোয়ারের ওপর সকলের দৃষ্টি পড়েছিল।

উত্তর ভারতের অধিবাসীরা এই সীমান্ত শহরের কথা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল। তেমনি ব্যগ্র ছিল পাঞ্জাবের শিখেরা।
কারো সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হলে পরস্পরে জিজ্ঞাসা করত—পেশোয়ারের খবর কি ?
এই প্রশ্নের একটা বিশেষ হেতু ছিল। কাবুল ও কান্দাহারের পাঠানেরা তখন সজাগ ছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অর্থের বিনিময়ে কাবুলের আমীরের বন্ধুত্ব ক্রয় করেছিলেন। তবু আমীরের মনে ছিল গুপ্ত অভিলাষ। একদা পেশোয়ার ছিল তারই রাজ্যের অন্তর্গত। ইংরেজ অধিকার করেছে সেই পেশোয়ার। যুদ্ধ করে তা পুনরধিকার করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা। অনুকূল সুযোগে আমীরের এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়, এ-কথা কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ জানতেন। আমীরও বুঝতে পেরেছেন, ভারতের চারদিকে ইংরেজের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে বা করতে উদ্যত। এই এক সুযোগ। এমন সুযোগ আর শীঘ্র ঘটবে না। আমীরের শ্যেন দৃষ্টি তাই তখন ছিল পেশোয়ারের ওপর। তাই লোকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—পেশোয়ারের খবর কি ?
কেননা সবাই জানত যে, পেশোয়ার যদি ইংরেজের হাতছাড়া হয়, তাহলে সমস্ত পাঞ্জাবই তাকে হারাতে হবে। পঞ্চনদের অদৃষ্টচক্র সেদিন পেশোয়ারের সঙ্গে এমনি ভাবেই সংযুক্ত ছিল।
আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পেশোয়ার বিভাগের দায়িত্ব ছিল কমিশনার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস এবং তাঁর সহকারী কর্ণেল নিকলসনের ওপর। দুজনেই সামরিক ও বেসামরিক কার্যে পারদর্শী। ব্রিগেডিয়ার সিডনী কটন ছিলেন সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ।
১২ই মে দিল্লীর সংবাদ এলো পেশোয়ারে।
সহসা এই বিপ্লবের সংবাদে এডওয়ার্ড ও নিকলসন স্থির থাকতে পারলেন না। এমন কি, সেনাপতি রীড ও ব্রিগেডিয়ার কটন পর্যন্ত ঐ সংবাদে চিন্তিত হলেন। পেশোয়ারের অদূরে ছিলেন নেভিল চেম্বারলেন নামে একজন সুদক্ষ সৈনিকপুরুষ। ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত সংকটকালে পেশোয়ার রক্ষার মন্ত্রণা জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। অনতিবিলম্বেই চেম্বারলেন এলেন পেশোয়ারে। ওদিকে রাওলপিণ্ডি থেকে স্যর জন লরেন্স কমিশনারকে তারযোগে জানালেন—পেশোয়ার সম্পর্কে তিনি যেন খুব সতর্ক থাকেন।

এডওয়ার্ডস লিখে পাঠালেন—"রাজ্যের সকল স্থান শত্রুদের হস্তগত না হইলে, আমরা পেশোয়ার হারাইব না, অথবা পেশোয়ারকে হারাইতে হইবে না। মধ্যবর্তী অপরাপর স্থানে অধিক পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করিতে পারিলে এই সীমান্ত শহর অবশ্যই নিরাপদ থাকিবে। এখানকার সিপাহীরা আপাতত শান্ত। একটি বিষয় আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার ও নিকলসনের মত এইরূপ যে, পাঞ্জাবের যে যে স্থানে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে ও যে যে স্থানে আজিও ঘটে নাই, তাহার মধ্য কেন্দ্র লাহোরে উপযুক্ত সংখ্যক য়ুরোপীয় সৈন্য ও কিছু বিশ্বাসী দেশীয় সৈন্য স্থাপন করিলে ভালো হয়। সৈন্যরা সেখান হইতে যে কোন স্থানে যাত্রা করিতে অবিলম্বে সঙ্গীন তুলিয়া প্রস্তুত থাকিবে। সিপাহীদের মধ্যে যে অসন্তোষ নাই তাহা নহে, তবে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, সেই অসন্তোষ যাহাতে দূর হয়, তাহার উপায় নির্ধারণ করা কর্তব্য।"

১৩ই মে। সেনাপতি রীডের ভবন।

শাসন-বিভাগের ও সমর-বিভাগের প্রধান কর্মচারীদের আজ এখানে একটি মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হলো।

সভায় ঠিক হলো, উপস্থিত গোলযোগের সময়ে পাঞ্জাবের শাসন-বিভাগ ও সমর-বিভাগের কর্মচারীরা এক জায়গায় থাকবেন এবং বর্ষীয়ান্ সেনাপতি রীড প্রদেশীয় সমস্ত সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হবেন। তিনি সর্বদাই চীফ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবেন। স্যর জন লরেন্স ও সেনাপতি রীড দুজনে একমতানুসারে কাজ করবেন। কেননা, এই সঙ্কট সময়ে সৈন্য শাসনকর্তা ও রাজ্য শাসনকর্তার মধ্যে মতের বা কাজের অনৈক্য বাঞ্ছনীয় নয়। আর একটি প্রস্তাবে ঠিক হলো যে, একটা অস্থায়ী সৈন্যদল গঠন করা দরকার। যখন যেখানে সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে, তখনই ঐ দল সেইখানে গিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। আটকের খেয়াঘাটে [illegible]একজন বিশ্বাসী পাঠানকে পাহারার কাজে রাখার কথাও হলো।

[illegible] মে। স্থান—রাওলপিণ্ডি। কমিশনার স্যর জন লরেন্সের ভবন।

[illegible]শোয়ারের মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে এলেন সেনাপতি রীড, [illegible] চেম্বারলেন, হার্বার্ট এডওয়ার্ডস প্রভৃতি। স্যর জন যেমন

দূরদর্শী তেমনি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন। বর্তমানকে অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টি যেমন ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত ছিল, তেমন পাঞ্জাব ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দিল্লী পর্যন্ত। এমন কি, পঞ্চনদে অবস্থান করে তিনি সমগ্র ভারতের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। সেনাপতি হিউয়েট যেমন মিরাটে থেকে মিরাটের নিরাপত্তার কথাই চিন্তা করেছিলেন, স্যর জন ঠিক তার বিপরীত আচরণ করলেন। তাঁর কার্যপ্রণালী একটা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ ছিল না। পাঞ্জাবের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন না। তিনি তাই সর্বাগ্রে দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বিদ্রোহের পরিস্থিতি আলোচনা করে প্রথমেই তিনি বললেন—আমার সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দূরবীন দিয়ে দিল্লীর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। দিল্লী আজ অবরুদ্ধ। এর মানে ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মর্যাদা একেবারে মাটিতে মিশিয়ে গেছে। আমার দায়িত্ব দুটি—প্রথম, দিল্লী উদ্ধার করা, দ্বিতীয়, পাঞ্জাবে বিদ্রোহ যাতে প্রসার লাভ না করতে পারে সেই চেষ্টা করা। লাহোর-অমৃতসর-পেশোয়ার সম্পর্কে আমরা যতই চিন্তা-ভাবনা করি না কেন, অবরুদ্ধ দিল্লীর কথা আমাদের বেশী করে ভাবতে হবে। পাঞ্জাবে যত সৈন্য পাওয়া যায়, তাদের দিল্লী পাঠান দরকার। আশা করি, এ বিষয়ে আপনাদের দ্বিমত নেই।

রীড। নিশ্চয় না। শুধু দিল্লী কেন—সমস্ত ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে আমরা কৃতসংকল্প।

স্যর জন। দ্যাট্স্ লাইক এ ট্রু জেনারেল। পাঞ্জাবের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা যেমন সচেতন থাকব, পাঞ্জাবের বাইরের কথাও আমরা তেমনি চিন্তা করব এবং সুবিধা হলে অন্যত্র সৈন্য পাঠাবার—বিশেষ করে দিল্লীতে, ব্যবস্থা করতে হবে। কি বলেন, ব্রিগেডিয়ার কটন?

কটন। এ বিষয়ে আমরা আপনার সঙ্গে একমত, স্যর জন।

এডওয়ার্ডস। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, পাঞ্জাব সম্পর্কে যেমন, দিল্লী সম্পর্কেও আমাদের সমান দায়িত্ব। বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র দিল্লী। মুসলমানেরাই সেখানে বিদ্রোহীদের মুরুব্বি ও পরিচালক।

স্যর জন। সেইজন্যেই তো আমি দিল্লী রক্ষা করতে ব্যগ্র। মোগল-রাজধানীতে আজ আবার মোগলের পতাকা উড়েছে, সেখানে আমাদের

প্রাধান্য অবলুপ্ত—এই কথা আপনারা সর্বক্ষণের জন্যে মনে রাখবেন। দিল্লী উদ্ধারের জন্যেই পাঞ্জাবের সৈন্য দরকার।

চেম্বারলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের অবস্থা দিন দিন যেরকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে আমরা এখনই বাইরে খুব বেশী সৈন্য পাঠাতে পারব কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, সীমান্তের দুরন্ত পাঠানেরা দিন দিন যেরকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তাতে এখানে যদি অল্প সৈন্য রাখা যায়, তাহলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে।

স্যর জন। ইউ আর পারফেকট্‌লি রাইট, চেম্বারলেন। য়্যাট দি সেম টাইম উই কান্‌ট্‌ ইগনোর ডেল্‌হি। (আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু তাই বলে আমরা দিল্লী সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না।)

শেষ পর্যন্ত রাওলপিণ্ডি কাউন্সিলে ঠিক হলো যে, আত্মবলবৃদ্ধির জন্যে আফগানদের সাহায্য নিতে হবে এবং তাদের দিয়ে একটা অভিনব সৈন্যদল গঠন করতে হবে। গভর্ণর-জেনারেলের কাছে এই বিষয়ের প্রস্তাব করে স্যর জন লরেন্স লিখলেন—"আমার এই প্রস্তাবে আপনি হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাঞ্জাবের শিখেরা কখনো পূর্বভারতের সিপাহীদের সহিত হাত মিলাইবে না। শিখ ও মুসলমানের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ, আমরা তাহারই সুযোগ লইব। এদিকে দিল্লীর মোগলদের সঙ্গে আফগানদেরও তেমন সহানুভূতি নাই। মোগল-আফগানের পূর্ব-ইতিহাস আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। আমার বিশ্বাস শিখ ও আফগান, কেউই মোগলের প্রাধান্য নাশ করিতে সিপাহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ঔদাস্য বা অসম্মতি প্রকাশ করিবে না। আশা করি, আপনি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন।"

লর্ড ক্যানিং এই প্রস্তাবের অনুমোদন করলেন।

এই নূতন সৈন্যদল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও আটঘাট বাঁধা হলো। পুলিশের দল বৃদ্ধি করা হলো। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের খেয়াঘাটে ও অন্যান্য স্থানে প্রহরী রাখা হলো। ধনাগার রক্ষার সুবন্দোবস্ত হলো। দেওয়ানী বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হলো। বিপক্ষ সন্দেহে তাঁরা সবাইকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে পারবেন। এলাহাবাদের পুনরুক্তি পাঞ্জাবেও হলো। নানা বিধিনিষেধের মধ্যে জনসাধারণের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠল।

অন্যদিকে বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয়েরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।
পাঞ্জাবের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহকে পরিপুষ্ট করে তোলার সকল কাজই তাঁরা গভর্ণমেণ্টের অলক্ষ্যে করছিলেন। মিরাট-দিল্লীর অভ্যুত্থানকে সর্বভারতীয় করে তোলার জন্যে তাঁরাও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নিঃশব্দে কাজ করছিলেন। অমৃতসরের শিখ সর্দার রাজা সাহেব দয়াল এই সম্পর্কে নানাসাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। ফকীরের বেশে বিদ্রোহীরা ব্যারাকে প্রবেশ করে সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করছিল। উদাসীন ভ্রমণকারীর বেশেও পূর্বভারতের বহু বিদ্রোহী-নেতা এই সময়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাসে গিয়ে সিপাহীদের সঙ্গে আসন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। ক্যাণ্টনমেণ্টের বাজারে বাজারে নৈশমন্ত্রণা সভা বসত এবং সেখানে জনসাধারণের মধ্যেও পাঞ্জাবের বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা হতো। এইসব প্রস্তুতি এমনই গোপনে চলেছিল যে, ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে থেকেও ইংরেজ অফিসাররা তার কিছুই টের পান নি। এমন কি, উত্তেজিত মুসলমানেরা দূরবর্তী স্থান থেকে পাঞ্জাবের সিপাহীদের ধর্মরক্ষার জন্যে দলবদ্ধ হতে পত্র লিখেছিল। এইসব চিঠিপত্রের কিছু কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। সেইসব চিঠিতে লেখা ছিল যে, ফিরিঙ্গিরা নানাভাবে ভারতবাসীর ধর্মনাশের চেষ্টা করছে। এইসব চিঠি থেকেই গভর্ণমেণ্টের ধারণা হয় যে, বিপ্লব ক্রমে সংক্রামক হয়ে উঠছে। চর্বিটোটার সূত্র ধরে জাতিনাশ ও ধর্মনাশের জোর প্রচারকার্য এই সময়ে পাঞ্জাবের সিপাহীদের মধ্যে চলেছিল। তাদের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ ইংরেজদের মনে সেদিন গভীর আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল।

ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল নিকলসনের আবেদন গেল পার্বত্যজাতির সর্দারদের প্রতি।
অভিনব এই আবেদন। ইংরেজদের রক্ষার জন্যে আজ তাদের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সতেরো বছর আগের ঘটনা তাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। সেদিন পার্বত্যপ্রদেশের সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে আফগানদের হাতে ইংরেজদের পরাজয় ঘটেছিল। তারা উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে সিপাহীদের কার্য পর্যবেক্ষণ করছিল। তাই অনেক সাধ্যসাধনা ও অনুরোধের পর তারা সাড়া দিল।

২১শে মে। সময়—রাত্রিবেলা। স্থান—পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট।

এডওয়ার্ডস্ ও নিকলসন এক বাংলোয় থাকেন। দুজনেই বিনিদ্রভাবে দুশ্চিন্তার অবসর যাপন করছেন। তাঁরা প্রতিমুহূর্তেই বিদ্রোহের আশঙ্কা করছিলেন—বুঝি রাত্রি শেষ হতে না হতেই সিপাহীরা তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কেন না, সিপাহীদের ব্যারাকের সামনে কামানসহ ইংরেজসৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এই কার্যপ্রণালী দেখে তাদেরও মন গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তার ওপর মিরাট ও দিল্লীর সংবাদে তারাও মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে। গভীর রাত্রে নিকলসন ও এডওয়ার্ডস্ যখন চিন্তার আবেগে আন্দোলিত হচ্ছিলেন, তখন নৌশেরা থেকে একজন সংবাদবাহক এলো। পেশোয়ার থেকে চব্বিশ মাইল দূরে নৌশেরা। সে এসে জানাল যে, সেখানকার পঞ্চান্ন নম্বর পলটনের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে।

তখনি ব্রিগেডিয়ার কটনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো যে পেশোয়ারের সিপাহীদের নিরস্ত্র করে পার্বত্য প্রদেশের লোকদের সৈনিকদলে নেওয়া উচিত। পাঁচ দল সিপাহীর মধ্যে চার দলকে নিরস্ত্র করা হবে ঠিক হলো। একুশ নম্বর পল্টন অনেক দিনের, এই দলের সিপাহীদের বিশ্বাস করা চলে। মুহূর্তের বিলম্বে মহা অনিষ্ট হতে পারে। যেসব সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করা হবে, ব্রিগেডিয়ার কটন তখনি তাদের অধিনায়কদের ডেকে পাঠালেন। আগে থেকেই তিনি সিপাহীদের দুইটি পৃথক স্থানে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সিপাহীরা তাদের অধিনায়কদের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হলো। অদূরে দাঁড়িয়ে রইল সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্য। তারা একে একে নীরবে ও ধীরভাবে বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রাখল, মাথা নত করে, ইউনিফর্ম থেকে একে একে সামরিক চিহ্ন খুলে ফেললো, বীরত্বের পরিচায়ক মেডেলগুলো খুলে ফেললো—প্যারেডের মাঠে এইসব সামগ্রী স্তূপাকার হয়ে জমা হলো। নিরস্ত্র সিপাহীরা নিঃশব্দে ব্যারাকের দিকে চলে গেল। পার্বত্যজাতির লোকেরা ইংরেজের পরাক্রম দেখে মুগ্ধ হলো। তারা ইংরেজের সৈন্যদলে যোগ দিতে আর আপত্তি করল না। কিছু সিপাহী ক্ষোভে ও ভয়ে ব্যারাক ছেড়ে দূরবর্তী জঙ্গলে বা পর্বতের নিকটস্থ লোকালয়ে চলে গেল। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হলেন। নিরস্ত্র সিপাহীরা যদি পার্বত্যজাতির সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে মুস্কিল।

কেননা, তাদের কাছে যথেষ্ট অস্ত্র আছে, সিপাহীরা সেই অস্ত্র কাজে লাগাতে পারে। একদল সৈন্য ছুটল তাদের ধরবার জন্যে। অনেকে ধরা পড়ল, অনেককে আবার পল্লীবাসীরা ধরিয়ে দিল। সেনাপতির হুকুম ভিন্ন সেনানিবাস পরিত্যাগ করা অপরাধ। সামরিক বিচারালয়ে তাদের বিচার হলো। বিচারে একান্ন নম্বর পল্টনের সুবাদার দিগ্বিজয় সিংহের ফাঁসি হলো। একজন হাবিলদার ও একজন সিপাহীরও কারাদণ্ড হলো। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুবাদারকে সকলের সামনে ফাঁসি দেওয়া হলো। কমিশনার তখন স্যর জন লরেন্সকে এক ডেসপ্যাচে লিখলেন—"পেশোয়ারের বেশীর ভাগ সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হইয়াছে। পেশোয়ার আপাতত নিরাপদ।"

এরপর ঠিক হলো পঞ্চান্ন নম্বর পলটনের সিপাহীদেব নিরস্ত্র করা হবে। এরা থাকত নৌশেরাতে। সেখান থেকে তাদের হোটিমরদানে যাবার আদেশ দেওয়া হয় এবং বেশীর ভাগ সিপাহী সেখানে চলে যায়। নৌশেরার তখন খুব কম সেনানিবাসে সিপাহীর ছিল। এরাই বিদ্রোহী হয়ে মরদানে সিপাহীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। ২১শে মে-র শেষ রাত্রে নৌশেরার এই বিদ্রোহের খবর পেশোয়ারে পৌছল, সে কথা আগেই বলেছি। হোটিমরদানে প্রায় হাজারখানেক সিপাহী ছিল। পেশোয়ার থেকে কমিশনার এডওয়ার্ডস এদের নিরস্ত্র কববার আদেশ দিলেন এবং ২৩শে মে রাত্রিবেলায় একজন য়ুরোপীয় ক্যাপ্টেনের অধীনে কয়েকজন ইংরেজ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যকে মরদানে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে দিলেন আটটা কামান। কর্ণেল হেনরী স্পটিশউড হোটিমরদানের সেনানিবাসের অধিনায়ক। তাঁর অধীনস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী—কমিশনারের এই কথার তিনি প্রতিবাদ করলেন। তিনি এডওয়ার্ডসকে লিখে পাঠালেন—"এখানকার সিপাহীদের সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। আমার অধীনস্থ সিপাহীদের আমি যেমন জানি, আপনারা তেমন জানেন না। বরং এইভাবে সন্দেহের বশবর্তী হইয়া সিপাহীদের নিরস্ত্র করিলে, আমরা তাহাদের আনুগত্য হারাইব। আমি এই নীতি সমর্থন করি না। আমার বিশ্বাস আপনার এই নীতি পাঞ্জাবের সিপাহীদের বিদ্রোহের পথে ঠেলিয়া দিতেছে।"

কর্ণেলের এই প্রতিবাদ নিষ্ফল হলো।

২৪শে মে। সিপাহীদের একজন নেতা এসে স্পটিশউডকে জিজ্ঞাসা করে—কর্ণেল সাহেব, পেশোয়ার থেকে ইংরেজ সৈন্য আসার কারণ কি? কর্ণেল সবই জানতেন। সিপাহীদের আশ্বস্ত করবার মতন কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না। সিপাহীরা অসন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেল। মর্মান্তিক দুঃখে কর্ণেল নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। এই কর্ণেল সিপাহীদের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর এই আত্মহত্যা মরদানের সিপাহীদের মনে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তারা আর স্থির থাকতে পারল না। দুর্গপ্রাচীরের ওপরে দাঁড়িয়ে তারা দেখলো পেশোয়ার থেকে ইংরেজ সৈন্য আসছে। বিক্ষুব্ধ এবং বিচলিত সিপাহীরা হাতের কাছে যা পেল—গোলা-গুলি, টাকা, ইউনিফর্ম—তাই-ই নিয়ে সোয়াটের অভিমুখে দৌড়ল। দিল্লী তাদের গন্তব্য স্থল। কিন্তু দিল্লী অনেক দূর। সমগ্র পাঞ্জাবের এখানে ওখানে হাজার হাজার ইংরেজ সৈন্য। তাদের ভেতর দিয়ে পথ করে পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়। তার ওপর তাদের পেছনে তাড়া করে আসছে নিকলসনের বিপুল বাহিনী। পলাতক সিপাহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। পর্বত ও অরণ্যে গন্তব্য পথ দুর্গম। সারাদিনের পর বিদ্রোহীরা যে যে পল্লীতে আশ্রয় নিলো, নিকলসনের সৈন্যরাও সেই সেই পল্লীতে উপস্থিত হলো। অনেকে ধৃত ও বন্দী হলো, অনেকে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল। অনেকে আহত হয়ে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আর্তনাদ করতে লাগল। একদল সিপাহী বিচ্ছিন্ন হয়ে সোয়াটের দিকে যায়। সোয়াটের বৃদ্ধ রাজা তাদের স্বধর্মী, সুতরাং তাঁর কাছে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। দুরারোহ পর্বত ও দুর্গম অরণ্য অতিক্রম করে এসে তারা পৌঁছল সোয়াটে। কাতর কণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করল। বৃদ্ধ রাজা সে-প্রার্থনা শুনলেন না। বিদ্রোহীরা সোয়াটে আশ্রয় না পেয়ে চললো কাশ্মীরের দিকে। তারা ভেবেছিল কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিংহ তাদের আশ্রয় দেবেন। হাজরার প্রান্তভাগ দিয়ে কাশ্মীরে যেতে হয়। বিদ্রোহীরা দেখল সেপথ অবরুদ্ধ। গিরিসঙ্কট অতিক্রমের উপায় নেই। বিপন্ন সিপাহীরা ছুটল কোহিস্তানের পথে—কিন্তু সর্বত্রই সশস্ত্র সৈন্য তাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে। চারদিকে সমুন্নত পর্বত, আশ্রয়স্থল অপরিচিত; যেদিকেই যায় সেদিকেই সশস্ত্র লোকের তাড়না। তার ওপর খাদ্যের অভাব, প্রবল বৃষ্টি আর দুরন্ত হিম। তবু বিদ্রোহীরা অবনত হলো না।

বিদ্রোহীরা তবু অগ্রসর হয়। সর্বত্রই তারা অবরুদ্ধ, আক্রান্ত ও নিপীড়িত হতে লাগল। পথেই কতজনের মৃত্যু হলো। যে কজন অবশিষ্ট ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে অদৃষ্টের কাছে মাথা নত করল। তাদের কেউ ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল, কেউ কামানের গোলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পঞ্চান্ন নম্বর পলটনের সেই বিদ্রোহীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যেভাবে বীরত্ব প্রকাশ করে প্রাণ দিয়েছিল, ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। নিকলসনের বিপুল সৈন্য ও অস্ত্রবলের বিরুদ্ধে এবং সবরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হোটিমরদানের সেই কয়েক শত সিপাহীর বীরত্ব—সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়। এদের বীরত্ব-গৌরব মহাকালের রূঢ় হস্তাবলেপেও বিলুপ্ত হবার নয়।

স্থান—পেশোয়ার। সময়—১০ই জুন, সকালবেলা।

হোটিমরদানের বিদ্রোহী সিপাহীদের একশো কুড়িজন বন্দীর মধ্যে চল্লিশ-জনকে প্রকাশ্যে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হলো। এর আগে ৩রা জুন, একান্ন নম্বর পলটনের পলাতক সিপাহীদের মধ্যে বার জনকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সীমান্তের দুরন্ত জাতিরা ইংরেজের এই পরাক্রম দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়; অনেকে বন্দুক-তলোয়ার নিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ইংরেজ এক ঢিলে দুই পাখী বধ করল।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কেয়ি লিখেছেন: "পঞ্চান্ন নম্বর পলটনের ১২০জন সিপাহী ইংরেজদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। বিদ্রোহী হইলেও ইহারা একটি ইংরেজকেও হত্যা করে নাই। সুতরাং তাহাদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া ন্যায়পরতার অবমাননা হইয়াছে।"

পেশোয়ারে যখন বিদ্রোহী সিপাহীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন জলন্ধরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। জলন্ধর দুর্গের সিপাহীদের ওপর কর্তৃপক্ষের গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল। ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোন ছিলেন এখানকার সেনানিবাসের অধ্যক্ষ আর মেজর লেক ছিলেন জলন্ধর বিভাগের কমিশনার। কমিশনার চাইলেন সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে, জনষ্টোন রাজী হলেন না। তিনি বললেন, হিতে বিপরীত হতে পারে। ইতিমধ্যে ফিলোর ও জলন্ধরের সিপাহীদের মধ্যে সাংকেতিক লিপির বিনিময় চলেছে কর্তৃপক্ষের অগোচরে।

সমগ্র জলন্ধর দোয়াবের সিপাহীদের অভ্যুত্থান হবে একদিনে, একসঙ্গে এবং একই সময়ে—এই ছিল বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা। তাদের প্রস্তুতি চলছিল সেই ভাবে। অবরুদ্ধ দিল্লীর সাহায্যের জন্য প্রচুর সামরিক উপকরণে পূর্ণ একখানা 'সীজ্ ট্রেন পাঠান হবে দিল্লীতে—বিদ্রোহীরা এ-সংবাদ পেল। ঠিক হলো জলন্ধর ও লুধিয়ানার পথে সেই ট্রেনখানা ধ্বংস করা হবে। কিন্তু সে-কাজ করতে গেলে পূর্ব নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে তা করতে হয় এবং তা করলে বিদ্রোহীদের প্রত্যাসন্ন অভ্যুত্থান সম্পর্কে ইংরেজ সজাগ হবার সুযোগ পাবে। সে সুযোগ তারা ইংরেজকে দিতে নারাজ। তাই বিদ্রোহীরা ট্রেন ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে বিরত হলো।

৭ই জুন। রাত্রিবেলা।

জলন্ধরের সেনানিবাসের অধিনায়কের বাংলোয় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল।

চারদিক ভৈরব কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হলো। -

বিপ্লবতরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে উঠল জলন্ধর।

"কর্ণেল সারকা কোঠি মে আগ্‌লাগা হ্যায়"—বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ সারা ক্যাণ্টনমেণ্টে ছড়িয়ে পড়ল। ভীত সন্ত্রস্ত অফিসারেরা প্যারেডের মাঠের দিকে ছুটলেন, ভয়বিহ্বলচিত্তে মহিলারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে যাবার উদ্যোগ করলেন। চারদিকের ভয়াবহ কোলাহলে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। দেখতে দেখতে সমগ্র ক্যাণ্টনমেণ্ট দুলে উঠল। কিন্তু জলন্ধরের সিপাহীদের হত্যাকাণ্ডের কোন অভিপ্রায় ছিল না, দিল্লী যাবার জন্যেই তারা তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। গভীর রাত্রে বিদ্রোহীরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল। ফিলোর ও হোসিয়ারপুরের সিপাহীদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তাদের ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন অশ্বারোহী ফিলোরের সিপাহীদের সংবাদ দেবার জন্যে আগে ছুটে যায়। পরের দিন সকালে জলন্ধরের পলাতক সিপাহীদের বাধা দেবার জন্যে ব্রিগেডিয়ারের আদেশে একদল ইংরেজ সৈন্য রওনা হলো। সিপাহীরা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, অনুসরণকারি সৈন্যরা সারাদিন তাদের কোন উদ্দেশ না পেয়ে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে ফিলোরের সিপাহীরা দুর্গ পরিত্যাগ করে জলন্ধরের পলাতক সৈন্যদের সঙ্গে যখন এসে মিলিত হলো, তখন বিদ্রোহীরা শতদ্রুর অপর পারে উত্তীর্ণ হবার আয়োজন করছিল। লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর সহকারী জলন্ধর ও

ফিলোর দুর্গের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে তখনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করতে ছুটেছিল। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা শতদ্রুর তীরে এসে উপস্থিত হলেন এবং পারাপারের সেই সেতুটি ভেঙে ফেললেন। একদিকে লুধিয়ানা, অপরদিকে ফিলোর ও জলন্ধর, মধ্যে শতদ্রু নদ। শতদ্রু-তীরে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে পারলে, পেছন থেকে ইংরেজ-সৈন্য নিশ্চয়ই এসে পড়বে, এমন অনুমান করলেন লুধিয়ানার কমিশনার। তবু অবস্থা সঙীন বুঝে এবং লুধিয়ানায় একটি য়ুরোপীয় সৈন্য নেই জেনে, তিনি নাভার রাজাকে অবিলম্বে উপযুক্ত সৈন্য-সাহায্য পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। রাজভক্ত নাভার রাজা দুটো ছ পাউণ্ডের কামান, দু'দল পদাতিক ও কিছু অশ্বরোহী সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাই নিয়ে ডেপুটি কমিশনার শতদ্রু-তীরে জলন্ধরের বিদ্রোহীদের বাধা দেবার আয়োজন করলেন।

নৌসেতু ভেঙে ফেলাতে বিদ্রোহীরা শতদ্রুর চার মাইল উজানে গিয়ে, নদী যেখানে সংকীর্ণ হয়েছে, সেইখানে পার হবার উদ্যোগ করল। প্রায় এক হাজার দুশো সিপাহী এইভাবে শতদ্রু উত্তীর্ণ হলো। লেফটেনাণ্ট উইলিয়মসের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য সেইখানে তাদের গতিরোধ করতে উদ্যত হলো। পথ দুর্গম, জায়গায় জায়গায় বালি ও খাদ—ইংরেজ সৈন্যের পৌঁছতে দেরী হলো। শতদ্রুর তীরে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে বিদ্রোহীদের ঘোরতর যুদ্ধ হলো। দু'ঘণ্টা ধরে দুই পক্ষে যুদ্ধ হলো। ইংরেজের কামান ছিল, সেই কামান থেকে মুহুর্মুহু গোলা বৃষ্টি হতে লাগল। বিদ্রোহীরা বন্দুকের গুলিতে তার জবাব দিল। নাভার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। ইংরেজের শিখ সৈন্য পরিশ্রান্ত। তাদের গুলি বারুদ একেবারে নিঃশেষিত। নিরুপায় ইংরেজ সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিলেন। শতদ্রুর তীর তখন নিশীথ রাত্রের চাঁদের কিরণে উদ্ভাসিত। বিদ্রোহীরা বিজয়গর্বে ছুটল লুধিয়ানার দিকে।

পরদিন মধ্যাহ্নের পুর্বেই বিদ্রোহীরা নগরে প্রবেশ করল।

লুধিয়ানা দুর্গের সিপাহীরা তাদের স্বাগত জানাল।

নগরের জনসাধারণ এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হলো।

মুহূর্তমধ্যে সমগ্র লুধিয়ানা বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবে পরিপুর্ণ হয়ে উঠল। কোনদিক থেকেই কোন সাহায্যকারী সৈন্য এসে পৌঁছল না। নগরমধ্যে বহু জাতির সমাবেশ—কাবুলী, কাশ্মীরী ও গুজার প্রভৃতি অনেক

প্রচুর লোক বিভিন্ন ব্যবসায় উপলক্ষে লুধিয়ানায় বাস করত। এরা সবাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হলো এবং একযোগে লুঠতরাজাদি নানা উপদ্রব আরম্ভ করে দিল। মুসলমান গুজারেরা একজন মৌলভির উত্তেজনায় ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। লুধিয়ানার এই বিদ্রোহ-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক চার্লস্ বল লিখেছেন : "কাবুলীরা নগর লুণ্ঠন কার্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রভাণ্ডার, রসদ ভাণ্ডার ও ধনভাণ্ডার বিলুণ্ঠনে, মার্কিন মিশনারীদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনে, গির্জা ও অট্টালিকা দাহনে, মুদ্রাযন্ত্রের ধ্বংস সাধনে এবং কোন্ বাড়িতে সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজের হিতৈষী লোকেরা বাস করে তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে, কাশ্মীরীরাই অগ্রবর্তী হইয়াছিল। সকলেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিয়া লুণ্ঠন কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা জেলখানার কয়েদীদের মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের যাহা কিছু সম্পত্তি, ইংরেজদের যাহা কিছু সম্পত্তি সবই বিনষ্ট হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা যাহা লইয়া যাইতে পারে নাই তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। ক্যাণ্টনমেণ্টের আস্তাবল হইতে ঘোড়া, খচ্চর পর্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়াছিল। শহরের ব্যবসায়ীরা টাকা দিয়া, জিনিস দিয়া বিদ্রোহীদের সাহায্য করিয়াছিল। আড়তদারগণের আড়ত হইতে আটা, ময়দা, চাল, ডাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। লুধিয়ানায় ইংরেজের প্রাধান্য, ক্ষমতা ও আধিপত্য কিছুকালের জন্য বিদ্রোহীদের পরাক্রমে পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল।"

ইতিমধ্যে জলন্ধরের বিদ্রোহী সিপাহীরা লুধিয়ানায় এসে পৌছল।

লুধিয়ানার উত্তেজিত জনসাধারণ তাদের স্বাগত জানাল।

লুধিয়ানার বিদ্রোহীরা লুঠতরাজের অতিরিক্ত কিছু করে নি। রাত্রিকালে তারা দিল্লীর দিকে যাত্রা করল। পাঞ্জাবের কমিশনার স্যর জন লরেন্স যেমন দিল্লী উদ্ধারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, পাঞ্জাবের বিদ্রোহী সিপাহীরাও তেমনি দিল্লীর বিদ্রোহকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্যে অধীর হয়েছিল। তাদের দখলে কামান বন্দুক সবই ছিল, নগরের বহুলোক তাদের স্বপক্ষে ছিল ; মনে করলে তারা অনায়াসেই লুধিয়ানার দুর্গ অধিকার করতে পারত। কিন্তু তখন তাদের মন দিল্লীর দিকে। তাই তারা আর সময় নষ্ট না করে সগৌরবে মোগলের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করল।

॥ আঠারো ॥

অবরুদ্ধ দিল্লী এখন বিদ্রোহের কেন্দ্র।

অবরুদ্ধ দিল্লী এখন লর্ড ক্যানিং-এর দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয়।

এক মাস আগেও বণিক কোম্পানী দিল্লী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ছিলেন। বাদশাহী তক্তে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ—মোগল-বংশের শেষ সম্রাট। নামেই বাদশাহ, আসলে তিনি ছিলেন ইংরেজের হাতের পুতুল—সর্বক্ষমতা-বর্জিত কোম্পানীর নিতান্ত করুণার পাত্র। বিদ্রোহীরা তাঁকেই আজ ভারত-সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে। সুনীল সলিলা স্রোতস্বতী যমুনার তীরে সুরম্য সৌধাবলীপূর্ণ সেই রমণীয় দিল্লী নগরী আজ একটা বিভীষিকাময় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ইংরেজের রক্তে মোগল-রাজধানীর রাস্তা লাল হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং কলকাতায় বসে তাই দিল্লীর কথা না ভেবে পারছেন না। বিদ্রোহ দিকে দিকে বিস্তার লাভ করছে, তবু তাঁর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আজ দিল্লীর ওপর নিবদ্ধ। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সকলের আগে দিল্লীকে অবরোধ-মুক্ত করতে ব্যগ্র এবং ব্যস্ত। বার বার তিনি পাঞ্জাবের কমিশনার স্যর জন লরেন্সকে লিখছেন—অবিলম্বে দিল্লী উদ্ধারের আয়োজন করুন। পাঞ্জাব থেকে যত পারেন সেখানে সৈন্য পাঠান। কোম্পানীর মানমর্যাদা, আধিপত্য—সব কিছু নির্ভর করছে দিল্লীর অবরোধ মোচনের ওপর। কমিশনার লরেন্সও কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি ইতিমধ্যেই কর্নেল ডেলিকে প্রচুর সৈন্য ও রণসম্ভার দিয়ে দিল্লীতে পাঠিয়েছেন মিরাট-আম্বালার সৈন্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। এই সম্মিলিত অভিযানের ফলাফলের জন্যে সারা ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজপুরুষেরা সেদিন উদ্বিগ্ন ছিলেন।

রাওলপিণ্ডি বৈঠকে ঠিক হয় যে অবরুদ্ধ দিল্লীর সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য পাঞ্জাব থেকে পাঠান হবে। প্রধানত সীমান্তের যুদ্ধকুশল লোকদের নিয়ে এই সৈন্যদল গঠন করা হলো। এই দলের সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন কর্ণেল ডেলি। নৌশেরা, আটক হয়ে ডেলি তাঁর সৈন্যদলসহ রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে যথারীতি আদেশ ও উপদেশ নিয়ে তিনি দিল্লী যাত্রা করলেন। পরবর্তী বর্ণনা আমরা ডেলির বিবরণ থেকেই বলি :

"১লা জুন আমি সসৈন্যে লুধিয়ানায় পৌঁছিলাম। ৪ঠা জুন আম্বালায় এবং ৬ই জুন কর্ণালে উপস্থিত হইলাম। দিল্লীর দুইজন পলাতক ইংরেজের সঙ্গে এইখানে আমার সাক্ষাৎ হইল। নিকটবর্তী কয়েকখানা গ্রামের লোকেরা বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়াছিল এবং পলাতক ইংরেজদের জিনিসপত্র লুঠ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহার প্রতিফল দিবার জন্য ইংরেজ দুইজন আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের ব্যগ্রতা আমি অনুভব করিলাম, কিন্তু অল্প লোকের অপরাধের জন্য সমস্ত লোকের সর্বনাশ সাধন করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমার তখন শীঘ্র শীঘ্র দিল্লীতে পৌঁছিবার আগ্রহ। অবশেষে আমি ইংরেজ দুইজনের পীড়াপীড়িতে আমার সৈন্যদলকে গ্রামধ্বংস করিবার হুকুম দিলাম। গ্রামবাসীরা ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। পলাতকদের মধ্যে অনেকেই সৈন্যদের হস্তে নিহত হইল, কতক বন্দী হইল। সৈন্যরা গ্রাম জ্বালাইতে আরম্ভ করিল, ঘরে ঘরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অন্য গ্রামের লোকেরা অনেক দূর হইতে সেই অগ্নিশিখা দেখিতে পাইয়াছিল।....এই ব্যাপারে দিল্লী যাইতে একদিন বিলম্ব হইল। ভারতবর্ষের দারুণ গ্রীষ্মকালে আমাদের এই বাহিনী পেশোয়ার হইতে দিল্লী পর্যন্ত ৫৮০ মাইল পথ বাইশ দিনে অতিক্রম করিয়াছিল। আমরা বদ্‌লি-সরাই শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্র ইংরেজ সেনাদলে আনন্দসূচক জয়ধ্বনি উঠিল।"

বদ্‌লি-সরাইয়ের যুদ্ধের পর সেনাপতি হেনরি বার্ণার্ড দিল্লীর চার জায়গায় সৈন্য স্থাপন করেছিলেন। রাওভবন, ফ্ল্যাগষ্টাফ টাওয়ার, এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা ভগ্নপ্রায় মসজিদ এবং মানমন্দির—এই চার স্থানে তিন হাজার ইংরেজ সৈন্য ও বাইশটা কামান নিয়ে সেনাপতি বার্ণার্ড মাসাধিককাল অপেক্ষা করছেন। এখন তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলো পাঞ্জাব থেকে আগত কর্ণেল

[illegible] প্রথম যে সৈন্যদল মিরাট ও আম্বালা থেকে দিল্লী [illegible] [illegible] সমবেত হয়েছিল, প্রথম যুদ্ধের পর তাদের বসতিস্থান পার্বত্য [illegible] থেকে সমতল ভূখণ্ডের এই চার স্থানে প্রসারিত হয়েছিল।

নগরপ্রান্তে একটি উচ্চভূমি—দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা ছোট্ট পাহাড়। এরই ওপর বার্ণার্ড তাঁর শিবির স্থাপন করেছিলেন। নগরের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'রাওভবন'—সুরম্য সুপ্রশস্ত প্রাসাদ; রাওভবনের অদূরে সুদৃশ্য ফ্ল্যাগষ্টাফ টাওয়ার। বিদ্রোহীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের সুবিধে হবে বলে বার্ণার্ড ঐ চার স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করেছিলেন। প্রত্যেক জায়গায় কামান স্থাপিত হয়েছিল। আমরা যে সময়ের ইতিহাস বলছি, তখন দিল্লী শহরের চারদিকে অনেকগুলি পল্লী ছিল। সমসাময়িক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই সব পল্লীর ভিতর দিয়ে কয়েকটি রাস্তা গিয়েছিল। "পল্লীগুলির কোথাও ভগ্নপ্রায় বা, কোথাও বা বাস করবার উপযুক্ত বাড়ি, কোথাও প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান, কোন স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণী, কোন স্থানে কর্ষিত শস্যক্ষেত্র, কোন স্থানে বা অস্বাস্থ্যকর পল্বল ছিল। রাওভবনের অনতিদূরে, কর্ণালগামী প্রশস্ত পথের মধ্যে সব্‌জীমণ্ডী নামক সুদৃশ্য পল্লী। পল্লীর বাইরে ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান, নিবিড় নিকুঞ্জ, প্রাচীরবেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা প্রভৃতিতে শোভিত প্রশস্ত, সমতল ক্ষেত্র খালের পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল।"

দিল্লীর চারদিকে সাত মাইলব্যাপী প্রাচীর। প্রাচীরের উচ্চতা চব্বিশ ফিট এবং এর পাশেই ছিল একটি গভীর পরিখা। আগেই বলেছি, প্রাচীরবেষ্টিত দিল্লী নগরীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল দশটি প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথগুলির অন্যতম কাবুল দরওয়াজা। সবজীমণ্ডির অদূরে প্রশস্ত রাজপথের পাশে কৃষ্ণগড়, ত্রিবেলিয়নগঞ্জ, পাহাড়ীপুর প্রভৃতি পল্লী কাবুল দরওয়াজার দিকে প্রসারিত ছিল। সুনীল যমুনার তটে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ একটি দুর্গের মতন অবস্থিত। এই সময়ে দিল্লীতে ছিল মিরাট ও দিল্লীর পাঁচ দল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী ও একদল গোলন্দাজ সৈন্য। এ ছাড়া ফিরোজপুর, ঝাঁসি, হিসার ও মথুরা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক সিপাহী দিল্লীতে এসে বিদ্রোহী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। গোলাগুলি, বারুদ ও রসদ তাদের ছিল অপর্যাপ্ত। বিদ্রোহীদের সংখ্যার তুলনায় ইংরেজদের সৈন্য সংখ্যা অল্পই ছিল। ইংরেজ সেনাপতি যদিও নিরাপদস্থানে শিবির সন্নিবেশিত করেছিলেন, যদিও তাঁর সৈন্যদের

ছাউনিগুলি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সুরক্ষিত হয়েছিল, তবু দিল্লী অধিকারের পক্ষে জেনারেল বার্ণার্ডের আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। ইংরেজ সৈন্য যেমন দুরতিক্রম্য স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছিল, সিপাহীরাও তেমনি সুদূর বিস্তৃত বিশাল নগরের মধ্যে থেকে, ইংরেজদের কাছে তাদের পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ প্রতীক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে রাওলপিণ্ডি থেকে সেনাপতি রীড এসে বার্ণার্ডের সৈনাপত্যের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

১৫ই জুন প্রধান সেনাপতির শিবিরে দিল্লী আক্রমণ সম্পর্কে একটা সভা বসল। সৈনিক প্রধানেরা সেই সভায় যোগ দিলেন। প্রথমেই জেনারেল বার্ণার্ড বললেন, "শহর যেমন সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত তেমনি বহুসংখ্যক সশস্ত্র সৈনিকে সুরক্ষিত। তোরণে তোরণে কামান সাজিয়ে তারা আমাদের গতিরোধ করবার আয়োজন করেছে। তার ওপর আমাদের সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধের উপকরণ এত কম যে তাতে দিল্লী উদ্ধার করা সুসাধ্য নয়। অন্ততঃ আরো এক হাজার সৈন্য না আসা পর্যন্ত নগর আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে ভীষণ দুঃসাহসের কাজ হবে।" তখন অন্যতম প্রধান সেনাপতি রীড বললেন, "কিন্তু আমরা যত দেরী করব, বিপক্ষেরা তত উৎসাহ পাবে। মনে করুন প্রথম আক্রমণে আমরা যদি বারুদ দিয়ে এক সঙ্গে লাহোর ও কাবুল তোরণ উড়িয়ে দিই এবং কাশ্মীর তোরণের সিপাহীদের ওপর জোর আক্রমণ চালাই, তাহলে কি রকম হয়?" ব্রিগেডিয়ার উইলসন বললেন, "এই ভাবে ওদের আক্রমণ করায় বিপদ আছে। সহসা নগর আক্রমণ করতে হলে শিবিরে যত সৈন্য আছে, তাদের প্রায় সকলকেই নিযুক্ত করতে হয়, তাতে আমাদের শিবির এক রকম অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। সুতরাং সাহায্যকারী সৈন্যদের প্রতীক্ষা করাই উচিত।"

শেষ পর্যন্ত নগর আক্রমণে বিরত থাকাই ঠিক হলো। কেননা, সাত হাজার বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে দু'হাজার সৈন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। দিল্লীর প্রচণ্ড গরমে ইংরেজ শিবিরে রোগের প্রাদুর্ভাব হতে লাগল। সৈনিকদলে বিসূচিকা দেখা দিল। সেনাপতি চিন্তিত হলেন। এদিকে নানাস্থান থেকে বন্যার তরঙ্গের মতো বিদ্রোহী সিপাহীরা ক্রমাগত দিল্লীতে এসে উপস্থিত হচ্ছে। বিদ্রোহীরা ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে অধীর হয়ে ওঠে। ইংরেজ সৈন্যরা যখন সময়ের প্রতীক্ষায় কালহরণ করছিল, বিদ্রোহীরা তখন

নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারা রাত্রিকালে দলে দলে বের হয়ে যেখানে যেখানে ইংরেজের সেনানিবাস, সেই সব জায়গায় হানা দিয়ে আক্রমণের সুযোগ খুঁজত। রাওভবন, গোলঘর, মানমন্দির, মসজিদ প্রভৃতি আক্রমণের উপায় চিন্তা করত। মেটকাফ্ হাউসের ইংরেজ সৈন্যদের ওপর বিদ্রোহীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এখানকার ইংরেজদের ওপর মুসলমান সিপাহীদের ভীষণ রাগ। কথিত আছে, এইখানে সম্রাট হুমায়ুনের একটি পালিত পুত্রের সমাধি হয়েছিল। মুসলমানেরা সেই স্থানকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। সেই পবিত্রস্থানে খ্রীস্টান ফিরিঙ্গী বাস করছে—এ তাদের কাছে অসহ্য। একদিন রাত্রিতে বিদ্রোহীদের কয়েকজন মেটকাফ্ হাউস আক্রমণ করল। তাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে ইংরেজসৈন্য সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হলো।

দিন যায়। সৈন্যের প্রতীক্ষায় প্রধান সেনাপতি অস্থির।

১৯শে জুন। সূর্যাস্তের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের শিবিরের পার্শ্ব ভাগ আক্রমণ করল। কামানের প্রচণ্ড গোলায় ইংরেজসৈন্যরা বিব্রত হয়। ক্রমে সূর্য অস্তগত হলো। গাঢ় অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ইংরেজসৈন্যরা অন্ধকারে গোলাবর্ষণ করতে থাকে—সে সব গোলা বিদ্রোহীদের ওপর পড়ে না, পড়ে তাদের নিজেদের ওপর। কিছুক্ষণ পরে গোলাবৃষ্টির বিরাম হলো। বিদ্রোহীরা নগরে ফিরে গেল। ইংরেজপক্ষের কুড়িজন হত ও সাতাত্তর জন আহত হলো। কর্ণেল ডেলি ও ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্ট আহত হলেন। প্রধান সেনাপতি চিন্তিত হলেন। তাঁর ভরসাস্থল পাঞ্জাব। প্রতি মুহূর্তেই তিনি পাঞ্জাব থেকে সাহায্যকারী সৈন্যদের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। দিল্লী উদ্ধার করতে এসে তাঁরা নিজেরাই যেন দিল্লীর সামনে একরকম অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। এমন কি, দূরদেশ থেকে সমাগত বিদ্রোহীদের প্রবেশপথও অবরুদ্ধ করবার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

২২শে জুন। প্রায় একহাজার সৈন্য আর পাঁচটা কামান এল পাঞ্জাব থেকে। সঙ্গে সঙ্গে জলন্ধর ও ফিলোর থেকেও বহু অশ্বারোহী এবং পদাতিক সিপাহী মোগলের রাজধানীতে এসে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করল। পরের দিন। সকাল বলো। বিদ্রোহীদের শিবিরে সকাল থেকেই তুমুল উত্তেজনা। উত্তেজনার কারণ পলাশি যুদ্ধের পর আজ একশো বছর পূর্ণ হলো। একশ

বছর আগে এই দিনে ইংরেজ ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর আজ একশো বছর পরে, এক নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। বিদ্রোহের সূচনাতেই ভারতের প্রায় সর্বত্রই সন্ন্যাসী ও ফকির, মৌলবি ও মোল্লা—সকলেই জনসাধারণ ও সিপাহীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন যে, হিন্দুস্থানে ফিরিঙ্গীদের আধিপত্য একশো বছরের বেশী থাকবে না। শতবর্ষ পরে তাদের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হবে। তেইশে জুন পলাশি যুদ্ধের একশো বছর পূর্ণ হলো। দিল্লীর বিদ্রোহীদের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী আগে থেকেই প্রচারিত হয়েছিল। প্রত্যেক সিপাহী এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উৎসাহিত হয়ে, এই শুভ দিনটির প্রতীক্ষা করছিল। দিল্লীর হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী একসূত্রে বাঁধা পড়েছিল। তাই পলাশি যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিনটি বিদ্রোহীরা এমনি যেতে দিল না। তেইশে জুন দিল্লীর আকাশের পূর্বপ্রান্তে যখন দেখা দিল সূর্যের রক্তিমাভা, তখনই বিদ্রোহীদের মনে সঞ্চারিত হলো এক নতুন উত্তেজনার, এক নতুন আশার। সেদিন আবার রথযাত্রা। হিন্দুর পবিত্র পর্ব। আর আকাশ প্রান্তে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ মুসলমানদের কাছে বহন করে নিয়ে এল এক মঙ্গলবার্তা। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মনেই তাই পলাশিযুদ্ধের স্মৃতি আজ জাগিয়ে তুললো এক নতুন উদ্দীপনার। আশায় ও উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বিদ্রোহীরা বের হলো লাহোর তোরণ দিয়ে দলে দলে। নজফগড়ের খালের ওপর একটা সেতু ছিল। সিপাহীরা সেইখান দিয়ে একটা কামান নিয়ে এল। ইংরেজদের ব্যূহের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। কিন্তু ইংরেজরা আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করে ঐ সেতুটা ভেঙে ফেলেছিল। কাজেই বিদ্রোহীরা সেতুপথে আর অগ্রসর হলো না। তারা তখন সব্জীমণ্ডীতে সমবেত হয়ে, ইংরেজ-শিবিরের দক্ষিণভাগ আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের প্রবল পরাক্রমের মুখে ইংরেজ সৈন্য বিব্রত হয়ে উঠল। তাদের কামান থেকে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি হতে লাগল। পাঞ্জাবের নতুন সৈন্যরা এগিয়ে আসে। দুই পক্ষে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। এগার ঘণ্টা যুদ্ধের পর সবজীমণ্ডী ইংরেজদের অধিকারে এল। সন্ধ্যার পূর্বে সিপাহীরা নগরে ফিরে গেল। আজকের যুদ্ধে তাদের জয়লাভ হলো না বটে, কিন্তু তারা যে রকম সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিলো, তা ইংরেজ সেনাপতি রীড পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

ইংরেজদের জয়লাভ হলো সত্য, কিন্তু তাদের দুশ্চিন্তার বিরাম ছিল না। স্যর জন লরেন্স আরো কিছু সৈন্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু সংখ্যায় বিদ্রোহীরা এখনো অনেক বেশী। তবু দিল্লী দখলের আশায় ইংরেজ সৈন্যের উৎসাহের অন্ত ছিল না। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের উৎসাহ ত কম নয়।

২৮শে জুন সেনাপতি বার্ণার্ড স্যর জন লরেন্সকে লিখলেন: "দিল্লী এখনো মহাসঙ্কটাপন্ন। বিদ্রোহীরা বার বার আমাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে, অল্প সৈন্য লইয়া আমি তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছি না। আশা করি, অতি শীঘ্রই আরো অধিক সৈন্য সাহায্য আসিবে। দিল্লীর ফটক ভাঙিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করা অনেকেরই পরামর্শ। সৈন্যবল অধিক না পাইলে আমি কিন্তু সাহস পাইতেছি না। বিদ্রোহীদের কামান আমাদের কামান অপেক্ষা অধিক কার্যক্ষম, সেই কারণে সহসা নগর আক্রমণে আমার অনিচ্ছা।"

২রা জুলাই রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহের নায়ক বখৎ খান প্রচুর সিপাহী ও লুণ্ঠিত ধনসম্পদ নিয়ে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনে রাজধানীতে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হলো। এই প্রসঙ্গে মেটকাফ্ নামক জনৈক ইংরেজ তাঁর দিনালিপিতে লিখেছেন: "রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমন উপলক্ষে যমুনার সেতুটি মেরামত করা হইল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বাদশাহ রোহিলখণ্ডের সিপাহীদের দেখিতে লাগিলেন। তাহারা তখনো কিছু দূরে ছিল। ২রা জুলাই রাজধানীর বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে লইয়া নবাব আহমদকুলি খান রোহিলখণ্ডের সিপাহীদের অভ্যর্থনা করিলেন। হাকিম আহ্সানউল্লা খান, জেনারেল সামাদ খান, ইব্রাহিম আলি খান প্রভৃতি দিল্লীর বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয়েরা সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহীদের অধিনায়ক মহম্মদ বখৎ খান সম্রাটের প্রতি তাঁহার আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন এবং যখন তিনি বাদশাহের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন বাহাদুর শাহ বলিলেন—"জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করে, তাহাদের জীবন ও ধনসম্পদ নিরাপদে থাকে এবং আমাদের শত্রু ইংরেজদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়—ইহাই আমাদের অন্তরের ইচ্ছা।"

তারপর দিল্লীর বিদ্রোহী নায়করা বখৎ খানকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসহ সৈনাপত্যে বরণ করলেন। সম্রাট তাঁকে একখানি ঢাল ও তরোয়াল দিলেন এবং প্রধান

সেনাপতি হিসাবে নির্বাচিত করলেন। যুবরাজ মির্জা মোগল এ্যাডজুটান্ট-জেনারেল নির্বাচিত হলেন। বখৎ খান তাঁর সঙ্গে রোহিলখণ্ড থেকে নিয়ে এসেছিলেন চার দল পদাতিক, সাতশো অশ্বারোহী আর ছয়টি কামান। বখৎ খান যখন দিল্লীর বিদ্রোহীদের পরিচালনা করবার ভার নিলেন তখন রাজধানীতে সিপাহীদের সংখ্যা বিশ হাজার। তিনি বিশেষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিদ্রোহের প্রয়োজনীয় সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন। ৪ঠা জুলাই দিল্লী বিদ্রোহের নূতন প্রধান সেনাপতি বখৎ খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করলেন।

দিন যায়।

যত সহজে দিল্লী উদ্ধার করা যাবে ইংরেজেরা ভেবেছিলেন, কর্মক্ষেত্রে নেমে তাঁরা দেখলেন যে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। পাঞ্জাব থেকে প্রচুর সৈন্য, অস্ত্র ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিতে স্যর জন লরেন্স যদিও কার্পণ্য করেন নি, তবু দিল্লীর অবরোধ-মোচনে তাঁর আশা সফল হয়নি। জুন শেষ হয়ে গেল—তবু দিল্লীর কোন কিনারা হলো না। বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে এর প্রতিক্রিয়া জেনারেল বার্ণার্ড সহজেই অনুমান করেছিলেন। তিনিও উদ্বিগ্ন চিত্তে দিল্লী উদ্ধারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দিবারাত্র তাঁর সহকর্মিদের সঙ্গে এ-বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছিলেন এবং সিপাহীদের বারবার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হলেও, তিনি নিজের ওপর বিশ্বাস হারান নি। বয়সের তুলনায় তাঁর উদ্যম ও উৎসাহ ইংরেজ সৈন্যদলে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল অসাধারণ। তাই তিনি এক চিঠিতে পাঞ্জাবের কমিশনারকে লিখেছিলেন: "বরং আমি পদত্যাগ করিব, তথাপি নামে কলঙ্ক রাখিয়া যাইব না।" উদাসীনভাবে দীর্ঘকাল দিল্লীর কাছে থাকবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। দিল্লী তাঁর চিন্তার সমগ্র বিষয় হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাব থেকে সাহায্যকারী সৈন্য এসেছিল বটে, কিন্তু সেনাপতি বার্ণার্ড তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত মনে করলেন না। তাঁর সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাঁর যুদ্ধোপকরণ অল্প—তাই তিনি আশানুযায়ী ফললাভ করতে পারেন নি। এতবড় গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর—অথচ দিল্লী-উদ্ধারের কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন সময়ে ৫ই জুলাই, সকাল দশটায় বিসূচিকা রোগে তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হলো। প্রধান সেনাপতির মৃত্যুতে ইংরেজ শিবিরে গভীর নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এলো।

সেনাপতি রীড প্রধান সেনাপতি হলেন। দিল্লী-উদ্ধারের সূচনাতেই দুজন প্রধান সেনাপতি প্রাণ হারালেন।

আরো একমাস কেটে গেল। দিল্লী উদ্ধার হলো না।

সেনাপতি রীড সসৈন্যে দিল্লীর কাছে রইলেন বটে, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে রীড পদত্যাগ করলেন। ইংরেজ শিবিরের চতুর্থ সেনাপতি হলেন জেনারেল উইলসন। ইতিমধ্যে ঝাঁসি, রাজপুতনা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে আরো অনেক উত্তেজিত সিপাহী দিল্লীতে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের বারম্বার আক্রমণে ইংরেজ সৈন্যরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের কুড়িবার সংঘর্ষ হলো। বিদ্রোহী-শিবিরে যেমন উদ্যম ও উৎসাহ, তেমনি নৈরাশ্য ও বিপদ ইংরেজ শিবিরে। ইংরেজ সৈন্যদের দিনে বিশ্রাম ছিল না, রাত্রে ঘুমও ছিল না।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা আরম্ভ হলো।

ইংরেজ শিবিরে কষ্টের একশেষ।

সৈন্যদের পরিচ্ছদ সব ভিজে গেল, তাঁবু ভিজে গেল। নিরুৎসাহে তারা সুরার আশ্রয় নেয়। সুরার সাহায্যেই তারা মনের অবসাদ ও অশান্তি দূর করতে চেষ্টা করে। বর্ষার জলস্রোতের মত পান-স্রোত অবাধে ইংরেজ শিবিরে প্রবাহিত হতে লাগল। প্রমত্ত ইংরেজ ও খালসা সৈন্যরা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে লাগল। সেনাপতি উইলসন ভাবলেন, এমন অবস্থায় বিদ্রোহীদের সম্মুখে থাকা সম্ভব নয়।

নগর আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। শিবির স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও হলো।

৩০শে জুলাই উইলসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর কলভিনকে লিখলেন: "বিদ্রোহীদিগের আক্রমণে বাধা দিতে আমি দৃঢ়সংকল্প। যেরূপে হউক শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অনেক। তাহারা আমাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া আমাদিগকে পর্যুদস্ত করিতে পারে। শুনিতেছি যে নিকলসনের তত্ত্বাবধানে আরো একদল সাহায্যকারী সৈন্য দিল্লী আসিতেছে। আমরা যদি তাহাদের উপস্থিতি পর্যন্ত আমাদের অধিকৃত স্থান রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিরাপদ হইব।"

দিন যায়।

দিল্লীর ইংরেজ শিবিরে উৎকণ্ঠার সীমা নেই।

ভারতের অন্যান্য স্থানের ইংরেজদের সংবাদ পাবার জন্যে এখানকার ইংরেজেরা সর্বদাই উৎকন্ঠিত।

কানপুর অবরুদ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ উত্তেজিত সিপাহীদের আক্রমণে শৃঙ্খলাশূন্য। মধ্য ভারতবর্ষ, রাজপুতনা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রধান প্রধান স্থান প্রচণ্ড বিপ্লবের রণক্ষেত্র। সেইসব স্থানে কি ঘটেছে, বিদ্রোহীরা এইসব স্থানে কি ক্ষমতা পেয়েছে, বিপন্ন ইংরেজরা কি ভাবে এইসব স্থানে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তা জানবার জন্যে দিল্লীর শিবিরের ইংরেজদের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু সংবাদ পাবার কোন উপায়ও ছিল না। তখন সারা ভারতবর্ষে রেলপথ ছিল সামান্যই। টেলিগ্রাফের তারও সর্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে ছিল না। গভর্ণর-জেনারেল কলকাতায়। দিল্লীর সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। সহজ পথে সংবাদ আদান-প্রদানের কেনো উপায় নেই। দিল্লীর সঙ্গে কলকাতার সংস্রব নেই। বিদ্রোহীরা প্রায় সর্বত্রই সংবাদ পাঠাবার উপায় বন্ধ করে দিয়েছিল। কলকাতা থেকে বোম্বাই মুলতান হয়ে, দিল্লীতে সংবাদ পৌছত। বহু বিলম্বে প্রাপ্ত এই সব সংবাদ আবার সব সময়ে সত্য হতো না। ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে কানপুর ও লক্ষ্ণৌর শোচনীয় খবর আসে। হুইলার ও হেনরী লরেন্স নিহত। দিল্লীর ইংরেজ শিবিরে শোকের ছায়া ঘনীভূত হয়। ইংরেজের জিঘাংসা তীব্র হয়ে ওঠে। পারলে পরে তারা ভারতবর্ষকে ভারত-বাসীশূন্য করে। একটা পরাধীন জাতি তাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েছে দেখে, ইংরেজের মনে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। উত্তেজনার সঙ্গে আতঙ্কও।

এদিকে দিল্লীর রমণীয় প্রাসাদ সৈনিকনিবাসে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে বিঘোষিত হয়েছেন।

তাঁর নামে আদেশ প্রচারিত হচ্ছে। তাঁর নামে ফিরিঙ্গী ধ্বংসের নানা রকম প্রস্তাব দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষিত হচ্ছে; তাঁর নামে দরবারে ওমরাহ ও সেনাপতিদের কার্য অবধারিত হচ্ছে। বয়সের ভারে শক্তিহীন বাদশাহের কিন্তু বিদ্রোহীদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা বা সাহস ছিল না। জ্যোতিষীদের আশ্বাস বাক্যে বিমুগ্ধ সম্রাট কেবলই দিন গুণছেন কবে ফিরিঙ্গীরা সমূলে বিনষ্ট হবে। দিল্লীর যে প্রাসাদের মধ্যে একসময়ে জনসাধারণ সহজে

প্রবেশ করতে পারত না, এখন সেই প্রাসাদই হয়েছে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সমাগত বিদ্রোহীদের আবাসস্থল। প্রাসাদের একটি অংশ পরিণত হয়েছে আস্তাবলে। এক অংশে বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত। প্রাসাদ এখন বিদ্রোহীদের প্রধান শিবির। প্রাসাদে বৃদ্ধ সম্রাটের এখন কোনো ক্ষমতাই ছিল না, যদিও তাঁর নামেই সব কাজ হতো। এই সময়কার দিল্লীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এক ইংরেজ লেখকের বিবরণ এই রকম: "নগরের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মুসলমানগণ গোহত্যা করিতে উদ্যত হওয়াতে হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাসাদে সিপাহীগণ অনৈক্যে পরস্পর বিভিন্ন এবং মতের বিভিন্নতায় পরস্পর ভিন্ন পথানুবর্তী হইতেছিল। ইহাদের প্রকৃত পরিচালক ছিল না। সিপাহীদিগের লুণ্ঠনে অস্থির হইয়া, দোকানদারেরা প্রায়ই দোকান বন্ধ করিয়া রাখিত। তাহারা সম্রাটের নিকটে অভিযোগ করিত। কিন্তু সম্রাট তাহাদের অভিযোগ শুনিয়া অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারিতেন না। বৃদ্ধ মোগলের পারবর্তে উত্তেজিত সিপাহীরাই দিল্লীর সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিয়াছিল।"

তবুও দিল্লী এখন বিদ্রোহীদিগের কেন্দ্র।

দিল্লীর প্রাসাদ এখন একটি সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত।

দুর্ভেদ্য উন্নত প্রাচীর সেই দুর্গকে নিরন্তর রক্ষা করছে। প্রশস্ত পরিখা দুর্গটিকে ইংরেজদের পক্ষে দুরতিক্রম্য করে তুলেছে। প্রাসাদের ভেতরে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ। রাশীকৃত গোলা, বারুদ, বন্দুক, সঙ্গীন আর তরবারী। প্রচুর রসদ আর বহু ঘোড়া। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ফিরিঙ্গী বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর। তাই এ সময়ে দিল্লী অধিকার করা লর্ড ক্যানিং সবচেয়ে জরুরী মনে করলেন। কিন্তু আট হাজার সৈন্য নিয়েও জেনারেল রীড দিল্লী অধিকার করতে পারলেন না। এই সংবাদে তিনি বিশেষ বিচলিত হলেন। ইংরেজ সৈন্যরা দিল্লী অবরোধ করতে গিয়ে নিজেরাই এখন অবরুদ্ধের মতো রয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে গেল, তবু অবরোধকারীদের অবরুদ্ধভাব ঘুচল না। স্যর জন লরেন্স বিব্রত বোধ করলেন। দিল্লী উদ্ধারের দায়িত্ব মুখ্যত তাঁরই ওপর ন্যস্ত। দিল্লী পুনরুদ্ধারের জন্যে স্যর জনের তবু দৃঢ় সংকল্প। তিনি তখন নতুন উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

কিন্তু পঞ্চনদের সর্বত্রই তখন বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঞ্জাবের সব সেনানিবাসেই কম বেশী আলোড়ন।

সুতরাং দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে স্যর জনকে পাঞ্জাবের কথাও চিন্তা করতে হয়। চিন্তা করতে হয় পেশোয়ারের কথা। পেশোয়ারের কমিশনার তাঁকে লিখেছেন: "পেশোয়ার রক্ষা করা আমাদের প্রধান কাজ। পেশোয়ার হারাইলে পাঞ্জাব রক্ষা করা যাইবে না। এখানেও সৈন্যের একান্ত প্রয়োজন।" স্যর জন ভাবলেন দিল্লী ও পেশোয়ারের মধ্যে দিল্লীর গুরুত্বই বেশী। প্রয়োজন হলে আমীর দোস্ত মহম্মদকে বরং পেশোয়ার উপত্যকা ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তবু বিদ্রোহীদের কবল থেকে দিল্লী উদ্ধার করতেই হবে। ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শক্তি, প্রভুত্ব ও মর্যাদা সবকিছু নির্ভর করছে অবরোধমুক্ত দিল্লীর ওপর। স্যর জনের এই প্রস্তাবের সঙ্গে অন্যান্য সেনাপতিদের মতভেদ হলো। জেনারেল নিকলসন বললেন—"পেশোয়ার পরিত্যাগ করিলে পাঞ্জাবের বিপদ অনিবার্য। দোস্ত মহম্মদ যদি পেশোয়ারের অধিকার ফিরিয়া পান, তাহা হইলে তিনি আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন।"

বহু তর্কবিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবের সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করে, দিল্লী উদ্ধারের জন্যে পেশোয়ার পরিত্যাগ করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলো।

॥ উনিশ ॥

বিতস্তার তীরে ঝিলামের সেনানিবাস।

এখানকার অধিনায়ক কর্ণেল এলিসের প্রেরিত ৫ই জুলাইয়ের এক সংবাদে স্যর জন লরেন্স জানতে পারলেন যে ঝিলামের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। দিল্লীর ঘটনায় তখন তিনি বিব্রত। তবু এ-বিদ্রোহের সংবাদ উপেক্ষা করতে পারলেন না। "ডিজব্যাণ্ড দেম্ ইম্মিডিয়েটলি" (এখনি তাহাদের নিরস্ত্র করুন)—এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সৈন্য ও কয়েকটা কামান পাঠিয়ে দিলেন তিনি। ঝিলামের সিপাহীরা যখন তাদের ব্যারাকের অপর দিকে সশস্ত্র য়ুরোপীয় সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ হতে দেখল, তখন তাদের বুঝতে বিলম্ব হলো না যে এখনি তাদের নিরস্ত্র করা হবে। তারাও ক্ষণমাত্র দেরী না করে নিজেদের বন্দুক ভরতে লাগল। ইংরেজ পক্ষের মুলতানী ঘোড়সওয়ারেরা প্রথমে সিপাহীদের আক্রমণ করল। কিন্তু বিদ্রোহীদের গুলির মুখে তারা স্থির থাকতে পারল না। ইংরেজসৈন্যরা তখন কামান নিয়ে তৈরী হয়। বিদ্রোহীদের বন্দুকের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মুখে কামানের গোলা বিশেষ কোন কাজে এলো না। ইংরেজ সৈন্যরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের কামান বিফল, অশ্বারোহীরা উদ্‌ভ্রান্ত। তখন তাদের জঙ্গমসৈন্য সিপাহীদের আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। বেগতিক দেখে সিপাহীরা ব্যারাক ছেড়ে চলে গেল। এই যুদ্ধেও বহু ইংরেজসৈন্য নিহত হয় এবং কর্ণেল এলিস আহত হন। পরের দিন বিদ্রোহীরা এসে প্রচণ্ডভাবে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করে, তাদের একটা কামান হস্তগত করল। সেই কামানের সাহায্যে তারা বিপক্ষকে পরাস্ত করে। পরের দিন আবার ক্যাণ্টনমেণ্টের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দুই দল সমবেত হলো। আজকের যুদ্ধে জয়মাল্য লাভ করল ইংরেজ সৈন্যরা।

বিদ্রোহীদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা যায়। অবশিষ্ট কাশ্মীরে পালিয়ে যায়। সেখানে তারা গিয়েছিল আশ্রয়ের আশায়। কাশ্মীরের ইংরেজভক্ত মহারাজা গুলাব সিংহ পারিতোষিকের লোভে আশ্রয়-প্রার্থীদের ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে সমর্পণ করেন। ইংরেজদের কামানের গোলায় তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

ঝিলাম-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটতে না ঘটতে কমিশনারের কাছে সংবাদ এলো শিয়ালকোটেও বিদ্রোহ। ঝিলাম থেকে সত্তর মাইল দূরে শিয়ালকোট। পাঞ্জাবের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস। পরদিনের বিদ্রোহের সংবাদ এখানেও এসেছিল এবং এই সেনানিবাসের সিপাহীরাও মনে করেছিল যে তাদেরও নিরস্ত্র করা হবে। রণদক্ষ ব্রিগেডিয়ার ব্র্যাণ্ড ছিলেন শিয়ালকোটের অধিনায়ক। ইংরেজসৈন্য তখন এখানে খুব কমই ছিল। এত বড় একটা সেনানিবাস য়ুরোপীয় সৈনিকশূন্য করবার একান্ত বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু দিল্লীর প্রয়োজন সকলের আগে, সেই জন্যে কমিশনার স্যর জন লরেন্স পাঞ্জাবের প্রত্যেকটি সেনানিবাস থেকে যত সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তা সবই দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শিয়ালকোট-বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মেলিসন লিখেছেন: "শিয়ালকোট ও ঝিলমের মধ্যবর্তী ইরাবতী ও বিতস্তার সেতুটি ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু পথ অবরুদ্ধ হইলেও শিয়ালকোটের সিপাহীদিগের নিকটে ঝিলামের সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহের পত্র লইয়া একজন সংবাদবাহক শিয়ালকোট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই পত্রে বৃদ্ধ মোগল ভূপতি তাহাদিগকে দিল্লীতে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং সিপাহীরা আর স্থির থাকিতে পারিল না। ৮ই জুলাই রাত্রেই তাহারা নিজেদের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিল। পরদিন প্রাতে বিদ্রোহীদের 'দীন্ দীন্' রবে সেনানিবাসের চারদিক পূর্ণ হইল। য়ুরোপীয়েরা এই ভৈরবরবে সচকিত ও সন্ত্রস্ত হইল। তাহাদের কোনরূপ ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীদের প্রতিরোধে তাহারা একান্ত অসমর্থ হইল। বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া নিরুপায় ইংরেজেরা সর্দার তেজসিংহের পুরাতন দুর্গের [illegible] সপরিবারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। পথিমধ্যে উত্তেজিত সিপাহীদের

অস্ত্রাঘাতে বহু ইংরেজের মৃত্যু হয়। ব্রিগেডিয়ার সাংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। সাহেবেরা দুর্গমধ্যে লুকাইলেন. বিদ্রোহীরা অবসর পাইয়া নগর লুণ্ঠন করতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ট্রেজারী লুঠ করিল, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিল, জেলখানার কয়েদী খালাস করিল, সাহেবদিগের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যাকালে বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ ইরাবতী নদী পার হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল।"

শিয়ালকোটে বিদ্রোহীদের জয়লাভ হলো, কিন্তু তাদের এই জয়োল্লাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। দিল্লীগামী সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনারেল নিকলসন জঙ্গমসৈন্য নিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন। চন্দ্রভাগাতীরে ত্রিমুঘাঘাটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিকলসনের সৈন্যদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো। যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্রাদি সব ফেলে পালিয়ে যেতে লাগল। পলাতক সিপাহীরাও নিষ্কৃতি পেল না। অনেকে চন্দ্রভাগার জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিল। ১৬ই জুলাইয়ের শেষ যুদ্ধে শিয়ালকোটের বিদ্রোহীরা নিকলসনের সৈন্যদের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা বাঁচল, বিচারে তাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। চন্দ্রভাগার তীরে বিদ্রোহীরা সেদিন রক্তের স্বাক্ষরে তাদের বীরত্ব ও বিক্রম লিখে রেখে গেল।

২১শে জুলাই। স্থান—লাহোর।

কমিশনার স্যর জন লরেন্স রাওলপিণ্ডি থেকে এখানে এলেন। নিকলসনও ঐ দিন লাহোরে উপনীত হলেন।

দিল্লীর বিষয় নিয়ে দুজনার মধ্যে গভীর পরামর্শ হলো। দিল্লী অধিকার করবার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে তিনি কিছুমাত্র ঔদাস্য করেন নি। বেলুচী, শিখ, য়ুরোপীয় সৈন্য যা কিছু সংগৃহীত হয়েছিল, সে সবই দিল্লী পাঠান সাব্যস্ত হলো। সেই সঙ্গে প্রচুর ঘোড়া, বন্দুক ও কামানও সংগ্রহ করা হলো। এই সব উপকরণ তরুণ নিকলসনের হাতে তুলে দিয়ে, স্যর জন তাঁকে জেনারেল পদবী দিয়ে সৈন্যাপত্যে বরণ করলেন। সেনাপতি নিকলসন এই সব সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মোগলের চিরপ্রাসিদ্ধ রাজধানী উদ্ধার করতে বিপুল উৎসাহে যাত্রা করলেন। ২৫শে জুলাই তাঁর সৈন্যদল বিপাশা পার হয়ে শতদ্রুতীরে উপনীত হলো।

সেইখান থেকে তারা দ্রুতবেগে যমুনার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। পথিমধ্যে সেনাপতি উইলসনের একখানি চিঠি পেলেন নিকলসন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল: "নজফগড় খালের উপর আমরা যে সেতু ভাঙিয়া দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীরা সেই সেতু পুনরায় নির্মাণ করিয়া সেইখানে অবস্থান করিতেছে। শীঘ্রই তাহারা আমাদের শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবে, এইরূপ সম্ভাবনা। অতএব আপনি যত শীঘ্র পারেন সসৈন্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।" ৬ই আগষ্ট জেনারেল নিকলসন আম্বালা থেকে স্যর জন লরেন্সকে লিখলেন: "ব্রিগেডিয়ার উইলসনের আহ্বানে অদ্যই আমি দিল্লী যাত্রা করিলাম।"

এদিকে ৩০শে জুলাই মিয়াঁমিরের পদাতিক সিপাহীর দল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ প্রচণ্ড আঁধি হয়ে চারদিক একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। সিপাহীরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। প্রায় আড়াই মাস আগে এদের নিরস্ত্র করা হয়েছিল আঁধির ভয়ে তাদের মধ্যে যখন উত্তেজনার ভাব দেখা দিল, তখন ক্যান্টনমেন্টের ইংরেজ-অধিনায়ক মনে করলেন সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। তখন শিখ ও ইংরেজ সৈন্যরা কমাণ্ডারের আদেশে কোনো রকম বিচার বিতর্ক না করে তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। নিরুপায় সিপাহীরা পালাতে বাধ্য হলো। কিন্তু নিরীহ ও নিরস্ত্রদের ওপর এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ জানাল প্রকাশ সিং নামে এক সিপাহী। কথায় নয় অসির মুখে এই প্রতিবাদের ফলে শিখ সৈন্যদলের অধিনায়ক নিহত হলো। তখন সিপাহীদের দণ্ড দেবার জন্যে ফ্রেডরিক কুপার প্রায় একশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পলাতক সিপাহীদের পেছনে প্রবলবেগে ছুটলেন। সিপাহীরা ইরাবতীর তীরে উজনালা নামক একটি পল্লীতে গিয়ে থামলো। পল্লীবাসীরা সাহায্য তো করলই না, বরং তাদেরকে ধরিয়ে দিল। সেদিন ছিল পয়লা আগষ্ট। বকরিদের দিন। ধৃত সিপাহীদের উজনালার পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে আসা হলো। সেইখানে তাদের দলে দলে গুলি করে মারা হয়। উজনালার বধ্যভূমিতে শিখঘাতকদের গুলির আঘাতে প্রায় চারশো সিপাহী প্রাণ দিল আর প্রায় পঞ্চাশ জন সেই স্বল্পপরিসর অবরুদ্ধ গৃহের মধ্যে ভয়ে, শ্রান্তিতে, অবসন্নতায় ও গ্রীষ্মের আতিশয্যে শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেল। পুলিশ ষ্টেশনের

অদূরে ছিল একটি কূপ। নিহত সিপাহীদের দেহগুলি ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। কানপুরের নৃশংসতার প্রতিশোধ ইংরেজ উজনালাতে নিলো। সেখানকার কূপেব মধ্যে ইংরেজ নরনারীর মৃতদেহ, উজনালার কূপে সিপাহীদের মৃতদেহ। দুই পক্ষের নৃশংসতার নিদর্শন, কানপুর ও উজ্‌নালার এই কূপ দুইটি আজো অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে বিদ্যমান। এইভাবে উজনালাতে নবমেধ যজ্ঞের পবিসমাপ্তি হলো। স্যর জন ধন্যবাদ জানিয়ে কুপাবকে পত্র লিখলেন এবং গভর্ণর-জেনাবেলকেও তাঁব এই কৃতিত্বের কথা জানিয়ে দিলেন।

৭ই আগষ্ট নিকলসন দিল্লীতে পৌছলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হলো।

নিকলসনের কাযকুশলতা কোম্পানীর সামরিক বিভাগেব ইতিহাসে ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আবাব উদ্ধত ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ বলেও তাঁর অখ্যাতি আছে সৈন্যদলেব মধ্যে। মূর্তিমান দম্ভ তিনি। কিন্তু সামরিক বিষয়ে তাঁব অসামান্য প্রতিভা তাঁকে পাঞ্জাবেব প্রধান কমিশনাবের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। দীর্ঘকাল দিল্লীর অবরোধ তাব উৎকণ্ঠার বিষয় হয়েছিল, এখন নিকলসনকে সেখানে পাঠিয়ে তিনি যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। পরের দিন সকালেই নিকলসন দিল্লীর সমস্ত সেনাশিবির ও কামানের স্থান পরিদর্শন করলেন। কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, মনে মনে তা স্থির করে রাখলেন। মেটকাফ হাউসের সামনের প্রাকারে কামান রাখার ব্যবস্থা বড় ভাল ছিল না, বার বার বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে সেনাপতি বার্ণার্ড ইতিপূর্বে সে বন্দোবস্ত ঠিক কবে উঠতে পারেন নি। নিকলসন এসেই সকলের আগে সেই ব্যবস্থা করলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই জঙ্গম সেনাদল দিল্লীতে এসে পৌছল।

ইংরেজ শিবিরে লোকবল কম ছিল, কামান কম ছিল, গোলাগুলির অভাব ছিল। নূতন সেনাদলের সঙ্গে তা প্রচুর পরিমাণে থাকাতে সে অভাব ঘুচল, দলবল পূর্ণ হলো।

২৫শে আগষ্ট। সকাল থেকেই অবিরাম বৃষ্টি। ইংরেজ সৈন্যরা সেই বৃষ্টিতে সজ্জিত হয়ে নজফগড়ে যুদ্ধযাত্রা করল। এই যুদ্ধের সেনাপতি নিকলসন। সংবাদ এসেছিল, নিমচ ও বেরিলির বিদ্রোহীদের সঙ্গে দিল্লীর কয়েকদল

সিপাহী আগের দিন নজফগড়ে জমা হয়েছিল। জল-কাদায় রাস্তা দুর্গম। কামানের গাড়ির চাকা কাদায় বসে যেতে লাগল। পদাতিক সৈন্তরা কর্দমাক্ত পিছিল পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারল না। অশ্বারোহিগণের ঘোড়ার পা কাদায় ডুবে যেতে লাগল, ভারবাহী উটের দল অতি কষ্টে কাদার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে চলছিল, এক এক জায়গায় পিঠের বোঝা পড়ে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে সেই দুর্গমপথ অতিক্রম করে সেনাদল সহজপথে এসে পৌঁছল। অচিরেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

তখন বেলা চারটা। নিকলসন নজফগড়ের খালের একটা শাখা খালে উপনীত হয়ে দেখলেন যে, সিপাহীরা খালের অপর পারে সজ্জিত হয়ে রয়েছে। খালের সেতু তাদের দক্ষিণভাগে। সম্মুখে একটি সরাই, সরাই-এর বামে ও দক্ষিণে দুটি পল্লী। পল্লী দুটিও তাদের অধিকারে। বিদ্রোহীরা সেতু, সরাই ও পল্লী—এই সব জায়গায় মোট দশটি কামান স্থাপন করেছে। বেলা পাঁচটার সময়ে ইংরেজপক্ষের সমগ্র সৈন্যদল খাল পার হলো। নিকলসন তাড়াতাড়ি সিপাহীদের সন্নিবেশ স্থল পর্যবেক্ষণ করে সকলের আগে সরাই আক্রমণ করা সাব্যস্ত করলেন। সিপাহীদের অধিকারের মধ্যে এইটাই ছিল তাদের প্রধান ব্যূহ। সসৈন্যে নিকলসন আসছেন শুনে বিদ্রোহীরা বামে, দক্ষিণে ও মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গোলা চালাতে আরম্ভ করল।

—কুইক্ মার্চ, ফায়ার! আদেশ দিলেন জেনারেল নিকলসন ৬১ নম্বর পল্টনের জখম সৈন্যদের। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। নজফগড়ের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ।

কয়েকবার গোলাবর্ষণের পর ইংরেজসৈন্য অগ্রসর হলো।

সামনে নিকলসন, পেছনে ইংরেজ সৈন্য। গুলিবৃষ্টি করতে করতে তিনি সিপাহীদিগের বিশ গজের মধ্যে এসে পড়লেন।

—চার্জ ইওর বেয়নেট, আদেশ দিলেন সেনাপতি।

সৈন্যরা হুকুম তামিল করল। ঘোরতর যুদ্ধ। দুই দলেই অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ। এক বিদ্রোহীর সঙ্গীনের খোঁচায় দলের ক্যাপ্টেন নিহত হলেন, অন্য একজন অফিসারের গুলিতে সেই বিদ্রোহীটির মৃত্যু হলো।

নজফগেড়র এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে মেলিসন লিখেছেন: "অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক সিপাহী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ইংরেজেরা সিপাহীদের

তেরোটা কামান দখল করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা অবশেষে খালের সেতু পার হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। পথ কর্দমাক্ত, শীঘ্র দৌড়ান অসম্ভব, ইংরেজ-সৈন্যরা তাহাদের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আট শত সিপাহীকে সংহার করিয়া ফেলিল।"

সেনাপতি নিকলসন বিজয়ী হলেন।

লুণ্ঠিত কামানগুলি নিয়ে পরের দিন সকালবেলায় তিনি দিল্লী ফিরলেন।

ফিরবার আগে নজফগড়ের সেতুটা তোপে উড়িয়ে দেওয়া হলো।

সেদিন দিল্লীর ইংরেজ শিবিরে মহোৎসব হলো। নজফগড়ের সংবাদ পেয়ে স্যর জন লরেন্স ধন্যবাদ জানিয়ে আবার তাঁকে চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির শেষ লাইনে এই কথা কয়টি লেখা ছিল :—

"এইবার দিল্লী-উদ্ধারে আপনার কৃতিত্ব দেখিবার জন্য আমরা সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব।"

কয়েকদিন পরে আরো কয়েকটি কামান এসে পৌঁছল।

নিকলসন এইবার মহোৎসাহে দিল্লী-উদ্ধারের আয়োজন করতে লাগলেন।

॥ কুড়ি ॥

বিদ্রোহের সূচনায় রাজধানী কলকাতার অবস্থা কি রকম ছিল, আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। যত দিন যায় কলকাতার অবস্থা ততই ভয়ানক হয়ে ওঠে। বিদ্রোহানল চারদিকে প্রজ্জ্বলিত। ইংরেজের সিংহাসন প্রবল স্রোতোমুখে জীর্ণ তরীর মত কাঁপছে। ইংরেজের শিশু ও রমণীরা, বাঙালির প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরেজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব আলিপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। গভর্ণর-জেনারেল ক্যানিং নেটিভ গার্ড তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করেছেন। স্বেচ্ছাবাহিনী সজ্জিত হচ্ছে চারদিকে। কোম্পানীর কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নেমে গিয়েছে। কাজকর্ম সব বন্ধ। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলেছে। কলকাতায় জনসাধারণ ভীত-ত্রস্ত ; যে যেখানে পারছে, পালিয়ে যাচ্ছে।

অযোধ্যার নবাব বন্দী। বারাকপুরের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হয়েছে। কলকাতায় ইংরেজদের মনের ভয় কিছুটা কমে এসেছিল।

তবু লর্ড ক্যানিং একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। না পারার কারণ ছিল। দেশের চারদিকে নানা প্রকারের নানা কথা, নানা রকমের নানা কাজ, আর সংবাদপত্রে সেই সব ঘটনা ও রটনার অতিরঞ্জিত সংবাদ। খবরের কাগজে যা ছাপা হয়, জনসাধারণ তাই পড়ে এবং আলোচনা করে। ব্যারাকেও দেশীয় ভাষার প্রকাশিত কাগজ যায়। অসন্তুষ্ট সিপাহীরা সেই সব কাগজ পড়ে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইংরেজি সংবাদপত্রের এক একটা প্রবন্ধ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়, আবার দেশীয় ভাষায় প্রচারিত খবরের কাগজের এক একটা প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়। জনসাধারণের মনে তার গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিদ্বেষ ঘনীভূত হয়। তাতেই বেশী অপকার হয়।

লর্ড ক্যানিং বিবেচনা করলেন, দেশী খবরের কাগজের চেয়ে ইংরেজী খবরের কাগজেই বেশী অপকার হচ্ছে। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং কলকাতার 'বেঙ্গল হরকরা'র দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিল। নানা রকমের সংবাদ অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়, লোকে আতঙ্কিত হয়, ইংরেজের প্রতি তাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। বিদ্রোহ সম্পর্কে সত্যমিথ্যা সংবাদ পল্লবিত হয়ে প্রতিদিন খবরের কাগজে বেরুচ্ছে—জনসাধারণের পক্ষে সে সব সংবাদ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক ছিল। এমন সময়ে পলাশি যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে এলো তেইশে জুন। পলাশির শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজে একটা বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গভর্ণমেণ্টের মনে হলো—এই সময়ে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া উচিত হয়নি। এর দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হতে পারে, শান্তিরও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। লর্ড ক্যানিং 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার' সম্পাদককে সাবধান করে দিলেন। সম্পাদক আর একটা প্রবন্ধ লিখলেন। গভর্ণমেণ্টের তাতেও আপত্তি।

তখন লর্ড ক্যানিং তাঁর কাউন্সিলের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এক বছরের জন্যে বন্ধ করা স্থির করলেন। বিদ্রোহ দিন দিন যত প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠল, ততই গভর্ণমেণ্টের দৃঢ় ধারণা হলো যে, ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাই বিদ্রোহকে প্রবল করে তোলার অন্যতম কারণ। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচ করতে উদ্যত হলেন। ১৩ই জুন আইন বিধিবদ্ধ হলো। "সেই আইনে বলা হলো : "যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র রাখেন অথবা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, গভর্ণমেণ্টে-এর নিকট হইতে তাঁহাদিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে। যাঁহারা বিনা লাইসেন্সে সংবাদপত্র প্রচার করিবেন, জানিয়া অথবা না জানিয়া যাঁহারা রাজ-বিদ্রোহমূলক সংবাদ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মনে উত্তেজনার সঞ্চার করিবেন, বিচারে তাঁহাদের গুরুতর দণ্ড হইবে, মুদ্রাযন্ত্রাদি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। "এই আইন এখন হইতে এক বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে।"

এই আইন জারী হওয়াতে কলকাতার ইংরেজ মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাঁরা অপমানিত বোধ করলেন। এদেশীয় লোকের সঙ্গে ইংরেজেরা এক আইনে বাঁধা, এই তাদের পক্ষে অপমান। ইংরেজ সম্পাদকেরা প্রতিবাদ করলেন। লর্ড ক্যানিং গ্রাহ্য করলেন না।

দিনের পর দিন যায়।

প্রতিদিনই ভারতের নানাস্থান থেকে বিদ্রোহের সংবাদ আসে।

জুলাই মাসের শেষ তারিখে গভর্ণর-জেনারেলের একটা নতুন ঘোষণা প্রচারিত হলো। তাতে বলা হলো—বিদ্রোহী সিপাহীদের বিচার অতঃপর সামরিক বিচারালয়ে হবে। ঠিক এই সময়ে কলকাতার ইংরেজরা গভর্ণমেণ্টের কাছে সামরিক আইন জারি করার প্রার্থনা করল। তাদের যুক্তি ছিল যে, স্থানান্তর থেকে বহুল পরিমাণে অস্ত্রাদি আমদানি হচ্ছে ; ইহা নিবারণের জন্য আইন করা দরকার। অমনি প্রচারিত হলো অস্ত্র-সংক্রান্ত একটি আইন। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সকলের সম্পর্কেই এই আইন বিধিবদ্ধ হলো। এই আইনে বলা হলো যে, দরকার মতো অস্ত্র রাখবার লাইসেন্স নিতে হবে। ভারতবর্ষের ইংরেজরা এতে সন্তুষ্ট হলো না। এদেশীয় লোকের সঙ্গে ইংরেজরা আবার এক আইনে বাঁধা পড়লেন।

বিদ্রোহের ব্যাপারে সৈন্যদের জন্য খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

ভারতের রাজস্ব থেকে সম্পূর্ণ সংকুলান হওয়া অসম্ভব।

তারপর এখনকার টাকার বাজার আগের মতন নেই। বেশী সুদ দিয়ে নতুন ঋণ গ্রহণ করা দরকার হবে। লর্ড ক্যানিং এইসব কথা বিস্তারিত ভাবে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভায় লিখে পাঠালেন। ছ টাকা সুদের খং বের করে অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। ডিসকাউণ্ট কমছে, লোকে নিরুৎসাহ হচ্ছে। আবশ্যকীয় সব টাকা যদি এখানে সংগৃহীত না হয়, ইংলণ্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা পুরণ করবার চেষ্টা করতে হবে। ভারতের রাজস্ব সেখানে ঋণের প্রতিভূ থাকবে। লর্ড ক্যানিং-এর এই সব প্রস্তাবের উত্তরে বিলাতের ডিরেক্টর-সভা লিখে পাঠালেন—ভারতবর্ষের সরকারী খরচ কমান হোক। এর উত্তরে লর্ড ক্যানিং লিখলেন—যে যে বিভাগে বিবেচনামত যত খরচ কমাইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা হইবে।

ভারতের চারদিকে বিদ্রোহ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তখন, সেই সঙ্কটকালে, রণকুশল একাধিক ইংরেজ সেনাপতি একে একে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। এঁদের আগমনে লর্ড ক্যানিং খুব আশ্বস্ত হলেন। আগষ্ট মাসের গোড়াতেই কলকাতায় এলেন পারশ্য-বিজয়ী স্যর জেম্‌স্ আউট্রাম। তার

সাত দিন পরেই রণতরীর কমাণ্ডার কাপ্তেন পীল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। ১৩ই আগষ্ট স্যর কালিন ক্যাম্প্‌বেল উপস্থিত প্রধান সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করলেন। লর্ড এলগিন চীনের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। তিনি কাপ্তেন পীলের জাহাজে কলকাতায় এলেন। তিনি লর্ড ক্যানিং-এর সহপাঠী। এই সব বীরপুরুষদের উপস্থিতিতে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন এবং ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধ করতে আগের মত তৎপরতা ও ধীরতা দেখাতে লাগলেন। বস্তুতঃ এই দারুণ উৎকণ্ঠার দিনে গভর্ণর-জেনারেল ভিন্ন রাজধানীতে প্রায় সকলেই উৎকণ্ঠিত জীবন যাপন করত। কথিত আছে যে, বিদ্রোহের সময়ে লর্ড ক্যানিং-এর দেহরক্ষী সকলেই দেশীয় সৈনিক ছিল এবং তাদের তিনি নিরস্ত্র করতে সম্মত হন নি। অনেকবার তাঁর কাছে এই সৈন্যদের নিরস্ত্র করবার এবং এদের পরিবর্তে ইংরেজ দেহরক্ষী সৈন্য মোতায়েন করার প্রস্তাব বহুবার তাঁর সামনে উত্থাপিত হয়, কিন্তু লর্ড ক্যানিং এতে সম্মতি প্রকাশ করেন নি। তিনি ভারতীয় দেহরক্ষীর পরিবর্তে য়ুরোপীয় দেহরক্ষী রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তিনি নিশ্চিন্তমনে ভারতীয় দেহরক্ষীদের হাতে নিজের দেহরক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন। এই রকম আচরণের ভেতর দিয়ে লর্ড ক্যানিং এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট দেশীয় সৈন্যদের ওপর বিশ্বাস হারায় নি। "কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন যে, 'লর্ড ক্যানিং ভারতবাসীদিগকে গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত রাখিবার জন্য এইরূপে নিজের জীবনের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন।"

বাংলার প্রথম লেফটেনাণ্ট গভর্ণর তখন স্যর ফ্রেডরিক হ্যালিডে। গভর্ণর-জেনারেল অবশেষে তাঁর কথা শুনলেন। "যে জীবনের উপর সমগ্র সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেই জীবন সর্বাংশে বিপত্তিশূন্য করা উপস্থিত সময়ে যে কতদূর আবশ্যক, তাহা লেফটেনাণ্ট গভর্ণর যখন ধীরভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, তখন লর্ড ক্যানিং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পূর্ব প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন।" তখন সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে বড়লাটের প্রাসাদে য়ুরোপীয় রক্ষী নিযুক্ত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিশিখা রাজধানীতে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু চারদিকের বিপ্লবের সংবাদে এখানকার ইংরেজদের মধ্যে গভীর

আতঙ্ক ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা অহরহ চারদিকে শুধু বিপ্লবের বিভীষিকা দেখতে লাগল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হলো, কঠোর অস্ত্র আইনেরও প্রবর্তন হলো, অযোধ্যার নবাবকে ফোর্ট উলিয়ম দুর্গে অবরুদ্ধ করা হলো—এমনি ভাবে কলকাতার শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু শহরের বাইরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। বারাকপুরে যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাই সারা ভারতে দাবানল জ্বালিয়ে তুলেছিল। তখনকার বাংলার এলাকা ছিল বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত। এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও বিদ্রোহ সেই সময়ে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এইখানে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দেব।

চট্টগ্রামে তখন একদল সিপাহী ছিল। তারা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করতেই ইংরেজরা ছদ্মবেশে জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে যায়। কাজেই সিপাহীরা বিনা বাধায় ধনাগার লুণ্ঠন ও কারাগারের কয়েদীদের মুক্ত করল। তারপর সৈনিকনিবাস পুড়িয়ে ও অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়ে ত্রিপুরার দিকে ধাবিত হয়। এখান থেকে সিপাহীরা তিন লক্ষ টাকা ও তিনটি হাতী লুঠ করতে পেরেছিল। রজব আলি খাঁ নামে এক হাবিলদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সীতাকুণ্ডের পথে ত্রিপুরার অভিমুখে যাত্রা করল। এদিকে চট্টগ্রামের কমিশনার ত্রিপুরার মহারাজকে এই সব উত্তেজিত সিপাহীর গতিরোধ করতে অনুরোধ করেন। রাজভক্ত মহারাজা ও দু'একজন জমিদার ইংরেজদের সাহায্য করতে সম্মত হয়ে সিপাহীদের আক্রমণ করলেন। স্বাধীন ত্রিপুরায় তারা আশ্রয় পেল না। বিদ্রোহী সিপাহীরা উপায়ন্তর না দেখে মণিপুরের নিকটবর্তী দুর্গম বনে আশ্রয় নিল।

শ্রীহট্টে এই সংবাদ পৌঁছল। সেখানকার ইংরেজ-রাজপুরুষ তাঁর অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদল নিয়ে চট্টগ্রামের পলাতক বিদ্রোহীদের গতি প্রতিরোধ করবার জন্যে অবিলম্বে যাত্রা করলেন। প্রতাপগড়ে এসে তারা শুনল যে বিদ্রোহীরা লাতু চলে গিয়েছে। পথ পল্বলময় ও জঙ্গলাকীর্ণ। চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা শ্রীহট্টের সিপাহীদের নিজেদের দলে আনবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের চেষ্টা ফলবতী হলো না। শ্রীহট্টের রাজভক্ত সিপাহীরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সঙ্গীন উচিয়ে দাঁড়াল। বিদ্রোহীদের আক্রমণে শ্রীহট্টের জঙ্গম সৈন্যদলের এক মেজর নিহত হলেন। শ্রীহট্টের সিপাহীদের সঙ্গে চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের

দু'বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের অনেকে মারা যায়। যারা জীবিত ছিল, তারা সেই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অবস্থান করতে লাগল। তাদের নির্গমনের সকল পথই অবরুদ্ধ হয়েছিল। চট্টগ্রামের সিপাহীরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে—এই সংবাদ যখন চারদিকে প্রচারিত হয়, তখন পূর্ববাংলার প্রধান নগর ঢাকায় কিছু গোলযোগ ঘটে।

বাংলার ইতিহাসে ঢাকা বহুকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। এক সময়ে রাজধানীর গৌরব ছিল এই শহরের। সেই গৌরবের দিনে ঢাকার নাম ছিল জাহাঙ্গীরাবাদ। বাংলার নবাব এক সময়ে এইখানে থেকে, সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এদেশে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যের সূচনার বহু আগে থেকেই ঢাকার খ্যাতি ইংলণ্ড পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্টস লিখেছেন: "যখন ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রাধান্য লাভ হয় নাই, যখন ইংরেজ বণিকগণ ক্ষুদ্র দ্বীপে সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেন, তখন বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় ঢাকা নগরী য়ুরোপীয় সভ্য জনপদে সাতিশয় খ্যাতি লাভ করে এবং বিপুল সম্পত্তিতে অপরাপর সম্পত্তিশালী নগরের গৌরবস্পর্ধী হইয়া উঠে। ঢাকার শিল্পকলা, বিশেষ করিয়া ইহার মসলিন চিরস্মরণীয়। ঢাকার মসলিনের গৌরব ও খ্যাতির কথা বিলুপ্ত হইবার নহে।"

সিপাহী যুদ্ধের প্রাক্কালে ঢাকার ইংরেজ রাজপুরুষেরা নিরুদ্বেগে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক ইংরেজ ও আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী এই শহরে বাস করত। জলপাইগুড়িতে যে দেশীয় পলটন ছিল, তার কিছু সিপাহী ঢাকায় কোম্পানীর ধনাগার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। কিছু গোলন্দাজ সৈন্যও ছিল—মোট আড়াইশ সিপাহী সেই সময়ে ঢাকায় ছিল। চার দিন পরে চট্টগ্রামের সংবাদ ঢাকায় পৌছল। সংবাদ পেয়ে কর্তৃপক্ষ ঢাকার সিপাহীদের নিরস্ত্র করার আয়োজন করলেন। এই প্রসঙ্গে মেলিসন লিখেছেন: "২৩শে নভেম্বর সকালবেলায় নৌসেনা বিভাগের লেফটেনাণ্ট লিউইস্ কতকগুলি জাহাজী গোরা ও দুইটি কামান লইয়া, সিপাহীদের নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। ইহার পর কয়েকজন গোরা যাইয়া, প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়-রক্ষক সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করে। তারপর সৈন্য

বিভাগের মালগুদামের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হয়। [illegible] সিপাহীরা বিনা গোলযোগে নিরস্ত্রীকৃত হয়।"

কিন্তু গোলমাল বাধল লালবাগের সিপাহীদের নিয়ে।

ইংরেজ সেনানায়করা যখন সিপাহীদের আবাসস্থান লালবাগে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সেখানকার সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অফিসারেরা তখন সকলে মিলে লালবাগ অবরুদ্ধ করলেন। সিপাহীরা বাধা দিল; তখন ইংরেজরা তাদের ওপর গুলি চালাতে লাগল। অবরুদ্ধ সিপাহীরা তাদের বন্দুকের মুখে তার জবাব দিল। আধ ঘণ্টা ব্যাপী এই সংঘর্ষের ফলে বিদ্রোহীদের চল্লিশ জন নিহত হয়; ইংরেজদের পক্ষের কয়েকজন নিহত এবং আহত হয়। বাকী সিপাহীরা ঢাকা ছেড়ে তাদের সদরস্থান জলপাইগুড়ির দিকে চলে গেল। পথিমধ্যে নদী পার হবার সময়ে কয়েকজন ডুবে মারা যায়।

গন্তব্যপথে বাধা পেয়ে, কিছু সময়ের জন্যে তারা ভূটানের পার্বত্যভাগে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

ভূটানের সীমার অদূরে জলপাইগুড়ি।

এখানে একটা ছোট সেনানিবাস ছিল। ৭৩ নম্বর পলটনের সিপাহীরা এই সেনানিবাসে থাকত। তাদের অধিনায়ক কর্নেল জর্জ সেওয়ার। জুন মাসেই প্রচারিত হলো যে, কলকাতা থেকে ইংরেজ সৈন্য এসে তাদের নিরস্ত্র করে মেরে ফেলবে—অন্যান্য স্থানের মতো এখানকার সিপাহীরাও সেই ভয়ে অস্থির। বিদ্রোহের সূচনাতেই তাদের নিরস্ত্র করবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু কর্নেল সম্মত হন নি। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর অধীনস্থ সিপাহীরা সকলেই প্রভুভক্ত। তাঁর ধারণা ছিল যে, অনেক জায়গায় কর্তৃপক্ষের অমূলক আশঙ্কা আর অলীক সন্দেহ সিপাহীদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। এই আশঙ্কা আর সন্দেহ উভয় পক্ষেই বর্তমান ছিল। এই সময়ে একদিকে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা যেমন একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে অর্থাৎ সিপাহীদের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে নানা রকম সন্দেহ। এই সন্দেহ থেকেই তাদের মধ্যে প্রচারিত হতো নানারকম আতঙ্কময় জনরব। সিপাহীরা জনরবে হতো উত্তেজিত আর সন্দেহের বশে ইংরেজ রাজপুরুষেরা হতেন শঙ্কিত। তাই তাঁরা নিজেদের নিরাপদ করবার জন্যে

নিরস্ত্রীকরণের সহজ পথ বেছে নিয়েছিলেন। কর্ণেল সেবিয়ার গভর্ণমেণ্টের এই নীতিতে যেমন বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ ছিলেন তেমনি তিনি তাঁর পল্টনের সিপাহীদের মনে করতেন বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত।

কিন্তু এই সময়ে জলপাইগুড়ী সেনানিবাসে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরের জিনিসপত্র দার্জিলিং থেকে আনবার জন্যে কর্ণেল সেবিয়ার গোটাকতক হাতী সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সিপাহীরা ভাবল, গোরা সৈন্য আনবার জন্যেই এই সব হাতী পাঠান হয়েছে। ভাবনার সঙ্গে ভয়—ভয়ের সঙ্গের অসন্তোষের লক্ষণ দেখে, সেখানকার ইংরেজরা অনুমান করলেন, সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করতে ষড়যন্ত্র করছে। আবার নিরস্ত্র করবার পরামর্শ। কর্ণেল প্যারেডের হুকুম দিলেন একদিন। সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করল, তারা বন্দুক নিয়ে প্যারেডে যেতে পারবে কিনা। কর্ণেল বললেন, হ্যাঁ—গুলীবারুদ-ভরা বন্দুক তাদের হাতে থাকবে। নির্বিঘ্নে প্যারেড হয়ে গেল। তবু ইংরেজদের ভয় গেল না। সিপাহীরা ষড়যন্ত্র করছে—তাদের মুখে কেবলই এই কথা। অবশেষে কোর্ট মার্শাল বসল। সিপাহীরা আগে থেকে এর কিছুই জানতে পারেনি। একেবারে সরাসরি বিচার। কয়েকজনকে ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কলকাতায় পাঠান হলো। এরই ফলে জলপাইগুড়ীর শান্ত সেনানিবাসের অবশিষ্ট সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তারা গুলিপূর্ণ বন্দুক নিয়ে য়ুরোপীয়দের আক্রমণ করল। এই বিদ্রোহ অবশ্য অল্পেই দমিত হয়।

॥ একুশ ॥

সমস্ত বিহারে বিদ্রোহের পূর্ব লক্ষণ।

দানাপুর, পাটনা, গয়া, ছাপরা, সারন, আরা, মজঃফরপুর ও মতিহারী—সর্বত্রই গোলযোগ। দানাপুরের সিপাহীরা ও পাটনার মুসলমানেরা বিদ্রোহে প্রথম উত্তেজিত হয়েছিল। বিহারে নীলকর সাহেবদের অনেকগুলো কুঠী ছিল। কৃষকদের ওপর এই নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য ছিল প্রসিদ্ধ এবং স্থানীয় সিপাহীদের মনে বিদ্রোহের বহু আগে থেকেই এর দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহের সূচনায় ইংরেজদের মনে তাই আশঙ্কা হলো, সিপাহীরা হয়ত নীলকুঠী আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে, সাহেবদের প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই পাটনার কমিশনার সিপাহীদের নিরস্ত্র করার প্রস্তাব করেন। লর্ড ক্যানিং সে-প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পাটনা অঞ্চলে বহু মুসলমান বাস করত। চারদিকের বিদ্রোহের সংবাদে তাদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। অযোধ্যা ইংরেজ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হলে লক্ষ্মৌর বহু মুসলমান পাটনায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং প্রধানত তারাই পাটনার মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্বেষের সঞ্চার করে। তার ওপর পাটনা বিভাগের কমিশনার উইলিয়ম টেলারের অত্যাচার স্থানীয় মুসলমানদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরো বেশী বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক মিচেল পর্যন্ত লিখেছেন, "কমিশনার টেলর সাহেব পাটনার অধিবাসীদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।...পাটনার কোন মুসলমান এই সময়ে আপনাকে নিরাপদ মনে করে নাই। কোন মুসলমান অধিবাসীর অদৃষ্টে এ সময়ে শান্তি সুখ ঘটে নাই। কমিশনারের যথেচ্ছাচারে সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলেই ভীত এবং সকলেই আপনাদের জীবন, সম্পত্তি ও আত্মীয়গণের রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িল।"

এই সময়ে পাটনায় ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের তিন জন প্রভাবশালী মৌলবী ছিলেন। তাঁদের নাম শাহ মহম্মদ হুসেন, আহম্মদ উল্লা এবং ওয়াজ্‌উল্‌হক্‌। সমগ্র মুসলমান সমাজে এঁদের প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। এঁরা সর্বদাই বহুসংখ্যক অনুচর-পরিবৃত হয়ে থাকতেন। টেলর সাহেবের সন্দেহ হলো, এই মৌলবীরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি এদের গ্রেফতার করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে গ্রেপ্তার করতে সাহস পেলেন না। তখন টেলার সাহেব এক বিচিত্র কৌশলজাল বিস্তার করলেন। বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন পাটনার সম্ভ্রান্ত লোকদের স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। এঁদের মধ্যে মৌলবী তিনজনও ছিলেন। যথাসময়ে আলোচনাকক্ষে টেলার সাহেব এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর সঙ্গে কিছু সৈন্য দেখা গেল। আলোচনার পর নিমন্ত্রিতেরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু মৌলবীরা যাবার উপক্রম করতেই কমিশনার তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন—যতদিন না শহরের গোলযোগ শান্ত হয়, ততদিন সাধারণের মঙ্গলের জন্যে আমি আপনাদের অবরুদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করি।

অবরুদ্ধ। মানে, আটক করে রাখা।

এ কি রকম বেইমানির কথা, ভাবলেন মৌলবী সাহেবরা। এমন কথা তো ছিল না। তাঁরা প্রতিবাদ করলেন। টেলার তাঁদের সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করলেন না। তারপর অস্ত্রধারী প্রহরীদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সার্কিট হাউসে তাঁরা অবরুদ্ধ হলেন। এই ভাবে পরামর্শের ছলে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মৌলবীদের বন্দী করে ইংরেজ-প্রতিনিধি আতিথ্যের মর্যাদা রক্ষা করলেন। সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ফরবেস্‌-মিচেল পর্যন্ত কমিশনারের এই কাজের নিন্দে করে লিখেছেন: "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রিত করিয়া যিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতকের তুল্য না বলিয়া, প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক বলাই অধিকতর সঙ্গত।"

মৌলবীদের গ্রেফ্‌তারে শহরে কিন্তু শান্তি স্থাপিত হলো না।

পাটনায় বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল।

বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগই ওয়াহাবী মুসলমান। মৌলবীদের আটকের পর পাটনার অধিবাসীদের নিরস্ত্র করবার চেষ্টা হয়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অনেকেই অস্ত্রশস্ত্র গোপন করে ফেললো। ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদের মনে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার করলো। ৩রা জুলাই সন্ধ্যাবেলা। পাটনার রাজপথে বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যেই আত্মপ্রকাশ করলো। হলুদ রঙের পতাকা উড়িয়ে দল বেঁধে তারা বের হলো। ঢোল পিটিয়ে অন্য লোকদেরও দলে যোগদান করতে আহ্বান করল। টেলার সাহেব একদল শিখসৈন্যকে এই অবৈধ জনতা নিবারণের হুকুম দিলেন এবং দানাপুর থেকে কিছু য়ুরোপীয় সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। বিদ্রোহীদের গুলিতে একজন ইংরেজ ডাক্তারের মৃত্যু হয়। শিখসৈন্য উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আত্মগোপন করে।

দানাপুর।

বিহারের বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র দানাপুর ক্যান্টনমেণ্টে বেশীর ভাগ দেশীয় সৈন্যই ছিল। জুলাই মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে বিদ্রোহের নানা রকম সংবাদ একে একে দানাপুরে উপস্থিত হলো। সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জনরবও। সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করেছে। কানপুরের সমস্ত ইংরেজ সিপাহীদের হাতে নিহত হয়েছে। লক্ষ্ণৌর অবস্থা বিপজ্জনক। আগ্রা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রায় সর্বত্রই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন বিহারে এই সব সংবাদ এসে পৌছতে লাগল। বিহারের লোকে এই সংবাদে স্থির থাকতে পারল না। দানাপুরের সিপাহীরাও এই সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিহারের জনসাধারণের দৃষ্টি তখন দানাপুরের সিপাহীদের ওপর। কলকাতার ইংরেজেরা দানাপুরের সিপাহীদের নিরস্ত্র করবার জন্যে এইবার গভর্ণমেণ্টের ওপর বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগল। তখন লর্ড ক্যানিং দানাপুরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতিকে লিখলেন যে যদি দরকার হয় তাহলে তিনি কিছু ইংরেজসৈন্য সেখানে পাঠাতে পারেন।

২৪শে জুলাই।

দানাপুর সেনানিবাসের অধ্যক্ষ জেনারেল লয়েড সিপাহীদের নিরস্ত্র করবার চেয়ে তাদের বন্দুকের ক্যাপ ইংরেজ সৈন্যদের অধিকারে রেখে দেওয়াই ঠিক করলেন। যদি ক্যাপই না পায়, তবে বন্দুক থাকলেও সিপাহীরা কোনো

অনিষ্ট করতে পারবে না—এই রকম সাব্যস্ত করে তিনি প্যারেডের আদেশ দিলেন। তার আগের দিন পাটনার পীর আলির ফাঁসীর সংবাদ দানাপুরে এসে পৌছল। সেই সংবাদে স্বভাবতই এখানকার সিপাহীদের চঞ্চল করে তুললো। সিপাহীরা যখন শুনল যে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে পীর আলি বলে গিয়েছে: "আমায় ফাঁসী দিতে পার, কিন্তু আমার জায়গায় হাজার হাজার লোক দাঁড়াবে"—তখন তাদের চেতনায় বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। পীর আলির বীরত্বের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে দানাপুরের তিন দল সিপাহীই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারা প্যারেডের মাঠেই ক্যাপ কেড়ে নেওয়ার জন্যে প্রতিবাদ জানাল। তাদের সামনে পেছনে সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। বিদ্রোহীরা কিন্তু ভয়শূন্য। প্যারেডের মাঠেই দাঁড়িয়ে সিপাহীরা সামরিক পোষাক পরিত্যাগ করল। যাবার সময়ে ক্যান্টনমেণ্টের ম্যাগাজিন থেকে কিছু অস্ত্র নিয়ে তারা দানাপুর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বর্ষায় স্ফীত দুরন্ত শোন নদী নির্বিঘ্নে পার হয়ে, বিদ্রোহীরা শাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরাতে পৌছল। পলায়িত সিপাহীদের বাধা দেবার জন্যে ইংরেজ সৈন্যরা সজ্জিত হলো। কিন্তু সিপাহীরা বিনা বাধায় আরায় পৌছল।

আরাতে পৌছে বিদ্রোহীরা সেখানকার বিদ্রোহীদলের অকুণ্ঠ সহায়তা পেল। সেই দলের যিনি নায়ক ছিলেন তাঁর নাম কুমারসিংহ। এই বর্ষীয়ান ও তেজস্বী ভূম্যধিকারী বিহার-বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। যৌবনে কুমার-সিংহ মহাপরাক্রান্ত বীর ছিলেন। এই বৃদ্ধ রাজপুত সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক। বিদ্রোহের সময়ে কুমারসিংহের বয়স ছিল আশী বছর। সমগ্র বিহারে আজো তাঁর নাম বিলুপ্ত হয়নি। সমগ্র বিহারের অধিবাসিগণ আজ পর্যন্ত তাঁর অসামান্য বীরত্বের কথা বিস্মৃত হয়নি। বিহারে বিদ্রোহীদের প্রেরণা ছিলেন এই বৃদ্ধ রাজপুত। ঐতিহাসিক গাবিনস্-এর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিভিন্ন ইংরেজ লোক কুমারসিংহের চরিত্র বিভিন্ন ভাবে চিত্রিত করেছেন। কেউ তাঁকে দেখিয়েছেন একজন রাজভক্ত ভূম্যধিকারী হিসাবে, আবার কেউ তাঁকে দেখিয়েছেন রাজবিদ্রোহীরূপে। তবে প্রকৃত কথা, কুমারসিংহ প্রথমজীবনে রাজভক্ত ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর স্বার্থ, লিপ্সা এবং অবিচার তাঁকে ইংরেজের একজন পরম শত্রু করে তুলেছিল।

কুমারসিংহ আরা জেলার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। জগদীশপুরে এঁর পৈতৃক আবাস। ইতিহাসে তাই তিনি জগদীশপুরের কুমারসিংহ বলে পরিচিত। তাঁর নামে একদা আরেতের রাজধানীতে ইংরেজদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হতো। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাহস ও তেজস্বিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাজপুত যুবককে ইংরেজ কোম্পানী চিরকাল শ্রদ্ধা ও সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। অস্ত্রচালনায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ। তাঁর প্রতাপে বিহারের জনসাধারণ সর্বদা তটস্থ থাকত। তাঁর প্রতিকূলে কেউই কোন কথা বলতে সাহস করত না, বা কোন কাজ করতে অগ্রসর হত না। কুমারসিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেউ বিপদগ্রস্ত হলে তাঁর নামে দোহাই দিত। কথিত আছে যে, কুমারসিংহের নামে সত্যিই বিপন্নের যেমন বিপদুদ্ধার হতো, তেমনি দুঃখীর দুঃখমোচন ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় লাভ হতো। ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্যক অবগত ছিলেন বলেই, বহু ব্যাপারে তাঁরা এই বর্ষীয়ান রাজপুতের সাহায্য ও পরামর্শ নিতেন। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক প্রশান্ত দেহকান্তি দেখে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হতো।

রেভিনিউ বোর্ডের অন্যায় বিচারই কুমারসিংহকে ধীরে ধীরে ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুলছিল। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলে, বিপুল জমিদারীর আয় থেকে কুমারসিংহের ব্যয় সঙ্কুলান হতো না। প্রায়ই তিনি এই জন্য মহাজনদের কাছ থেকে বেশী সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন। তাঁর দানের পাত্র বহু ইংরেজ-রাজপুরুষও ছিলেন। এইভাবে তাঁর অনেক টাকা ঋণ হয় এবং কালক্রমে কুমারসিংহ ঋণজালে এমন আবদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তার থেকে নিষ্কৃতিলাভ করা তাঁর একান্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ঋণের দায়ে এক একবার তাঁর বিশাল জমিদারী নিলামে উঠতে থাকে। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট কুমারসিংহের জমিদারী রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের জন্যে এই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। কুমারসিংহ একজনের কাছ থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা নিয়ে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করেন ; কিন্তু যথাসময়ে তিনি এই কুড়ি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারেন না। তখন রেভিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশনার মারফৎ কুমারসিংহকে জানালেন যে, যদি এক মাসের মধ্যে সব টাকা না পাওয়া যায়, তা'হলে বোর্ড, গভর্ণমেণ্টকে তাঁর জমিদারীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক

পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করবেন। কুমারসিংহ এতে দুঃখিত হলেন। ইংরেজের ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর মনে এই প্রথম সন্দেহ দেখা দিল। ক্রমে সেই সন্দেহ বিরাগে পরিণত হয়। জীবনের শেষ বয়সে এই রকম ঋণদায়গ্রস্ত হওয়াতে কুমারসিংহের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা ও অশান্তি দেখা দেয়। এমনিতেই তিনি একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে পারিবারিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন। এই সময় থেকেই কুমারসিংহের ওপর রাজপুরুষদের সন্দেহ হতে থাকে। ঠিক এমন সময়ে দেখা দিল সাতান্নর বিপ্লব। ইংরেজ ভাবলে কুমারসিংহ এর সুযোগ নিতে পারেন—হয়ত তিনি দেশব্যাপী এই বিদ্রোহের সুযোগে নিজের ক্ষমতায় সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করতে পাওনাদারদের নিরস্ত করতে পারেন এবং আবার হয়ত তিনি তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পেতে পারেন। এই আশঙ্কা করেই বিদ্রোহের প্রাক্কালে পাটনার কমিশনার টেলার সাহেব কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেলকে লিখলেন—জগদীশপুরের কুমারসিংহ বিপ্লবপ্রয়াসী। উত্তরে লর্ড ক্যানিং নির্দেশ দিলেন—কুমারসিংহের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন।

ক্রমে রাজপুরুষদের মিথ্যা সন্দেহ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধ রাজপুতকে ঘোরতর ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুললো। তিনি গোপনে দানাপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহে প্রেরণা দিতে লাগলেন। বিদ্রোহের সূচনাতেই কানপুর থেকে একদিন নানাসাহেবের এক বিশ্বস্ত দূত এসে কুমারসিংহকে একখানি গোপন পত্র দিয়ে যায়। উক্ত পত্রে আসন্ন বিদ্রোহে বিহার যাতে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে, সেজন্য নানাসাহেব কুমারসিংহকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতব্যাপী বিদ্রোহ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা বিঠুরে বসে বিরচিত হয়েছিল তার একটা প্রতিলিপিও পাঠিয়ে দেন। পত্রের শেষে নানাসাহেব লিখেছিলেন—"শতাব্দীব্যাপী কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটাইবার এই সুযোগ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই আমাদের প্রথম সংগ্রাম। রাণা প্রতাপসিংহের বংশধর আপনি। ইংরাজ আপনার প্রতি যেরূপ অবিচার করিয়াছে, আমার প্রতিও সেইরূপ করিয়াছে। অতএব আসুন, আমরা পরস্পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি। এই শতবর্ষব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রতিকার অস্ত্রের মুখেই সম্ভব। কোম্পানীর দেশীয় ফৌজ এই বিদ্রোহে

আমাদের প্রধান সহায়; দানাপুরের সিপাহীরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে, জানিবেন।"

একদিন আরার কলেক্টর সাহেব কুমারসিংহের অনুপস্থিতিতে জগদীশপুরের প্রাসাদ খানাতল্লাস করলেন। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেল না। দানাপুরের সিপাহীদের সঙ্গে কুমারসিংহের গোপন পত্র বিনিময়ের কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। তবু ইংরেজ এই বৃদ্ধ রাজপুতের নামে শঙ্কিত। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রাসাদ খানাতল্লাসী করায় কুমারসিংহ ভীষণ বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করলেন। এমন সময়ে কমিশনার টেলার সাহেব তাঁকে পাটনায় ডেকে পাঠালেন। ইতিপূর্বে কমিশনার কি কৌশলে পাটনার মুসলমান সমাজের সম্মানিত মৌলবীদের আটক করেছিলেন, সে সংবাদ কুমারসিংহ অবগত ছিলেন। বিচক্ষণ রাজপুত বুঝলেন যে, মৌলবীদের মত তাঁকেও অবরুদ্ধ করা হবে। কুমারসিংহ কমিশনারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। এই প্রত্যাখ্যান গভর্ণমেণ্ট যে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে না, এ তিনি জানতেন এবং জেনে শুনেই, জীবন-সায়াহ্নে বার্ধক্যের অবসাদ ও জড়তা ভুলে গিয়ে, বৃদ্ধ রাজপুত অসীম শক্তিশালী ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন এবং স্বয়ং বিদ্রোহীদের পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহ তাঁর সহকারী হলেন।

দেখতে দেখতে সমগ্র বিহার বিপ্লবের আবর্তে বিঘূর্ণিত হয়ে উঠল।
দানাপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা জগদীশপুর থেকে ক্ষিপ্রপদে আরায় এল। শাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা। নগরে প্রবেশ করে বিদ্রোহীরা প্রথমে জেলখানার কয়েদীদের খালাস করল, সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করল এবং তারপর আতঙ্কগ্রস্ত ইংরেজরা যে-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়ি অবরোধ করল। কিন্তু যুদ্ধের উপযুক্ত উপকরণ না থাকায় এবং ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গটি খুব সুরক্ষিত থাকায়, সিপাহীরা বিশেষ কিছু করতে পারল না। দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে কুমারসিংহের কামান দুটিও এ সময়ে বিশেষ কার্যকরী হলো না। এ-দিকে দানাপুর থেকে কাপ্তেন ডানবারের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য ষ্টীমারে করে আরার দিকে রওনা হলো। আরার

কুমার সিংহ

বিদ্রোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মেলিসন লিখেছেন : "অপরিসীম কষ্টে ডানবারের সেনাদল ২৮শে জুলাই সন্ধ্যাকালে আর নগরের তীরভূমি প্রাপ্ত হয়। তখন রাত্রি হইয়াছে, চারদিকেই ঘোর অন্ধকার। সারা রাত্রি পথ চলিয়া ইংরেজ সৈন্য রাত্রি দ্বিপ্রহরে একটা নিবিড় আম্রকাননের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা পূর্ব হইতেই লুকাইয়া ছিল, ইংরেজ সেনাদলের সাদা সাদা ইউনিফর্ম অন্ধকারেও চিনিতে পারিয়া বিদ্রোহীরা অনবরত গুলি চালাইতে লাগিল। প্রথমেই কাপ্তেন ডানবার নিহত হইলেন। অন্ধকারে শত্রুপক্ষের গুলিতে সৈন্যদলের অনেকেই ভূশায়ী হইল। সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্য আরায় না গিয়া ষ্টীমারের দিকে ছুটিল। কিন্তু সেখান হইতে ষ্টীমার বার মাইলের পথ। বিদ্রোহীরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ইংরেজ সৈন্যরা নৌকায় আরোহণ করিলে বিদ্রোহীরা নৌকায় আগুন ধরাইয়া দিল, অনেকে পুড়িয়া মরিল, অনেকে জলে ডুবিয়া মরিল। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, আবার বাকী সৈন্যের উপর চারিদিক হইতে গুলি পড়িতে লাগিল। চারি শত সৈন্যের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশজন জীবন লইয়া ষ্টীমারে পৌছিল।

২৯শে জুলাই পরাজিত সেনাদল দানাপুরে পৌছল। দানাপুরের ইংরেজরা বিজয়ী সেনাদলকে সাদরে অভ্যর্থনা করবার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সে উৎসাহ আর রইল না। এই সময়ে ভিনসেন্ট আয়ার সসৈন্যে কলকাতা থেকে এলাহাবাদে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এই ভীষণ পরাজয়ের সংবাদ শুনে তিনি দানাপুর থেকে নিজের সৈন্য ও কয়েকটি কামান নিয়ে ৩০শে জুলাই আরার দিকে যাত্রা করলেন। ভিনসেন্ট আয়ার ষ্টীমারযোগে শোণনদ পার হয়ে আর এক সীমাভাগে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর সঙ্গে দু'শো য়ুরোপীয় সৈন্য। গোলা-বারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম বহন করবার জন্য গরুর গাড়ি ছিল। বর্ষাকালের জলে ও কাদায় গরু চলতে পারে না। বিষম দুর্দশা। মাঠে তখন কৃষকেরা গরু নিয়ে লাঙল চালাচ্ছিল। ভিনসেন্ট আয়ার সেই সব গরুর লাঙল জোয়াল খুলে নিজেদের গাড়িতে জুড়ে দিলেন। মাঠের গরু কখনো গাড়ি টানেনি, অনেক কষ্টে তাদেরকে গাড়ি টানতে বাধ্য করা হয়। বিদ্রোহীদের আড্ডা আমবাগানে। পথেই যুদ্ধ

হলো। বিদ্রোহীদের বন্দুকে গুলিবৃষ্টি, তাদের কামান ছিল না। বন্দুক ও তলোয়ার ভরসা। ইংরেজ গোলন্দাজেরা কামানে গোলাবর্ষণ করতে থাকে, কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ কুমারসিংহের বীরত্বে ইংরেজ সৈন্যকে বিশেষ বিব্রত হতে হলো। কুমারসিংহের সৈন্যরা গাছের অন্তরাল থেকে গুলি চালায়, আয়ার পুরোভাগে কামান রেখে, বিপক্ষের দিকে তোপ দাগবার হুকুম দিলেন। সংখ্যায় বিদ্রোহীরা বেশী, কিন্তু কামানের মুখে বন্দুক কতক্ষণ? বিদ্রোহীরা তাই বেশীক্ষণ বিপক্ষের গতিরোধ করতে পারল না। তোপের মুখে তারা ক্রমাগত হটতে লাগল। ইংরেজ সেনাপতি অগ্রসর হতে লাগলেন। শেষ যুদ্ধ হলো একটা ছোট্ট নদীর ধারে। নদীর অপর তটে বিবিগঞ্জ পল্লী। নদী পার হবার জন্য যে সেতু ছিল, কুমারসিংহ তা ভেঙে ফেলেছিলেন। আয়ার নদী পার হতে পারলেন না। তিনি দক্ষিণদিকে ফিরে রেলপথের বাঁধ অতিক্রম করে একটা সড়ক পেলেন। ঐ সড়ক দিয়ে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। কুমারসিংহ এখানেও তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। বিবিগঞ্জের সন্নিহিত ভূখণ্ডে দুই পক্ষে সেদিন তুমুল যুদ্ধ হলো। বিবিগঞ্জের এই যুদ্ধের বিবরণ ঐতিহাসিক মিচেল দিয়েছেন এইভাবে :

"বাঁধের নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। ইংরেজ সেনাপতি বাঁধ ছাড়াইয়া, আবার পথে উপস্থিত হইতে না হইতেই, কুমারসিংহ ঐ বন অধিকার করিলেন। মুহূর্তমধ্যে বনের অন্তরাল হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। গুলির পর গুলির আঘাতে আয়ারের সৈন্যদল বিব্রত হইয়া পড়িল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমারসিংহ প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। বৃদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া, ইংরেজ সেনাপতি চমকিত হইলেন। শীঘ্রই ইংরেজের কামান কুমারসিংহের হস্তগত হইল। তখন ইংরেজ সৈন্য সঙ্গীন দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইংরেজদের সঙ্গীনের সম্মুখে সিপাহীরা বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।…৩রা আগষ্ট সকাল বেলায় আয়ার সসৈন্যে আরায় উপনীত হইলেন। আরার অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আনন্দিত হইল।"

এইবার ইংরেজের দৃষ্টি পড়ল জগদীশপুরে।

কুমারসিংহের রাজধানী জগদীশপুর।

পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—এই তিন রকম সৈন্য মিলিয়ে আয়ারের বাহিনীর সংখ্যা তখন প্রায় পাঁচশো। সেই পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও ছিল তাঁর। এই সব নিয়ে তিনি ১১ই আগষ্ট জগদীশপুরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। কুমারসিংহ তখন জগদীশপুরে। তাঁর সুপ্রশস্ত প্রাসাদের অভ্যন্তরে তিনিও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। নিজস্ব সৈন্যবলও ছিল তাঁর যথেষ্ট। জগদীশপুরে যাবার পথে এক বিশাল অরণ্য। সেই অরণ্য ভেদ করে নগরে প্রবেশ করবার রাস্তা। কুমারসিংহ জঙ্গলের মাঝখানে এক জায়গায় সৈন্য সন্নিবেশ করে, বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা করলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হলো না। ইংরেজের কামানের মুখে অনেক বিদ্রোহী নিহত হলো। এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা জগদীশপুরের দিকে পালিয়ে গেল। বেলা একটার সময়ে ইংরেজ সেনারা কুমারসিংহের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করল। নগরের অনেক লোক ইতিমধ্যেই পালিয়েছিল। কুমারসিংহ কোথায়? ইংরেজেরা সেদিন তাঁর কোনো সংবাদ পেল না। পরের দিন সকালে জানা গেল কুমারসিংহ জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পরে সংবাদ এল কুমারসিংহ তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সাসারামে চলে গিয়েছেন। তাঁকে ধরতে না পেরে ইংরেজ সেনাপতি হতাশ হলেন।

কুমারসিংহ নেই, কিন্তু তাঁর বাসভবন রয়েছে। ইংরেজের পক্ষে তাই যথেষ্ট। বারুদ দিয়ে তাঁর প্রাসাদ ভূমিসাৎ করে ফেলা হলো। অন্তঃপুরের মহিলাদের তিনি পূর্বেই স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পবিত্র দেবালয়ও ইংরেজদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। কুমারসিংহ বহু অর্থব্যয় করে একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি তা বিনষ্ট করে ফেললেন। প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির সঙ্গে মন্দিরটি ধ্বংস হওয়াতে বৃদ্ধ রাজপুতের প্রাণে মর্মান্তিক বেদনা লেগেছিল। কুমারসিংহের দুই ভাই অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাসভবনও ঐভাবে বিধ্বস্ত করা হয়। জগদীশপুরের কিছু দূরে জৌতরা নামক স্থানে কুমারসিংহের আর একটি প্রাসাদ ছিল। সেনাপতি আয়ার সৈন্য পাঠিয়ে সেটাও নষ্ট করে ফেললেন। কিন্তু এইখানেই ইংরেজরা নিরস্ত হলো না। তারা জগদীশপুরের আশেপাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বহু পল্লীবাসিকে নিহত করল। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের শব গাছে গাছে লটকিয়ে

দেওয়া হলো। তারপর ইংরেজ সৈন্য দানাপুরে ফিরে গিয়ে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতে লাগল; কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে তারা পল্লীদাহে, নরহত্যায় ও লুণ্ঠনে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে লাগল। বহু শ্যামল পল্লী শ্মশানে পরিণত হলো।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হলো।

কুমারসিংহের প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও দেবালয় মাটীতে মিশিয়ে গেল। সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হলো। সিপাহীরা পরাজয় স্বীকার করল। কিন্তু কুমারসিংহ ইংরেজের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন না। আগেই বলা হয়েছে, কুমারসিংহ সাসারামের কাছে এক পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর নামের এক আশ্চর্য শক্তি ছিল। তাঁর নামে—তাঁর উৎসাহ ও উত্তেজনায় বিহারের বহু স্থানের সিপাহীর হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। বহু যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। ইংরেজরা বিস্ময়ে শুধু ভাবত—এই বৃদ্ধ রাজপুতের শরীরে এখনো এত শক্তি, মনে এত উৎসাহ! তিনি যেখানে গিয়েছেন সেইখানকার সিপাহীরাই কুমারসিংহের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ সেই সময়ে সমগ্র বিহারে কোম্পানীর দেশীয় ফৌজের মধ্যে তাঁর প্রভাব ইংরেজদের মনে সময়ে সময়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করত।

কুমারসিংহ দিল্লী যাবেন ঠিক করলেন, কিন্তু পথে সেখানকার সিপাহীদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি অযোধ্যার দিকে গেলেন। এখনো তিনি যুদ্ধ করবেন এবং সেই আশায় কুমারসিংহ যখন মধ্য ভারতবর্ষ ও উত্তর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন বিভিন্ন দলের বহু সিপাহী তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল। ক্রমেই নানাস্থান থেকে ভালো ভালো অস্ত্রাদি সংগৃহীত হতে থাকে। যখন তাঁকে আবার ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তখন তাঁর যুদ্ধের সরঞ্জাম অল্পই ছিল। যখন তিনি পৈতৃক আবাসভূমি জগদীশপুর পরিত্যাগ করেন, তখনো কুমারসিংহের অস্ত্রাদির যেমন অভাব, অনুচর ও সৈন্যের সংখ্যা সেইরকম অল্প ছিল। এখন আর সে অভাব নেই। এখন তিনি তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আজমগড় আক্রমণে উদ্যত হলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে আজমগড়ের পর, এলাহাবাদ বা বারাণসী আক্রমণ করবেন, এবং সেখান থেকে তাঁর জন্মভূমি জগদীশপুরে পৌছবেন।

আজমগড়।

এখানে ইংরেজদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। জগদীশপুরে পরাজয়ের আট মাস পরে কুমারসিংহ সসৈন্যে এসে বাজপাখীর মতন হঠাৎ একদিন এই ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। এই সময়ে এখানে দুশো য়ুরোপীয় পদাতিক সৈন্য, কিছু মাদ্রাজী অশ্বারোহী আর দুটো কামান ছিল। কর্ণেল মিলম্যান ছিলেন এখানকার অধিনায়ক। কুমারসিংহের সৈন্যসংখ্যা মিলম্যানের সৈন্যসংখ্যার চার-পাঁচগুণ। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হতে পারলেন না। তাঁর সৈন্যসংখ্যা অল্প, তারা কুমারসিংহের গতিরোধ করতে পারল না। তিনি প্রবল পরাক্রমে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিপক্ষের বহু সৈন্য নিহত ও আহত হলো। মিলম্যান উদ্বিগ্নচিত্তে সাহায্য পাওয়ার জন্য বারাণসী, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে সংবাদ পাঠালেন। আজমগড়ের সৈন্যগণ আত্মরক্ষার জন্য তাদের চারদিক সুরক্ষিত করল।

এই প্রসঙ্গে মেলিসন লিখেছেন: "শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরে আত্রৌলি গ্রামের নিকটে মিলম্যান কুমারসিংহের বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে গেলেন। কিন্তু সেই রাজপুত নায়কের বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে তিনি বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। ইংরেজ কর্ণেল পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। (কুমারসিংহ আজমগড় অধিকার করিলেন। (২২ শে মার্চ, ১৮৫৮)। এই পরাজয়ের দারুণ প্রতিক্রিয়া ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল; বিশেষ করিয়া এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে জয়লাভের পর আজমগড়ে এই পরাজয় ইংরেজের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

বারাণসী ও গাজিপুর থেকে কিছু নতুন সৈন্য কর্ণেল ডেমস্-এর অধীনে এসে পৌঁছল। কিন্তু তিনিও কুমারসিংহের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হলেন না। আজমগড় পতনের সংবাদ যখন এলাহাবাদে পৌঁছল, লর্ড ক্যানিং তখন ঐখানে ছিলেন। তিনি খুব উদ্বিগ্ন হলেন। কুমারসিংহের প্রতিপত্তি, সাহস ও পরাক্রম তাঁর অজানা ছিল না। গভর্ণর-জেনারেল বুঝতে পারলেন যে, জগদীশপুরের বৃদ্ধ রাজপুত যেমন কৌশলী এবং সামরিক কার্যে যেমন অভিজ্ঞ, তার ওপর অযোধ্যার উত্তেজিত সিপাহীরা প্রতিদিন যেভাবে তাঁর দল পরিপুষ্ট করছে, তাতে তিনি আজমগড় অধিকার করার পর, প্রবল পরাক্রমে একাশী মাইল পথ অতিক্রম করে কাশীতে নিজের আধিপত্য স্থাপনে

সমর্থ হবেন। লর্ড ক্যানিং অবিলম্বে প্রতীকারের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। কুমারসিংহের গতিরোধ করবার জন্যে তিনি কাশী ও এলাহাবাদ থেকে প্রচুর সৈন্য আজমগড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। লক্ষ্ণৌ থেকেও কিছু সৈন্য পাঠান হলো।

আজমগড়ের পথে তমসানদী। নদীতে একটি নৌসেতু। সেতুমুখে কুমারসিংহ কিছু বাছাই-করা সৈন্য সাজিয়ে রাখলেন। বাকী সৈন্য গাজীপুরের কাছে গঙ্গা পার হয়ে জগদীশপুরে গিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করবে, এই রকম ঠিক হলো। ইংরেজ তাঁকে প্রচুর সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে, এই সংবাদ পেয়ে কুমারসিংহ আজমগড় থেকে একটু দূরে নঘাই নামক পল্লীতে শিবির সন্নিবেশ করলেন। তিনি জানতেন যে, ইংরেজ-সৈন্য তাঁর পেছনে আসবে। ইংরেজ-সৈন্য তিন-চার মাইলের মধ্যে এসে পড়তেই কুমারসিংহ সেই রাত্রেই শিবির তুলে সেকেন্দরপুরের দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখান থেকে বিনা বাধায় ঘর্ঘরা নদী উত্তীর্ণ হলেন। সেখান থেকে তিনি গেলেন মান্নাহার। সর্বত্রই ইংরেজসৈন্য তাঁকে সমানে অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু কিছুতেই তারা বিদ্রোহীদের শক্তি পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হলো না। অবশেষে কুমারসিংহ গঙ্গা পার হয়ে গাজীপুর যাবার সংকল্প করলেন। ইংরেজেরা গাজীপুরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় যত নৌকা ছিল, সেগুলো ডুবিয়ে রেখে দিল। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা কুমারসিংহের একান্ত অনুরক্ত ছিল। তারা নিমজ্জিত নৌকার সন্ধান বলে দিল। কুমারসিংহ কয়েকখানি নৌকা উঠিয়ে, রাত্রিশেষে গঙ্গা পার হলেন।

সকালবেলা।

গঙ্গা পার হয়ে কুমারসিংহ পাল্কীতে চড়ে যাচ্ছেন। তাঁর পেছনে বসে আছেন নেপালের রণদলন সিংহ। সবেমাত্র ভোরের আলো এসে তাঁর দেহে পড়েছে, অমনি একজন অনুচর কুমারসিংহের মাথায় ধরল রাজছত্র। ইতিমধ্যে ইংরেজসৈন্য গঙ্গার তটে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা অবিলম্বে কুমারসিংহের ছত্র লক্ষ্য করে কামান ছুড়ল। ছত্রধর ও পার্শ্বচর নিহত হলো। কুমারসিংহ জানুদেশের ওপর বাহু রেখে, দক্ষিণ করতলে দক্ষিণ কপোল বিন্যস্ত করে, হাওদার ওপর বসেছিলেন। গোলার আঘাতে তাঁর বাহুর সন্ধিস্থল ভেঙে গেল এবং উরুদেশের খানিকটা মাংস উড়ে গেল। কুমারসিংহ হাওদায় অচৈতন্য

হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান হলো তখন বৃদ্ধ রাজপুত অনুচরদের বললেন, "আমার ডান হাতখানা কেটে গঙ্গার জলে ফেলে দাও।" তাই করা হলো। তারপর একখানা খাটিয়ায় শুয়ে তিনি অনুচরসহ জগদীশপুরে উপস্থিত হলেন। সিংহ তাঁর বিধ্বস্ত গুহায় ফিরলেন শুধু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্যে।

প্রাসাদের বেশীর ভাগ তখন ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে। আহত কুমারসিংহ একটি বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলেন। তাঁর ভাই অমরসিংহ তখন কয়েক হাজার সিপাহী নিয়ে এইখানে বাস করছিলেন। অমরসিংহের সৈন্য কুমারসিংহের সৈন্যদলের সঙ্গে সম্মিলিত হলো। এদিকে কাপ্তেন লে গ্রাণ্ড আরা থেকে সৈন্য নিয়ে জগদীশপুর অভিযান করলেন। কিন্তু জগদীশপুরের কাছে কুমারসিংহ ও অমরসিংহের সিপাহীরা এমন প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁকে আক্রমণ করল যে, প্রায় দেড়শ সৈন্যসহ ইংরেজ কাপ্তেন নিহত হলেন। বাকী সৈন্য বেগতিক দেখে আবার পালিয়ে গেল। প্রায় এক বছর আগে এই কাপ্তেন লে গ্র্যাণ্ড তাঁর প্রাসাদ ধ্বংস করেছিলেন। আজ নিজের সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত চিরপ্রিয় আবাসস্থলে গিয়ে এবং লে গ্র্যাণ্ডকে পরাজিত ও নিহত করে, বৃদ্ধ রাজপুত প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করলেন।

কুমারসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অমরসিংহ বিহারের বিদ্রোহ পরিচালনা করতে লাগলেন। অমরসিংহের সঙ্গেও ইংরেজপক্ষের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হয়। অরণ্যময় দুর্গম পথে তাঁর হাতে ইংরেজসৈন্য বারবার পর্যুদস্ত হয়। তিনি একস্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে ব্যূহ সন্নিবেশ করতেন এবং তাঁর সৈন্যরা যেখানে ইংরেজদের দেখতে পেত, সেইখানেই তাদের আক্রমণ করত। ইংরেজ সেনানায়করা তাদের কিছুই করে উঠতে পারলেন না। বিদ্রোহীরা একবার নিবিড় অরণ্যে অদৃশ্য হয়, আর একবার সহসা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ইংরেজদের বিব্রত করে তোলে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এই রকম গোরিলা যুদ্ধ আর একজন দেখিয়েছিলেন। তিনি মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপি। অবশেষে বিদ্রোহীরা গয়ার জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে ইংরেজদের শহর থেকে বিতাড়িত করল। তখন সেনানায়ক ডাগ্‌লাস্‌ সাত হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এই বিপুল

সৈন্য নিয়েও তিনি দু'মাসের মধ্যে অমরসিংহের বিশেষ কিছু করতে পারলেন না।

তখন স্যার হেনরী হ্যাভলক নতুন কৌশলে অমরসিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শোণের তটে তিনি বিদ্রোহীদের গতিরোধ করলেন। ইংরেজপক্ষের তিন হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য ছ মাস কাল অবিরাম চেষ্টা করে যা সম্পন্ন করতে পারেনি, হ্যাভলকের কৌশলে তাই সম্পন্ন হলো। একদিকে ডাগ্‌লাস, অন্যদিকে হ্যাভলক, বিদ্রোহীরা মাঝখানে আবদ্ধ হলো। এইভাবে ক্রমাগত সাত মাস যুদ্ধের পর অমরসিংহের সিপাহীদলের পরাজয় ঘটে এবং জগদীশপুর সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের করায়ত্ব হয়। এতদিনে ইংরেজ শাহাবাদে নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হতে পারল।

বিহার-বিদ্রোহে জগদীশপুরের সিংহের গর্জনে লর্ড ক্যানিং-এর পর্যন্ত হৃৎকম্প হয়েছিল। কুমারসিংহ এবং অমরসিংহের যুদ্ধকৌশল ও অকুতোভয়তা একাধিক ইংরেজ ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন। সাত-আটজন ইংরেজ সেনানায়ক হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে অমরসিংহকে সহজে পরাজিত করতে সক্ষম হন নি। কুমারসিংহ ও অমরসিংহ পরিচালিত বিহারের বিদ্রোহ তাই ইংরেজকে সেদিন বিচলিত করে তুলেছিল। আজ শতবর্ষ পরে সেই অনমনীয় বীরত্বের আধার কুমারসিংহ ও অমরসিংহকে আমরা আবার স্মরণ করি। স্মরণ করি জগদীশপুরের সেই দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে যাঁরা একদিন বলতে পেরেছিল—সারে হিন্দুস্থানমে কোম্পানী সরকারকো বরবাদ কর দেঙ্গে—সারা হিন্দুস্থানে আমরা কোম্পানী-রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করব। ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত সেই বৃদ্ধ রাজপুত—সিপাহীযুদ্ধের সেই অন্যতম নির্ভীক নায়কের স্মৃতি ভারতবাসীর মানসপটে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকবে।

॥ বাইশ ॥

"ইংরেজের রাজত্ব গেল।"

"আর তারা এদেশে থাকতে পারবে না।"

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সকল জেলাতেই লোকের মুখে মুখে এই কথা। সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, আতঙ্ক আর জনরব। সকল জেলাতেই নিরীহ লোকের প্রাণের ভয়।

আবার সর্বত্রই তেমনি স্বাধীনতা লাভের জন্যে দুর্দমনীয় আকাংখা। শহরে, জনপদে, পল্লীগ্রামে এক নতুন চাঞ্চল্য। এক নতুন জাগরণ। সকলের কাছেই ফিরিঙ্গী বণিক ভারতের শত্রু। হাটে-বাজারে সর্বত্রই বিদ্রোহের আলোচনা। সারা ভারতবর্ষই যেন উদ্বেলিত। সহস্র কণ্ঠে একই ধ্বনি—ফিরিঙ্গী লোককো মারো। মিরাট থেকে আম্বালা, আম্বালা থেকে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ থেকে দিল্লী—সর্বত্র সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি। বিদ্রোহের ডমরুধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত। ইংরেজ কোম্পানীর পায়ের তলা থেকে মাটী যেন দিন দিন সরে যাচ্ছে। শতবর্ষ ধরে কৌশল আর চক্রান্ত দ্বারা যে সাম্রাজ্য তারা ভারত মহাসাগরের উপকূলে গড়ে তুলেছিল, আজ সেই সাম্রাজ্যসৌধ বুঝি ভেঙে পড়ে। মোগলের রাজধানীতে আজ স্বাধীন ভারতের পতাকা। 'দীন্ দীন্' রবে বিদ্রোহীরা ছুটে চলেছে সর্বত্র ; সর্বত্রই তাদের কামান আর বন্দুকের মুখে গর্জে উঠ্‌ছে দুটি কথা—ইংরেজ সাবধান!

বিদ্রোহের ভৈরব কল্লোল একদিন শোনা গেল রোহিলখণ্ডে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্যতম বিভাগ রোহিলখণ্ড সেদিন ইংরেজের দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুশ্চিন্তার কারণ রোহিলা পাঠান। যেমন তেজস্বী তেমনি স্বাধীনতাপ্রিয়। এদের কাছ থেকেই ইংরেজ কোম্পানী একদিন এই দেশ ছিনিয়ে নিয়েছিল। অতীতের সে-ইতিহাস, বিশেষ করে

রোহিলা-নারীদের ওপর ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী রোহিলা পাঠানেরা সহজে বিস্মৃত হয়নি। হাফেজ রহমতের স্বদেশপ্রেম আজো রোহিলাদের মনে প্রেরণা দেয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তারা শুধু দিন গুণছিল। সাতান্নর বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের যে কয়টি প্রধান কেন্দ্র ভারতে ছিল, তার মধ্যে রোহিলখণ্ডের রাজধানী বেরিলী অন্যতম। বেরিলী-বিদ্রোহ তাই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

রোহিলখণ্ডের পূর্ব ইতিহাস এখানে একটু উল্লেখযোগ্য। মোগল-রাজত্বের অধঃপতনের সময়ে এই প্রদেশ যুদ্ধপ্রিয় আফগানদের অধিকারে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে হাফেজ রহমতের অধীনে পাঠান রোহিলারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট হয়। অযোধ্যার নবাবের চক্রান্তে এবং ইংরেজদের সৈন্যবলে স্বাধীনতা-প্রিয় আফগানদের অধঃপতন হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কাত্রার যুদ্ধে হাফেজ রহমত নিহত হন। তারপর লর্ড লেকের সঙ্গে যুদ্ধে রোহিলখণ্ড ইংরেজের পদানত হয় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোহিলারা করভারে জর্জরিত হয়, তখন তারা একবার বিদ্রোহী হয়। সেই বিদ্রোহ দমন করতে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। বেরিলীর ব্যবসায়ীরা প্রধানত হিন্দু হলেও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী।

রোহিলখণ্ডের বড় শহর বেরিলী।

রোহিলখণ্ডের বৃহত্তম সেনানিবাস এইখানে।

বেরিলীতে ইংরেজ পলটন ছিল না। পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, সবই সিপাহী। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড ছিলেন এই সেনানিবাসের অধিনায়ক। এপ্রিল মাসের প্রথমেই চর্বি-টোটা উপলক্ষ্য করে সিপাহীদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের সেই চর্বি-টোটাই ব্যবহার করতে বাধ্য করেন। এই নিয়ে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন না, কিম্বা তাঁরা বিপদের কোনো আশঙ্কা করলেন না। মিরাটের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদ বেরিলীতে এসে পৌঁছল ১৪ই মে। তখন সেনানিবাসের কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন এবং তাঁদের সমস্ত পরিবারবর্গকে নৈনীতালে পাঠিয়ে দিলেন। অশ্বারোহী সিপাহীদের প্রস্তুত থাকতে বলা

হলো। ১৫ই মে প্যারেডের মাঠে সমস্ত সিপাহীদের সমবেত হতে বলা হলো। সেদিন ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড সিপাহীদের রাজভক্তি ও আনুগত্য সম্পর্কে নতুন করে উপদেশ দিলেন, অমূলক আশঙ্কায় অধীর হতে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, নতুন টোটা তাদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এই আশ্বাস বাক্যে বিশেষ কোন ফল হলো না; বরং সিপাহীরা বুঝল যে ইংরেজরা ভয় পেয়েছে। ইতিমধ্যে দিল্লীর খবরও এখানে পৌঁছে গেছে। মে মাস শেষ হতে না হতেই ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

৩১ শে মে বেরিলীর সিপাহীরা অশান্ত হয়ে উঠল।

তার দু'দিন আগে বেরিলীর অন্যতম সেনানায়ক কর্ণেল ট্রপ জানতে পারলেন যে, সিপাহীরা শীঘ্রই তাঁদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হবার শপথ গ্রহণ করেছে। তারা নাকি এখানকার ইংরেজদের সমূলে বিনষ্ট করবে। পদাতিক দলের সিপাহীরা নাকি গঙ্গার তীরে স্নান করতে করতে এই শপথ নিয়েছে। ভরসার মধ্যে একমাত্র অশ্বারোহী সিপাহীরা। তাদের ওপর কর্তৃপক্ষের গভীর বিশ্বাস। তাই তাদের সজ্জিত হবার আদেশ দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে ফিরোজপুরের উত্তেজিত সিপাহীরা দলে দলে বেরিলীতে উপস্থিত হয়ে নানা রকম কথায় এখানকার সিপাহীদের উত্তেজিত করে তুললো। বেরিলীর সিপাহীরা যখন এদের মুখে শুনল যে, বহুসংখ্যক ইংরেজসৈন্য, সিপাহীদের মারবার জন্যে অদূরে সজ্জিত রয়েছে, তখন তারা আর স্থির থাকতে পারল না। এই জনরব সেনানিবাসে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

৩০ শে মে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হলো।

৩১ শে মে, রবিবার। বেলা এগারটা। সহসা গোলন্দাজ সৈনিকনিবাসের দিকে কামানের শব্দ হলো। সেই শব্দে ইংরেজরা চমকে উঠল। তারা আশঙ্কায় আত্মহারা হলো। অশ্বারোহীদের ছাউনির পেছন আমবাগান। তোপের শব্দে শঙ্কিত ও চমকিত ইংরেজরা সেই আমবাগানের মধ্যে আশ্রয় নিল। দেখতে দেখতে তাদের আবাসস্থলে অগ্নি-শিখা গর্জন করে উঠল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে বাংলোর চালাগুলি খুব শুষ্ক ছিল। অগ্নি-সংযোগ হবামাত্র মুহূর্ত মধ্যে তা জ্বলে উঠল। এদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রজ্জ্বলিত পাবকের গতি বিস্তারে সহায় হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাংলোগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতঃপর উত্তেজিত সিপাহীরা ইংরেজদের জীবননাশে অগ্রসর হলো।

তাদের দৃষ্টিপথে যে কোনো ইংরেজ পড়ল, তাকেই তারা নির্বিচারে গুলি করতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড তোপের আওয়াজ শুনেই ঘোড়ায় চড়ে সিপাহীদের ব্যারাকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিদ্রোহীদের গুলির আঘাতে তিনি নিহত হলেন। বাকী ইংরেজ প্রাণের ভয়ে আমবাগান থেকে নৈনীতালের দিকে পালিয়ে গেলেন। বেরিলীতে বেসামরিক ইংরেজের সংখ্যা প্রায় দেড়শো। সকলের পক্ষে পালান সম্ভব হলোনা। অনেকেই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন। তারপর তাদের বাসগৃহ ভস্মীভূত ও ধনাগার লুণ্ঠিত হলো। কয়েদীরা মুক্তিলাভ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করল। ছয় ঘণ্টার মধ্যে বেরিলীতে ইংরেজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হলো।

রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্তা হাফেজ রহমৎ খাঁর বংশধর খাঁ বাহাদুর খাঁ এতদিনে তাঁর হৃতগৌরব ফিরে পেলেন। তিনি বেরিলীতে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সঙ্গে এসে হাত মেলালেন মোবারিক শাহ। রোহিলারা খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য স্বীকার করে নিল এবং তাঁকেই বেরিলীর শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করল। এই প্রসঙ্গে মেলিসন লিখেছেন: "গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মুসলমান খা বাহাদুর খাঁ, বেরিলির শাসনকর্তা হইয়াই খৃষ্টান নিধনে উদ্যত হইলেন। যেসব ইংরেজ আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহারা নবনিযুক্ত শাসনকর্তার সম্মুখে আনীত হইলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ স্বয়ং তাঁহাদের বিচার করিলেন। বিচারে তাঁহাদের ফাঁসি হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেন না। ...তারপর বৃদ্ধ রোহিলাপাঠান যাবনিক পতাকা উড়াইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক বেরিলীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিলেন। বক্ত খাঁ-কে তিনি নূতন সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন।"

রোহিলখণ্ড এখন স্বাধীন। দিল্লীর বাহাদুর শাহের কাছে এই বার্তা পাঠিয়ে দিলেন বেরিলীর নূতন শাসনকর্তা। সমগ্র রোহিলখণ্ডে খাঁ বাহাদুর খাঁর আধিপত্য ঘোষিত হলো।

বেরিলী-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে মোরাদাবাদ, শাজাহানপুর, বদায়ুন প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের রুদ্রমূর্তি দেখা দিল।

বেরিলীর আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মোরাদাবাদ।

১৬ই মে মিরাটের সংবাদ এখানে এসে পৌছল। উনত্রিশ নম্বর পলটনের একটা দল এখানে ছিল। কিছু গোলন্দাজ সৈন্যও। সাহেব উইলসন তখন মোরাদাবাদের জজ। এই বুদ্ধিমান সিভিলিয়ানকে লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর এই সময়ে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সিপাহীদের শান্তভাবে রাখবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু এই সময়ে এখানে নবাব নিজামুৎউল্লা খাঁ নামে একজন প্রভাবশালী বর্ষীয়ান মুসলমান বাস করতেন। কোম্পানীর সরকারে তিনি মুন্সেফ ছিলেন এবং এখন পেনশন ভোগ করছিলেন। শহরের সমস্ত মুসলমান তাঁর বাধ্য। তিনিই প্রথমে সিপাহীদের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন। একদল বিরক্ত ও উত্তেজিত মুসলমানের সঙ্গে তিনি শহরে প্রবেশ করে সিপাহীদের বিদ্রোহী হতে প্ররোচনা দেন, তাদের মধ্যে গুড়-মুড়ী বিতরণ করেন। নিজামুৎ উল্লার উচ্ছা ছিল, ইংরেজদের তাড়িয়ে দিল্লীর বাদশাহের নামে তিনি মোরা-দাবাদের শাসনকর্তা হবেন। সিপাহীরা অস্থির হলেও সহসা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে একটু সংকোচ বোধ করল। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য স্থান থেকে মোরাদাবাদে কিছু বিদ্রোহী সিপাহী এসে উপস্থিত হয় এবং তারা এখানকার সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করে। তারপর আর একদল গুপ্ত বিদ্রোহী এখানে এসে উনত্রিশ নম্বর পলটনের সিপাহীদের প্রধান প্রধান লোকদের নিজেদের মতে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। মোরাদাবাদের সিপাহীরা এবং জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই তখন জিজ্ঞাসা করেছিল, বেরিলীর খবর কী?

চারদিকের উত্তেজনামূলক জনরবের মধ্যে উইলসন মোরাদাবাদের সিপাহীদের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সফলকাম হলেন না। কিছুদিনের জন্য শহর শান্ত ও নিরাপদ ছিল। কিন্তু লুণ্ঠনপ্রিয় গুজরেরা তখন শহরের আশেপাশে উৎপাত করে বেড়াচ্ছিল। রামপুরের এক মৌলবী ছিল এদের নেতা। এই মৌলবীই প্রধানত মোরা-দাবাদের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে তাদের রাজভক্তির মূল শিথিল করে দিয়েছিলেন। ধর্ম, জাতি ও সম্মান রক্ষার কথা তুলে তিনি সিপাহীদের উত্তেজিত করে তুললেন। মোরাদাবাদে যখন ধর্ম ও জাতি-নাশের জনরব উঠল, তখন লোকে স্থির থাকতে পারল না। কোম্পানীর

মুলুকে চিরাচরিত ধর্ম ও চিরন্তন জাতীয় গৌরব বিলুপ্ত হবে—বিদ্যুতের বেগে এই ধারণা লোকের মনে দেখা দিল। মোরাদাবাদের সিপাহীরা বিচলিত হয়ে উঠল এবং পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, বেরিলীর খবর কী?

বেরিলী রোহিলখণ্ড বিভাগের সদর। কাজেই এর ওপর অন্যান্য স্থানের শান্তি নির্ভর করছিল। মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ, তাই বেরিলীর সংবাদ জানতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠলেন। অবশেষে জুন মাসের প্রথমেই বেরিলীর ডাক বন্ধ হলো। মোরাদাবাদের সৈনিক-নিবাসে জনরব উঠল যে, বেরিলীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। তারপর রামপুরের নবাবের প্রেরিত এক দূত যখন বেরিলী-পতনের দুঃসংবাদ নিয়ে এল, মোরাদাবাদের ইংরেজদের উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পেল। বেসামরিক ইংরেজ কর্মচারিরা মোরাদাবাদ পরিত্যাগ করে মিরাটে চলে গেলেন। সৈনিকদলের অফিসাররা সপরিবারে গেলেন নৈনীতাল। নৈনীতাল মিরাটের চেয়ে কাছে এবং তার পথও অধিকতর নিরাপদ। তারপর সুবাদার ভবানীসিংহ ও হাবিলদার বলদেব সিংহের নেতৃত্বে মোরাদাবাদের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যেসব ইংরেজ তখনও পর্যন্ত শহরে ছিল, বিদ্রোহীরা প্রথমেই তাদের আক্রমণ করল। কতক নিহত হলো, কতক মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করে বন্দিভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হলো। সরকারী ধনাগার লুণ্ঠিত হলো এবং জেলখানা ভেঙে প্রায় ছশো কয়েদীকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। মুক্ত কয়েদীরা বিদ্রোহীদের দল পরিপুষ্ট করল।

যেদিন বেরিলীতে বিপ্লব আরম্ভ হয় ঠিক সেই ৩১শে মে রবিবার শাজাহানপুরেও ঘোরতর বিপ্লব শুরু হয়। বেরিলী থেকে সাতচল্লিশ মাইল দূরে শাজাহানপুর। এইখানে ছিল আটাশ নম্বর পলটনের সিপাহীরা। কাপ্তেন জেমস ছিলেন এদের অধিনায়ক। যথারীতি দেওয়ানী বিভাগের কর্মচারীরাও ছিলেন। এ ছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে কিছু ইংরেজও এখানে বাস করতেন। মীরাটের খবর পনরই মে শাজাহানপুরে এল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের অধিবাসীদের মনে দেখা দিল উত্তেজনার লক্ষণ। কিন্তু সেনানিবাসের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেল না। সিপাহীদের ওপর তাঁদের অগাধ

বিশ্বাস ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল শহরের লোক উচ্ছৃঙ্খল হলেও সিপাহীরা তাঁদের পক্ষে থাকবে। এই বিশ্বাসের দরুণ তাঁরা নিরুদ্বেগ ছিলেন। শাজাহানপুরের বিপ্লব সম্পর্কে ঐতিহাসিক চার্লস বল্-এর বর্ণনা এই রকম :

"৩১শে মে রবিবার। শাজাহানপুরের অধিকাংশ ইংরেজ উপাসনার জন্য গির্জায় গিয়াছিলেন। যখন তাঁরা উপাসনায় রত, ঠিক সেই সময়ে সিপাহীরা তাঁদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবে অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, শাজাহানপুরেও তাহাই ঘটে। সেই পুরাতন পদ্ধতির পুনরুক্তি। ইংরেজদের বাসগৃহ পুড়িল, ধনাগার লুণ্ঠিত হইল, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল। বিদ্রোহীরা গির্জার মধ্যে গিয়া হঠাৎ আক্রমণ করায়, কয়েকজন ইংরেজও নিহত হইলেন। কতক ইংরেজ তখন ভয়ার্ত হইয়া মহিলাদের লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনা গৃহেই রহিলেন। পরে তাঁহারা অতিকষ্টে অযোধ্যার প্রান্তস্থিত মোহমদীতে পলায়ন করেন। পার্শ্ববর্তী পল্লীর অধিবাসিগণ প্রকাশ্যভাবে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। একজন ইংরেজের একটি চিনির কারখানা ও মদের ভাঁটি বিলুণ্ঠিত হয়। ...সৈনিক-নিবাসেও সাতিশয় গোলযোগ ঘটিল। কাপ্তেন জোন্স তাঁহার দলের সিপাহীদিগকে শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইলেন। হাসপাতালের ইংরেজ ডাক্তার সেই সময়ে গাড়ি করিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ স্বীয় আবাসগৃহে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে উত্তেজিত সিপাহীদের গুলিতে ডাক্তারটি সপরিবারে নিহত হন।"

শাজাহানপুরের বিদ্রোহের পর সমগ্র রোহিলখণ্ডে খাঁ বাহাদুর খাঁর আধিপত্য ঘোষিত হলো এবং তিনি দিল্লীর বাদশাহের নামে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন।

বেরিলীর ত্রিশ মাইল দূরে বদায়ুন।

বদায়ুনের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এডওয়ার্ডস্ সাহেব মে মাসের শেষে একদিন সংবাদ পেলেন যে, ২৫শে মে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানেরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হবে।

তখন ঈদের পর্ব। মুসলমানেরা এই উৎসবের আনন্দে তখন প্রমত্ত। ম্যাজিষ্ট্রেটের আশঙ্কা হলো হয়ত ঈদের সময়ে উত্তেজিত হয়ে মুসলমানেরা বিপ্লব ঘটাবে। কিন্তু নির্বিঘ্নে ঈদের উৎসব কেটে গেল। সুখের বিষয়

বদায়ুনে তখন একজন মাত্র ইংরেজ বাস করতেন। তিনি কালেক্টর এডওয়ার্ড উইলিয়ম। আর একটিও ইংরেজ সেখানে ছিল না। চারদিকে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ, নগরের নিরাপত্তা ও নিজের প্রাণের জন্যে তিনি ব্যাকুল। নিজের স্ত্রী-পুত্রকে তিনি নৈনীতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর দেখা হবে কি না, তা তিনি ভাবেন নি। বেরিলী থেকে প্রায় একশো সিপাহী বদায়ুনে এসেছিল, তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী নয়, তবু কালেক্টর সাহেব তাদেরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। পুলিশের লোকজনের ওপরও তাঁর পূর্ণ ভরসা ছিল না। অন্য স্থান থেকে সৈন্য সাহায্য পাবেন, তাও দুরাশা। ঈদের উৎসব নির্বিঘ্নে কেটে গেলেও, শহরের সর্বত্র একটা প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা। সর্বত্রই ফিরিঙ্গী বধের জল্পনা-কল্পনা। তাই এমন অবস্থায় কালেক্টর সাহেব মহা বিপদে পড়লেন। একদিন নির্জন গৃহে একাকী তিনি ভোজনে বসেছেন, এমন সময় অত্যল্প দূরে একজন অশ্বারোহী ইংরেজ পুরুষের মুখ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। সেই আগন্তুকের সঙ্গে বারোজন অশ্বারোহী। আগন্তুক কাছাকাছি আসতেই, উইলিয়ম তখনি তাঁকে চিনতে পারলেন। নবাগত এটোয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁরই পিতৃব্য-পুত্র আলফ্রেড ফিলিপস্। একত্রে ভোজন করতে বসে দুজনের মধ্যে চারদিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হলো। ফিলিপস্ বললেন, এটোয়া বিপদগ্রস্ত, সেই জন্যে তিনি বেরিলী থেকে সৈন্য সাহায্য পাবার আশায় সেখানে যাচ্ছেন। কিন্তু বেরিলীর অবস্থা তো আরো বিপজ্জনক, বললেন উইলিয়ম এবং ফিলিপস্কে সেখানে যেতে নিষেধ করলেন। বদায়ুনের ধনাগারে যেসব সিপাহী পাহারা ছিল, তাদের সুবাদার শপথ করে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানিয়েছিলেন যে, বেরিলীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে এখানকার সিপাহীদের কোন যোগাযোগ নেই ; অতএব এখানকার ধনাগার নিরাপদ। ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু যেদিন সুবাদার এই কথা বললেন, ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যাকালে ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্তিত হলো। বেরিলীর উত্তেজিত সিপাহীরা বদায়ুনের সিপাহীদের ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হবার জন্যে অনুরোধ করে পাঠাল। পরবর্তী ঘটনার বিবরণ মেলিসন দিয়েছেন এইভাবে : "সেই রাত্রেই সিপাহীরা লুঠ করিতে লাগিল, বেরিলীর একদল সিপাহী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। স্থানীয় জনসাধারণও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, সেখানকার তিন শত কয়েদীকে খালাস করিল,

সকলে দল-বদ্ধ হইয়া নগর লুণ্ঠন করিতে করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ির দিকে ছুটিল। ম্যাজিষ্ট্রেট শেখপুরার দিকে পলায়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত জেলা শৃঙ্খলা-শূন্য অশান্তিময় ও ঘোরতর বিপ্লবে অরাজক হইয়া পড়িল। এখানেও বেরিলীর খাঁ বাহাদুর খাঁর নামে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। এইভাবে সমগ্র রোহিলখণ্ড বিভাগ সহসা যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব শক্তিতে, ইংরেজের অধিকার-ভ্রষ্ট হইয়া ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল। বদায়ুনের ট্রেজারী লুঠ করিয়া বিদ্রোহীরা খুব বেশী টাকা পায় নাই, কারণ কালেক্টরীতে তখন বেশী টাকা মজুত ছিল না।"

রোহিলখণ্ডের নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করে খাঁ বাহাদুর খাঁ হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে একত্র করলেন এবং দেশের সমস্ত ইংরেজ সংহার করবার মন্ত্রণা করলেন। হিন্দুদের উদ্দেশে এই সময়ে প্রচারিত খাঁ বাহাদুর খাঁর একটি ঘোষণাপত্র এই রকম: "ফিরিঙ্গীরা যদি তোমাদিগকে পুরস্কার দিবার লোভ দেখাইয়া তাহাদিগের মতের পোষকতা করিতে অনুরোধ করে, তাহাতে তোমরা বিশ্বাস করিও না। ফিরিঙ্গীরা অঙ্গীকার পালন করিতে জানে না। তাহারা বিদেশী, তাহারা প্রতারক, তাহারা বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের পরামর্শ শুনিলে তোমাদের নিজেদেরই অনিষ্ট হইবে।"

ইতিমধ্যে ফরক্কাবাদে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটল।

ফরক্কাবাদ আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত একটা বড় শহর এবং রোহিলখণ্ডের মতই মুসলমান-প্রধান স্থান। এখানকার মুসলমানরাও স্বাধীনতা-প্রিয় ও প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষী। ইংরেজ-শাসনের প্রতি তাদের ঘোর বিরাগ। ফরক্কাবাদ জেলার উত্তর সীমায় শাজাহানপুর ও বদায়ুন, মাঝখানে গঙ্গা। মে মাস শেষ হবার আগেই সমগ্র বিভাগ ভয়ঙ্কর বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ফরক্কাবাদে প্রাচীন নবাব বংশের অনেক লোক ছিল। সময়ের পরিবর্তনে এঁদের দুরবস্থা ঘটেছিল। কিন্তু দুরবস্থায় পড়লেও, বিগত সম্মান, সমৃদ্ধি ও বংশগৌরব—সবই এঁদের স্মৃতিপটে তখনো পর্যন্ত অম্লান ছিল। শতবর্ষের চেষ্টায় ইংরেজ এদের দমন করলেও, বিদ্রোহের প্রাক্কালে, ফরক্কাবাদে এই নবাব-বংশের লোকদের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। একজন নবাব বিদ্রোহের সূচনাতেই নিজের

মসনদে বসে নিজেকে দেশের কর্তা বলে ঘোষণা করলেন। শহরের সকলেই তাঁর আজ্ঞাকারী হয়েছিল। ইংরেজরা রূপোর পাত মুড়ে চামড়ার টাকা চালাচ্ছে, রাজ্যের সমস্ত রূপো আত্মসাৎ করছে, আটায় ময়দায় হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়েছে এই সব পুরাতন কথা ও নতুন হুজুগের কথা এখানেও প্রচার হয়েছিল। ফররুকাবাদের বিদ্রোহের মূল কারণ তাই-ই। এখানকার দশ নম্বর পল্টনের সিপাহীরা সর্বপ্রথমে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নি। ফররুকাবাদের বিদ্রোহের সূচনায় জনসাধারণের ছিল সমর্থন। সাহেবরা বিদ্রোহীদের ভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। দুর্গের অবস্থা ভাল ছিল না, কামানও বেশী ছিল না। যুদ্ধের উপকরণও অল্প ছিল, সেই জন্যেই বেশী ভয়। ফররুকাবাদ বিদ্রোহের অধিনায়ক ছিলেন সুলতান খাঁ। তাঁর নেতৃত্বে ৪১ নম্বর ও ১০ নম্বর পলটনের সিপাহীরা বিদ্রোহী হলো। ফররুকাবাদে বহু ইংরেজ নর-নারী সিপাহীদের গুলিতে নিহত হয়। দুর্গের মধ্যে যে সব ইংরেজ আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় ছিল না, রাত্রিকালে নদীতে নৌকা চড়ে তারা পালিয়ে গেল। তিনখানা নৌকা—আরোহী একশো জন। তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েই বেশী। তখন বর্ষাকাল। ভাগীরথী দুকূল ভাসিয়ে পূর্ণ বেগে ছুটেছে। অন্ধকার রাত। নৌকা খোলা হয় নি। ভোরে খোলা হলো। দুজন কর্ণেল ও একজন মেজরের তত্ত্বাবধানে নৌকা ছাড়ল। খানিক দূর গিয়ে একখানা নৌকা চড়ায় লেগে অচল হয়, হাল ভেঙে যায়, মেরামত করবার অবসর হলো না। সে-নৌকার আরোহীরা অপর দুই নৌকায় আরোহণ করল। ঠিক সেই সময়ে নদীর অপর পারে প্রায় তিন শো বিদ্রোহী সমবেত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক। মুহূর্তমধ্যে তিনশো বন্দুক থেকে অগ্নিবর্ষণ হলো। দেখতে দেখতে কানপুরের সতীচৌরা ঘাটের সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পুনরুক্তি হলো এখানে। নৌকার আরোহীরা কেউ কেউ নৌকার উপরেই মরল, কেউ কেউ নদীর জলে ঝাঁপ দিল, তাদের ওপরেও বিদ্রোহীদের গুলি এসে পড়তে লাগল। জলের ওপরেই অনেকের প্রাণ গেল, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা জলে ডুবে মরল। যারা মরল না, বিদ্রোহীরা তাদের বন্দী করে নিয়ে গেল। ফররুকাবাদের নবাবের হুকুমে তাদের সবাইকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

ফররুকাবাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফতেগড়ে বিপ্লব দেখা দিল।

ফতেগড় আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত আর একটি নগর। শাজাহানপুরের ২৫ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। ফররুকাবাদ থেকে ফতেগড়ের দূরত্ব ছ মাইল। কামানের গাড়ির একটা প্রকাণ্ড কারখানা ছিল এখানে। এই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিল গোলন্দাজদলের একজন ইংরেজ সৈনিক। ফতেগড় জেলার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষেরও বেশী; অধিবাসীদের দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান। দশ নম্বর পলটনের কিছু সিপাহী এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য এখানে ছিল। এদের অধিনায়ক কর্ণেল স্মিথ।

ক্রমে ফতেগড়ে বিপ্লব ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এখানকার সিপাহীরা বেরিলী ও শাজাহানপুরের সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়। কর্ণেল স্মিথ অবস্থা খারাপ বুঝে মহিলা, বালকবালিকা এবং যুদ্ধে অসমর্থ ইংরেজদের কানপুরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কানপুরে তখন বহু ইংরেজ সৈন্য এসেছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। বারো-তেরোখানি নৌকায় শেষ রাত্রে ১৭০ জনকে ফতেগড় থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ক্যান্টনমেণ্টের সিপাহীদের দেশীয় অফিসারদের কথানুযায়ী কর্ণেল স্মিথ ১২০ জন ইংরেজসহ দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দুর্গ সুদৃঢ় ছিল না, খাদ্যও সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় নি। ১২০ জনের মধ্যে মাত্র ত্রিশজনের অস্ত্র ধরবার যোগ্যতা ছিল। এদের নিয়েই কর্ণেল স্মিথ দুর্গ রক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। ফরাক্কাবাদের নবাব তফ্‌ফুজল হোসেন যাঁকে বিদ্রোহীরা নবাব বলে ঘোষণা করল। তারপর বিদ্রোহীরা কারাগার থেকে কয়েদীদের মুক্ত করল, ধনাগার লুঠ করল। অবশেষে তারা ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণ করল।

ঐতিহাসিক কেয়ি ফরাক্কাবাদের এই বিদ্রোহ-প্রসঙ্গে লিখেছেন: "দুইদিন ধরিয়া দুর্গে গোলাবর্ষণ করিয়াও সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইল, দুইটি কামান অকর্মণ্য হইয়া পড়িল, গোলাগুলি নিঃশেষ হইয়া আসিল, মহিলা ও শিশুগণের দুরবস্থার একশেষ হইল। যখন আর কোন উপায় রহিল না, তখন ইংরেজরা পলায়নের চেষ্টা করিলেন।"

এইভাবে ইংরেজরা ফরাক্কাবাদ ও ফতেগড় থেকে বিতাড়িত হয়। এই দুই স্থানেই তাদের আধিপত্য, তাদের প্রাধান্য, তাদের ক্ষমতার সব চিহ্ন

বিলুপ্ত হয়ে গেল। রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের বিপ্লব, কেবল নরহত্যা বা জনসাধারণের অচিন্ত্যনীয় শক্তির জন্যে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। অভাবনীয় ব্যাপকতার জন্যেও এই বিপ্লব ঐতিহাসিকের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই বিপ্লব নগরের পর নগরে, পল্লীর পর পল্লীতে তার অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দিয়েছে। শাসক শ্রেণীর দূরদর্শিতার অভাবেই যে এই সময়ে ইংরেজদের দুর্গতির একশেষ ঘটেছিল, সেকথা ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণও স্বীকার করেছেন। শতবর্ষব্যাপী স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের ভেতর দিয়ে ইংরেজ বণিক কোম্পানী ভারতের মাটিতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, সেই বিষবৃক্ষেরই ফল সাতান্নর এই রক্তাক্ত বিপ্লব। রোহিলখণ্ডের কঠিন মাটিতে রক্তের অক্ষরে তারই স্বাক্ষর সেদিন বিদ্রোহীরা রেখে গিয়েছিল।

॥ তেইশ ॥

আগ্রা।

যমুনার তীরে সুরম্য নগরী আগ্রা এক সময়ে মোগলের রাজধানী ছিল। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী। কলভিন তখন এই প্রদেশের ছোটলাট।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আয়তন ছিল একলক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল। হিন্দুস্থানের প্রধান স্থানগুলি ছিল এই প্রদেশের অন্তর্গত। দক্ষিণ-পুর্ব দিকে কর্মনাশা নদী, উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের সানুপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের সামা ভাগ। তখন এই প্রদেশে বহু বীরজাতির বসতি ছিল। প্রদেশের নগরে নগরে ও গ্রামগুলিতে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। এই সুবিস্তৃত প্রদেশেরই শাসনকর্তা লর্ড কলভিন।

মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে ছোটলাট উদ্বিগ্ন হলেন। দুর্গ ও ধনাগার রক্ষা করবার ব্যবস্থা করলেন। ১৫ই মে সকালবেলায় ক্যান্টনমেন্টে একটি প্যারেডের আয়োজন হলো। কলভিন স্বয়ং এই প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে তিনি ইংরেজ সৈন্যদের বললেন—তোমরা সিপাহীদের অবিশ্বাস করোনা। তারপর তিনি সিপাহীদের সম্বোধন করে বললেন—তোমাদের ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তোমাদের কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে, আমার সামনে তা ব্যক্ত কর। সিপাহীরা গর্জন করে উঠল, একজনও সম্মুখে এলো না। রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তারা ইংরেজদের দিকে তাকাতে লাগল। ভাব দেখে কলভিন বুঝলেন ব্যাপার সুবিধের নয়। তিনি সিপাহীদের নিরস্ত্র করলেন। তারা দিল্লী চলে গেল। তবু ইংরেজদের আতঙ্ক দূর হলোনা। রাজধানীতে শান্তি ফিরে এলো না। জুন মাসের শেষে অনেক ইংরেজ আগ্রা পরিত্যাগ করে চলে গেল। ঝড়ের

আগে প্রকৃতি যেমন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে থাকে, আগ্রা সেদিন সেই রকম প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ ছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে আগ্রার আকাশে ঝড়ের মেঘ দেখা দিল। রাজধানীর শান্তি ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল।

জুন মাসের শেষ ভাগ। ইতিমধ্যেই প্রায় সারা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মধ্যভারত ও রাজপুতানা পর্যন্ত বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা ইংরেজের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। এমন সময়ে একদিন সংবাদ এলো যে, নিমচ ও নাসিরাবাদের দু'হাজার বিদ্রোহী সিপাহী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আগ্রার দিকে আসছে। আতঙ্কিত ইংরেজরা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। সৈনিকনিবাস থেকে এক মাইল দূরে, সুনীল যমুনার দক্ষিণ তটে আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ অবস্থিত। লাল পাথরের তৈরি ও গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। সিপাহী যুদ্ধের সময় থেকে প্রায় তিন শো বছর আগে সম্রাট আকবর নতুন করে এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন। এই দুর্গের সৌন্দর্য সাধনে ও পারিপাট্য বিধানে আকবর উদাসীন ছিলেন না। দুর্গটি যেমন সুদৃঢ় ও দুরতিক্রম্য, দুর্গ-প্রাচীরের ভেতরে তেমনি স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য প্রাসাদ, শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত তাজমহলের গৌরবস্পর্ধী মতিমসজিদ এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। এই দুর্গেই একদা সম্রাট শাজাহান বন্দী-জীবন যাপন করেছিলেন। মোগল যুগের ইতিহাসের একটা বিরাট স্মারক-চিহ্ন আগ্রার এই দুর্গ।

২রা জুলাই নিমচের সিপাহীরা আগ্রার তেইশ মাইল দূরে ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হলো। বিদ্রোহী সিপাহীদের আগ্রা আসবার পথে তাদের বাধা দেবার জন্যে যে সিপাহীদলকে পাঠানো হয়েছিল, তারা কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে নিহত করে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। আগ্রার ইংরেজ মহলে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। কলভিন নিজে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। সৈনিকনিবাস রক্ষার জন্য কোটার সৈন্য নিযুক্ত হলো। ইংরেজের এই বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ভরতপুরের রাজা। তিনি তিনশো অশ্বারোহী ও দুটো কামান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্য ব্রিগেডিয়ার পলজোয়েল ৮০০ সুশিক্ষিত ইংরেজ-সৈন্য নিয়ে আগ্রা থেকে বের হলেন। বিপক্ষদলের সৈন্যসংখ্যা দু'হাজারের ওপর। শাহগঞ্জে দুই দলে সাক্ষাৎ। এখানে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চললো। ইংরেজ পক্ষের বহু অশ্ব এবং যোদ্ধা নিহত হলো।

নিরুপায় সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্য দুর্গে ফিরে এল। দুর্গের ইংরেজরা প্রতি মুহূর্তেই অসীম আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। কামানের ধ্বনিতে প্রতি মুহূর্তে তাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও আশঙ্কা, হর্ষ ও বিষাদের ছায়াপাত হচ্ছিল। সব চেয়ে উদ্বিগ্ন ছিল ইংরেজ মহিলারা। তারপর যখন তারা দেখল যে ইংরেজসৈন্য যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে ফিরে আসছে, তখন আগ্রার দুর্গে হাহাকার পড়ে গেল। বিজয়ী সিপাহীরা তীব্রবেগে ইংরেজ সৈন্যদের অনুসরণ করছিল। *দেখতে দেখতে ধোঁয়া ও ধুলোয় আগ্রার আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল।* আগ্রায় ইংরেজদের সমস্ত বাড়িই ভস্মীভূত এবং সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হলো, সরকারী কাগজপত্রও সব পুড়ে গেল। উত্তেজিত সিপাহীরা দুর্গ আক্রমণ না করে দিল্লীর দিকে প্রস্থান করল। মোগলের চিরবিখ্যাত মতিমসজিদ এই সময়ে ইংরেজদের হাসপাতালে পরিণত হয়।

সিপাহীরা আগ্রা থেকে চলে গেলেও, ইংরেজদের ভয় গেল না, তারা দুর্গের বাইরে বাস করতে সাহসী হলো না। প্রায় দু হাজারের মত লোক এই সময়ে আগ্রা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল,—বেশীর ভাগই য়ুরোপীয় ও ইউরেশীয়। ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বর্ষীয়ান বর্ষীয়সী, সকলেই এক রকম অদৃষ্টের ভাগী হয়ে, একস্থানে ছিল। দুর্গে হিন্দু ও মুসলমানের অভাব ছিল না। মুসলমানদের কালো রঙের পরিচ্ছদ দেখলেই ইংরেজদের ভয় করত। বিদ্রোহের সময়ে কালোরঙের পরিচ্ছদ ইংরেজদের মনে বিভীষিকা জাগিয়ে তুলিয়েছিল। একদা এই দুর্গের মধ্যে যারা বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হতো, সৌভাগ্যের দিনে যারা এই সুদৃশ্য দুর্গের মধ্যে থেকে যমুনার সুখস্পর্শ বায়ু সেবনে যারা একদা পুলকিত হতো, আজ অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে, তাদের এই রকম দশা ঘটবে, আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে ব্যাকুল হতে হবে, দু'মাস আগেও আগ্রার ইংরেজেরা তা ভাবতে পারে নি।

আগ্রায় ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় হলো।
লর্ড ক্যানিং এর জন্যে দায়ী করলেন ব্রিগেডিয়ার পল্‌জোয়েলকে। বৃদ্ধ সেনাপতিকে পদচ্যুত করা হলো। তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হলেন কর্নেল কটন।

দুর্গের মধ্যে ছয়-সাতটি অস্ত্রাগার ছিল আর ছিল দু' মাসের উপযোগী খাদ্যসম্ভার। কর্নেল কটন প্রথমেই আশ্রয়-দুর্গ সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করলেন। দুর্গ-প্রাচীরে বহুসংখ্যক কামান সন্নিবেশিত হলো। গোলন্দাজ খুব বেশী ছিল না। সবলকায় ইংরেজদের এই কাজ দেওয়া হলো। দুর্গের চারদিকের উচ্চভূমি পরিষ্কৃত ও সমভূমিতে পরিণত হলো। গোলাগুলি প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হতে লাগল। কর্নেল কটন বারুদখানা রক্ষার জন্য সবিশেষ মনোযোগী হলেন। অস্ত্রাগারগুলির চারদিকে মাটির প্রাচীর তোলা হলো। সেগুলি রক্ষার ভার দেওয়া হলো ইংরেজ সৈন্যদের ওপর। দুর্গ দ্রুত সুরক্ষিত করার আরো একটি কারণ ছিল। গোয়ালিয়রের উত্তেজিত সিপাহীদল এইসময়ে অনেকগুলো ছোট ও বড় কামান নিয়ে, আগ্রার সত্তর মাইল দূরে অপেক্ষা করছিল। ইংরেজের শিক্ষায় সুশিক্ষিত এইসব সিপাহী যেমন পরাক্রান্ত তেমনি সংখ্যায় বেশী ছিল। দুর্গের ইংরেজেরা স্বভাবতই এদের আক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হলো।

জুলাই মাস কেটে গেল।

আগষ্ট মাসও অতীতের সঙ্গে মিশে গেল।

সমস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। আগ্রার পাশাপাশি বহু স্থানে বহু ক্ষমতাশালী লোক তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর বাদশাহের নামে শাসনকার্য চালাতে আরম্ভ করেছে। অবরুদ্ধ কলভিন দিল্লীর দিকে তাকিয়ে আছেন। মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী বিদ্রোহীদের হাতে। নবাব ওয়াজেদ আলির প্রিয় বাসভূমি লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীরা জয়পতাকা উড়িয়েছে। কাজেই এই দুই প্রধান স্থান থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। দুর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা রকম জনরব উঠত। সেইসব জনরব শুনে ইংরেজদের আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পেত। আলীগড়, এটোয়া, মৈনপুরী এবং মথুরা—সর্বত্রই বিদ্রোহী সিপাহীরা দলে দলে প্রবেশ করে জেলখানা, ধনাগার, অস্ত্রাগার ও ইংরেজদের বাংলো লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দিল এবং লুণ্ঠিত জিনিসপত্র নিয়ে তারা দিল্লীর দিকে চলে গেল। দিল্লীর মোগলপ্রাসাদে বাদশাহী পতাকা উড়েছে, সেখানে ইংরেজের প্রাধান্য অবলুপ্ত হয়েছে—এই সংবাদ সেদিন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সর্বত্র তুমুল

উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল এবং সিপাহীদের উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। চারদিকেই বিদ্রোহীরা দিনের পর দিন প্রবল হয়ে উঠছে—কি সংখ্যায়, কি অস্ত্রে এবং সর্বক্ষণই তারা ইংরেজের শোণিতপাতের সুযোগ প্রতীক্ষা করছিল। এইভাবে দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পিছনে বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখে ছোটলাট কলভিন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। তথাপি সকল বিষয়েই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকবার সময়ে আলীগড়ে বিদ্রোহী ঘাউস খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে তাঁর শাসিত প্রদেশে এক বিভাগের পর অন্য বিভাগে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে গেল, রাজধানী আগ্রা বিদ্রোহীদের অধিকারে চলে গেল, তখন তাঁর মানসিক ও শারীরিক অবসাদ দুই-ই প্রবল হয়ে দাঁড়াল। একে ত তিনি অসুস্থ ছিলেন; তার ওপর এই রকম গুরুতর পরিশ্রম ও গভীর দুশ্চিন্তায় কলভিন ক্রমে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর কলভিনের মৃত্যু হলো। পরের দিন দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। কলকাতায় লর্ড ক্যানিং কর্মদক্ষ কলভিনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন। মৃত্যুকালে স্বজাতির ধিক্কার ও তিরস্কার ভিন্ন তাঁর ভাগ্যে আর কিছুই লাভ হয় নি।

মধ্য ভারতবর্ষও বিদ্রোহ থেকে মুক্ত ছিল না।

জয়াজীরাও সিন্ধিয়া তখন গোয়ালিয়রের রাজা।

বয়স মাত্র তেইশ বছর। সামন্ত-সন্ধি অনুসারে বরাবরই তাঁর রাজ্যে তাঁরই খরচে ইংরেজ-কোম্পানীর একদল সৈন্য প্রতিপালিত হতো। আগ্রা থেকে ৬৫ মাইল দূরে গোয়ালিয়রের রাজধানী ইন্দোর। এই তরুণ মহারাষ্ট্রীয় ভূপতির অধীনে তখন আট হাজার ইংরেজ সৈন্য আর ছাব্বিশটা কামান। এ ছাড়া, দেশীয় সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার। এই দশ হাজার সিপাহীদের সম্বন্ধে কলভিনের খুব দুশ্চিন্তা ছিল। ছোটলাট কলভিন মনে করেছিলেন যে, ভারতব্যাপী এই বিদ্রোহের সুযোগে তরুণ জয়াজীরাও হয়ত সিপাহীদের পক্ষ অবলম্বন করে নিজে স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস সত্যই স্বতন্ত্র রূপ নিত যদি ভারতের দেশীয় নৃপতিরা এই বিদ্রোহে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এ বিদ্রোহে তাঁদের কোন ভূমিকাই ছিল না।

জয়পুর, যোধপুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, নাভা, কাশ্মীর—শত শত রাজভক্ত দেশীয় নৃপতি বিদ্রোহ থেকে নিরাপদ দূরত্বেই ছিলেন। জয়াজীরাও-ও এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ইংরেজদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। কিন্তু গোয়ালিয়রে ইংরেজদের অধীনে যে সিপাহীরা ছিল, তারাই বিদ্রোহী হয়। মেজর ম্যাকফার্সন তখন ইন্দোর দরবারে পলিটিকাল এজেণ্ট। দিনকর রাও তখন মহারাজার প্রধান মন্ত্রী। রাজধানী থেকে ছয় মাইল দূরে মোরারে ছিল গোয়ালিয়রের সৈনিক-নিবাস। ২৮শে মে এখানে সহসা গোলমাল দেখা দিল। মহারাজা স্বয়ং ইংরেজদের রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নশীল হলেন।

১৪ই জুন, রবিবার।

ইংরেজদের আক্রমণের জন্য বিদ্রোহীরা প্রায় সর্বত্র এই তারিখটিকে বেছে নিয়েছিল। ইংরেজরা যখন গির্জায় সমবেত হয়ে, ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যস্ত থাকবে, বিদ্রোহীরা তখন সুযোগ বুঝে তাদের আক্রমণ করবে। গোয়ালিয়রেও ১৪ই জুন রবিবার সেই ঘটনার পুনরুক্তি হলো। সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত সৈনিকনিবাস বিশৃঙ্খল ও গোলযোগপুর্ণ হয়ে উঠল। ইংরেজের পরিচালিত সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। দরবারের সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। রেসিডেণ্ট ম্যাকফার্সন পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। অসহায় ইংরেজ নরনারীদের কতক রেসিডেন্সীর সুরক্ষিত ভবনে, কতক মহারাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিল। কিন্তু শেষে গোয়ালিয়রের অবস্থা এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠল যে, ইংরেজরা সেখান থেকে চম্বলের অভিমুখে যাত্রা করল। বিদ্রোহীদের হাতে পলাতক ইংরেজদের দুর্দশার একশেষ হলো। গোয়ালিয়রে সর্বসমেত বিশ জন ইংরেজ নিহত হয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রান্তভাগে নিমচ্। আগে গোয়ালিয়রের অধিকৃত ছিল। বর্তমানে এখানে ইংরেজ সরকারের একটা বড় ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। এখানেও সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে' লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি নির্দিষ্ট কাজগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে এবং তারপর বিজয় উল্লাসে তারা দিল্লীর দিকে ছুটে। নিমচের দেড়শো মাইল দূরে নশিরাবাদ। এখানেও সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল। নিরুপায় ইংরেজরা সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফেলে ত্রিশ মাইল দূরে

বেওয়ারে পালিয়ে গেল। উত্তেজিত সিপাহীরা বিনা বাধায় তাদের বাংলোয় আগুন ধরিয়ে, সম্পত্তি লুঠ করে, জেলখানার কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে দিল্লীর দিকে ছুটল।

আগ্রা থেকে চারশো মাইল দূরে ইন্দোর।

হোলকারের এই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন রাণী অহল্যাবাঈ।

মধ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইন্দোরের একটা বিশেষ স্থান ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন তুকাজী রাও হোলকার ইন্দোরের রাজা। বয়স একুশ বছর। শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। ইন্দোর থেকে ছ মাইল দূরে রেসিডেন্সী আর তেরো মাইল দূরে মৌ-তে ছিল সেনানিবাস। সেনানিবাসের অধিনায়ক কর্নেল প্লাট আর কর্নেল ডুরাণ্ড তখন এখানকার রেসিডেন্ট। সামরিক কর্মে তাঁর নৈপুণ্য প্রসিদ্ধ। সিপাহী যুদ্ধের সূচনায় ডুরাণ্ড মধ্য-ভারতবর্ষে গভর্ণর-জেনারেলের প্রতিনিধির দায়িত্বও পেয়েছিলেন। চারদিকের সংবাদ ইন্দোরেও এসে পৌছল। গোয়ালিয়র, নিমচ, নসিরাবাদ, আগ্রা ও দিল্লীর দুঃসংবাদ একে একে তুকাজীরাওর কানে পৌছল। বুঝলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে চারদিকেই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু হোলকারের ছিল ইংরেজ-প্রীতি। কাজেই ইংরেজ-রাজত্বের পতন তাঁর কাম্য ছিল না।

তবু ইন্দোরে বিদ্রোহ হলো। মহারাজ তুকাজী রাও চিন্তিত হলেন। তাঁর অস্ত্রাগার প্রায় শূন্য ছিল। উত্তেজিত সিপাহীদের বাধা দেবার জন্যে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব। ইন্দোর দরবার তখন রেসিডেন্ট ডুরাণ্ডকে এই বিষয়ে জানাতেই, তিনি হোলকারের পক্ষ থেকে বোম্বাইয়ের গভর্ণর লর্ড এলিফিন-ষ্টোনের কাছে এক হাজার বন্দুক, দেড়শো জোড়া পিস্তল আর দু'লক্ষ ক্যাপ চেয়ে পাঠালেন। হোলকার ইংরেজের বন্ধু, তাঁর বল বৃদ্ধি করা দরকার, এই বিবেচনা করে লর্ড এলিফিনষ্টোন ঐগুলি অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলেন।

জুন মাস নিরুপদ্রবেই কেটে ছিল। জুলাই মাসের প্রথমেই হোলকারের সেনাগণ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। রেসিডেন্সী আক্রমণ তাদের প্রথম উদ্যম। তারপর একে একে ডাকঘর, ট্রেজারী, ভাল ভাল সরকারী বাড়ি ও ইংরেজদের বাংলোগুলি বিদ্রোহীরা লুণ্ঠন করল। কমপক্ষে বিশজন ইংরেজকে তারা গুলি করে মারল। রেসিডেন্ট পালাতে বাধ্য হলেন। মহিলা ও বালক-বালিকাদের কামানের গাড়িতে তুলে ইংরেজ পুরুষরা কেউ হাতীতে,

কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। পলাতকগণ ভূপালের দুর্গে আশ্রয় নিল। সেই রাত্রেই বিদ্রোহীরা ইন্দোরের রেসিডেন্সী পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিল। মৌ সেনানিবাস তখনো পর্যন্ত শান্ত ছিল। কিন্তু রেসিডেন্সী পতন ও ডুরাণ্ডের পলায়নের সংবাদ মৌ-তে যখন পৌছল, তখন কর্ণেল প্লাট উদ্বিগ্ন হলেন। সিপাহীদের ওপর কর্ণেলের অগাধ বিশ্বাস। হঠাৎ একদিন রাত্রে সেনানিবাসের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে কর্ণেল প্লাট ও অপর কয়েকজন অফিসারকে গুলি করে মারল। ইংরেজদের বাসস্থান জ্বলে উঠল। গোলন্দাজ দলের অধ্যক্ষ হাঙ্গারফোর্ড সন্দিহান হয়ে আগে থেকেই দুর্গে কামান সাজিয়ে রেখেছিলেন। এখন তিনি কামান থেকে অগ্নি বর্ষণ করতেই সিপাহীরা দলে দলে ইন্দোরের পথে অগ্রসর হতে লাগল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড, এমন কি লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত, ইন্দোর-বিদ্রোহের জন্যে হোলকারকে দোষী মনে করেছিলেন। এইভাবে ইন্দোরে ইংরেজের সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা সেদিন বিলুপ্ত হয়েছিল। ইন্দোরের বিদ্রোহী সিপাহীরা মহারাজকে তাদের নেতৃত্ব করবার জন্য অনুরোধ করে ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে দিল্লী চলে যায়।

রাজপুতানা।

মধ্যভারতের মত রাজপুতানাও সেদিন ইংরেজ সরকারকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন সমগ্র রাজপুতানা প্রদেশ মিবার, জয়পুর, মাড়বার প্রভৃতি আঠারটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে সতেরটি রাজ্য রাজপুত হিন্দু রাজার অধিকারে আর বাকী রাজ্যটি মুসলমান রাজার অধীনে ছিল। বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দার আমীর খাঁর বংশধরেরা এই রাজ্যটিতে আধিপত্য করতেন। এই রাজ্যের মুসলমান রাজা তখন টঙ্কের নবাব বলে পরিচিত ছিলেন। এই আঠারটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যের শাসনকার্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত এজেণ্ট পরিচালনা করতেন। এই সব এজেণ্টদের ওপর কর্তৃত্ব করবার জন্য একজন রেসিডেণ্ট থাকতেন। কর্ণেল জর্জ লরেন্স তখন রাজপুতানার এজেণ্ট। তিনি স্তর হেনরী লরেন্স-রই অন্যতম ভাই। মিরাটের গোলযোগের সংবাদ যখন রাজপুতানায় পৌছল, জর্জ লরেন্স তখন আবু পর্বতে গ্রীষ্মের অবকাশ যাপন করছিলেন। এই সংবাদ পেয়েই তিনি

গুরুতর দায়িত্ব বুঝতে পারলেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইলেরও বেশী পরিমাণের বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন তাঁকে রক্ষা করতে হবে। রাজপুত রাজারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে ও শান্তিতে কাল যাপন করছিলেন। তবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে তেমন ঐক্য বা সমবেদনা ছিল না। কিন্তু রাজপুতনার ঠাকুররা গভর্ণমেণ্টের আধিপত্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। মিরাটের সংবাদ পাবার চারদিন পরেই কর্ণেল লরেন্স প্রত্যেক রাজাকে নিজের নিজের সৈন্য সাজিয়ে তৈরি থাকতে অনুরোধ করলেন। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর কলভিন কর্ণেল লরেন্সকে সমস্ত ইংরেজ সৈন্য ও কোম্পানীর টাকা নিয়ে আগ্রা রক্ষার জন্য অনুরোধ করলেন।

ছোটলাটের এই অনুরোধে কর্ণেল লরেন্স বিস্মিত ও চমকিত হলেন। এই সংকটকালে রাজপুতানা ছেড়ে এলে কী সমূহ বিপদ হবার সম্ভাবনা তা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। রাজপুতানার কেন্দ্রস্থলে আজমীর। দিল্লীর মতই আজমীরের গুরুত্ব। বিবিধ যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার এইখানে। এইস্থানের ধনাগারে বহু অর্থ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থ আজমীর। রাজপুতানার মহাজন ও কুঠিওয়ালাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রাশীকৃত অর্থ এইখানে রয়েছে। কর্ণেল লরেন্স বুঝলেন এমন একটি স্থান যদি সিপাহীদের হস্তগত হয়, তাহলে রাজপুতানায় ভীষণ বিপদ দেখা দেবে। কাজেই রাজপুতানা ছেড়ে তাঁর কিছুতেই যাওয়া চলে না। কলভিন তখন লরেন্সের হাতে আরো ক্ষমতা দিলেন—তাঁকে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেলের পদ দিয়ে রাজপুতানার সমগ্র সৈন্যদলের অধিনায়ক করেন। ব্রিগেডিয়ার লরেন্সের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সিপাহীদের আজমীর থেকে সরিয়ে তাদের স্থলে মাইহার সৈন্য রাখলেন। এইভাবে আজমীর রক্ষা পেল—সমগ্র রাজপুতানাও ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখে রক্ষা পেল। উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি সর্বমান্য রাজপুত রাজাদের ওপর এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এঁরা সকলেই সৈন্য ও কামান দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন এবং সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মিচেল লিখেছেন: "রাজপুতনায় আপাততঃ কোন গোলযোগ না ঘটিলেও এবং রাজপুত ভূপতিগণ দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের সহিত কোনরূপ সংস্রব না রাখিলেও, লর্ড কলভিন একেবারে নিশ্চিন্ত হন নাই। যাঁহারা এক সময়ে মোগলের

সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, মোগলের নাম স্বীয় মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সূক্ষ্মদর্শী লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের স্মৃতিপটে সবদা জাগরূক ছিল।"

সাতান্নর স্মরণীয় বিপ্লবে রাজপুতানার কোন ভূমিকাই ছিল না। রাজপুতের বীরত্ব এই সময়ে ইংরেজের ছত্রচ্ছায়া তলে নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ ছিল। রাজপুতানার বিশাল মরুভূমি বা উন্নত শৈলশিখরে সিপাহী বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত হয় নি।

ইতিহাস এখানে সেদিন মূর্ছাহত ছিল।

॥ চব্বিশ ॥

জেনারেল হ্যাভলক যখন অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের আয়োজন করছিলেন, তখন সেনাপতি উইলসন দিল্লী উদ্ধারে ব্যস্ত ছিলেন। লক্ষ্ণৌর আগেই দিল্লী অবরোধ-মুক্ত হয়। এইবার আমরা সেই কাহিনী বলব।

মে মাস থেকে আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত দিল্লী নগরী বিদ্রোহীদের করায়ত্ত ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধ হয়েছিল, ইংরেজ সৈন্যকে প্রত্যেকবারই পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছিল। সৈন্যক্ষয় এবং অস্ত্র ও রসদ নিঃশেষ হওয়ার ফলে ইংরেজ দিন দিন অবসন্ন হচ্ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই স্যর জন লরেন্স দিল্লী উদ্ধারের জন্য প্রচুর সৈন্য, কামান ও গোলা-বারুদ পাঠিয়ে দিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিংহ জম্মু থেকে প্রতিশ্রুত সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। মিরাট থেকেও একদল সৈন্য এল। এই সব সাহায্য পেয়ে ইংরেজ সেনাপতিরা উৎসাহিত ও আনন্দিত হলেন। দিল্লীতে তখন ভারতের সৈন্য বিভাগের বাছাই করা পাঁচ জন সেনানায়ক ছিলেন—নেভিল চেম্বার্লেন, বেয়ার্ড স্মিথ, জেনারেল উইলসন, আলেকজান্দার টেলর ও জন নিকল্‌সন। এইবার ইংরেজ নতুন উদ্যমে মোগলের রাজধানী অবরোধ করতে অগ্রসর হলো। এখন ইংরেজের সৈন্য-সংখ্যা সাড়ে ছ' হাজার। এর মধ্যে এক হাজার দু' শো য়ুরোপীয় সৈন্য। এই সাড়ে ছ' হাজার সৈন্য ত্রিশ হাজার বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সংকল্প করল। ইংরেজ বাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেয়ার্ড স্মিথের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনারেল উইলসন অবিলম্বে নগর-প্রাচীর আক্রমণ করা সাব্যস্ত করলেন।

ইংরেজ ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে কামান স্থাপনে উদ্যত হলো। কাশ্মীর ও মোরী দরওয়াজা তাদের লক্ষ্য। ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে কামান সন্নিবেশিত হবে বলে স্থির হলো। জেনারেল উইলসন তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশে উদ্দীপনাময়ী

ভাষায় বক্তৃতা করলেন। রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যরা কাজ করত। উটের পিঠে বোঝাই করে কামান স্থাপনের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হলো. গরুর গাড়িতে গোলা-বারুদ। পেছনে এক-একটা বড় বড় কামান চল্লিশটা বলদে টেনে নিয়ে গেল। কামানের গাড়ির শব্দে, সৈন্যদের তুমুল কোলাহলে চারদিক ভরে উঠল। বিদ্রোহীরা ইংরেজদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না। তাদের কামান নীরব, বন্দুক নিশ্চেষ্ট। বিপক্ষের এই নিশ্চেষ্ট ভাব ইংরেজদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। চার জায়গায় কামান সাজান হলো। ১৩ই সেপ্টেম্বর বিকেলে ইংরেজের কামান থেকে গোলাবৃষ্টি হলো। প্রাচীরের দু'জায়গা ভেঙে গেল। সেই ভগ্ন স্থান দিয়ে কৌশলের সঙ্গে অভিযান করা হবে—এই রকম সাব্যস্ত হলো। অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ইংরেজ-পক্ষ থেকে যুদ্ধ পরিচালিত হতে লাগল।

ইংরেজের কামানের জবাব এল প্রাচীরের ওদিক থেকে। প্রথম দিনের যুদ্ধে প্রায় একশো ইংরেজ নিহত হলো। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় বেশী। অস্ত্রশস্ত্রেও তারা শক্তি-সম্পন্ন। তাদের অধিনায়ক বখত খাঁও সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে আরো বিদ্রোহী এসে তাদের দলবৃদ্ধি করেছে। মোগলের রাজধানী তখন বিদ্রোহীদের পদভরে টলমল। কিন্তু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার অত্যন্ত অভাব ছিল।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাত্রি তিনটা।

ইংরেজ শিবিরে সৈন্যরা প্রস্তুত। সূর্য উঠবার আগেই তারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ইংরেজ-সৈন্যের পাশাপাশি চলেছে শিখ ও গুর্খা সৈন্য। সেনানায়ক নিকলসনের আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় দল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হলো। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কামান স্থাপন করে নগর-প্রাচীর ভেঙে ফেলার উদ্যোগ হলো। কাবুল তোরণ, কাশ্মীর তোরণ ও লাহোর তোরণের কতকাংশ উড়িয়ে দেওয়া হলো। কিছু ইংরেজ-সৈন্য নগরের কতকাংশে প্রবেশ করল, একদল সৈন্য দুর্গ প্রাকারের ওপরে উঠবার চেষ্টা করল। নিকল্‌সন স্বয়ং দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়ে কাশ্মীর তোরণের নিকটবর্তী 'মেইন গার্ড' অধিকার করলেন। আর একদল ইংরেজ-সৈন্য বহু যোদ্ধার প্রাণপাত করে কাবুল তোরণ অধিকার করল।

জেনারেল বখৎ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

তাঁর আদেশে সিপাহীরা এমন তীব্র বেগে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করল, এমন পরাক্রমের সঙ্গে ইঁট ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল যে, ইংরেজ সৈন্য পরিখার নীচে মই রেখে প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে উঠতে প্রথমে সমর্থ হলো না, শেষে তাদের প্রয়াস সফল হয়। সিপাহীদের গুলিতে একজন ইংরেজ সৈন্য মরে, অমনি আর একজন এসে তার শূন্য স্থান পূর্ণ করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণ ক্রমেই তীব্র হয়। সে-আক্রমণের প্রচণ্ডতার মুখে ইংরেজ সৈন্য পর্যুদস্ত হয়ে গেল। বেয়ার্ড স্মিথ ও নেভিল চেম্বার্লেন এর আগেই আহত হয়েছিলেন। আজকের যুদ্ধে সত্তর জন বড় বড় অফিসার ও এগার শো সৈন্য নিহত হলো। এমন কি, বহু রণক্ষেত্রের বিজয়ী বীর নিকল্‌সন কাশ্মীর তোরণ অধিকার করতে গিয়ে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হলেন এবং তাঁর ভাই চার্লস নিকল্‌সনও গুরুতর আঘাত পেলেন। তথাপি এই দিন ইংরেজ সৈন্যের প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়। কাশ্মীর তোরণ বিধ্বস্ত করে সেনাপতি উইলসন ঘোড়ায় চড়ে, এক হাতে মানচিত্র নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। সেনাপতি ও তাঁর সহচরবর্গ নগরের একটি গৃহে সেই রাত্রি যাপন করলেন।

তারপর ছ' দিন ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ চললো। ১৫ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ঐতিহাসিক মার্টিন লিখেছেন: "দিল্লীর কিয়দংশ অধিকার করিয়াই, ইংরেজ সৈন্য দোকানপাট লুট করিতে লাগিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে ছিল নানা রঙের সুরা। আগ্রহ সহকারে সেই সুরা উদরস্থ করিয়া সৈন্যরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কাপ্তেন হডসনের বিবরণীতে জানা যায় যে, সুরাপানে উন্মত্ত ইংরেজ সৈন্যরা বারংবার তাহাদের অধিনায়কের আদেশ অমান্য করিয়াছিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজ সৈন্যের এই শৃঙ্খলহীনতার সুযোগ লইতে পারিলে অনায়াসেই ইংরেজ পক্ষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিত, এমন কি দিল্লীতে তাহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত। সেনাপতি উইলসন সৈন্যদের মধ্যে এই রকম শৃঙ্খলাহানি দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি যাবতীয় সুরা নষ্ট করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীর রাজপথে সুরাস্রোত প্রবাহিত হইল। পথের উপর সুরাপূর্ণ শত শত বোতল ভগ্ন হইয়া রহিল।"

১৭ই সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যাবেলা।

ইংরেজ সৈন্য দিল্লীর পথে পথে যুদ্ধ করতে করতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে

অগ্রসর হতে লাগল। বিদ্রোহীরা বাধা দিতে নিরস্ত থাকল না। ঘরের ছাদ, জানালা, দরওয়াজা প্রভৃতি থেকে সিপাহীরা তাদের ওপর তীব্র বেগে গুলি বৃষ্টি করতে লাগল।

১৮ই সেপ্টেম্বর। ইংরেজ সৈন্য লাহোর তোরণ অধিকার করবার চেষ্টা করল। বিদ্রোহীরা অলক্ষ্যভাবে গুলি বৃষ্টি করাতে ইংরেজ সৈন্য ভীত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। তারা অগ্রসর হতে ভয় পেল। সেনাপতি উইলসন চিন্তিত হলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ লাহোর তোরণ, জুম্মা মসজিদ ও আজমীর তোরণ অধিকার করল। দিল্লীর কতকাংশ ইংরেজ সৈন্য অধিকার করলেও, ইংরেজ সৈন্যদেরই আর একটা দল ঐ দিন কৃষ্ণগঞ্জে সিপাহীদের হাতে পরাজিত হয়। অবশেষে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয় পতাকা উড়ল। ঐ দিন ইংরেজ মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী অধিকার করল। সে-রাত্রে দেওয়ান-ই-খাসে ইংরেজরা পান-ভোজনের উৎসব করল। চার মাসের দীর্ঘ অবরোধের আজ অবসান—ইংরেজ শিবিরে উল্লাসের সীমা নেই। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রিফিথস্ প্রাসাদ অধিকারের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে:

"দিল্লী প্রাসাদের সমস্ত তোরণ, সমস্ত গৃহ, অস্ত্রাগার ও কামান-বন্দুকাদি ইংরেজের হস্তগত হইল। বাকী কেবল সম্রাটের প্রাসাদ। গুপ্তচরেরা জেনারেল উইলসনকে জানাইল, বাদশাহ ও রাজপরিবারের সমস্ত লোক প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া শহরতলীতে আশ্রয় লইয়াছেন। বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে। কেবল জনকতক গোঁড়া মুসলমান তাহাদের ধর্মের খাতিরে অথবা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিবার সংকল্পে, তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। ফটকে ফটকে এক একজন শাস্ত্রী বন্দুক কাঁধে লইয়া বিমর্ষ বদনে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মরিবার জন্য প্রস্তুত।"

দিল্লী অধিকৃত হলো।

বিদ্রোহীরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ল।

অধিবাসীরা নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে স্থানান্তরে যেতে উদ্যত হলো। ইংরেজ সৈন্যদের এখন প্রতিহিংসা তৃপ্তির অবাধ সুযোগ। শিখ সৈন্যরাও অবাধ লুণ্ঠন আরম্ভ করল। মোগলের রাজধানী ইংরেজদের মত শিখদেরও বিদ্বেষভাবকে জাগিয়ে তুললো। মোগলের আদেশে তেগবাহাদুর যেখানে

নিহত হয়েছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ যেখানকার অধিবাসীদের বিপক্ষতায় একান্ত নিপীড়িত হয়েছিলেন, বান্দা যেখানে দারুণ নির্যাতনের মুখে আত্ম-বিসর্জন করেছিলেন—সেই দিল্লীর কথা তারা বিস্মৃত হয় নি। ইংরেজপক্ষেও সেই একই কথা। এইখানে তাদের অসহায় পুরনারীদের শোণিতপাত হয়েছে, এইখানে তাদের বহু স্বজাতীয়কে অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। তাই দিল্লী ও মোগলের নামে ইংরেজ ও শিখ সৈন্য সমান ভাবে উত্তেজিত হলো—সমান ভাবেই তারা নিজেদের প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হলো। দোষী ও নির্দোষী কেউই রেহাই পেলনা। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মার্টিন লিখেছেন, "যাহারা কোনরূপে শান্তির ব্যাঘাত করে নাই, ইংরেজ সৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবারীতে দেহ বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।...শান্ত, অশান্ত, উদ্ধত ও অনুদ্ধত, অপরাধী ও নিরপরাধ, সকলকেই সমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল। দিল্লীর অধিকারের পর প্রথম কয়েক দিন এইরূপে সহস্র সহস্র লোক বন্দুকের গুলিতে বা অন্যরূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। যাহারা আহত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও গুলি করিয়া বধ করা হইল।"

ইংরেজ দিল্লীর প্রাসাদ দখল করল বটে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরেজের হাতে পড়েন নি। ১৪ই সেপ্টেম্বর রাজধানী আক্রান্ত হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ইংরেজ যখন চাঁদনী চক্ প্রভৃতি অধিকার করে, তখন সেনাপতি বখৎ খাঁ আর কোনো উপায় না দেখে, পলায়নে কৃতসংকল্প হন। প্রাসাদে গিয়ে তিনি বাহাদুর শাহকে বললেন, ইংরেজ দিল্লী অধিকার করলেও, এখনো তিনি স্থানান্তরে গিয়ে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি করতে পারেন। বাদশাহের নামে এবং তাঁর উপস্থিতিতে এখনো বিদ্রোহকে পরিচালিত করা সম্ভব, এখনো অনেকে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তিনি বৃদ্ধ সম্রাটকে সিপাহীদের সঙ্গে অযোধ্যায় যেতে পরামর্শ দিলেন। তাঁরা সেখান থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। বেগম জিন্নৎ মহল বখৎ খাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বেগম এখনো তাঁর পুত্রের জন্যে সিংহাসনের আশা করেন। তিনিও সম্রাটকে অনুরোধ করলেন অযোধ্যায় চলে যাবার জন্যে। কিন্তু বাহাদুর শা বাবুর, হুমায়ুন বা আকবরের বংশধর হলেও, তাঁর দিগ্বিজয়ী পূর্বপুরুষদের মত দৃঢ়চেতা সম্রাট ছিলেন না। উদ্যম বা সাহস

কিছুই তাঁর ছিল না। বার্ধক্যে তিনি একান্ত অবসন্ন। বিদ্রোহে তিনি অন্যের হাতে ক্রীড়াপুত্তল। অবরোধের সময়ে সিপাহীদের অধিনায়কেরা তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করত। আজ তাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হলো। বখৎ খাঁ তাই বিফল মনোরথ হলেন। বাহাদুর শাহ স্থানান্তরে যেতে সম্মত হলেন না।

মীর্জা এলাহি বক্স ছিলেন বাহাদুর শাহের আত্মীয়। বখৎ খাঁ চলে গেলে তিনি বৃদ্ধ ভূপতিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন। এলাহি বক্স তাঁকে বোঝালেন—বিদ্রোহীদের জয়লাভের আর কোনো আশাই নেই। কাজেই তাদের সঙ্গে তাঁর যাওয়া উচিত নয়। গেলে পরাজয় ও অনিষ্ট দুই-ই অনিবার্য। দুর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁর কথা শুনলেন। কিন্তু ইংরেজ তো এখনি তাঁর অন্বেষণ করবে, কোথায় আত্মগোপন করা যায়? কুতুবমিনারে যাবেন কি? এলাহি বক্স বললেন—হুমায়ুনের সমাধিভবনই আত্মগোপনের উপযুক্ত স্থান। হুমায়ুনের কবর! মুহূর্তমধ্যে বাহাদুর শাহের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ভাগ্য-বিড়ম্বিত তাঁর সেই পূর্বপুরুষের কথা। রাজ্য থেকে যিনি একদা বিতাড়িত হয়ে দুঃখ ও দুর্গতির একশেষ ভোগ করেছিলেন এবং যেসব পূর্বপুরুষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে রাজভোগের সুখ থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তাঁদের দেহ এইস্থানের শীতল মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত রয়েছে। সেই সমাধিভবনে আজ দিল্লীর সর্বশেষ সম্রাটের সকল আশার অবসান হতে চললো। বাহাদুর শাহ এলাহি বক্সের প্রস্তাবেই সম্মত হলেন। বেগম জিন্নৎ মহল ও তাঁর গর্ভজাত পনর বছরের পুত্র জোয়ান বখৎকে সঙ্গে নিয়ে বাহাদুর শাহ রাত্রির অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতসারে হুমায়ুনের সমাধি-ভবনে উপনীত হলেন। বাদশাহী গৌরবে চিরদিনের মত জলাঞ্জলি দিয়ে বৃদ্ধ সম্রাট সমাধি ভবনের কঠিন মৃত্তিকার ওপর এসে দাঁড়ালেন। এমন ভাগ্য-বিপর্যয় বুঝি তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে লাঞ্ছনার তখনো অনেক বাকী।

দিল্লী দখল হলো।

যে দিল্লীতে একদা কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে—কাল সেই ধূসর প্রান্তরে আজ মোগল রাজত্বের সমাধি রচনা করল।

প্রাসাদ দখল হলো। তারপর ?

"তার পরে শূন্য হলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লীরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোক মালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের উর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হলো তার সীমা॥"

কিন্তু বাদশাহ কোথায় ?

প্রাসাদের ইংরেজ-রক্ষীদলের অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তেন হড্‌সন। জেনারেল উইলসন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—সম্রাট কোথায় ?

—প্রাসাদে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না, বললেন হড্‌সন।

—ফাইণ্ড হিম আউট য়্যাণ্ড এ্যারেষ্ট হিম (তাঁকে খুঁজে বের করুন এবং বন্দী করুন), আদেশ দিলেন সেনাপতি।

এই বিশাল নগরী বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ, ইংরেজের আক্রমণে এখন বিপর্যস্ত। এমন অবস্থায় কোথায় তিনি খুঁজে বেড়াবেন সম্রাটকে—ভাবলেন হড্‌সন। মনে পড়ল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টর গোয়েন্দা বিভাগের মৌলবী রজব আলির কথা। হড্‌সনের তিনি দক্ষিণ হস্ত। দিল্লীর কোথায় কি হচ্ছে, বিশ্বস্ত রজব আলি প্রত্যহ তার সব সংবাদ নিয়ে, হড্‌সনকে জানাতেন। রজব আলির শরণাপন্ন হলেন হড্‌সন। গুপ্তচর তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি শীঘ্রই সম্রাটের সংবাদ নিয়ে আসছেন। মুন্সী জীবনলালের কাছে ছুটলেন রজব আলি। তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, একমাত্র মীর্জা এলাহি বক্স জানেন সম্রাট এখন কোথায়। গেলেন তিনি এলাহি বক্সের ভবনে। সেইখানে গিয়ে রজব আলি যখন জানতে পারলেন যে সম্রাট সপরিবারে হুমায়ুনের সমাধি ভবনে রয়েছেন, তখন তিনি এলাহি বক্সকে বোঝালেন যে ইংরেজের হাতে বাদশাহকে সমর্পণ করতে পারলে তাঁরা দুজনেই লাভবান হবেন। রজব আলির এই প্রস্তাবে এলাহি বক্স সম্মত

হলেন। আরো চব্বিশ ঘণ্টাকাল সমাধিভবনে সম্রাটকে লুকিয়ে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো।

যথাসময়ে কাপ্তেন হডসন এই সমাচার পেলেন।

তিনি জানালেন সেই সংবাদ জেনারেল উইলসনকে।

সেনাপতি বাদশাহকে সসম্মানে বন্দী করে আনবার আদেশ দিলেন।

কাপ্তেন হড্সন পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে, রজব আলির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের দিকে ছুটলেন।

জিন্নৎ মহল বাদশাহকে বোঝালেন যে, যদি তাঁদের জীবনরক্ষা হয়, তাহলে আত্মসমর্পণই শ্রেয়। বৃদ্ধ বাদশাহ বেগমের কথায় সম্মত হলেন। বেগম ও জোয়ান বখ্তের হাত ধরে স্খলিতপদে বৃদ্ধ বাদশাহ পাল্কীতে চড়ে সমাধিক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে বহির্গত হলেন। নিষ্কাশিত তরবারী হাতে দ্বারদেশে দাঁড়িয়েছিলেন কাপ্তেন হডসন। তৈমুরের বংশধর ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে তাঁর কাছে সমাগত হলেন। তারপর স্ত্রী-পুত্র ও নিজের জীবন ভিক্ষা করে 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' বাদশাহ কাপ্তেন হডসনের হাতে তাঁর দু'খানা তরবারী সমর্পণ করলেন। কথিত আছে যে, এর একখানি এক সময়ে নাদির শাহ ব্যবহার করতেন, দ্বিতীয় খানি স্বহস্তে ধারণ করতেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। মোগলশৌর্যের শেষ প্রতীক দু'খানি অবশেষে হডসন সেনাপতি উইলসনের কাছ থেকে পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছিলেন। অনুচরেরা পাল্কীর কাছ থেকে সরে গেল। দিল্লীর প্রসিদ্ধ চাঁদনী চক দিয়ে বন্দী বাদশাহের পাল্কী যেতে লাগল। পাল্কীর সামনে ও পেছনে সঙ্গীনধারী ইংরেজ সৈন্য। সকলের পুরোভাগে হডসন। নাগরিকেরা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে নির্বাকভাবে এই করুণ দৃশ্য দেখতে লাগল।

এখনো তিনজন শাহজাদা বাকী—মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা মোগল ও মীর্জা আবু বকর। রজব আলি ও এলাহি বক্স এঁদেরও ধরিয়ে দিলেন। এঁরাও সমাধিভবনে আত্মগোপন করেছিলেন। কাপ্তেন হডসন একশো সৈন্য নিয়ে শাহাজাদাদের বন্দী করতে আবার এলেন হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে। সঙ্গে আছেন রজব আলি আর এলাহি বক্স। পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শাহাজাদারা বিজেতার মহানুভবতার ওপর নির্ভর করে আত্মসমর্পণ করলেন। শাহাজাদাদের অনুচরদের নিরস্ত্র করা হলো। তারপর তিনখানা গরুর গাড়িতে চড়িয়ে বন্দী সম্রাট-পুত্রদের শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। পথে সশস্ত্র

এবং উত্তেজিত জনসাধারণ। কাপ্তেন তার ভেতর দিয়েই বন্দীদের নিয়ে চললেন। দিল্লীতে বহু ইংরেজ নর-নারীহত্যার নায়ক এই তিন জন শাহজাদা। হডসনের প্রতিহিংসা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নগরে পৌছবার এক মাইল থাকতে দিল্লী তোরণের কাছে কাপ্তেন হডসন শাহজাদাদের গাড়ি থেকে নামতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিত হৃদয়ে সেই আদেশ পালন করলেন। তিন জনকেই বধ্যবেশ পরান হলো। তারপর পথিমধ্যে সেই তিনজন নিরস্ত্র বন্দী রাজকুমারকে তিনি কুকুরের মত গুলি করে মারলেন। হডসন এইখানেই থামলেন না। কোতোয়ালীর সামনে মৃতদেহ তিনটি লটকিয়ে রাখবার হুকুম দিলেন। লোকে ইংরেজের প্রতাপ দেখে ভয় পাবে—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।)

ঐতিহাসিক মেলিসন কাপ্তেন হডসনের এই নৃশংস কাজ সমর্থন করেন নি। এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "শাহাজাদাদের হুকুমে বিদ্রোহীরা ইংরেজ-নরনারীদের বলিদান করিয়াছিল এই অদ্ভুত জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহারা এই হত্যায় যে লিপ্ত ছিলেন না, তাহা পরবর্তী কালে প্রমাণিত হইয়াছে। হডসনের আচরণ আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর (পাশবিক এবং অধিকতর অনাবশ্যক অত্যাচার আর হইতে পারে না।" ঐতিহাসিক মার্টিন এবং মিচেলও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।)

বিদ্রোহীরা পলাতক।

বাদশাহ ইংরেজদের বন্দী।

দিল্লীতে নরহত্যার স্রোত বয়ে গেল। মোগলের রাজধানী নতুন করে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হলো। দিল্লীর পথের ধূলিতে চিরদিনের মতো মিলিয়ে গেল মোগলের মহিমা। বিজয়ী সৈন্যরা দুদিন ধরে দিল্লীতে যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিল। নরহত্যা ও সম্পত্তি বিলুণ্ঠন তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে ইংলণ্ডের 'টাইমস' পত্রিকার বোম্বাইয়ের সংবাদদাতা লিখেছিলেন: "যেদিন নাদির শাহ চাঁদনী চকের ক্ষুদ্র মসজিদে থাকিয়া, অধিবাসীদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, সেইদিনের পর হইতে শাহজাহানের নগরে এইরূপ দৃশ্য লোকের দৃষ্টিপথে আর পড়ে নাই।"

দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হলো। বৃদ্ধ মোগল ইংরেজের বন্দী।

বন্দী বাদশাহের এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন গ্রিফিথস্। ২১শে সেপ্টেম্বর সম্রাট আত্মসমর্পন করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর গ্রিফিথস্ তাঁকে দেখতে যান। "আমি দেখিলাম একটি সাধারণ চারপাই-এর উপর সামান্য মখমলের আসনে সম্রাট পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন। মহিমান্বিত মোগল বংশের শেষ ংশধর এক স্বল্পপরিসর প্রকাশ্য স্থানে দীনহীনের মতো বসিয়া আছেন। ি ান্বিত শ্বেতশ্মশ্রু ভিন্ন তাঁহার আকৃতিতে আকর্ষণীয় আর কিছুই ছিল না। ঃ সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের পরিধানে শাদা আলখাল্লা, মাথায় শাদা টুপি আর তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন অনুচর তাঁহাকে ময়ূরপুচ্ছের তৈরি দুইখানি প্রকাণ্ড পাখা দিয়া ব্যজন করিতেছে। বৃদ্ধ মোগল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ—যেন বর্তমানের ভাগ্যবিপর্যয় তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন। অতি করুণ সেই দৃশ্য আমি বেশীক্ষণ দেখিতে পারি নাই।"

রাজধানীর অধিকাংশ স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত। যমুনার কল্লোলে বাজে শুধু অপমান ও পরাজয়ের গান। তারপর? তারপর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে ম্যাজিস্ট্রেট স্যর টমাস মেটকাফের বিচারে, অবাধে লোকের ফাঁসি হতে লাগল। এই যুদ্ধের চরম মূল্য ইংরেজকে অবশ্য দিতে হয়েছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে আহত জেনারেল নিকলসন ২৩শে সেপ্টেম্বর মারা যান। দিল্লী উদ্ধার করতে গিয়ে ইংরেজকে সেদিন একাধিক রণদক্ষ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতিকে হারাতে হয়েছিল। এ ছাড়া, ইংরেজ-পক্ষে প্রায় চার হাজার সৈন্য হত ও আহত হয়। এই অভিযানে গভর্ণমেন্টের খরচের পরিমাণ ছিল একষট্টি লক্ষ টাকা।

॥ পঁচিশ ॥

এইবার লক্ষ্ণৌ-উদ্ধার পর্ব।

তিনজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করতে অভিযান করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন রেসিডেন্সীতে পৌঁছবার আগেই শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে বহু কষ্টে ও ভীষণ প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে আউট্রাম ও হ্যাভলক সসৈন্যে লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সীতে পৌঁছলেন—সেসব কথা আগেই বলেছি। ২৫শে সেপ্টেম্বর সেনাপতি আউট্রাম রেসিডেন্সীতে পদার্পণ করে বুঝলেন যে আরো সৈন্য দরকার। তিনি দিল্লীর সেনানায়কের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। জেনারেল উইলসনের পরিবর্তে দিল্লীর সেনানায়ক তখন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল গ্রিথেড। স্যর কলিন ক্যাম্পবেল তখন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি।

১৩ই আগষ্ট তিনি ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় পৌঁছলেন।

ভারতের চারদিকে তখনই বিপ্লব। সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ বিদ্রোহীদের করায়ত্ত। রোহিলখণ্ডে ইংরেজের প্রাধান্য একেবারে লুপ্ত হয়েছে। মধ্য ভারতবর্ষ উত্তেজনা-তরঙ্গে আন্দোলিত। বহু স্থানেই সংবাদ আদান-প্রদানের পথ অবরুদ্ধ। এই দুর্যোগময় পটভূমিকাতেই স্যর কলিন প্রধান সেনাপতির কর্মভার গ্রহণ করেন। কলকাতায় পৌঁছে ভারতব্যাপী বিপ্লবের বিবরণ শুনে প্রধান সেনাপতি সর্বাগ্রে অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ নগরী উদ্ধারে কৃতসংকল্প হলেন। সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করে স্যর কলিন নভেম্বরের প্রথম ভাগেই অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। তাঁর দৃষ্টি অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌর দিকে।

সেনাপতি হ্যাভলক ও আউট্রাম বিদ্রোহীদের লক্ষ্ণৌ থেকে একেবারে বিতাড়িত করতে পারেন নি। ওয়াজেদ আলির রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখনো সিপাহীরা তাদের প্রাধান্য রক্ষা করছিল। এই সময়কার অযোধ্যার অবস্থার

বর্ণনা গাবিনস্ দিয়েছেন এইভাবে: "পথে মানবের সমাগম ছিল না। উদ্দাম কুক্কুর ভিন্ন আর কোন জীবিত প্রাণীকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত না। লোকালয়ে লোকবসতি ছিল না। জনবহুল পল্লী, লোকপূর্ণ রাজপথ, কৃষীবলপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রসমূহ, সমস্তই নিস্তব্ধভাবে ছিল। এইরূপ জনমানবহীন স্থান অতিক্রম করিয়া, প্রধান সেনাপতি ওয়াজেদ আলীর রাজধানীতে উপনীত হইলেন।"

*

ছ' মাস ধরে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো।

সেসব যুদ্ধের আনুপুর্বিক বর্ণনা আমাদের কাহিনীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। দু' একটির উল্লেখ করব।

১৩ই নভেম্বর, বিকেলবেলা।

ইংরেজপক্ষের হতাবশিষ্ট সৈন্যরা রেসিডেন্সীর দিকে আবার অগ্রসর হলো। সামনে প্রশস্ত ময়দান। ময়দানের পাশে একটিমাত্র ক্ষুদ্র পল্লী। দক্ষিণ দিকে একটি প্রান্তর। তারপরে প্রায় চারশো গজ পর্যন্ত ছোট ছোট ঝোঁপ—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কুটীর ও বাগান। এইসব অতিক্রম করে নবাব গাজিউদ্দীন হাইদরের প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির শাহনজিফ্। শাদা পাথরের গুম্বজে সুশোভিত। সমাধিমন্দিরের প্রাঙ্গণ উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। শাহনজিফের অল্প দূরে কদমরসুল নামে ছোট্ট একটি মসজিদ। এই মসজিদের নিকটবর্তী জঙ্গলে এবং এর উন্নত প্রাচীরের অন্তরাল থেকে বিদ্রোহীরা গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ইংরেজ সৈন্য এখানে প্রচণ্ড বাধা পায়। বিদ্রোহীদের কামানে ও বন্দুকে ইংরেজপক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয়। স্যর কলিন ক্যাম্পবেল স্বপক্ষের বলক্ষয়ে চিন্তিত হলেন। ক্রমে রাত্রির অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। কয়েকজন অফিসার গুরুতর ভাবে আহত হলেন। প্রধান সেনাপতি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর ললাট-রেখা আকুঞ্চিত হয়। মুখভঙ্গীতে ফুটে ওঠে দুশ্চিন্তার রেখা। বিদ্রোহীদের পরাক্রম পর্যুদস্ত করা তাঁর কাছে অসম্ভব বোধ হলো। ইংরেজ সৈন্য আর অগ্রসর হতে পারল না। প্রাচীরের রন্ধ্র দেশ থেকে গুলির পর গুলি এসে ইংরেজপক্ষের অনেকের প্রাণনাশ করতে লাগল। কামানের গোলায় প্রাচীর ভেঙে ফেলার চেষ্টা পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। ইংরেজ সৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হলো।

শাহনজিফ্ অধিকার করতে স্যর কলিনের প্রভূত বলক্ষয় হলো।

তারপর দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ইংরেজ সৈন্য একে একে আলমবাগ, চারবাগ, কৈসারবাগ, সেকেন্দ্রাবাগ, মতিমহল, বেগমকুঠি, মচ্ছিভবন, দেলখোশবাগ ইত্যাদি বহু স্থান অধিকার করতে সক্ষম হলো। মতিমহল রক্ষার জন্য বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু শেষে তাদের ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়। কিন্তু মতিমহল অধিকৃত হলেও বিদ্রোহীদের উদ্যম ভঙ্গ হলো না। তারা কৈসারবাগ থেকে মতিমহল ও খোর্সেদ মঞ্জিলের মাঝখানে গোলা-বৃষ্টি করতে লাগল। প্রধান সেনাপতি খোর্সেদ মঞ্জিলে ছিলেন। রেসিডেন্সীর সৈন্যরা গোলাবৃষ্টির মধ্যেও মতিমহল থেকে খোর্সেদ মঞ্জিলে যেতে লাগল। এইখানে হ্যাভলক ও আউট্রামের সঙ্গে প্রধান সেনাপতি মিলিত হলেন। আলমবাগ থেকে এই পর্যন্ত আসতে প্রধান সেনাপতির লেগেছিল পাঁচ দিন এবং কমপক্ষে পঞ্চাশজন অফিসার ও প্রায় পাঁচশ সৈন্য হত বা আহত হয়। এইভাবে লক্ষ্ণৌ আসতে প্রধান সেনাপতির প্রচুর বলক্ষয় হয়।

রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করেই স্যর কলিন সকলকে রেসিডেন্সী পরিত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। হ্যাভলক ও আউট্রাম আপত্তি করলেন, অন্যান্য সেনানায়করাও এই প্রস্তাবের বিরোধী হলেন। তাঁরা প্রায় পাঁচ মাস কাল যেখানে থেকে অসংখ্য বিপদের সম্মুখে আত্মরক্ষা করেছিলেন, এখন সহসা সেই স্থান পরিত্যাগের প্রস্তাব হওয়াতে তাঁরা যুগপৎ ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হলেন। বিদ্রোহীদের একেবারে উৎখাত করে, অযোধ্যার রাজধানীতে তাঁরা নিজেদের প্রাধান্য সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি কারো কথা শুনলেন না। রেসিডেন্সী পরিত্যাগ করে প্রথমে দিলখুশায় যাওয়া স্থির হলো। পথের দূরত্ব পাঁচ মাইল। বিদ্রোহীরা তখনো কৈসারবাগ থেকে সেকেন্দ্রাবাগ যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এইখানে বিদ্রোহীদের গুলিতে ইংরেজপক্ষের প্রায় দু'হাজার সৈন্য মারা যায়। অবশেষে ইংরেজ নরনারী নিরাপদে দিলখুশায় পৌঁছল। এইখানে সেনাপতি হ্যাভলকের মৃত্যু হয়।

এই ভারতব্যাপী বিপ্লবে ভারতের সাধারণ নারীও যে কিছু অংশ গ্রহণ করেছিল তার একটি চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ফরবেস্-মিচেল: তিনি লিখেছেন, "সেকেন্দ্রাবাগের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পিপুল গাছ ছিল।

গাছটির শীর্ষদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীতে সমাচ্ছন্ন। গাছের নিম্নভাগে শীতল জলপূর্ণ কয়েকটি জালা ছিল। যখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক ইহার শীতল ছায়ায় শ্রান্তি বিনোদন এবং জালার শীতল জলে পিপাসা শান্তির জন্য বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। অদূরে কয়েকটি ইংরেজ সৈন্যের মৃতদেহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের একজন শবগুলির আঘাতের স্থান পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের উপরিভাগে কেহ রহিয়াছে কিনা, পর্যবেক্ষণের জন্য অপর একজনকে অনুরোধ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি উর্ধ্বমুখে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'হ্যাঁ, আমি দেখিতে পাইতেছি'—ইহা বলিয়াই, সেই ব্যক্তি লক্ষ্য নির্দেশ পূর্বক বন্দুক ছুঁড়িল। অমনি বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে একটি সুসজ্জিত ও গতাসুদেহ ভূপতিত হইল। উহার পরিধানে গোলাপী রঙের রেশমী কাপড়ের আঁটা পায়জামা, এবং আংরাখা ছিল। মাটিতে পড়িবামাত্র বক্ষোদেশের আংরাখার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাবৃত বক্ষঃস্থল দেখিয়া উহা নারীদেহ বলিয়া বোধ হইল। নারীর কটিদেশে গুলিভরা দুইটি পিস্তল। পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ অঞ্চলের বহু নারী এইভাবে বিদ্রোহীদের সহায়তা করিয়াছিল।"

২২শে নভেম্বর। রাত্রিকালে ইংরেজ সৈন্যরা রেসিডেন্সী পরিত্যাগ করে আলমবাগে পৌঁছল। এইখানে সেনাপতি হ্যাভলকের মৃতদেহ সমাহিত হয়। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আউট্রামকে আলমবাগে রেখে কানপুরে যাত্রা করলেন। আউট্রামের সঙ্গে রইল চার হাজার সৈন্য ও পঁচিশটি কামান আর স্যর কলিনের সঙ্গে গেল তিন হাজার সৈন্য।
তখন কানপুর রক্ষার ভার ছিল সেনাপতি ওয়াইণ্ডহ্যামের ওপর। ইতিমধ্যে তাঁতিয়া তোপির নেতৃত্বে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সিপাহীরা এসে কানপুর আক্রমণ করে। সেনাপতি ওয়াইণ্ডহ্যাম বিদ্রোহীদের আক্রমণে পরাজিত ও বিব্রত হলেন। কানপুরের এই বিপদের বার্তা শুনেই প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌর অভিযান অসমাপ্ত রেখে এখানে চলে এসেছিলেন। তিনি এসে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে কানপুর মুক্ত করলেন। কিন্তু

এখনো গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগের অনেক জায়গায় বিদ্রোহীদের *প্রাধান্য রয়েছে। দিল্লী অধিকারের অব্যবহিত কাল পরেই সেনাপতি গ্রিথেড* সসৈন্যে দিল্লী থেকে উত্তরপশ্চিম ভারতের বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করেছিলেন। কয়েকদিন পরেই সমস্ত পথে আতঙ্কের সঞ্চার করে ইংরেজ সৈন্য আলিগড়ে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে গ্রিথেড তাড়াতাড়ি আগ্রার দিকে অভিযান করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আগ্রার বিদ্রোহী সিপাহীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে তেরোটা কামান ফেলে কালি নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। এর পর কর্ণেল হোপ গ্র্যান্ট কর্ণেল গ্রিথেডের কার্যভার নিয়ে, মৈনপুরীতে বিদ্রোহ দমন করতে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি সর্বাংশে বিপ্লবের শান্তি করতে পারেন নি। সিপাহীরা দলবদ্ধ হয়ে, আবার ইংরেজের প্রাধান্য বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। মৈনপুরী, ফতেগড় প্রভৃতি স্থানে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এপর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তিনটি স্থান ইংরেজরা অধিকার করতে পেরেছিল—উত্তর-পশ্চিমে দিল্লী, দক্ষিণ-পূর্বে এলাহাবাদ এবং এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী আগ্রায় ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তখন প্রধান সেনাপতি চারদিকে বিপ্লব দমনের জন্য নানাস্থান থেকে সৈন্য আনিয়ে, বিভিন্ন বিপ্লব-কেন্দ্রে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। চীনদেশে যে সৈন্যদল যাচ্ছিল তাও এই কাজে নিযুক্ত হয়। কানপুরে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হলো বটে, কিন্তু তখনো ফতেগড়ে ফরাক্কাবাদের নবাব স্বপ্রধান ছিলেন। প্রধান সেনাপতি তাই অবিলম্বে ফতেগড়ে যাত্রা করলেন। ঐতিহাসিক মেলিসন লিখেছেন: "এই অভিযানে তিনি পথিমধ্যে কালি নদীর তীরে বাধা পান। বিদ্রোহীদের তোপের মুখে তাঁহার অনেক সৈন্য ক্ষয় হয়। পরে ইংরেজপক্ষের কামানের গোলায় বহু সিপাহী নিহত হইলে তাহারা পিছু হটিতে থাকে, তাহাদের কামানও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তিন চারি মাইল যাইবার পর সিপাহীরা পুনরায় যুদ্ধের চেষ্টা করে, কিন্তু বিপক্ষের আক্রমণে নিতান্ত বিপর্যস্ত ও হীনবল হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। শেষে বিনা বাধায়ই ইংরেজ সৈন্য ফতেগড় দুর্গে প্রবেশ করে। সিপাহীরা প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ফেলিয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ফতেগড় ইংরেজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল।"

প্রধান সেনাপতি একমাস কাল ফতেগড় রইলেন। এখান থেকে তিনি রোহিলখণ্ড বিদ্রোহীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফতেগড় থেকে রোহিলখণ্ডে যাবেন। লর্ড ক্যানিং এতে আপত্তি করলেন। তিনি স্যর কলিনকে লিখলেন: "সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ডে প্রাধান্য স্থাপন করা নিরতিশয় বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করা উহা অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। মনে রাখিবেন, জনসাধারণের দৃষ্টি এখন অযোধ্যার উপর। অযোধ্যা বিদ্রোহীদের শক্তিসঞ্চয়ের কেন্দ্র। অতএব আপনি রোহিলখণ্ডের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করুন।"

তিন হাজার একশো সৈন্য ও ১৬০টি কামান নিয়ে প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন। সৈন্য ও কামানের সংখ্যা তাঁর কম নয়, কিন্তু কুড়ি মাইল পরিধি পরিমিত একটি বৃহৎ নগর অধিকারের জন্য এই আয়োজন পর্যাপ্ত ছিল না। বিদ্রোহীরা যে পথ অবরোধ করেছিল, সে পথ না ধরে, অন্য পথে খুব কৌশলের সঙ্গে ব্যূহ রচনা করে, স্যর কলিন লক্ষ্ণৌর পার্শ্ববর্তী নানা স্থান অধিকার করতে করতে অগ্রসর হলেন। দিল্লীর বিখ্যাত কাপ্তেন হডসনও এই অভিযানে ছিলেন। গোমতীর উভয় তটে সৈন্য সন্নিবেশিত হলো। ২রা মার্চ, ১৮৫৮ নগর আক্রমণ শুরু হয়। প্রথম উদ্যমেই সেকেন্দ্রাবাগ ও শাহনজিফ অধিকৃত হয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়িতে কয়েকজন সিপাহী ছিল। সেই বাড়ি অধিকার করতে গিয়ে মুষ্টিমেয় সিপাহীর বিক্রমে একদল ইংরেজ সৈন্যকে হটে আসতে হয়। শেষে কামানের সাহায্যে ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করে। একজন মাত্র আহত সিপাহী বেঁচে ছিল। উন্মত্ত প্রায় ইংরেজ ও শিখ সৈন্য পরে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে নিজেদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে।

কৈসারবাগ ও বেগমকুঠিতে বহু বিদ্রোহী বাস করছিল। ইংরেজ সৈন্য এই দুই স্থানও অধিকার করে। ১০ই মার্চ বেগমকুঠি আক্রান্ত হয়। সেদিন রাত্রে বেগমকুঠিতে প্রধান সেনাপতি এক দরবারের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য—নেপালের রাজা জঙ্গবাহাদুরের অভিনন্দন। ইতিমধ্যে জঙ্গবাহাদুর তিন হাজার গুর্খা সৈন্য নিয়ে ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সৈন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেয়। এইখানে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যিনি দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলকে বন্দী করেছিলেন,

এবং নিজের হাতে যিনি শাহজাদাদের বধ করেছিলেন, সেই দুঃসাহসিক কাপ্তেন হডসন বেগমকুঠি আক্রমণের সময়ে একজন বিদ্রোহীর গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইবার ইংরেজ সেনাপতিদের এক পরাক্রান্ত বিদ্রোহীর সম্মুখীন হতে হলো। তিনি অযোধ্যা-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মৌলবী আহমদউল্লা। তিনি এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ ও সুগঠিত দেহ এই মৌলবীই ছিলেন লক্ষ্ণৌ-বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক রাসেল লিখেছেন: "ইংরেজের প্রতি মৌলবী আহামদউদ্দৌলার যেমন বিদ্বেষভাব ছিল; ইংরেজের ক্ষমতানাশে তিনি তেমন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ধর্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহীদের আরো উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া স্বধর্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গে কাতর হয় নাই। কথিত আছে, তাঁহার হাতে একটি কোড়া মাত্র থাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হস্তে করিয়া সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন।"

এই মৌলবীর সঙ্গে মিলেছিলেন লস্কর শাহ্ নামে এক ফকির।

এই দু'জনের উত্তেজনায় বিদ্রোহীরা সাহস ও বল দুই-ই পেয়েছিল।

ইংরেজ সৈন্য ২১শে মার্চ মৌলবীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। তিনি তখন সাদতগঞ্জে। প্রতিপক্ষের সামনে মৌলবী সাহেব এমন দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করেন যে, সেনানায়ক লুগার্ড তাতে অতিমাত্রায় বিস্মিত হন। ইংরেজের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে তাঁর দলের অনেকগুলি সৈন্য নিহত ও অনেকগুলি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবীর দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইংরেজ সৈন্য এদের পিছু তাড়া করে। মৌলবী স্বয়ং অক্ষত শরীরে প্রস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার পরেই বিদ্রোহীদের বাধা দান শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় এবং জয়ের আশা নেই দেখে, বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করল। ইংরেজেরা আবার ওয়াজেদ আলির রাজধানীতে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করল।

বেগম হজরৎ মহল রাজধানী পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে গেলেন এবং সেখান থেকে এই তেজস্বিনী নারী ইংরেজের পরাক্রম নাশের চেষ্টা করেন। যে সব পরাক্রান্ত তালুকদার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, তাঁরা এই সময়ে নানাস্থানে আত্মপ্রাধান্য রক্ষায় উদ্যত হলেন।

তারপর? তারপর দিল্লীতে লুঠতরাজের যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গিয়েছিল, তারই পুনরুক্তি হলো লক্ষ্ণৌতে। এখানেও ইংরেজ সৈনিকের পাশে গুর্খা ও শিখরা ছিল। এই লুণ্ঠনের বর্ণনা একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ লেখক এইভাবে দিয়েছেন: 'ইংরেজ, শিখ ও গুর্খা সৈন্যরা লক্ষ্ণৌতে ভীষণ লুণ্ঠন ব্যাপারে রত হয়। *নবাবের প্রাসাদ হইতে সামান্য গৃহ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হওয়ায় বহু কোটি* কোটি টাকার দ্রব্য বিনষ্ট ও চূর্ণীকৃত হয়। অনেক বাড়িতে সিপাহীরা লুক্কায়িত ছিল। সেই সব বাড়ি বারুদ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়; আর সিপাহীরা জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়।"

রাসেল এই লুণ্ঠনের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: "বিলুণ্ঠনের দৃশ্য বর্ণনীয় নহে। উন্মত্ত সৈনিকেরা দ্রব্যাদির ভাণ্ডার ভাঙিয়া ফেলিল। স্বর্ণখচিত বস্ত্র, রৌপ্যময় পাত্র, বিবিধ প্রকার অস্ত্র, পতাকা, শাল, বাদ্যযন্ত্র, পুস্তক, প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপাকার করিল। মণিমাণিক্য খচিত পিস্তল তরবারি ভাঙিয়া ফেলিয়া এগুলি প্রমত্ত সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল।..... সমগ্র লক্ষ্ণৌ বিলুণ্ঠনকারীদের হাতে পড়িয়াছিল। ইংরেজ শিবিরের সকলেই লুঠতরাজে প্রমত্ত হইয়াছিল। ইমামবাড়া, কৈসারবাগ আর হজরৎগঞ্জের দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কোনরূপ শৃঙ্খলার সম্মান ছিল না, সুনীতির বন্ধন ছিল না, মানবের মানবোচিত গুণের কোনরূপ নিদর্শনই ছিল না।...বিলুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা নিহতদিগের উপরও আত্মপরাক্রম প্রকাশে বিরত ছিল না। বারুদের বস্তায় প্রজ্বলিত দেশলাই ফেলিয়া, গৃহের ভিতরকার সিপাহীদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ফ্রান্সের অধিপতি নবম চার্লস মৃত শত্রুর গন্ধ ভালবাসিতেন। তিনি যদি ১৮৫৮ অব্দে মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌর পথগুলিতে একবার পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া যাইত।"

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হলো বটে, কিন্তু অযোধ্যায় বহু স্থান তখনো পর্যন্ত ইংরেজের অধিকারের বাইরে রইল। স্যর কলিন তখন অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করবার জন্য তিন জন অধিনায়কের অধীনে তিনটী সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন। তিনি স্বয়ং রোহিলখণ্ড আক্রমণ করার কথা বিবেচনা করলেন।

লক্ষ্ণৌতে পরাজিত হয়ে মৌলবী আহমদউদ্দৌলা নিরাশ বা নিরস্ত হলেন না। তিনি শাহজাহানপুরের ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। স্যর কলিন তখন শাহজাহানপুরে। মৌলবী এই সংবাদ অবগত হয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করে মোহমদীতে উপনীত হলেন। বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন প্রধান সেনাপতি। মোহমদীর দুর্গ ধ্বংস করে মৌলবী আবার এলেন শাহজাহানপুরে। সমগ্র নগর মৌলবীর পদানত হলো। তারপর ১৮টা কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে. ৩রা থেকে ১১ই মে পর্যন্ত তিনি প্রতিপক্ষের দিকে তীব্রভাবে গোলাবৃষ্টি করতে থাকেন। শাহজাহানপুরের ইংরেজ-সৈন্যের অধিনায়ক তখন জেলখানায় আত্মরক্ষা করছেন। সংবাদ পেয়ে অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠালেন প্রধান সেনাপতি। তবু মৌলবীর পরাজয় সুসাধ্য হলো না। অশ্বারোহী-সৈন্যে তিনি অধিক বল-সম্পন্ন ছিলেন। তা'ছাড়া অযোধ্যার নানা স্থান থেকে তাঁর সাহায্যের জন্য সৈন্য আসতে লাগল। অযোধ্যার বেগম এলেন মৌলবীকে সাহায্য করতে। নানাসাহেব তাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। বেরিলীর ফিরোজশাহ তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হলেন।

অবস্থা সংকটজনক উপলব্ধি করে, প্রধান সেনাপতি অবশেষে স্বয়ং বহু সৈন্যসহ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন।

পানহাটের রণক্ষেত্রে কোনো পক্ষেরই জয়-পরাজয় স্থির হলো না।

অবশেষে জুন মাসের প্রথমভাগে পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ সিংহের ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজের মহাত্রাস এই মৌলবীর মৃত্যু হয়। গভর্ণমেণ্ট সেই সময়ে এই বিদ্রোহীর মাথার দাম ধার্য করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিশ্বাসঘাতক রাজা মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

ফয়জাবাদের মৌলবী আহমদউদ্দৌলার মৃত্যু হলো। তাঁর বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত করেছেন। মেলিসন লিখেছেন : "কেহ অন্যায়রূপে স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিলে, যদি দেশ-হিতৈষী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মৌলবী নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত দেশ-হিতৈষী। যে বৈদেশিকগণ তাঁহার দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে বিলক্ষণ দৃঢ়তার

সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষোচিত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। মৌলবী প্রভৃত ক্ষমতাশালী, নির্ভীক, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং ইংরেজের প্রতিপক্ষের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুইবার প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্পবেলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। স্যর কলিনের ন্যায় বীরপুরুষকেও তাঁহার সমর-চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।"

এই সময়ে কানপুরে ইংরেজপক্ষের নৌ-সেনাধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের মৃত্যু আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এইবার প্রধান সেনাপতি রোহিলখণ্ড জয় করতে মন দিলেন।

বেরিলীতে তখনো খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রবল প্রতাপ। ফিরোজশাহেরও প্রচুর সৈন্য। আগেই বলেছি যে প্রধান সেনাপতি তিন জন সেনানায়ককে বিদ্রোহ দমন করতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হন। সম্মিলিত সৈন্য ৫ই মে বেরিলীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেরিলীতে অশ্বারোহী গাজিগণ অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তারা এমন সুকৌশলে, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে তরবারী চালনা করেছিল যে, পাঁচজন গাজীর আক্রমণে ইংরেজপক্ষের এক শো সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু শেষে ইংরেজপক্ষেরই জয় হয়। ৭ই মে বেরিলী অধিকৃত হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ পালিয়ে গেলেন।

এইভাবে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও বেরিলীতে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জুন মাসের মধ্যেই বিদ্রোহীরা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য স্থান থেকে তাড়িত হয়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ক্রমে এইসব স্থানে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে। বিপ্লব স্তিমিত হয়। কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষের মানচিত্রে তখনো পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরেজের দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল।

সেই রাজ্যটির নাম ঝাঁসী।

এইখানেই বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ।

এই বিপ্লব নিবারণ করতে গিয়ে ইংরেজকে হিমসিম খেতে হয়; বহু সৈন্য ও অভিজ্ঞ বহু সেনাপতির যুদ্ধকৌশল আবশ্যক হয়। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বীরত্বে ইংরেজ সেনাপতিকে বিব্রত হতে হয়। এইবার আমরা সিপাহীযুদ্ধের সেই গৌরবময় কাহিনী বলব।

॥ ছাব্বিশ ॥

সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম নায়ক, অসাধারণ রণকুশল মারাঠাবীর তাঁতিয়া তোপি গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সিপাহীদের সাহায্যে ইংরেজদের কাছ থেকে কানপুর আবার অধিকার করেছিলেন। ২৬শে নভেম্বর, পাণ্ডু নদীর তীরে তুমুল যুদ্ধের পর ইংরেজসৈন্যের বিষম পরাজয় হয় এবং তার পরদিন তাঁতিয়া তোপি কানপুর অধিকার করলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের অন্যতম সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার উইলসন নিহত হন। তারপর রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্পবেল, জেনারেল ওয়াইণ্ডহাম ও ওয়ালপোল। ৬ই ডিসেম্বর আবার দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদের পক্ষে নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপি সৈন্য পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে তাঁতিয়া তোপির পরাজয় হলো এবং বিদ্রোহীরা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে বিঠুরের দিকে পালিয়ে যায়। ৯ই ডিসেম্বর গঙ্গা পার হবার সময় বিদ্রোহীদের সঙ্গে কর্ণেল হোপ গ্র্যান্টের শেষ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও তাঁতিয়া তোপির পরাজয় হয়। গোয়ালিয়রের সৈন্য কাল্পীতে গিয়ে সমবেত হলো। তাঁতিয়া তোপি আবার এদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ঝাঁসীর রাণীর পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কী ভাবে সংগ্রাম করেছিলেন, সে কাহিনী পরে বলছি।

সাগর ও নর্মদা প্রদেশের মধ্যে ঝাঁসী।

ঝাঁসীতেও লর্ড ডালহৌসির কৌশলে কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল এবং কোম্পানী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহারের কি চরম নিদর্শন প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। বাইশ বছর বয়সের এই বীরাঙ্গনার অন্তরে ছিল প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষ। তিনি শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ইংরেজের অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি এই

অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যে ন্যায়সম্মত যুক্তি দেখিয়েছিলেন। সেই যুক্তি কোম্পানী গ্রাহ্য করে নি। নিজের রাজ্যের মধ্যে গো-হত্যা করার নিষ্ফল প্রতিবাদ, রাণীর বাৎসরিক ষাট হাজার টাকার নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে তাঁর মৃত স্বামীর ঋণ পরিশোধ করতে তাঁকে বাধ্য করা এবং তাঁর বৃত্তির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া—এইসব নানা কারণে গভর্ণমেণ্টের প্রতি রাণীর বিরাগ ও অসন্তোষ ক্রমে ঘনীভূত হতে থাকে। অসন্তোষের সবচেয়ে প্রধান কারণ ছিল কোম্পানীর জুলুম। ঝাঁসী রাজবংশের উপাস্যা শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর নামে কয়েকখানি গ্রাম নিষ্কর দেবোত্তর দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানী সেই গ্রামগুলি যখন খাস করে নিতে উদ্যত হয়, রাণী তখন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সে-প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়। রাণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি ঝটিকাসঞ্চারের প্রতীক্ষায় রইলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য: "এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা অভিমানিনী রাণী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার আগুন পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানীর সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন।"

সিপাহী বিদ্রোহের তিন বছর আগে ঝাঁসী কোম্পানীর রাজ্যে পরিণত হয়। সেখানে এই সময়ে কোম্পানীর একদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী ও কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। কাপ্তেন ডানলপ ছিলেন এদের অধিনায়ক, আর কাপ্তেন আলেকজান্দার স্কীন ছিলেন কমিশনার। ঝাঁসীতে যে কোনো রকম গোলযোগ হবে, কমিশনার তা বিশ্বাস করতেন না। যখন মিরাটে সিপাহীরা বিদ্রোহী হলো, তখনো কমিশনারের বিশ্বাস হয় নি যে, ঝাঁসীর সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, অথবা বাইরের লোক তাদের উত্তেজিত করে তুলবে। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জলে উঠেছে, তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সতর্ক হতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝাঁসীর শান্ত অবস্থা দেখে কমিশনার স্কীন তা হেসে উড়িয়ে দিলেন। মে মাস কেটে গেল। জুন মাসের প্রারম্ভে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর কলভিনকে তিনি লিখলেন—"এখানকার সিপাহীদের প্রভুভক্তি ও অনুরক্তি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কোন দিকে কোন গোলযোগ নাই।"

কিন্তু "এই প্রশান্ত ঝাঁসী রাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন শুদ্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝাঁসী নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্গারিত হইল।"

দিনের বেলায় হঠাৎ সেনানিবাসের দুখানা বাংলো পুড়ে গেল। ৫ই জুন দুর্গের দিকে বিদ্রোহীদের বন্দুকের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। সেই দুর্গের মধ্যে ইংরেজের বারুদ ও ধনাগার। শহরের ইংরেজরা পরিবারবর্গের সঙ্গে নগরের দুর্গে আশ্রয় নিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে শহরে অনেক ইংরেজ বাস করত। অফিসাররা রইলেন সেনানিবাসে। বিদ্রোহী সিপাহীরা তখন ইংরেজ অফিসারদের প্রায় সকলকেই নিহত করল। তারপর কয়েদীদের কারামুক্ত করে তাদের নিয়ে উত্তেজিত সিপাহীরা দুর্গ অবরোধ করল। দুর্গের অধ্যক্ষ কাপ্তেন গর্ডন নিহত হলেন। দুর্গের গোলাগুলি বারুদ সব ফুরিয়ে গেল। তখন বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোনো উপায় রইল না। কাপ্তেন স্কীন দুর্গশীর্ষে শাদা পতাকা উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে দুর্গের প্রায় একশো জন ইংরেজ নরনারী ও শিশুর প্রাণ গেল। এই ভাবে ৮ই জুন ঝাঁসীতে বিদ্রোহের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। অবশিষ্ট ইংরেজ ঝাঁসী পরিত্যাগ করে চলে যায়।

তারপর সিপাহীরা প্রাসাদ অবরোধ করল। বিদ্রোহীদের দলপতি রাণীর কাছে তিন লক্ষ টাকা দাবী করল। টাকা না দিলে তোপে প্রাসাদ উড়িয়ে দেবে বলে ভয়ও দেখাল এবং রাণীর দায়াদ সদাশিব রাওকে ঝাঁসীর গদীতে বসাবে, এমন কথাও বিদ্রোহীরা বলল। ঝাঁসী বিদ্রোহের প্রথম পর্বে রাণীর কোন ভূমিকা ছিল না এবং তাতে তাঁর কোনো হাতও ছিল না। তিনি সিপাহীদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোনো সংবাদই তখন জানতেন না। এখন বুঝলেন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। তিনি তখন অগত্যা তাঁর সম্পত্তি থেকে অলঙ্কারাদিতে এক লক্ষ টাকা দিয়ে সিপাহীদের শান্ত করলেন। বিদ্রোহীরা উৎফুল্লচিত্তে ঘোষণা করল—"মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা, অম্মল রাণী লক্ষ্মীবাঈকা।" তারপর বিদ্রোহীরা জয়পতাকা উড়িয়ে দিল্লী অভিমুখে ছুটল। অতঃপর রাণী ইংরেজের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই রাণীর ওপর বিরূপ ছিলেন। তাঁরা ঝাঁসী বিদ্রোহের জন্য রাণীকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। এই সুযোগে ইংরেজের সহায়তায় সদাশিব রাও ঝাঁসীর রাজা হবার উদ্দেশ্যে রাণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে ঝাঁসীর মহারাজা বলে ঘোষণা করলেন। রাণী সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে সদাশিবকে বন্দী করতে বাধ্য হলেন। তারপর রাণী লক্ষ্মীবাঈ নতুন সৈন্য সংগ্রহ করলেন, দুর্গের মেরামত করলেন, নতুন টাঁকশাল বসালেন এবং বিঠুরের নানাসাহেবের কাছে এই সব সংবাদ জানিয়ে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন। আগে থেকেই নানাসাহেবকে তিনি পত্র লিখতেন, নানাসাহেবও তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে পত্র দিতেন। এই ভাবে দুজনে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ঝাঁসীতে কোম্পানীর ক্ষমতা বিলুপ্ত হবার পর ন'দশ মাস কাল রাণী খুব দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। এর মধ্যে বোরছা রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁর আক্রমণ প্রসিদ্ধ। তিনি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করতে এসেছিলেন। রাণী বুন্দেলখণ্ডের সর্দারের সাহায্যে নথে খাঁকে পরাজিত করেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ হিন্দু কুলবধূর বেশ পরিত্যাগ করে পাঠানীর বেশ ধারণ করেছিলেন, এবং তরবারী হাতে স্বয়ং দুর্গের ওপর থেকে তাঁর সৈন্যদের প্রেরণা দিয়েছিলেন। পরাজিত রাজারা রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ইংরেজ রাজপুরুষদের অনুগ্রহ লাভ করেন। এইসব অভিযোগের ফলে লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে কোম্পানীর মনে বিপরীত ধারণা হয়।

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মারাঠি জীবনী-লেখক লিখেছেন :

"রাণী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় প্রায়ই পুরুষবেশে, কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত হইয়া, দরবারে উপস্থিত হইতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুনী রঙের আংরাখা, মাথায় টুপী, তাহার উপর পাঠানী পাগড়ি, কোমরে জরির দোপাটা, তাহাতে বিলম্বিত রত্নখচিত তরবারী। এই পুরুষবেশে তাঁহার যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত।...তিনি দরবার গৃহে বসিতেন না। তাঁহার বসিবার ঘর দরবার গৃহের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইত

না। সেইখান হইতে তিনি কর্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন। সদয় ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে এবং প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। উপাস্যদেবী শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। এই ভাবে লক্ষ্মীবাঈ দশ মাস কাল ঝাঁসী রাজ্য শাসন করেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ভিন্ন রাজ্যরক্ষণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে ঝাঁসীরাজ্যে তাঁহার দত্তকপুত্র দামোদর রাওয়ের অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন, এই জন্যই তিনি তাঁহার সুশাসিত রাজ্য কোম্পানীর হাতেই ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যে রাণী ইংলণ্ডেও দূত পাঠাইয়াছিলেন।”

কিন্তু কোম্পানী তখন রাণীকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, বিদ্রোহের জন্যে তাঁকে দায়ী করেছেন, তাই কোন প্রমাণ, বিচার বা যুক্তিতে তাঁরা মন দিলেন না। ১৮৫৮-র মার্চ মাসে ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ ঝাঁসীর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। ঝাঁসী বিদ্রোহের এই তৃতীয় অধ্যায়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের যে বীরাঙ্গনা মূর্তি আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

১৯শে মার্চ। স্যর হিউ রোজের বাহিনী ঝাঁসী থেকে চোদ্দ মাইল দূরে চঞ্চলপুরে এসে উপস্থিত হলো। এখান থেকে ইংরেজ সেনাপতি একদল অশ্বারোহী ও কামান সমেত একদল গোলন্দাজকে ঝাঁসী পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসীর দিকে অগ্রসর হয়েছে, রাণী প্রাসাদে বসে এই সংবাদ পেলেন। এই সংবাদ পেয়েই রাণী তাঁর সদভিপ্রায় জানাবার জন্য ইন্দোরে একজন দূত পাঠালেন। ঝাঁসী ইন্দোরের এজেন্টের অধীন ছিল। স্যর রবার্ট হ্যামিলটন তখন ইন্দোরের এজেণ্ট। দূত বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে ইন্দোরে গেল না, হ্যামিলটনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করল না, স্থানান্তরে থেকে ঝাঁসীর দরবারের বিরুদ্ধে অনেক অসত্য কথা লিখে পাঠাতে লাগল। এই বিপদের সময়ে রাণীর দরবারে উপযুক্ত লোক কেউই ছিল না। নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও তেমন কর্মপটু ছিলেন না। তাছাড়া, রাণী দুর্গেই থাকতেন, বাইরের খবর তাঁর কাছে খুব কমই আসত। এদিকে তাঁরই কর্মচারীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সকলকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করতে লাগল।

এইভাবে প্রতিকূল পরিবেশ ও দরবারের বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ্মীবাঈকে ইংরেজের বিরুদ্ধে নিয়ে গেল। রাণী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যবস্থা করা সহজ নয়। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ এই দুঃসাধ্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাণীর বাহিনীতে অনেক আফগান ও বুন্দেল সৈন্য ছিল, কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা খুব কমই ছিল। ঐতিহাসিক মেলিসনের মতে, রাণীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এগার হাজার। তিনি এখন সৈন্যদলের শৃঙ্খলাসাধন করে নতুন করে ঝাঁসীবাহিনী গড়ে তুললেন এবং স্বয়ং তাদের পরিচালনভার গ্রহণ করলেন। জীর্ণ দুর্গের সংস্কার করালেন, কামানগুলো যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে আদেশ দিলেন। শুধু এই করেই রাণী ক্ষান্ত হলেন না। বড় বড় কামান চালাবার ব্যবস্থা করলেন এবং দুর্গের ও শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করতে লাগলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন বলে এই ভাবে প্রস্তুত হবার আগে ইংরেজদের মনে কোনো সন্দেহ না জাগে তার জন্যে রাণী তাদের আনুগত্য স্বীকার করে স্যর হ্যামিলটনের কাছে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন। মেলিসন প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত লক্ষ্মীবাঈয়ের এই কূটনীতির প্রশংসা করেছেন। তারপর নানাসাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন। এই ব্যাপারে তাঁর উদ্যম অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি দেখে প্রজারা উৎসাহিত হলো। ঝাঁসীর বীর নারীরাও যুদ্ধের আয়োজনে তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ঝাঁসীর বিদ্রোহ দমন করতে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চাইল। অবিলম্বে ঝাঁসী অধিকার করা লর্ড ক্যানিং অত্যাবশ্যকীয় মনে করলেন। ঝাঁসীতে ইংরেজের আধিপত্য, তাদের প্রাধান্য, তাঁদের ক্ষমতা বিলোপ হওয়াতে গভর্ণর-জেনারেলের গভীর দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কলকাতা থেকে লর্ড ক্যানিং সেনাপতি স্যর হিউ রোজকে লিখলেন: "যেমন করিয়াই হউক ঝাঁসীতে আমাদের প্রাধান্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।"

"মেরি ঝাঁন্সী দিউঙ্গী নেহি"।

এই স্পর্ধিত উক্তি নতুন করে ধ্বনিত হয়ে উঠল লক্ষ্মীবাঈয়ের অন্তরে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল ঝাঁসীতে। কামান তৈরী হয়, দুর্গ মেরামত হয়, সৈন্যদের

শিক্ষা দেওয়া হয়। যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে একদিন সারাদিন উপবাসের পর সূর্যাস্তকালে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে দেবীদর্শনে গেলেন লক্ষ্মীবাঈ। বৃটিশ কোম্পানীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি আজ দাঁড়াতে চলেছেন, ইষ্টদেবী যেন তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ করেন, মনে মনে এই প্রার্থনা জানালেন রাণী আর স্বামীর নামে নতুন করে শপথ নিলেন—মেরি ঝান্সী দিউঙ্গী নেহি। ঝাঁসীর প্রত্যেক সৈনিকও গ্রহণ করল এই শপথ।

২১শে মার্চ্চ ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ দেড় হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসী নগর ও দুর্গ বেষ্টন করলেন। উঁচু পাহাড়ের ওপর ঝাঁসীর দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইট ও পাথরের প্রাচীরে বেষ্টিত সেই দুর্গ। দুর্গ প্রাচীরের ভিত্তি কুড়ি ফুট প্রশস্ত। নীচে পনর ফুট চওড়া ও বারো ফুট গভীর পরিখা। দুর্গগম্বুজে বড় বড় কামান, দুর্গপ্রাকারে কামান বসাবার বহু ছিদ্র। এগার হাজার সৈন্য দ্বারা সেই দুর্গ সুরক্ষিত। দুর্গের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ছাড়া আর সকল দিকেই ঝাঁসী নগর প্রসারিত। নগরের পরিধি সাড়ে চার মাইল। আঠার থেকে ত্রিশ ফিট পর্যন্ত উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। দুর্গপ্রাচীরের মত নগর-প্রাচীরেও গুলি নিক্ষেপের রন্ধ্র ও কামান সান্নবেশের স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

এই নগর ও দুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করলেন স্যর হিউ রোজ।

২২শে রাত্রিতে ইংরেজ সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করল। ২৩শে উভয় পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হলো। ইংরেজের কামানের উত্তর দিল রাণীর কামান। এই দিনের যুদ্ধের বিবরণ ঐতিহাসিক চার্লস বল দিয়েছেন এইভাবে: "প্রথম আক্রমণে ঝাঁসীর গোলন্দাজদিগের পরাক্রমে ইংরেজসৈন্যের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। রাত্রিকালে ইংরেজ পক্ষ অবসর বুঝিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু রাণী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সৈনিকদলের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি চারিদিক রণবাদ্যের ভৈরব রবে পরিপূর্ণ এবং সমগ্র নগর প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। প্রভাত হইবামাত্র গোলন্দাজেরা দুর্গ প্রাচীর হইতে কামানের গোলা চালাইতে লাগিল। রাণীর 'হুইসলিং ডিক্' নামক প্রসিদ্ধ কামান হইতে যখন গোলাবৃষ্টি হয়, তখন ইংরেজ সৈন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই।"

২৫শে মার্চ ইংরেজ সৈন্য দুর্গের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করল।

প্রস্তরময় নগর প্রাচীরে বৃটিশ কামান গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। দুর্গের

লোকেরা আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কথিত আছে যে, পুরমহিলারা দুর্গ প্রাকার থেকে কামান ছুঁড়েছিলেন এবং সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যাদি বণ্টন করেছিলেন। অন্যদিকে সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হাতে নিয়ে রাণীর জয়ধ্বনি করতে লাগল। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝাঁসী দুর্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

ঘাউশ খাঁ ছিলেন রাণীর প্রধান গোলন্দাজ। এই দিন ঘাউশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ থেকে এমন তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি করলেন যে, তাতে ইংরেজ পক্ষের তোপ বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মীবাঈ এক তোড়া টাকা দিয়ে ঘাউশ খাঁকে পুরস্কৃত করলেন। এই ভাবে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইংরেজসৈন্য ও ঝাঁসীর সৈন্য সমান পরাক্রমে ও সমান সাহসে যুদ্ধ করল। লক্ষ্মীবাঈয়ের রণকৌশলের কাছে ইংরেজ সেনাপতির সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ঝাঁসীর সৈন্যদের পরাক্রম, সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখে স্যর হিউ রোজ বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। আট দিন দিনে ও রাতে দুই পক্ষে সমানভাবে যুদ্ধ হলো। রাণী দুর্গের সর্বত্র এবং নগরের যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেখানে গিয়ে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন। ৩১শে মার্চ রাত্রিকালে ইংরেজ সেনাপতির শিবিরে সংবাদ এল যে উত্তরদিক থেকে একদল সৈন্য আসছে। তিনি বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল যে সেই সৈন্য তাঁতিয়া তোপির।

বাইশ হাজার সৈন্য আর ২৮টা কামান নিয়ে ঝাঁসীর রণাঙ্গনে আবির্ভূত হলেন মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপি।

কাল্পীতেই তিনি লক্ষ্মীবাঈর সাহায্য-প্রার্থনার চিঠি পান। নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব রাণীর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং অবিলম্বে উপযুক্ত সৈন্য ও কামান দিয়ে তাঁতিয়া তোপিকে ঝাঁসীর অবরোধকারী ইংরেজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। তাঁতিয়া তোপি বহু সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীতে আসছেন শুনে, ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হলেন। দুর্গের মধ্যে এগার হাজার আর এই বাইশ হাজার সৈন্য—সেনাপতি তাঁতিয়া তোপি; অতএব দুশ্চিন্তার কারণ যথেষ্টই ছিল।

বেত্রবতীর তীরবর্তী প্রান্তরে তাঁতিয়া তোপি তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। সেনাদলকে তিনি দুভাগে বিভক্ত করলেন। দক্ষিণভাগে তিনি নিজেই

সেনাপতি। প্রতিপক্ষের সৈন্য অল্প ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ঝাঁসীর অবরোধ ভাঙার জন্য তিনি বাঁ-দিক দিয়ে প্রথমে আক্রমণ করলেন। স্যর হিউ রোজ নিশ্চিন্ত ভাবে ছিলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা অল্প। কিছু সৈন্য দুর্গ অবরোধের জন্য রেখে দিয়ে, বাকী সৈন্য তিনি তাঁতিয়া তোপির সৈন্যদলের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁতিয়া তোপির অগ্রগামী সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণে পরাজিত হলো। তাদের বহু লোক রণক্ষেত্রে হত ও আহত হলো। তারা কামান ফেলে পালিয়ে গেল। ইংরেজ সৈন্য তাদের কামানগুলো দখল করে নিল। তাঁতিয়া তোপি শঙ্কিত হলেন। তাঁর শিবিরের পুরোভাগ বহুদূরব্যাপী জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে জঙ্গলের গাছপালা সব শুকিয়ে গিয়েছে। তাঁতিয়া তোপি জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিলেন। হু হু করে বন জ্বলতে লাগল। নিবিড় ধূম্ররাশিতে চার-দিক সমাচ্ছন্ন হলো। বিপক্ষের আগমন পথ এই ভাবে ধোঁয়ায় ও আগুনে বিপত্তিময় করে, তাঁতিয়া তোপি বেত্রবতী পার হয়ে কাল্পীর অভিমুখে প্রস্থান করলেন। জ্বলন্ত বনের ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে পথ করে নিয়ে ইংরেজ সৈন্য তাঁর পেছনে তাড়া করল। ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্ট শত্রুপক্ষের বহু কামান ও রসদ হস্তগত করলেন।

পরবর্তী তিন দিন ইংরেজের সঙ্গে রাণীর সৈন্যদের ঘোরতর যুদ্ধ হলো। বন্দুকে বন্দুকে গুলিবৃষ্টি। দুর্গ প্রাচীর থেকে ক্রমাগত প্রস্তরবৃষ্টি। চার-দিকে তুরীভেরীর ঘন ঘন সিংহনাদ। উভয় পক্ষই তুমুল বিক্রম প্রকাশ করতে লাগল। ৩রা এপ্রিল ইংরেজ সৈন্য নগরে প্রবেশ করবার প্রধান পথ বোরছা দরওয়াজা অধিকার করল। সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীর অতিক্রম করে তারা নগরে প্রবেশ করল। নগরে প্রবেশ করে তারা যে যে পথ দিয়ে গেল, সেই সেই পথের দুই পাশের সকল গৃহেই আগুন লাগিয়ে দিল, এবং বালক-বৃদ্ধ-যুবা যাকে সামনে পেল তারই প্রাণান্ত করে ছাড়ল। নগরের মাঝখানে রাণীর প্রাসাদ। স্যর হিউ রোজ স্বয়ং সেই প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্যরা বীরত্বের একশেষ দেখিয়ে প্রাণ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ ইংরেজ সেনাপতির অধিকৃত হয়। প্রাসাদশীর্ষ থেকে ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসীর জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলল। প্রাসাদ ও নগরের চার দিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। তেরো দিন যুদ্ধের পর ঝাঁসীর পতন হয়।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সৈয়দ আহমদ খান লিখেছেন : "৪ঠা এপ্রিল ১৮৫৮ ইংরেজেরা সমস্ত ঝাঁসী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকরা নগরে হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রেরও অধিক লোক বৃটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রীলোকগণকে বিনষ্ট করিয়া মারিতে লাগিল।"

রাণী দেখলেন ইংরেজকে বাধা দেওয়া তাঁর অসাধ্য। ভালো ভালো গোলন্দাজদের অনেকেই নিহত আর সর্বোৎকৃষ্ট কামানগুলির মুখ বন্ধ। সৈন্যবলও হ্রাস পেয়েছে, নগরের অধিকাংশ ভস্মীভূত, প্রাসাদ বিলুণ্ঠিত। নিরুপায় রাণী রাজ্য পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হলেন। পিতা মোরোপন্ত তাতে প্রস্তুত হলেন। বিশ্বস্ত অনুচরেরা সজ্জিত হলো। তিনি স্বয়ং পুরুষবেশ ধারণ করে, পুত্র দামোদরকে পিঠের সঙ্গে রেশমী কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়ে অশ্বারোহণ করলেন। একটি হাতীর হাওদার মধ্যে মণিমাণিক্য প্রভৃতি পুরে দেওয়া হলো। এই ভাবে প্রস্তুত হয়ে ৪ঠা এপ্রিল গভীর রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আত্মগোপন করে দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়ে রাণী নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর গন্তব্য স্থানে কাল্পী। উদ্দেশ্য—তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে সেখানে মিলিত হয়ে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে, আবার যুদ্ধ করবেন। রাণী দুর্গ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন জেনে, ইংরেজ সেনাপতি তাঁকে ধরবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে রাণীর পেছনে পাঠালেন। রাণী ততক্ষণে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, ইংরেজ সৈন্য তাঁকে ধরতে পারল না। দ্রুতগামী অশ্বে লক্ষ্মীবাঈ নির্বিঘ্নে সেই রাত্রে কাল্পীতে উপস্থিত হলেন। ঝাঁসীর একুশ মাইল দূরে কাল্পী। কিন্তু রাণীর পিতা মোরোপন্ত দতিয়া রাজ্যের মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজের হস্তে বন্দী হন। স্যর রবার্ট হ্যামিল্টনের আদেশে তাঁর ফাঁসী হয়।

ঝাঁসী পরিত্যাগ করে রাণী চলে গেলেন।

তারপর? তারপর কানপুর ও দিল্লীর ইতিহাসের পুনরুক্তি হলো ঝাঁসীতে। কানপুর ও দিল্লীতে যা ঘটে ছিল, ঝাঁসীতেও তাই ঘটল। ইংরেজসৈন্যের এই অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিক মার্টিন লিখেছেন :

কাল্পীর রণক্ষেত্রে তাঁতিয়া তোপি

'ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসীর পাঁচ হাজার নিরীহ অধিবাসীকে বধ করিয়াছিল। অনেক মহিলা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল; ঝাঁসীর দুর্গ এবং নগর বিলুণ্ঠিত হয়। উন্মত্ত সৈনিকেরা সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই ভাঙিয়া ফেলে। আয়না, ঝাড়লণ্ঠন, চেয়ার, কার্পেট, শাটিনের বিছানা, রূপার পায়া-ওয়ালা পালঙ্ক, হাতীর দাঁতের বহুমূল্য দ্রব্যাদি সবই বিনষ্ট ও প্রাসাদের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।"

স্থান—কাল্পী।

তাঁতিয়া তোপি ও রাও সাহেব এখানে অবস্থিতি করছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর সৈন্য ছিল না। রাণী রাও সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কাল্পীতে একটা দুর্গ ও অস্ত্রাগার ছিল। এই তাঁর শেষ অস্ত্রাগার। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্যরা এই সময়ে কাল্পীতে এসে উপস্থিত হলো। রাও সাহেব সৈন্য পরিচালনার ভার দিলেন তাঁতিয়া তোপির ওপর। তিনি কিছু সৈন্য নিয়ে কাল্পীর চল্লিশ মাইল দূরে কুঞ্চে ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। এই যুদ্ধের ফলাফলও বিদ্রোহীদের অনুকূলে গেল না। ইংরেজ পক্ষের কিছু সৈন্য ও তিন জন অফিসার হতাহত হলেও বিদ্রোহীদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ-ছ' শো। তাদের ন'টা কামান ইংরেজদের হস্তগত হলো। রাণী মনে করেছিলেন রাজপুতরা যোগ দেবে, কিন্তু তারা দিল না। বৃটিশ সৈন্যরা একত্র হয়ে আক্রমণ করল। দুর্গ তেমন সুদৃঢ় ছিল না। কাল্পীতে রাণীর সৈন্যরা আর তিষ্ঠিতে পারল না।

কুঞ্চের যুদ্ধের পর কাল্পীর ছয় মাইল দূরে যমুনার তীরবর্তী গোলাবলী নামক স্থানে আর একটা যুদ্ধ হয়। বাঁদার নবাব এই সময় দু' হাজার অশ্বারোহী ও কয়েকটি কামান নিয়ে রাণীকে সাহায্য করতে আসেন। রাণী অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালনাভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধেও ইংরেজসৈন্য জয়ী হয়। কাল্পীর যুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি এমন পরাক্রমে ইংরেজ সৈন্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করেছিলন যে, ইংরেজ সৈন্য হটে যেতে বাধ্য হয়। তাঁর আক্রমণের বেগ ইংরেজ সেনাপতিকে পর্যন্ত বিস্মিত করে। এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী এক ইংরেজ সেনানায়কের

বর্ণনা উদ্ধৃত করে মেলিসন লিখেছেন: "কাল্পীর যুদ্ধে আমরা প্রায় পরাজিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে উষ্ট্রারোহী সৈনিক দলও প্রায় দেড় শো নূতন সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে ঘটনাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ কোনরূপ প্রতিপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমান বিক্রমে সৈন্যপরিচালনা করিয়াছিলেন।"

ঝাঁসী গেল, কাল্পীর দুর্গও হস্তচ্যুত হলো। রাণী তবু দমলেন না। তিনি স্থির করলেন যে, গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করে, স্বজাতি ও স্বধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানকার সিপাহীদের হস্তগত করবেন। এইভাবে দুর্গের আশ্রয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজসাধ্য হবে। তাঁতিয়া তোপি, রাওসাহেব ও বাঁদার নবাব এতে সম্মত হলেন। ৩০শে মে তাঁরা সকলেই গোয়ালিয়রের সেনানিবাস মোরারে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে এগার হাজার সৈন্য ও বারটা কামান। দয়াজীরাও সিন্ধিয়া তখন গোয়ালিয়রের মহারাজা। দিনকর রাও তাঁর মন্ত্রী। দুরারোহ পর্বতের ওপর গোয়ালিয়রের বিখ্যাত দুর্গ। রাজা ও রাজমন্ত্রী দুজনেই বাইরে রাণী ও রাও সাহেবের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেন, কিন্তু গোপনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকেও সংবাদ দিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই স্বয়ং মহারাজা তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী ও আটটা কামান নিয়ে রাণীর শিবির আক্রমণ করলেন। বেলা সাতটার সময়ে তাঁর কামান থেকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হলে। রাও সাহেব ভাবলেন যে, মহারাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন, তাই এই সম্মানসূচক কামানের ধ্বনি। তিনি নিশ্চেষ্ট রইলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী লক্ষ্মীবাঈ সিন্ধিয়ার এই বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারলেন। মাত্র দু'শো যোদ্ধা নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে তিনি এমন তেজে মহারাজার তোপের মুখে গিয়ে পড়লেন যে, গোলন্দাজেরা তাঁর প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে, কামান ফেলে পালিয়ে গেল। বহু সৈন্য সত্ত্বেও গোয়ালিয়রের মহারাজা পরাজিত হয়ে আগ্রার পথে পালিয়ে গেলেন। গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাঈ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন।

গোয়ালিয়রের দুর্গ ও ধনাগার রাণী অধিকারে এল।

গোয়ালিয়রের সৈন্যদল রাণীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। তিনি সৈন্যদের ছ'মাসের মাইনে চুকিয়ে দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে

রণক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাঈ

সন্তুষ্ট করলেন। নানাসাহেব মহারাষ্ট্রের পেশবা এবং রাওসাহেব গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা বলে ঘোষিত হলেন। রাও সাহেব উৎসবের আয়োজন করেন, রাণী বিরক্ত হন। উৎসবের পরিবর্তে তিনি রাওসাহেবকে সৈন্যদলের শৃঙ্খলা সাধনে মনোযোগী হতে অনুরোধ করেন। তিনি সে অনুরোধ অবহেলা করলেন। দুর্গ রক্ষার আয়োজন করলেন না। রাণীর সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যায়। স্যর হিউ রোজ বিপুল বাহিনী নিয়ে গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। রাণীর আদেশে তাঁতিয়া তোপি সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজ সেনাপতিকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে মোরার সেনানিবাস পরিত্যাগ করে চলে যায়। তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়। ১৬ই জুন ইংরেজ সেনাপতি মোরার অধিকার করলেন। তারপর গোয়ালিয়রের অদূরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধেও বিদ্রোহীদের পরাজয়, ইংরেজের জয়।

গোয়ালিয়রের যুদ্ধের সকল বন্দোবস্ত রাণী একাকীই সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিধান করে, যে রৌদ্রে ইংরেজ সেনাপতি চারবার মূর্ছিত হয়ে পড়েন, সেই প্রখর রৌদ্রে অপরিশ্রান্তভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করে ঘোড়ায় চড়ে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন।

স্থান—গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাঁচ মাইল দূরে কোঠা-কি-সরাই।
সময়-১৭ই জুন।

ইংরেজ সেনানায়ক কর্ণেল স্মিথ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, পথ দুর্গম, অগণিত নালা-খাল, অশ্বারোহী সৈন্যদের পক্ষে পার হওয়া দুর্ঘট। গোয়ালিয়রের দিকে বিদ্রোহীদের কামান সুসজ্জিত; বিদ্রোহীরাও দূরে দূরে প্রস্তুত। বিদ্রোহীরা ঘন ঘন কামান দাগতে লাগল। কর্ণেল স্মিথ তাঁর গোলন্দাজদের কামান দাগাবার হুকুম দিলেন। কামানে কামানে যুদ্ধ। এইদিনের স্মরণীয় যুদ্ধে রাণী সারাদিন পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। কিন্তু এত উদ্যম, এত অধ্যবসায়, এত নির্ভীকতাসত্ত্বেও জয়লক্ষ্মী লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রতি বিমুখ হলেন। বিদ্রোহীরা পরাজিত হ'য়ে দুটো কামান ফেলে পালিয়ে গেল। ইংরেজসৈন্য গোয়ালিয়র সেনানিবাস দখল করল। রাণী রণস্থল পরিত্যাগ করলেন। ঝাঁসী বিদ্রোহের ওপর যবনিকা পাতহলো।

যুদ্ধক্ষেত্রেই রাণী ক্লান্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় কিছুদূর যাবার পর সামনে একটা সংকীর্ণ খাল পড়ল। সেই জলপ্রবাহ দেখে ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। রাণী খাল পার হতে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই অগ্রসর হলো না। ইতিমধ্যে কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী তাঁকে আক্রমণ করল। রাণী কিছুক্ষণ একাকী তাদের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করলেন। প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাতে রাণীর মাথার ডানদিক কেটে গেল, আর একজন তাঁর বক্ষঃস্থলে সঙীনের আঘাত করল। আর আশা নেই দেখে রাণী তখন তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ইঙ্গিত করলেন। অনুচর তাঁকে নিকটবর্তী একটা পর্ণকুটীরে নিয়ে গেল। কুটীরস্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পবিত্রগঙ্গাজল দিয়ে রাণীর অন্তিম পিপাসা শান্তি করলেন। তারপর পুত্রের দিকে একবার গভীর স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করে বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোয়ালিয়রের মাটিতে মিশে গেল বীরত্বের একটি প্রদীপ্ত শিখা।

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু হলো।

ইংরেজ শিবিরে আনন্দ দেখা গেল।

কিন্তু রাণীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৃটিশ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ বলেছিলেন, "বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ঝাঁসীর রাণী।"

মধ্যভারতের সমস্ত নগর, গ্রাম ও অরণ্য তখন তাঁতিয়া তোপির নামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁতিয়া তোপি মনের মধ্যে বিদ্রোহ পোষণ করে প্রথমে জয়পুরের দিকে প্রস্থান করলেন। তাঁকে ধরবার জন্য ইংরেজের সৈন্যও ছুটল। গুপ্তচরের সংবাদ হাওয়ার আগে ছুটে যায়। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল রবার্ট নেপিয়ার তখন মধ্যভারতবর্ষের সেনাপতি। তাঁতিয়া তোপির আগেই তিনি সসৈন্যে জয়পুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গোয়ালিয়র, ঝাঁসী, ভরতপুর ও নাসীরাবাদ প্রভৃতি দু জায়গায় দু'দল সৈন্য রেখে ইংরেজ সেনাপতিরা পলায়িত মারাঠা সেনাপতিকে ধরবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করতে লাগলেন। মধ্যভারতের সর্বত্র সৈনিকদল তাঁকে ধরবার জন্য সতর্কভাবে অবস্থান করতে থাকে। বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত—সর্বত্র ইংরেজের গুপ্তচর আর সৈন্যে ছেয়ে গেল। তাঁতিয়া তোপি যে দিকে যাবেন, যেখানে উপনীত হবেন, যে জনশূন্য নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, সেই দিক,
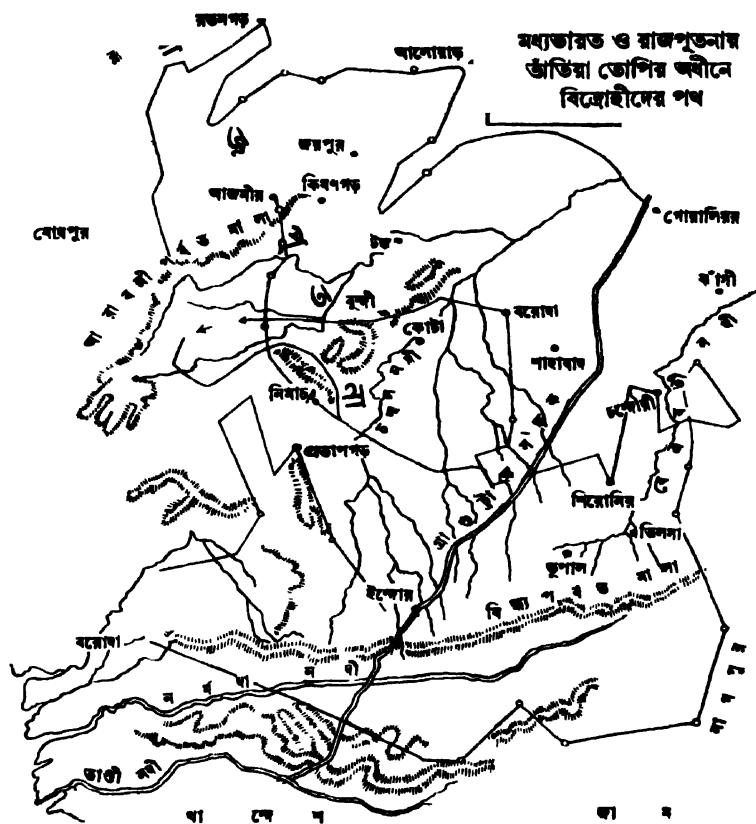
শুধু এই জনশূন্যস্থল ইংরেজসৈন্যদের পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

টেল ক একে ন' মাস কেটে গেল, তাঁতিয়া তোপির কোনো সন্ধানই মেলে না; তাঁর বুদ্ধি, কৌশল ও চাতুর্যের কাছে ইংরেজের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁতিয়া তোপির পলাতক-জীবন সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। একা নয়, সৈন্যপরিবৃত হয়েই তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে ইংরেজের চক্ষে ধুলো দিয়ে এই দীর্ঘকাল নিরাপদে আত্মগোপন করেছিলেন। এর মধ্যে ৭ই আগষ্ট কোটারিয়া নদীর তীরে ভিলবারা নামক স্থানে সেনাপতি রবার্টসের সঙ্গে তাঁতিয়া তোপির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষ বুদ্ধি ও চাতুরীর পরিচয় দিয়ে সৈন্য ও কামানসহ সম্পূর্ণ অক্ষত দেহেই পলায়ন করেন। এর সাত দিন পরেই বনাস নদীর তীরে রবার্টসের সৈন্যের সঙ্গে তাঁর আবার যুদ্ধ হয়। এবারেও তিনি অক্ষত শরীরে প্রস্থান করলেন। এরপর তিনি চম্বল নদী পার হয়ে, ঝালবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরপত্তনে পৌঁছলেন। প্রসিদ্ধ জলিম সিংহের বংশধর পৃথ্বী সিংহ তখন এখানকার রাণা। ইংরেজের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ। তাঁতিয়া তোপি রাণার প্রাসাদ অবরোধ করলেন এবং তাঁর সৈন্যদলকে নিজের দলভুক্ত করলেন। পরদিন যুদ্ধের খরচের জন্য তাঁতিয়া তোপি রাণার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করলেন। রাণা রাজ্য পরিত্যাগ করে মৌতে চলে গেলেন। তখন বর্ষার জলে চম্বল নদী স্ফীত হয়েছে। ইংরেজসৈন্যের পক্ষে সহজে নদী পার হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাঁতিয়া ঝালরপত্তনে পাঁচ-ছ'দিন অবস্থান করলেন। তারপর তাঁর সহচর রাওসাহেব ও বাঁদার নবাবের পরামর্শে তিনি ইন্দোর যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য—ইংরেজসৈন্য আসবার আগেই হোলকারের রাজধানীতে গিয়ে সেখানকার সৈন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া। পথে রাজগড়ে ইংরেজসৈন্যের সঙ্গে তাঁতিয়া তোপি যুদ্ধে পরাজিত হন। তারপর তাঁকে নানা স্থানে নানা দিকেই ইংরেজসৈন্যের সম্মুখীন হতে হয়। এবং প্রত্যেক স্থানেই যুদ্ধ করে পথ করে নিতে হয়। এক এক জায়গায় তাঁতিয়া তোপি ইংরেজ সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছেন, পালাবার পথ নেই, কিন্তু তিনি অপূর্ব চতুরতার সঙ্গে পথ করে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু এইভাবে আর কত দিন ঘোরা যায়? সহচররা ক্লান্ত হলেন, বন্ধুদের উৎসাহ নিঃশেষিত হয়। তাঁরা একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। বাঁদার নবাব অদৃশ্য হলেন, আর রাওসাহেবও

ঘোর বিপদের সময়ে তাঁতিয়া তোপিকে ছেড়ে চলে গেলেন। রইলেন অন্যতম সহচর নরবরের সর্দার মানসিংহ। নরবর গোয়ালিয়রের ৪৪ ম . . দক্ষিণে অবস্থিত একটি জনপদ। এই জনপদ মহারাজা সিন্ধিয়ার অধীন ছিল। নরবরের সর্দার মানসিংহ গোয়ালিয়রের দরবারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। ইনি পাওরী দুর্গ অধিকার করেছিলেন। পরে ইংরেজ-সেনাপতির সঙ্গেও মানসিংহের সংঘর্ষ বাধে। দুর্গ আক্রান্ত হলে ২৩শে আগষ্ট রাত্রিকালে মানসিংহ নিবিড় বনভূমি দিয়ে, দক্ষিণাভিমুখে চলে যান এবং তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে মিলিত হন। সেই থেকে মানসিংহ তাঁতিয়ার বিশ্বস্ত সহচর হয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এই সহচরই যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে একদিন ইংরেজের কাছে ধরিয়ে দেবে, তাঁতিয়া তোপি তা কল্পনাও করেন নি।

বর্ষাকালটা তাঁতিয়া বেত্রবতী নদীর উভয় তীরের পার্শ্ববর্তী আরণ্য ভূভাগে কিছুদিন পরিভ্রমণ করে কাটালেন। তারপর ইশাগড়ে এসে রসদ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি চন্দেরির দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষীকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁতিয়া তোপি সংরাওলীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এখানেও তাঁর সঙ্গে এক ইংরেজ সেনানায়কের কিছুক্ষণ যুদ্ধ হয়। তিনি কামান ফেলে অক্ষত দেহে পলায়ন করেন। সকল স্থানেই এক একজন ইংরেজ সেনাপতি সৈন্য ও কামান নিয়ে তাঁতিয়াকে তাড়া করেছিলেন। সাওয়ার, মাইকেল, স্মিথ ও লকহার্ট প্রভৃতি বিচক্ষণ সেনানায়করা পদে পদে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু ধরতে পারেন নি।

কিছুদিন পরে নর্মদা-তীরে রাও সাহেবের সঙ্গে তাঁতিয়া তোপি আবার মিলিত হন। নর্মদার উত্তর দিকের জনপদের পথ তাঁদের সামনে অবরুদ্ধ। তাঁতিয়া দক্ষিণ দিকে যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতিরা তাঁর চারদিকে তখন বেড়াজাল রচনা করেছে। নদী পার হবার ঘাটে, নিবিড় জঙ্গলের প্রান্তভাগে, জনপূর্ণ লোকালয়ে, যেখানে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, ইংরেজসৈন্য সেইখানেই অবরোধ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হলো। রাও সাহেব ও তাঁতিয়া তোপি নর্মদা উত্তীর্ণ হলেন। সেখান থেকে তাঁরা বরোদা রাজ্যে যাত্রা করেন। ইচ্ছা ছিল উত্তর পশ্চিমে ফিরে যাওয়া, কিন্তু মেজর সাওয়ার তাতে বাধা দিলেন। মাড়োয়ার রাজ্যে

তাঁতিয়া তোপি

প্রবেশ করা তাঁতিয়ার ইচ্ছা ছিল, মেজর হোমস্ সেদিকের পথও অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তখন যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে পারণের গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করেন। সঙ্গে মানসিংহ। পরিশ্রান্ত মারাঠাবীরের একান্ত ভরসা তখন মানসিংহ। এই সময়ে পরম বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ তাঁতিয়াকে ধরিয়ে দেবার জন্য ইংরেজ সেনাপতি মিডের কাছে গেলেন। কেবলমাত্র তাঁতিয়াকে নয়, নিজের সম্পত্তি ফিরে পাবার আশায় মানসিংহ নিজের আত্মীয়, বন্ধু অনেককেই ধরিয়ে দেবার জন্য মিডের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। নিয়তির এমনই পরিহাস যে, তাঁতিয়া তোপির মত বুদ্ধিমান বীর এমন বিশ্বাসঘাতকের ওপরই নির্ভর করলেন।

৭ই এপ্রিল: সময়—গভীর রাত্রি।

গভীর নিশীথে নিবিড় অরণ্যের এক গুপ্তস্থানে তাঁতিয়া তোপি ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময়ে স্বার্থপর মানসিংহ ইংরেজসৈন্য নিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁকে বন্দী করেন।

বন্দী হবার সময়ে বিশ্বাসঘাতক মানসিংহের কঠোর সম্ভাষণে মারাঠা-বীরের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ৮ই এপ্রিল সকালবেলায় সেনানায়ক মিডের শিবিরে আনীত হলেন। সামরিক আইন অনুসারে তাঁতিয়া তোপির বিচার হলো। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন—তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হলো। তাঁতিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। কিন্তু বিচারালয়ে তাঁর যুক্তি গ্রাহ্য হলো না। তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। ১৮৫৯ অব্দের ১৮ই এপ্রিলের সন্ধ্যায় গোয়ালিয়র থেকে পাঁচ মাইল দূরে সিপ্রিতে তাঁর ফাঁসি হয়। ঐতিহাসিক মেলিসন পর্যন্ত একে লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলে নির্দেশ করেছেন। যে জেনারেল মীড তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত মৃত্যুকালে তাঁতিয়ার সাহস দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। মিচেল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সাহস ও গর্বের সঙ্গেই তাঁতিয়া তোপি বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিলেন। বিদ্রোহে তাঁহার যে ভূমিকা ছিল তাহাতে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। চক্ষু বন্ধ না করিয়াই তিনি ফাঁসির রজ্জু নিজের হাতে গলায় দিয়াছিলেন। সমবেত ইংরেজরা নির্ভীকতার এই দৃষ্টান্ত সন্দর্শনে অভিভূত হইয়াছিল এবং সকলেই এই বীরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল।"

গেরিলা যুদ্ধে এই মারাঠাবীরের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য ইংরেজ সেনানায়কদের বিস্মিত করেছিল। তিনি বারংবার সমগ্র রাজপুতানা ও মালব ঘুরে বেরিয়েছেন। এই দুই রাজ্যের পরিধি ১,৬১,৭০ বর্গ মাইল। এই বিস্তীর্ণ জনপদে পরিভ্রমণের সময়ে তাঁতিয়া তোপি একবারও ইংরেজের হাতে পড়েন নি। বালুকাময় মরুভূমি, গভীর অরণ্য, উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল নদী, দুরারোহ পর্বত, চারিদিকে শত্রুব্যূহ—এই সবের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পলাতক বীর নিরাপদে ঘুরে বেরিয়েছেন। একাধিক ইংরেজ সেনাপতি তাঁর অনুসরণ করেছে। অনেক জায়গায় এদের সঙ্গে তাঁতিয়ার যুদ্ধ হয়েছে। অনেক যুদ্ধে তিনি হেরেও গেছেন। তাঁর কামান তাঁর হাত থেকে চলে গিয়েছে। তাঁর সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তবু আশ্চর্য ভাবে প্রত্যেকবারই তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু অবশেষে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর জীবনের ওপর যবনিকা নেমে এল শোচনীয় ভাবে। তাঁতিয়া তোপির মৃত্যুর সঙ্গে মধ্যভারতে বিপ্লবও শেষ হয়। এই স্বদেশ-প্রেমিকের স্মৃতি মধ্যভারতে আজো অম্লান রয়েছে।

১৮৫৮, ২৭শে জানুয়ারী। স্থান—দিল্লী-প্রাসাদের দেওয়ানী খাস।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের বিচার আরম্ভ হলো, দু'শো বছর আগে যাঁরা বিশাল ভারতের পনর কোটি প্রজার অদ্বিতীয় প্রভু ছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা ভারতের উপকূলবর্ত্তী একটি সামান্য নগরে বাস করবার অনুমতির প্রার্থনা করে যাঁদের সামনে যুক্ত-করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকত, আজ তাঁদেরই বংশধর তাঁদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেই দরবার কক্ষে তাঁদেরই অনুগৃহীত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধস্তন কর্মচারীদের কাছে বিচারপ্রার্থী হলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ। প্রধান অভিযোগ—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হয়ে তিনি সিপাহীদের রাজবিদ্রোহে উত্তেজিত করেছিলেন। চল্লিশ দিন ধরে এই বিচার চলেছিল। বিচারকগণ প্রধান প্রধান অপরাধে বাহাদুর শাহকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। তাঁর প্রতি চিরজীবন নির্বাসন দণ্ডের আদেশ হলো। বন্দী অবস্থায় তাঁকে সুদূর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুণে নির্বাসিত করা হয়। সঙ্গে গেলেন বেগম জিন্নৎ মহল। এইখানেই দিল্লীর মোগল রাজবংশের অবসান। দিল্লীশ্বর নাম বিলুপ্ত।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ শেষ দশায় রেঙ্গুন শহরে অনাথের ন্যায় জীবন বিসর্জন করেন।

যাঁরা এই বিপ্লবের প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাঁরা একে একে রণক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলেন। মৃত্যু কাউকে চিরদিনের মত কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিল ; দুর্গম অরণ্য বা দুরারোহ পর্বতমালা কাউকে চিরকালের মত অবরুদ্ধ করে রাখল। কেউবা আত্মসমর্পণ করলেন। বেরিলীর খাঁ বাহাদুর খাঁর ফাঁসি হলো। মিথৌলির বৃদ্ধ রাজা আন্দামানে নির্বাসিত হলেন। বেগম হজরৎ মহল নেপালের পার্বত্য প্রদেশে আত্মগোপন করলেন। নানাসাহেব নিরুদ্দেশ হলেন। নিরুদ্দিষ্ট নানাসাহেবের কোনো সন্ধানই ইংরেজ পায় নি। ভারতব্যাপী বিপ্লবের ওপর যবনিকা নেমে এলো।

ইতিহাসের গর্ভ স্পন্দিত ও আলোড়িত করে বিদ্রোহের লেলিহান শিখা অবশেষে স্তিমিত হলো—থেমে গেল প্রলয়োচ্ছ্বাস। অরণ্যে, জনপদে ও নগরে রইলো শুধু বিদ্রোহের স্মৃতি।

॥ সারাংশ ॥

ইংলণ্ড থেকে ভারতে যাত্রার প্রাক্কালে লণ্ডনের এক ভোজসভায় লর্ড ক্যানিং ভারতের আকাশে এক হস্ত পরিমিত একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উল্লেখ করেছিলেন। বিদ্রোহের সূচনা থেকে আঠারো মাস ধরে ভারতের আকাশে সেই মেঘ থেকেই উঠল ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রনিনাদ। শতশিখায় ছড়িয়ে গেল বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতবর্ষে। তারপর আঠারো মাস পরে মহাদুর্যোগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটল। সাতান্নর বিদ্রোহ এই ভাবেই ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল। একশো বছর ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজা সিংহাসন থেকে ইজারার সনদ পেয়ে ভারতবর্ষ শাসন করছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে, ১৮৫৮ অব্দের ১লা নভেম্বর ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলো। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করে বণিক কোম্পানীর হাত থেকে ভারতরাজ্য খাস করে নিলেন। প্রথম রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং ১লা নভেম্বর তারিখে রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বাক্ষরিত একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। ভারতের ইতিহাসে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অধীনে আর একটা নতুন যুগ। কিন্তু তার আগে সিপাহীযুদ্ধের উপসংহার হিসাবে আরো দু'একটা কথা বলার আছে।

প্রথম কথা বিদ্রোহ-দমনে ইংরেজের কঠোরতা।

বিদ্রোহের সূচনা থেকেই ইংরেজের প্রতিহিংসা তীব্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বারাণসী থেকে সেনাপতি কর্নেল নীল যখন এলাহাবাদে আসেন তখন পল্লীদাহ ও নিষ্ঠুরতার একটি বর্ণনা থেকেই ইংরেজের বর্বরতার পরিচয় পাওয়া যাবে। ঐতিহাসিক কেয়ি জনৈক ইংরেজ সৈনিকের দিনলিপি উদ্ধৃত করে বলেছেন :

"২৭শে জুন সন্ধ্যাকালে আমাদের ২৪০ জন সৈন্য (ইহাদের মধ্যে আমিও একজন), ১১০ জন শিখ ও ২০ জন সওয়ার বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। আমরা তিনদলে বিভক্ত হইয়া পল্লীসমূহে অপরাধীদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে দলে ছিলাম, সেই দল একটি পল্লীতে উপস্থিত হইল। আমরা উক্ত পল্লীতে আগুন লাগাইলাম, পল্লীটি ভস্মীভূত হইয়া গেল। দুই মাইল দূরবর্তী আর একটি পল্লীতে গেলাম। আমাদের দেখিবামাত্র অধিবাসীরা দৌড়াইতে লাগিল। আমরা তাহাদের উপর বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলাম। প্রায় এক শত লোক গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী হইল। একজন বৃদ্ধ ছিলেন সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তিনি সিপাহীদিগের আশ্রয় দিয়াছিলেন এই অপরাধে আমাদের সঙ্গী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাঁহাকে একটি বৃক্ষের শাখায় ফাঁসি দেওয়া হইল। এইরূপে গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগাইতে লাগাইতে আমরা এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটি গ্রামের দুইশত লোককে অবরুদ্ধ করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হয়। সকলেই পুড়িয়া মারা যায়। এইভাবে আগুনে পুড়াইয়া, ফাঁসি দিয়া ও বেত্রাঘাতে জর্জড়িত করিয়া আমরা সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলাম। সে সব দৃশ্য বর্ণনা করিতেও আমি শিহরিয়া উঠি।"

এই ভয়াবহ কঠোরতার পুনরুক্তি প্রায় সর্বত্রই হয়েছিল। শান্তি, শৃঙ্খলা ও কোম্পানীর প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সন্দেহে, বিনা প্রমাণে, সরাসরি বিচারে হাজার হাজার লোকের ফাঁসি হয়। যার যে অপরাধই হোক না কেন, তারই দণ্ড ফাঁসি। উইলিয়ম এডওয়ার্ডস হুইলার ভোলানাথ চন্দরের একটি বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন: "এলাহাবাদে ইংরেজের বর্বরতা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। পথপার্শ্বে ও বাজারে যে সকল ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের শব গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার জন্য আটখানি গাড়ি নিয়োজিত হয়। তিন মাস এই গাড়িতে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ সকল শব লইয়া যাওয়া হয়। সরাসরি বিচারে একমাত্র এলাহাবাদে ছয় হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।"

এলাহাবাদ থেকে কানপুর যাবার পথে কাপ্তেন রেণ্ড সেনাপতি নীলের নির্দেশে পথের দু'ধারের সমস্ত পল্লীই ধ্বংস করেছিলেন এবং বহু নিরীহ লোকের

প্রাণবধ করে জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করেছিলেন। কিছুমাত্র বিচার বিবেচনা না করেই তিনি পল্লীবাসীদের গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিলেন। পথের দুধারেই অসংখ্য মৃতদেহ ঝুলতে থাকে। পল্লীদাহ ও নরহত্যা অবাধে চলে। ইংরেজের বর্বরতার অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাদের দিল্লী অভিযানের সময়। আম্বালা থেকে দিল্লী যাবার পথে জেনারেল বার্ণার্ডের আদেশে হাজার হাজার নিরীহ ও নিরপরাধ ভারতবাসীকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি, মৃতদেহগুলির ওপর ইংরেজ সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। বল্লম ও সঙ্গীনের অগ্রভাগে রক্ষিত গরুর মাংস নিরীহ হিন্দুদের মুখের মধ্যে দেওয়া হতো। ইংরেজ সৈন্যের এই অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার অতি ভয়াবহ ও লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন 'দি হিস্ট্রি অব্ দি অব্ ডেল্‌হি' গ্রন্থের লেখক। এবং এই লেখক ইংরেজ। কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আরা—সর্বত্র ইংরেজ প্রতিহিংসার এমন চরম দেখিয়েছিল যা মেলিসন ও কেয় প্রমুখ ঐতিহাসিকরাই সমর্থন করতে পারেননি। বিদ্রোহ শান্ত হবার পরেও, শান্তির নামে দীর্ঘকাল ধরে এই কাণ্ড চলেছিল। ইংরেজের বর্বরতা বিদ্রোহের সূচনায়, বিদ্রোহের মধ্যে এবং বিদ্রোহের পরে চূড়ান্তভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিদ্রোহীরা ইংরেজের ওপর অত্যাচার করেছিল সত্য, কিন্তু ইংরেজ তার প্রতিশোধ নিয়েছিল অতি নির্মম ও নৃশংসভাবে। একজন মিসেস চেম্বার্স, মিস জেনিং বা ক্লিফোর্ডের বদলে বিদ্রোহ অবসানের পর, ইংরেজের গুলিতে এদেশের মেয়ে মরেছে হাজারে হাজারে।

এই প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর নির্ভীক সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে যখন প্রতিহিংসার সুর তীব্র হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে হরিশ্চন্দ্র তাঁর কাগজের মাধ্যমে লর্ড ক্যানিংকে বার বার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিদ্রোহ-দমনের নামে এই রকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য প্রতিহিংসার পরিণাম ভালো নয়। সেদিন গভর্ণর-জেনারেল যদি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সুপরামর্শ গ্রহণ না করতেন, তাহলে ইংরেজের বর্বরতা ও অত্যাচার আরো তীব্র হয়ে উঠতো এবং এর জন্যই লর্ড ক্যানিংকে সেদিন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অপ্রিয়ভাজন হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় কথা এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো কেন?

এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর—ইতিহাসের গতি বিপ্লবের প্রতিকূলে ছিল। তাই বিদ্রোহী সিপাহীরা প্রাণপাত যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকাম হলো। নেতৃত্বের অভাব সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার আর একটি বড় কারণ। ভারতব্যাপী এই বিপ্লবে সেদিন এমন একজন নেতা ছিলেন না যাঁর নির্দেশ সংযত ও সংহত ভাবে সমস্ত সিপাহীই মেনে নিতে পারে। এই নেতৃত্ব নিয়েও সিপাহীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে আত্মকলহের সূত্রপাত হয়। বিদ্রোহের সূচনা স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রচণ্ডভাবেই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু উপকরণ ও সংগঠনে ত্রুটি ছিল বলেই এর ব্যর্থতা গোড়া থেকেই এক রকম সুনিশ্চিত ছিল। এ বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ সামরিক, অথচ সামরিক বিপ্লবের যা প্রধান অবলম্বন সেই সরঞ্জাম বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ছিল না এবং অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রতুলতাই তাদের ব্যর্থতার তৃতীয় কারণ। বিদ্রোহীদের বন্দুক ছিল সাবেকী, ইংরেজ-সৈন্যের বন্দুক আধুনিক। সংবাদ আদান-প্রদানের দিক দিয়ে এবং যানবাহনের দিক দিয়েও বিদ্রোহীদের প্রতি পদে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে ইংরেজদের সুবিধা ছিল অনেক। চতুর্থতঃ সমস্ত সামন্ত নৃপতি এবং শক্তিশালী ভূম্যধিকারীরা বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিলেন এবং এঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজের পক্ষে ছিলেন। কেবল মাত্র ঝাঁসীর রাণী, অযোধ্যার বেগম, এবং বাঁদার নবাব, জগদীশপুরের কুমারসিংহ প্রভৃতি দু'চারজন ছোটখাট দেশীয় নৃপতি ও জমিদার বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিলেন। পঞ্চমতঃ জনসাধারণের একটা বৃহত্তম অংশ বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিল এবং ব্যর্থতার এও ছিল একটা বিশেষ কারণ। কোনো ঐতিহাসিক বিপ্লবের সঙ্গে যদি দেশের সমস্ত জনসাধারণের সহযোগিতা না থাকে, তাহলে সে বিপ্লব কখনো সার্থক হতে পারে না। জাতির বৃহত্তম অংশ এতে যোগদানে বিরত ছিল, সেইজন্য ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণরূপে সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে আখ্যা দেওয়া চলে না। বিদ্রোহীদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যের অভাবও ব্যর্থতার আর একটি কারণ। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ কখনো ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। পরস্পরকে তাঁরা ঈর্ষ্যা করতেন, সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে, একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদাই চক্রান্তের জাল বুনতেন।

তথাপি এই বিদ্রোহকে অসার্থক অভ্যুত্থান বলা চলে না। কেননা নানা কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেদিন একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল। সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃত সার্থকতা এইখানেই।

সাভারকর বলেছেন, ত্রুটি এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও সাতান্নর এই বিপ্লব ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক মহাবিপ্লব বলে নিঃসন্দেহে পরিগণিত হবে। সহস্র সহস্র জীবনের বিনিময়ে, অজস্র রক্তপাতের ভেতর দিয়ে সিপাহীযুদ্ধ ভারতবাসীর জন্য সেদিন এই শিক্ষাই রেখে গিয়েছিল যে, স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র জনকতক ক্ষমতাচ্যুত ও বিক্ষুব্ধ তালুকদার এবং নেতার চক্রান্তের ফলেই ঘটেছিল অথবা এর পেছনে কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না—এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়।”

ইতিহাসের এক নিগূঢ় কার্যকারণের অনিবার্য গতিপথেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং ইতিহাস-বিধাতার নেপথ্য-প্রেরণাই এই বিস্ফোরণকে প্রায় সর্বভারতীয় করে তুলেছিল। এ যদি নিতান্ত আঞ্চলিক ঘটনা হতো, তাহলে সিপাহীযুদ্ধ সর্বভারতে এমন আলোড়ন কখনই জাগিয়ে তুলত না। সাতান্ন সালে যদি এই বিদ্রোহ না ঘটত, তাহলে বণিক কোম্পানীর হাতে ভারতের শোষণ আরো তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠত। আবার অন্য দিকে, সাতান্নর ঐ বিপ্লব যদি সার্থক হতো, যদি ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজের শাসন একেবারে বিলুপ্ত হতো, তা হলে হয়ত ঘড়ির কাঁটা পেছনে চলে যেত—হয়ত মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনের ফলে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত হতো। আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য কোনো দিনই বাস্তব হয়ে উঠবার অবকাশ পেত কি না সন্দেহ। এই দুই বিপর্যয় থেকে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছে এই স্মরণীয় বিপ্লব এবং এর প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য এইখানেই।

আধুনিক এবং তথাকথিত 'সত্যানুসন্ধানী' ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা যে যাই বলুন, এ কথা আদৌ সত্য বা সমর্থনযোগ্য নয় যে বাহাদুর শাহ, ঝাঁসীর রাণী, কুমারসিংহ, নানাসাহেব প্রভৃতি সিপাহী যুদ্ধের নায়কবৃন্দ স্বদেশভক্ত ছিলেন না কিম্বা তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য সুযোগ বুঝে এই

বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরভাবে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এঁদের কারো বিরুদ্ধে এমন হীন অপবাদ আনা চলে না।

বাহাদুর শাহের বিচারের সময়েও ইংরেজের সামরিক আদালত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদানের রাশিকৃত প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন; তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন, আদালত এমন কথা বলেনি। তারপর এই বিদ্রোহে বাহাদুরশাহের স্বেচ্ছায় যোগদানের আরো একটা বড় প্রমাণ আছে। যে পাঁচ মাস বিদ্রোহীরা দিল্লী অধিকার করে রেখেছিল, সেই পাঁচ মাস বিদ্রোহীদের সাহায্য করবার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। নিজে অর্থসংগ্রহ করে ও নিজের মূল্যবান দ্রব্যাদি বিক্রয় করে তিনি বিদ্রোহীদের অর্থসংকট মোচনে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি সিপাহী নেতাদের ইংরেজবাহিনীকে আক্রমণ করবার জন্য বারবার বলতেন এবং তাদের কাছে অনেকবার অভিযোগ করেছিলেন যে, তারা একটি যুদ্ধেও ইংরেজদের হারাতে পারেনি। ১৪ই সেপ্টেম্বর যেদিন ইংরেজরা দিল্লী জয় করবার জন্য শেষ আক্রমণ শুরু করল, সেদিন থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত, এই চুরাশী বৎসরের বৃদ্ধ প্রত্যহ সিপাহীদের কাছে গিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়ে আসতেন। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে বাহাদুর শাহ কোনো দিনই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না, যদিও জিন্নৎমহল, তাঁর পিতা ইলাহী বক্স ও মোগল দরবারের কয়েকজন ধুরন্ধর বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন। কাজেই ভারতব্যাপী এই বিদ্রোহের প্রসঙ্গে বৃদ্ধ মোগলকে বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করা, সত্যের অপলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বাহাদুর শাহ সম্পর্কে যা সত্য জগদীশপুরের অশীতিপর বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী কুমার সিংহ সম্পর্কেও তাই। তিনি ভয়ে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, এ কথা ইতিহাস বলেনা; বরং ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সেই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজপুত মুষ্টিমেয় জনবল ও স্বল্প অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে

এক বছর ধরে ইংরেজের প্রচণ্ড শক্তিকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। কৃতিত্বে, সাহসে ও বীরত্বে কুমারসিংহ পৃথিবীর যে কোনো গেরিলা যোদ্ধার সমকক্ষ স্থান অধিকারে যোগ্য। স্বদেশপ্রেমিক কুমারসিংহ তাঁর নিজের মাতৃভূমিকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, বিদ্রোহে যোগ দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস তিনি কোনো দিনই করেন নি।

সেই রকম ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা রাণীর ইংরেজ ভক্তির কথা বলেন তাঁরা সত্যেরই অপলাপ করেন মাত্র। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেব সম্বন্ধে বরং এ কথা বলা চলে যে তিনি পেশোয়াশাহী পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং বিদ্রোহে তিনি অন্যান্যের তুলনায় তেমন কৃতিত্ব বা সাহসের পরিচয় দেন নি। এমন কি, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পেশোয়ারাজ স্থাপন করার জন্য যে সাহস ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, নানাসাহেব তাও দিতে পারেন নি। শেষের দিকে জয়লাভে আশা নেই দেখে, তাঁতিয়া তোপি ও রাও সাহেবের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে, নানাসাহেব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। সে তুলনায় রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কৃতিত্ব অনেক বেশী। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র এই বীরাঙ্গনাই জীবন দিয়েছিলেন এবং প্রকৃত বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন তাঁতিয়া তোপি।

আজ, শতবর্ষের ব্যবধানে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে, তাঁর নেতৃত্বের স্বরূপ ও চরিত্র নিয়ে যদি আমরা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, বাহাদুর শাহ, ঝাঁসীর রাণী, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতি এবং অযোধ্যার ক্ষমতাচ্যুত তালুকদারেরা কেবলমাত্র হৃত ক্ষমতা ফিরে পাবার আশায় বিদ্রোহ করেন নি। আর যদি তাই সত্য হয়, তাহলেও তাঁরা কী অপরাধ করেছিলেন? বিদেশী দস্যুদের হাত থেকে নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা কিম্বা নিজের রাজ্য রক্ষা করা, রাজা হোক প্রজা হোক, সকলেরই প্রধান কর্তব্য। আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। বিদ্রোহীরা যখন দিল্লী দখল করে, তখন সিপাহী কমিটির হাতেই সব ক্ষমতা ছিল। অন্যান্য স্থানেও সিপাহী কমিটিগুলি কম শক্তিশালী ছিল না। কাজেই এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব, বিদ্রোহের প্রজ্বলন্ত স্তরে, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ওপর

ছিল না। এর নেতৃত্ব ছিল সকল শ্রেণীর নেতৃত্ব। সুত,
নেতৃত্বের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমরা দেখেছি,
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সকল ভারতবাসীর বিদ্রোহ। বিহার,
প্রদেশ, মধ্যভারতবর্ষ, দিল্লী প্রভৃতি যেসব স্থান বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল,
কৃষক সম্প্রদায়কেও যোগদান করতে দেখা গিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা
এদেশে সবেমাত্র শুরু হয়েছে, কাজেই ইংরেজি শিক্ষিত জনসাধারণ বলতে
যাদের বোঝায়, তারা এই বিদ্রোহ থেকে দূরেই ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল
নগণ্য। জনসাধারণ এই বিদ্রোহের পেছনে একেবারে ছিল না, তা বলা চলে
না, কেননা বহুস্থানেই পলাতক বিদ্রোহীদের এরাই আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য
দিয়েছে এবং সেজন্য ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারও তাদের সহ্য করতে
হয়েছিল। বিদ্রোহ যদি কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে
অল্প সময়ের মধ্যে এ কথনই এমন ব্যাপক ও প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারত না।
সুতরাং, ইতিহাসের নিরপেক্ষ মানদণ্ডে, ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানকে জাতীয়
আন্দোলন বা স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম না বললেও, ভারতের ইতিহাসে এর
গুরুত্বকে আমরা কিছুতেই লঘু করে দেখতে পারি না। কেননা, আগেই
বলেছি, এই বিদ্রোহই আমাদের যুগান্তরের মুখে এনে দিয়েছিল। কাজেই
এই বিদ্রোহ আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং যাঁরা এতে অংশ গ্রহণ
করেছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁদের বীরত্ব, সাহসের এবং আত্মোৎসর্গের জন্য
ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। এই পটক্ষেপে সিপাহীযুদ্ধের
ইতিহাস ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
বলে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। সে সংগ্রামের হয়তো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে
যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার আন্তরিকতা কি অস্বীকৃত বা উপেক্ষিত হবে?

সময়—১লা নভেম্বর, ১৮৫৮।
স্থান—এলাহাবাদের দরবার।
কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয়েছে। পার্লামেন্টের নতুন আইন অনুসারে
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। অতঃপর যে নীতি
অনুসারে ভারত সাম্রাজ্য শাসিত হবে, মহারাণীর এক ঘোষণাপত্র মারফৎ
ভারতবাসীকে তাই জানিয়ে দেবার জন্য এই দরবারের অনুষ্ঠান। লর্ড ভাবি

নমন্ত্রী। কোম্পানীর আমলের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড জন্ ভাইকাউন্ট ক্যানিং ভারতসাম্রাজ্যের প্রথম রাজপ্রতিনিধি এক বছর ধরে হিসাবে মহারাণীর নামে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। সেই কৃতিত্বে, সা ত্রের প্রথমেই বলা হলো: "ভারতবর্ষে যেসকল প্রদেশ আমার সমকক্ষ কারে আছে, এতদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেগুলি শাসন করিয়া মা আসিতেছিলেন। এক্ষণে, আমি—ভিক্টোরিয়া—পার্লামেণ্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছি।" ঐতিহাসিক এই ঘোষণাপত্রে মহারাণী তাঁর ভারতীয় প্রজাদের ও সমস্ত নৃপতিদের উদ্দেশ্যে বহু প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেইসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রধান তিনটি—রাজ্যবৃদ্ধি না করা, ধর্মে হস্তক্ষেপ না করা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। ঘোষণার শেষে বলা হলো: "পরিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই সকল সংকল্প যাহাতে আমি কার্যে পরিণত করিতে পারি, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাকে এবং আমার আদেশে যাঁহারা রাজ্য শাসন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দান করুন।" মহাসমারোহে এই দরবারের অনুষ্ঠান হলো।

ভারতের সমস্ত ভাষায় ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণাপত্র বহুলোকের সামনে পঠিত হলো। সেই পয়লা নভেম্বরের রাত্রিতে রাজধানী কলকাতায় ও প্রত্যেক জেলায় জেলায় আলো ও আতসবাজীর উৎসব হলো।

এই উৎসব ও ঘোষণার মধ্যে মিলিয়ে গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। মিলিয়ে গেল ভারতব্যাপী বিপ্লবের অগ্নিশিখা। শান্ত হলো বিদ্রোহী ভারত। যুগান্তরের তোরণে এসে স্পন্দিত হয়ে উঠলো ভারতের ইতিহাস এক নতুন চেতনা নিয়ে।

এই বিদ্রোহের শিক্ষা কি?

এই বিদ্রোহ আমাদের দেখিয়ে দিল যে ভারতবাসীর ওপর সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার খুব দৃঢ় ছিল না। ইতিহাসের সিংহদ্বার দিয়ে বণিক কোম্পানী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নি, করেছিল কৌশলে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে এবং বণিকের মানদণ্ড পলাশিযুদ্ধের অবসানে রাজদণ্ড রূপে দেখা দিলেও, সেই

দণ্ড পরিচালনায় ইংরেজের বণিক-সুলভ মনোবৃত্তিই প্রকাশ। শাসনের সমস্ত ন্যায় ও নীতি উপেক্ষা করে, তারা স্বৈরাদণ্ড শাসন করেছিল, তাই ইতিহাসের নেপথ্য বিধানে, পলাশিযুদ্ধের এলো সিপাহীযুদ্ধ। বণিকগোষ্ঠীর শিথিল মুষ্টি থেকে খসে পড়ল সাম্রাজ্য ; নূতন ভারতবর্ষের হলো অভ্যুদয়। বহ্নি-গর্ভ সেই অভ্যুদয়। ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য তীব্রভাবে সচেতন করে দিয়ে—সিপাহীযুদ্ধের ওপর যবনিকা পতন হলো। ভারতের রাজনীতিতে পরোক্ষে এক যুগান্তরের সূচনা করে দিয়ে যায় এই বিপ্লব। যে চেতনার অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল ভারতবাসীর মনে এই বিপ্লব, তা সাম্রাজ্যের হাতবদল হলেও, দিন দিন ব্যাপক ও সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। রাসেল সত্যই বলেছেন—"সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবাসীর মনে যে ইংরেজ-বিদ্বেষ জাগিয়ে দিয়ে গেল, ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর মনকে যেভাবে বিরূপ করে দিয়ে গেল, ইংলণ্ডের সাধ্য হবে না কোনো দিন তার প্রতীকার করা। যে বিশ্বাস আমরা হারালাম তা আর ফিরে পাব না। কঠিন হস্তে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতবাসীর অন্তরের এই জাগ্রত চেতনাকে কি কোনো দিন দমন করা সম্ভব হবে?" সিপাহীযুদ্ধের শতবর্ষ মধ্যেই ইংরেজ তারই স্বজাতির এই ভবিষ্যদ্বাণীর অভ্রান্ততা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে—কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

সম্রাট বাহাদুর শাহ কবি ছিলেন। বিদ্রোহের আগুন যখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে তিনি একটি গজল রচনা করেছিলেন। একদিন দিল্লীর প্রাসাদে একজন সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করল

দম্‌দমায়মেঁ দম্ নেঁহী খয়ের মাঙ্গো জান্‌কি
আয় জাফর ঠৈণ্ডী হুই শম্‌শের্ হিন্দুস্থান কি।

"হে সম্রাট, এখন প্রতি মুহূর্তেই আপনি যখন দুর্বল হয়ে পড়ছেন, তখন, আপনি (ইংরেজের কাছে) আপনার জীবন ভিক্ষা করুন ; কারণ, ভারতের তরবারী এখন চিরদিনের মতন ভেঙে গেছে।"

...ত আছে, এর উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন :

গাজীয়োঁমেঁ বু রহেগী জব্‌তক্ ইমান কি
তব্ তো লণ্ডনতক্ চলেগী তেগ্ হিন্দুস্থান কি।

...দের বীর যোদ্ধাগণের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাসের কণামাত্র এক বছর ধরে... ততক্ষণ তীক্ষ্ণ থাকবে হিন্দুস্থানের কৃপাণ এবং একদিন সেই কৃতিত্বে, সা...নের তোরণে ঝলকে উঠবে।"

সমকক্ষ...যুদ্ধের বর্ষীয়ান এই নায়কের এই ভবিষ্যদ্বাণীও পরবর্তী কালের মা...তহাসে অভ্রান্তভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়ে একদিন ইংরেজ বণিক কোম্পানী যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, শতবর্ষের মধ্যেই সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি উঠল টলে। ইতিহাসের প্রান্তরে মিলিয়ে গেল বণিকের রাজ্যলিপ্সা, খসে গেল তার হাত থেকে রাজদণ্ড। পলাশির প্রতিশোধ নিল ভারতবাসী মিরাট-দিল্লী-কানপুর-লক্ষ্ণৌ-ঝাঁসীতে। রক্তের স্বাক্ষরে বিদ্রোহীরা রচনা করে গেল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ব্যর্থ হলেও অগ্নিক্ষরা সে-ইতিহাস গৌরবেরই ইতিহাস।

আর সেই ইতিহাসে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন—সেই মঙ্গল পাঁড়ে, কুমার সিংহ, অমর সিংহ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপি, মৌলবী আহমদউল্লা, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, হজরৎ মহল, বাহাদুর শাহ—তাঁরা সকলেই ভারতবাসীর গর্ব এবং গৌরবের পাত্র।

নানাসাহেবের চিঠি

পরিশিষ্ট (ক)

নানাসাহেবের দুইখানি চিঠি

[ভারতব্যাপী বিদ্রোহের উপর যখন যবনিকা পড়ল, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন কোম্পানীর হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁর স্বাক্ষরিত একখানি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। এই ঘোষণাপত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিদ্রোহীদের অপরাধ ক্ষমা করা সম্পর্কেও কিছু নির্দেশ ছিল। ঘোষণাপত্র প্রচারিত হবার সতেরো মাস পরে নানাসাহেব তাঁর আত্মগোপনের অজ্ঞাতস্থান থেকে মহারাণীকে কয়েকখানি পত্র লেখেন। আমরা এখানে দু'খানা চিঠির বাংলা অনুবাদ দিলাম। মূল চিঠি ছিল উর্দু ভাষায়। প্রথম চিঠির তারিখ ১৭ই রমজান, ১২৭৫ হিজরী (২০শে এপ্রিল, ১৮৫৯) এবং অজ্ঞাতনামা এক ব্রাহ্মণ পত্রবাহক কর্ণেল পিঙ্কনের শিবিরে এসে নানার ইস্তাহারখানা দিয়ে যান। গোরক্ষপুরের কমিশনার সেটা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে, মূল ও অনুবাদ দুই-ই কলকাতায় বড়লাটের কাছে পাঠিয়ে দেন।]

(১)

সমগ্র হিন্দুস্থানের অপরাধ আপনি ক্ষমা করিয়াছেন এবং সমস্ত খুনীলোকের অপরাধও মকুব করা হইয়াছে—ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যেসব সিপাহী আপনাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা করিয়াছে, তাহাদের অপরাধও ক্ষমা করা হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীর জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে আমাকে ক্ষমা করা হয় নাই, যদিও

দুই

আমি নিরুপায় হইয়াই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়াছিলাম। আমার দ্বারা কোনো প্রকার হত্যা কার্য সাধিত হয় নাই। যদি জেনারেল হুইলার আমাকে বিঠুর হইতে ডাকিয়া না পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমার সৈন্যরা বিদ্রোহী হইত না। আমার সৈন্যদের কেহই মারাঠা ছিল না; সেজন্য তাহারা আমার বাধ্য ছিল না। আমি পূর্বেই জেনারেল হুইলারকে বলিয়াছিলাম যে, আমার ন্যায় একজন গরীব লোক ইংরেজদের বিশেষ কোনো সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু জেনারেল সাহেব আমার কথা শুনিলেন না, তিনি কেবলমাত্র আমাকে কানপুর ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন কোম্পানীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করিল, তখন আমার সৈন্যরা তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে, যদি আমি ইংরেজদের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলে আমার সৈন্যরা আমার পরিবারবর্গকে হত্যা করিবে এবং ইংরেজরা আমার সৈন্যদের বিদ্রোহের জন্য আমাকে শাস্তি দিবে। সুতরাং আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ছিল। অতএব আমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কানপুরের সৈন্যরা আমার অবাধ্য হইয়াছিল, এবং তাহারা ইংরেজ স্ত্রীলোকদের হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি যথাসাধ্য তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং যখন ইংরেজ নরনারী তাহাদের আশ্রয় দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, আমিই তাহাদের এলাহাবাদে যাইবার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু কোম্পানীর সিপাহীরাই সেই সব নৌকা আক্রমণ করিয়াছিল। আমি সেই সময়ে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিলাম এবং এইভাবে দুই শত ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছি যে, যখন আমার সৈন্যরা কানপুর হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং আমার ভাই আহত হইয়াছিল, তখন কোম্পানীর সিপাহী ও বদমায়েসরা ঐ দুইশত জনকে নিহত করিয়াছিল। ইহার পর আমি আপনার ঘোষণাপত্রের কথা শুনিলাম। আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এবং এই পত্র লিখিবার সময় পর্যন্ত আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, এবং জানিবেন যে আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন যুদ্ধ করিব। আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে আমি খুনী নহি কিম্বা আমি বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধীও নহি, তথাপি ঘোষণাপত্রে আমার সম্পর্কে কোনো

আদেশ দেওয়া হয় নাই। আমি ছাড়া বর্তমানে আপনাদের আর কেহ শত্রু নাই, সুতরাং যতকাল বাঁচিব ততকাল আমি যুদ্ধ করিব। আমিও একজন মানুষ। আমি আপনাদের নিকট হইতে অল্প দূরেই আছি। ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনাদের মত শক্তিশালী জাতি আমার বিরুদ্ধে দুই বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিতে পারিল না। আপনি সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন এবং সকলেই এখন আপনার পক্ষে যোগদান করিয়াছে। একমাত্র আমার কথাই বিবেচনা করা হয় নাই। কিন্তু আপনি দেখিবেন আমার যে অবশিষ্ট সৈন্য আছে তাহাদের লইয়া আমি কি করিতে পারি। আমি আবার ইংরাজের রক্তপাত করিব এবং এইবার সেই রক্ত হাঁটু পর্যন্ত প্রবাহিত হইবে। আমি মরিতে প্রস্তুত। বৃটিশের ন্যায় একটি শক্তিশালী জাতির নিকট আমি যদি শত্রু বলিয়া গণ্য হইতে পারি, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। মৃত্যু একদিন আসিবে অতএব তাহার জন্য আর ভয় কি? ...যদি উচিত মনে করেন, তাহা হইলে আমার পত্রের জবাব দিবেন। মূর্খ বন্ধু অপেক্ষা জ্ঞানবান শত্রু শ্রেয়ঃ। ইতি

ধুন্ধুপন্থ নানা

(২)

[নানার দ্বিতীয় চিঠিখানির তারিখ ২২শে রমজান (২৬শে এপ্রিল, ১৮৫৯) এবং এই পত্রে স্থানের উল্লেখ আছে—দেওগড়।]

মেজর রিচার্ডসনের মারফত আমার ২০শে এপ্রিল তারিখে ইস্তাহারের জবাব পাইলাম। তাহাতে আমি যে সব বিষয় উল্লেখ করিয়াছি সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিষয় সম্পর্কে জবাব দেওয়া হইয়াছে। তাহা আমি মানিয়া লইলাম। কিন্তু আমি এইভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তবে মহারাণীর স্বাক্ষর-যুক্ত ও শীলমোহর করা একখানি পত্র আমার নিকট যোগ্য সামরিক অফিসার মারফত যদি পৌঁছায়, তাহা হইলে আমি পত্রের উল্লিখিত শর্তাবলী বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে পারি। আপনারা হিন্দুস্থানে এ পর্যন্ত যত দাগাবাজী করিয়াছেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া আমি কি জন্য আপনাদের সহিত যোগদান করিব? যদি আপনারা সত্যসত্যই দেশের গোলমাল দূর করিতে চাহেন, তাহা হইলে ফরাসী কমাণ্ডিং অফিসার মারফত মহারাণীর

স্বাক্ষরিত পত্র অবশ্যই পাঠাইবেন। তাহা ভিন্ন অন্য পত্র আমার নিকট গ্রাহ্য হইবে না। কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডনে আমি আমার এক দূতকে পাঠাইয়াছিলাম। সেই সময় আমার সেই দূত মারফত মহারাণী স্বহস্তে তাঁহার শীলমোহর করা যে পত্র আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার নিকট আছে। সেইরূপ শীলমোহর করা ও স্বাক্ষরিত পত্রই আমি চাই। নতুবা আমি কোনো শর্তেই রাজী হইব না। একদিন মৃত্যু হইবে জানি, তবে কেন অগৌরবের মৃত্যু বরণ করিব? যতদিন আমার দেহে জীবন থাকিবে ততদিন আমার ও আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলিবে। আমি নিহত হই কিম্বা ধৃত হই অথবা আমার ফাঁসী হয়—যাহা কিছু করিনা কেন, অস্ত্রের সাহায্যেই তাহা করিব। তবে মহারাণীর স্বাক্ষর-যুক্ত পত্র পাইলে আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। ইতি

ধুন্ধুপন্থ নানা।

পরিশিষ্ট (খ)

তাঁতিয়া তোপির জবানবন্দী

[৭ই এপ্রিল, ১৮৫৯, তাঁতিয়া তোপি ধরা পড়েন। ৮ই এপ্রিল সকালবেলা তাঁকে জেনারেল মীডের শিবিরে নিয়ে আসা হয়। সিপ্রিতে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়: (১) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁর আনুগত্যের অভাব; (২) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং (৩) কানপুরে নিরপরাধ ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা করা। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রথম দুটি অভিযোগ সম্পর্কে তাঁতিয়া তোপি আদালতে সংক্ষিপ্ত একটি জবানবন্দী প্রদান করেন এবং তৃতীয় অভিযোগটি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে প্রত্যাহৃত হয়। জেনারেল মীড এই জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন।]

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমার কখনো আনুগত্য ছিল না। কারণ আমি কোনো দিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রজা ছিলাম না, এমন কি বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের নাগরিকও ছিলাম না। ইংরেজের অধিকারে আমার জন্ম হয় নাই। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমার জন্ম হয়, তখন আমার প্রভু পশ্চিম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। যে জাতি আমার প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, সেই জাতির প্রতি আমার কোনো আনুগত্যই থাকিতে পারে না। আমার আনুগত্য একমাত্র পেশবাদের প্রতি এবং সেই আনুগত্যের প্রশ্নে একমাত্র তাঁহারাই আমার বিচার করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনুগত্যহীনতার অভিযোগ টিকিতে পারে না।

ছয়

আদালতের দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু এই অভিযোগের জন্য আমাকে যে দণ্ড দেওয়া হইবে, যাঁহারা আমার বিচার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও সেই দণ্ডবিধান হওয়া উচিত। তাঁহাদের বিরুদ্ধেও ভারতবাসী গুরুতর অভিযোগ আনিতে পারে—কুশাসনের অভিযোগ, পররাজ্য গ্রাসের অভিযোগ, প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে ভারতবাসী আজ এই সব অভিযোগ অনায়াসেই আনিতে পারে এবং এইগুলি প্রমাণ করা তাহাদের পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি অপরাধ হইয়া থাকে, সে-অপরাধ আমি সগৌরবে স্বীকার করিতেছি। আমি কখনো নরহত্যায় লিপ্ত হই নাই। আমি যাবতীয় বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভু নানা সাহেবের আদেশ পালন করিয়াছি। আমাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমার অনুরোধ, আমাকে যেন বীরের মতো তোপের মুখে মরিতে দেওয়া হয়।

পরিশিষ্ট (গ)

সিপাহী যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জী

১৮৫৭ ১০ই মার্চ—বহরমপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহ।

১৯শে মার্চ—বারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ের বিদ্রোহ।

৩১শে মার্চ—বহরমপুরের বিদ্রোহী পল্টনের পদচ্যুতি।

৮ই এপ্রিল—মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি।

১২ই এপ্রিল—৩৪ নম্বর পল্টনের একজন জমাদারের ফাঁসি।

৯ই মে—মিরাটের ৩য় অশ্বারোহীদলের ৮৫ জন সিপাহীর দণ্ড।

১০ই মে—মিরাটের তিনটি পল্টনের বিদ্রোহ। দণ্ডিত সিপাহীদের মুক্তি। মিরাট-বিদ্রোহীদের দিল্লী যাত্রা।

১১ই মে—বিদ্রোহীদের দিল্লী অধিকার। বাহাদুর শাহ সম্রাট ঘোষিত।

১৩-৩১ মে—ফিরোজপুর, মজঃফরপুর, আলিগড়, নৌশেরা, এটোয়া মৈইনপুরী, রুড়কী, নসিরাবাদ, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি ও শাহজাহানপুরে বিদ্রোহের বিস্তার।

২৭শে মে—কর্ণাল-শিবিরে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আনসনের মৃত্যু।

১-৫ই জুন—মোরাদাবাদ, বদায়ুন, আজমগড়, সীতাপুর, নিমচ, কাশী, কানপুর ও ঝাঁসীতে অভ্যুত্থান।

৬ই জুন—এলাহাবাদে বিদ্রোহ। নানাসাহেব কর্তৃক কানপুর অবরোধ।

৭-৮ই জুন—বিদ্রোহীদের ঝাঁসী-দুর্গ অধিকার—লক্ষ্মীবাঈ-এর ক্ষমতা লাভ। বদলি-সরাই-এর যুদ্ধ ও ইংরেজদের দিল্লী-উদ্ধারের চেষ্টা।

৯-১৮ই জুন—দরিয়াবাদ, ফতেপুর, নওগাঁ, গোয়ালিয়র ও ফতেগড়ে বিদ্রোহ।

২৭শে জুন—নানাসাহেব কর্তৃক কানপুর অধিকার।

২৯শে জুন—চীনহাটের যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয়।

১লা জুলাই—নানাসাহেবের অভিষেক ও "পেশবা" উপাধি ধারণ। হাতরাস ও ইন্দোরের বিদ্রোহ।

২রা জুলাই—বিদ্রোহী কর্তৃক লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী অবরোধ।

৪ঠা জুলাই—অযোধ্যার কমিশনার স্যর হেনরী লরেন্সের মৃত্যু।

১২ই জুলাই—ফতেগড়ের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয়।

১৬ই জুলাই—নানাসাহেবের বিঠুরে পলায়ন। জেনারেল হ্যাভলক কর্তৃক কানপুর উদ্ধার।

২৫শে জুলাই—দানাপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ।

২৭শে জুলাই—কুমার সিংহ কর্তৃক আরা অধিকার।

৩রা আগষ্ট—আরার যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ।

১০ই আগষ্ট—জগদীশপুরে কুমার সিংহের পরাজয়।

১৬ই আগষ্ট—বিঠুরে তাঁতিয়া তোপির পরাজয়। নানাসাহেবের পলায়ন।

১৪ই সেপ্টেম্বর—ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী-উদ্ধারের চেষ্টা ও কাশ্মীর তোরণ আক্রমণ।

১৯শে সেপ্টেম্বর—ইংরেজ কর্তৃক দিল্লীর লাহোর তোরণ অধিকার।

২০শে সেপ্টেম্বর—ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী পুনরধিকার।

২১শে সেপ্টেম্বর—বাহাদুর শাহের আত্মসমর্পণ।

২২শে সেপ্টেম্বর—বাহাদুর শাহের পুত্রদ্বয়ের গ্রেপ্তার ও হত্যা।

২৭শে সেপ্টেম্বর—তাঁতিয়া তোপি কর্তৃক কানপুর পুনরধিকার।

৬ই ডিসেম্বর—সেনাপতি ক্যাম্পবেল কর্তৃক কানপুর অধিকার তাঁতিয়া তোপির পলায়ন ও লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে যোগদান

৯ই ডিসেম্বর—কাল্পীর যুদ্ধ ও তাঁতিয়া তোপির পশ্চাদপসরণ।

১৮৫৮ ২৭শে জানুয়ারী—বাহাদুর শাহের বিচার।

৫ই মার্চ—মেহেন্দী হুসেন এবং গোণ্ডা ও চার্দার রাজা কর্তৃক চাণ্ডাতে ইংরেজ শিবির আক্রমণ।

২১শে মার্চ—ইংরেজ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ উদ্ধার ও ঝাঁসী আক্রমণ।

২২শে মার্চ—কুমার সিংহ কর্তৃক আজমগড় অধিকার।

১লা এপ্রিল—বেত্রবতীর তীরে ইংরেজের সঙ্গে তাঁতিয়া তোপির যুদ্ধ ও পরাজয়।

৩-৫ই এপ্রিল—ইংরেজ কর্তৃক ঝাঁসী অবরোধ ও ঝাঁসী-দুর্গ অধিকার। লক্ষ্মীবাঈর পলায়ন। আজমগড়ে ইংরেজদের দ্বিতীয়বার পরাজয়।

২৩শে এপ্রিল—জগদীশপুরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুমার সিংহের আবার যুদ্ধ ও জয়লাভ।

২৬শে এপ্রিল—কুমার সিংহের মৃত্যু।

৬ই মে—ইংরেজ কর্তৃক বেরিলি উদ্ধার ও বাহাদুরখানের পরাজয়।

১১ই মে—ইংরেজ কর্তৃক মৌলবী আহমদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং শাহজাহানপুর অবরোধ।

২২শে মে—রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বান্দার নবাব ও নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেবের নেতৃত্বে কাল্পীর দ্বিতীয় যুদ্ধ।

২৪শে মে—কাল্পীর পতন।

১লা জুন—লক্ষ্মীবাঈ কর্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার।

১৭ই জুন—ইংরেজ কর্তৃক গোয়ালিয়র অবরুদ্ধ। যুদ্ধস্থলে লক্ষ্মীবাঈ নিহত। তাঁতিয়া তোপির পলায়ন।

২০শে জুন—ইংরেজ কর্তৃক গোয়ালিয়র পুনরধিকার।

১৪ই আগষ্ট—উদয়পুরের যুদ্ধ ও তাঁতিয়া তোপির পরাজয়।

১৭-১৯শে আগষ্ট—ইংরেজ কর্তৃক জগদীশপুর অবরুদ্ধ। অমর সিংহ কর্তৃক জগদীশপুর রক্ষার চেষ্টা ও তাঁহার পরাজয়।

২৫শে আগষ্ট—মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

১লা নভেম্বর—মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারিত।

১৮৫৯ ২১শে জানুয়ারী—শিকহারের যুদ্ধে তাঁতিরা তোপির পরাজয়।

৭ই এপ্রিল—মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁতিয়া তোপি ধৃত।

১৮ই এপ্রিল—তাঁতিয়া তোপির ফাঁসি।